
অভিজ্ঞান রায়চৌধুরী
অনিলিখা
রহস্য সমগ্র ২

Arajakata Exclusive

অভিজ্ঞান রায়চৌধুরী

অনিলিখা রহস্য সমগ্র ২



পত্রভারতী®

রাজর্ষি সরকার, সমুদ্র বসু, সংকেত মিত্র,
শুভজিৎ রায়, সোনাল দাস, রবি দাস
ও
অনিলিখার আরও অসংখ্য পাঠকভক্তদের
যাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা ছাড়া অনিলিখা এত বছর ধরে
বাংলা সাহিত্যের আকর্ষণের কেন্দ্রে থাকত না।

অনিলিখার যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৯৯৬ সালের এপ্রিল মাসে কিশোর ভারতীর পাতায়। গল্পের নাম ছিল 'মিকুমুর গবেষণা'। এখনও এত বছর বাদে সে গল্প অনিলিখার অন্য অনেক গল্পের মতো বিভিন্ন আলোচনায় ঘুরে-ফিরে আসে।

তারপরে আরও দুই যুগ কেটে গেছে। অনিলিখাকে নিয়ে অনেক গল্প, অনেক উপন্যাস লেখা হয়ে গিয়েছে গত সাতাশ বছরে। অনিলিখা পৌঁছে গেছে প্রায় সব বাঙালি পাঠকের ড্রয়িংরুমে। অজান্তেই অনিলিখা অনেক পাঠকের প্রতিবেশী হয়ে উঠেছে। সাম্প্রতিককালে 'স্পটিফাই অরিজিনাল'-এ অনিলিখার বেশ কিছু উপন্যাস নিয়ে অডিও সিরিজ হয়েছে। এই সিরিজ ২০২২ সালে অডিও স্টোরি বিভাগে ভারতের 'বেস্ট প্রোডিউসড ফিকশন'-এর মর্যাদা পেয়েছে।

এমন অনেক পাঠকই আছে, যাঁরা সারাবছর অনিলিখাকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের অপেক্ষায় থাকেন। অনিলিখাকে ঘিরে এই উৎসাহ-উদ্দীপনা আমাকে অবাক করে, উৎসাহিত করে। সেই আকাশছোঁয়া প্রত্যাশাপূরণের জন্য প্রত্যেকবার এমন কিছু লেখার চেষ্টা করি, যা আগে কখনও লেখা হয়নি। লিখতে চেয়েছি এমন কিছু লেখা যা ভবিষ্যতের পাঠক তৈরি করবে, ভবিষ্যতের সম্ভাবনার কথা সামনে নিয়ে আসবে। অনিলিখার জায়গা সেখানেই। অনিলিখা গবেষক নয়, গোয়েন্দাও নয়, প্রফেসারও নয়। চেনা কোনও পথেই অনিলিখা হাঁটে না।

আমি চেয়েছিলাম অনিলিখাকে অত্যন্ত সৎ, সাহসী, তীক্ষ্ণধী, বিজ্ঞানমনস্ক এক নারী চরিত্র হিসেবে গড়ে তুলতে। তার মধ্যে সবার আগে অবশ্যই থাকবে মানবিকতা, সততা।

অনিলিখার গল্প ঠিক কাদের জন্য? যাঁরা পড়েছেন তারা সবাই জানেন, অনিলিখার প্রত্যেকটা গল্প বা উপন্যাসই সব বয়সের জন্য।

অনিলিখার গল্প মানে শুধু কল্পবিজ্ঞান নয়, তার মধ্যে উঠে আসে, আজকের সমাজ, বিশ্ব রাজনীতি, মানবিক অনুভূতি, আমাদের চারদিকে ছড়িয়ে থাকা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সম্ভাবনা। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অনিলিখার চরিত্রে কিছু পরিবর্তন এসেছে, হয়তো গল্পের চরিত্রেও। অজস্র পাঠক বহু বছর ধরেই অনিলিখার বিভিন্ন গল্প ও উপন্যাসকে দু'মলাটের মধ্যে পেতে চেয়েছেন। সেই

আগ্রহ থেকেই 'অনিলিখা সমগ্র ১' প্রকাশিত হয়েছিল ২০২১ সালে। এবারে পরের বেশ কিছু অনিলিখা কাহিনি নিয়ে এল 'অনিলিখা সমগ্র ২'। কিছু ক্ষেত্রে পুজোবার্ষিকীতে প্রকাশিত উপন্যাস এই বইতে পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত হয়েছে।

এই বইটি তোমাদের কাছে পৌঁছে দিতে যিনি মূল ভূমিকা গ্রহণ করেছেন আমার সেই প্রিয় সাহিত্যিক ও দাদা পত্রভারতীর কর্ণধার ত্রিদিবদাকে অজস্র ধন্যবাদ জানাই। ধন্যবাদ জানাই বউদি চুমকি চট্টোপাধ্যায় ও স্বর্গীয় কিংবদন্তী সাহিত্যিক অনীশ দেবকে, যাঁরা আমার উপরে ভরসা না রাখলে আমি এই উপন্যাসগুলো কোনওদিন লিখতে পারতাম না। সবশেষে ধন্যবাদ জানাই তোমাদের, যাদের আগ্রহ, উদ্দীপনা আমাকে প্রতি মুহূর্তে স্বপ্ন দেখায় অনিলিখার পরের গল্প লিখতে।

অভিজ্ঞান রায়চৌধুরী

কেনিলওয়ার্থ, ইংল্যান্ড
১০ নভেম্বর, ২০২৩



গল্প

উপন্যাস

গল্প



অনিলিখা ও গন্ধরহস্য

এরকম অসাধারণ ডেভিলের টেস্ট পাচ্ছিস না! তোর কোভিডও হতে পারে! প্রতীকের দিকে তাকিয়ে রাগত দৃষ্টিতে বিশ্বজিৎদা বলে উঠল। তারপরে এ নিয়ে আর কোনো বাক্যব্যয় না করে প্রতীকের ডেভিলের বাকি অংশ নিজের প্লেটে তুলে এনে আবার ডেভিলে মনঃসংযোগ করল।

আমরা আজ কোভিডের ভয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দূরে দূরে বসে আছি। মুখে মাস্ক। সেটা পরে এরকম ডেভিল উপভোগ করা এমনিতেই বেশ শক্ত। তার উপরে বিশ্বজিৎদার এমন মন্তব্য শুনে আমরা সবাই প্রতীকের থেকে আরও দূরে সরে বসার চেষ্টা করলাম। বাড়ি থেকে প্রচুর বকাবকি খেয়ে বেরিয়েছি। কিছু হলে আর দেখতে হবে না।

গত তিন মাসে অনেক কিছুই পাল্টে গেছে। বন্ধ হয়ে গেছে শনিবারের আসরও। আমরা সবাই ঘরবন্দি। লকডাউন বাড়ছে তো বাড়ছেই। প্রথমে ভেবেছিলাম কয়েকদিন। এখন সেটা কয়েক মাসে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

গতকাল রাতে হঠাৎ মেসেজ পেলাম বিশ্বজিৎদার কাছ থেকে। এই শনিবার আবার আড্ডা হবে। সঙ্গে কিছু নিয়মাবলী—মাস্ক পরতে হবে, টেম্পারেচার বা অন্য কোনোরকম কোভিডের সিম্পটম থাকলে আসা চলবে না, মুখে হাত দেওয়া চলবে না, হাঁচি বা কাশির আগে হাত তুলতে হবে—এরকম আঠেরোটা নিয়ম। পরে আরও তিনটে যোগ করেছিল। যার মধ্যে একটা ছিল যে অন্য কারো প্লেটের থেকে খাবার তুলে নিয়ে খাওয়া যাবে না।

ব্যস। আর কে দেখে। সত্যি কথা বলতে কি আমরা সবাই হাঁফিয়ে উঠেছিলাম। এ কয়েক মাসে যা অবস্থা হয়েছে, তাতে এরপরে চিড়িয়াখানায় গেলে জীবজন্তুদের কষ্ট অনেক বেশি অনুভব করতে পারব।

তাছাড়া একটা বড় সুবিধে ছিল। প্রতীকদের এই রামতনু বোস লেনের বাড়িতে এমন কিছু ঘর আছে, যেখানে রীতিমতো কনফারেন্স করা যায়। এক-একটা ঘরের সাইজ এখনকার ফ্ল্যাটের থেকে বড়।

সময়ের আধ ঘণ্টা আগেই আমরা সবাই এসে জমায়েত হয়েছি। বিশ্বজিৎদার পাঠানো একুশটা নিয়মাবলী সতর্কভাবে মেনে দূরে দূরে বসে আছি। সব কিছু কন্টাক্টলেস। মাসিমা অর্থাৎ প্রতীকের মা ডেভিল করেছেন। সবার জন্য আলাদা প্লেট। সেটা খেয়েই প্রতীক মাকে উদ্দেশ্য করে বলেছিল, কোনো টেস্ট নেই মা।

সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বজিৎদার এই মন্তব্য ও ডেভিল অপহরণ। আমিও অবশ্য বিশ্বজিৎদার সঙ্গে সহমত। এরকম ভালো ডেভিলকে টেস্টলেস বলা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ।

সবাই এসে গেছে। এক অনিলিখাদি বাকি। অনিলিখাদি জেনারালি ঘড়ি ধরে ঠিক সময়ে আসে। তাই আর আসবে না ধরে নিয়ে আমরা বেশ হতাশ। অনিলিখাদি না থাকলে যেন শনিবারের আসরের অর্ধেক আনন্দ থাকে না।

একটু রাগও হচ্ছে অনিলিখাদির উপরে। অমন একটা ডানপিটে মেয়ে কোভিডকে এত ভয় পায়।

লকডাউনের ঠিক আগে আগে অনিলিখাদি সুইডেন থেকে ফিরে এলেও চোদ্দোদিন কোয়ারান্টাইনে ছিল। তখনও দেখা হয়নি।

বিশ্বজিৎদা ডেভিলে একটা বড় কামড় দিয়ে মাসিমা মানে, প্রতীকের মায়ের দিকে তাকিয়ে বলল, অসাধারণ হয়েছে মাসিমা। কোভিড নয়, আসলে সর্দি-কাশির জন্য নাক বন্ধ হয়ে যাওয়ায় প্রতীক স্বাদ পাচ্ছে না।

বুঝতে পারলাম কোভিড কথাটা উল্লেখ করে মাসিমাকেও একটু নার্ভাস করে ফেলেছে বিশ্বজিৎদা। এখন পরিস্থিতি একটু হালকা করার চেষ্টা করছে।

যাতে আরেকটা ডেভিল চাওয়া যায়।

ইতিমধ্যে এক অত্যন্ত পরিচিত হাঁটার শব্দ, ঘরের বাইরে চটি খোলার আওয়াজ ও চুড়ির আওয়াজ পেয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি অনিলিখাদি ঘরে ঢুকছে। নীল জিন্সের উপরে লাল টপ। বেশ পরিপাটি সাজ। মুখে অবশ্য মাস্ক। ধীরেসুস্থে ঢোকার ধরন দেখে বোঝা যায় আজ অন্যদিনের মতো তাড়া নেই।

মুহূর্তে ঘরের পরিবেশ বদলে গেল। গরমে হাঁসফাঁস পরিবেশের মধ্যে যেন হঠাৎ এক ঝলক ঠান্ডা নির্মল হাওয়া। অনিলিখাদির সঙ্গে এক'মাস দেখা না হলেও এর মধ্যে ফোন করে করে আমাদের প্রত্যেকের খোঁজখবর নিয়েছে। সবার সঙ্গে 'কে কেমন আছি' এরকম গোছের কিছু প্রশ্ন করে একটু দূরে রাখা একটা সোফায় বসে অনিলিখাদি বলে উঠল, উফ, এখানেও কোভিড নিয়ে আলোচনা! টপিক বদলাতে হবে। শুধু কোভিড নিয়ে আলোচনা চলবে না।

আমি বললাম, চাইলেই বা পারছি কোথায় অনিলিখাদি। চারদিকে এর কোভিড, ওর কোভিড। কিছু দেশে তো মৃতের কবর দেওয়ার জায়গা পাচ্ছে না, এত মানুষ মরছে!

অনিলিখাদি বলে উঠল, আমার মতে ভারতীয়দের খুব ভয়ের কিছু নেই। ভারতীয়দের ইমিউনিটি, জিনের গঠন বৈচিত্র্য এবং যা কিছু কিছু খাদ্যাভাস আছে, তাতে ডায়াবেটিসের মতো কিছু জটিলতা না থাকলে খুব সিরিয়াস কিছু হবে না। সেজন্যই ডেথ রেট এত কম। এটাকে সঙ্গে নিয়েই এখন আমাদের বাঁচতে হবে।

এতদিন বাদে জমজমাট আড্ডা। তারমধ্যে আবার অনিলিখাদি। যা হয় আর কী! নেক্সট এক ঘণ্টা কোভিড, চীন, নেপাল, ইতিমধ্যে কে কী করেছি—এরকম নানান বিষয় নিয়ে আলোচনা হল। অনিলিখাদি মাঝে মধ্যে কথা বললেও মূলত সবার কথা শুনছিল। এটা অনিলিখাদির একটা বৈশিষ্ট্য। চুপ করে বসে সবার কথা শোনে।

কিন্তু কথা যখন বলে, তখন সেটা না শুনে উপায় থাকে না।

কোভিডের জন্য শুনেছি বিশ্বজিৎদার চাকরি গেছে। কিন্তু তবু বিশ্বজিৎদার চীনের প্রতি কেন জানি এক অজানা দুর্বলতা আছে। এমনকী চায়না বলে একটা কুকুরও আছে।

বিশ্বজিৎদা বলে উঠল, জানি না কেন কোভিডের জন্য সবাই চীনকে দোষ দিচ্ছে। বেচারারা নিজেরাও তো ভুগছে। যে কোনো দেশ থেকে এটা ছড়াতে পারত। হ্যাঁ, মানছি ওদের ওখানে যেরকম ওপেন মার্কেট, সেখানে বিভিন্ন প্রাণীর রক্ত মিশে মিউটেট করে নতুন ভাইরাস হওয়ার চান্স থাকে, কিন্তু তার মানে এই নয় যে, ওরা ইচ্ছে করে কিছু করেছে।

আমরা প্রায় সবাই এখন চীন বিরোধী। কোভিড আর লাদাখে চীনের

আক্রমণের পরে চীন নামটা শুনলে আমরা খেপে উঠি। বেচারা চীন। এর পরে যা হয় আর কী! আমরা সবাই মিলে বিশ্বজিৎদাকে অভিমন্যুর মতো ঘিরে ধরে আক্রমণ শুরু করলাম।

বিশ্বজিৎদার শোচনীয় অবস্থার মধ্যে অনিলিখাদি হঠাৎ হাল ধরে বলে উঠল, এবারে এমন বিষয় নিয়ে একটা ঘটনা বলি, যেটা নিয়ে বিশ্বজিৎ কিছু আগে বলছিল।

—কী নিয়ে? অবাক হয়ে তাকাল বিশ্বজিৎদা।

—ওই যে বলছিলে না, যে স্বাদ চলে গেছে প্রতীকের। এটা নিশ্চয়ই জানো স্বাদের আশি শতাংশ আসে ঘ্রাণশক্তির থেকে। ইনফ্যাক্ট আমাদের স্বাদের অনুভূতি খুব দুর্বল। সেখানে ঘ্রাণশক্তি তেমনই প্রবল। স্নিফার ডগদের থেকে কোনও অংশে খারাপ নয়। অ্যাটমিক লেভেলে তফাত করতে পারি। তাই ঘ্রাণশক্তি হারালে আমরা সেন্স অফ টেস্ট হারাই, সেটা জানো নিশ্চয়ই। সুইজারল্যান্ডে একটা লোকের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলার অভিজ্ঞতা হয়েছিল। ঘ্রাণশক্তি নিয়ে সেই গল্পটা আজ বলি।

আমরা সবাই অনিলিখাদির গল্পের অপেক্ষায় ছিলাম। জানি টপিক যাই হোক না কেন, সব ঘটনাই খুব ইউনিক আর রোমহর্ষক হয়। একটা ম্যাগনেটিক আকর্ষণ থাকে।

একসঙ্গে চিৎকার করে উঠলাম, শিগগির বলো।

বিশ্বজিৎদা শুধু ঠোঁটের কোণে একটু হাসি ফুটিয়ে বলল, লকডাউনে অনিলিখার গল্পের স্টক শেষ হয়ে গেছে দেখছি। শেষে ঘ্রাণশক্তি।

অনিলিখাদি কথাটা শুনে মুচকি হেসে বলতে শুরু করল—ব্যার্ন হচ্ছে সুইজারল্যান্ডের রাজধানী। কিন্তু অনেকেই সে শহরকে চেনে না। সুইজারল্যান্ড বলতে আমরা ভাবি শুধু জুরিখ, বা জেনেভার কথা। ব্যার্ন শহরের ইতিহাসের সঙ্গে আমার সবথেকে প্রিয় বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের অনেক কাজ জড়িয়ে আছে। তাই ব্যার্ন শহর দেখার একটা প্রবল আগ্রহ ছিল। সে সুযোগ হঠাৎ পেয়ে গেলাম।

এটা বছর দুয়েক আগের ঘটনা।

বিকেল চারটে নাগাদ আমার জুরিখের কাজ শেষ হয়ে গেল। পরের দিন আবার বারোটায় মিটিং জেনেভায়। নেসলে কোম্পানির চিফ টেকনোলজি অফিসারের সঙ্গে। সকালে যাওয়া যায়, কিন্তু সুপার ফাস্ট ট্রেনেও তিন ঘণ্টা লাগবে। ব্যার্ন জুরিখ আর জেনেভার প্রায় মাঝামাঝি। সেদিন রাতে ব্যার্নে চলে গেলে আইনস্টাইনের বাড়ি, সেই বিখ্যাত ক্লক টাওয়ার ইত্যাদি দেখে নেওয়া যাবে। সকালে ওখান থেকে ঘণ্টা দেড়েকের ট্রেনে জেনেভা চলে যাওয়া যাবে। মিটিং-এর অনেক আগে পৌঁছে যাব।

সেই প্ল্যানমাফিক ব্যার্নে পৌঁছলাম সন্ধে সাতটা নাগাদ। সেপ্টেম্বরের শেষ দিক। ঠান্ডা পড়তে শুরু করেছে। ব্যার্ন হোপ-বান-হফ বা সেন্ট্রাল স্টেশন থেকে হাঁটাপথ আমার হোটেল। হোটেল না যেন এক ক্যাসল। আশেপাশের সব বাড়িও প্রায় মধ্যযুগের। নিরপেক্ষ দেশ হওয়ার জন্য দুই বিশ্বযুদ্ধই ব্যার্নের সৌন্দর্যে কোনো আঘাত হানেনি।

হোটেলে জিনিসপত্র রেখে প্রথমেই গেলাম আইনস্টাইনের বাড়ি দেখতে। বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তবু বাইরে থেকে দেখলাম।

ওঁর বাড়ি থেকে ক্লক টাওয়ার মিনিট পাঁচেকের হাঁটা পথ।

জিটগ্লগ ক্লকটাওয়ার। ১২১৩ সাল নাগাদ তৈরি। রাস্তার দু-ধারে সুইস ফ্ল্যাগ লাগানো। ছোট ছোট পাথরে সাজানো রাস্তা। রাস্তার মাঝ বরাবর ট্রামলাইন গেছে। দু-ধারে সামান্য উঁচু ফুটপাথ পাথরের রাস্তার সঙ্গে প্রায় মিশে গেছে। রাস্তার ঠিক মাঝে দাঁড়িয়ে থাকা মধ্যযুগীয় ক্লকটাওয়ারটা দূর থেকে দেখা যায়। দু-ধারে ব্যারোক স্টাইলের বাড়ি।

এই পথে হাঁটতে হাঁটতে আইনস্টাইনের মাথায় এসেছিল থিওরি অফ রিলেটিভিটির কথা। $E=mc^2$ এই সূত্রও এখানে থাকতেই লেখা। এই পথটাও খুব বিখ্যাত, বলা হয় কামগ্যাসে।

এটাই ছিল পুরোনো ব্যার্নের সেন্টার।

ওই রাস্তায় হাঁটার সময় একদম অন্যরকম এক অনুভূতি হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল সেই জিনিয়াস বিজ্ঞানীও যেন আমার পাশে পাশে হাঁটছেন। মনে হচ্ছিল যেন শুনতে পাচ্ছিলাম ওনার কথা—আসলে লোকে যেমন ভাবে আমি তেমন বুদ্ধিমান নই, অনিলিখা। আমি শুধু প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার জন্য অনেক বেশি সময় দিই, যেটা তোমরা দাও না।

রাস্তার মধ্যে সাইকেলের জন্য আলাদা নির্দিষ্ট লেন আছে। চারদিকের মধ্যযুগীয় পরিবেশের মধ্যে দিয়ে সাপের মতো এগিয়ে চলেছে সুইস ফ্ল্যাগের রঙের অত্যাধুনিক চার-কামরার ট্রাম। শহরের কেন্দ্রের এই পুরো জায়গাটা ইউনেস্কোর হেরিটেজ সাইটের মধ্য পড়ে। এর পরেই শপিং প্রমিনেড, সেখানে অনেক সুইস চকলেট আর ঘড়ির দোকান।

হাঁটতে হাঁটতে কিছুটা যাওয়ার পরে একটা বড় চত্বর খুঁজে পেলাম। খাবার টেবিল ছড়িয়ে রাখা আছে। তার চারদিকে নানান পাব-রেস্টুরেন্ট। তার মধ্যে একটা ভারতীয় রেস্টুরেন্টে খেয়ে নিলাম।

দেখলাম ব্যার্নের নিজস্ব জার্মান ভাষা আছে। সেটা অন্য জার্মান ভাষা থেকে একটু আলাদা।

খেয়ে উঠে আবার ঘুরে দেখতে শুরু করলাম। ততক্ষণে সূর্যাস্ত হয়ে গেছে। কিছুটা দূরে শহরের মাঝখান দিয়ে সবজেটে রঙের নদী বয়ে যাচ্ছে।

'আরা' নদী। এরকম এত সবুজ জলের রঙ আমি আগে দেখিনি।

পথে একটা ক্যাথেড্রাল দেখে হাঁটতে হাঁটতে যে জায়গায় শেষে এসে পৌঁছলাম, সেটা একটা বিশাল বড় খোলা চত্বর। সামনে অনেকগুলো ফোয়ারা। সামনে ভারি সুন্দর পুরোনো দিনের এক প্যালেস। খেয়াল করে দেখলাম আসলে ওটা সুইজারল্যান্ডের পার্লামেন্ট। তবে সেরকম কোনো সিকিউরিটি চোখে পড়ল না। অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল। প্রায় দশটা। পার্লামেন্ট বন্ধ থাকলেও তার পিছন দিকে একটা ভারি সুন্দর বিশাল বাগান। বাগানটা পাহাড়ের একদম ধারে। দূরে অন্য পাহাড়ের গায়ে ছড়িয়ে থাকা বাড়ির আলো যেন জোনাকির মতন জ্বলছে। মাঝখানে অনেক নীচ দিয়ে বয়ে গেছে পাহাড়ি নদী আরা। সব মিলিয়ে এক মোহময়ী পরিবেশ। যেন কোনো শিল্পীর ক্যানভাস।

বাগানে গিয়ে একটা বেঞ্চিতে বসলাম। ঠান্ডা বাড়ছে। অনেক দূরে একটা প্যালেস দেখা যাচ্ছে।

শুনেছি 'সুইস ফ্যামিলি রবিনসন'-এর লেখক ইউহান ডেভিড উঁইসও এখানেই থাকতেন।

এর মধ্যে হাওয়া দিতে শুরু করল। কনকনে হাওয়া। একটা বিশ্রী গা-গোলানো গন্ধ ভেসে এল বাতাসে। মনে হল যেন কিছু মরে পচে গেছে। ওই বেঞ্চি থেকে দূরে সরে অন্য দিকের একটা বেঞ্চিতে এসে বসলাম।

সামান্য ঠান্ডা লাগলেও এরকম মনোরম দৃশ্য চট করে দেখতে পাওয়া যায় না। বাগানের কিছু আলো জ্বলে উঠেছে, তবে সে আলো চারধারের অন্ধকারের অধিকার বজায় রেখেই যেন তার নিজের জায়গা করে নিয়েছে। সে দৃশ্য বিভোর হয়ে দেখছি, হঠাৎ লক্ষ করলাম আমার বেঞ্চে আমার পাশে এক মাঝবয়সি ভদ্রলোক এসে বসেছেন।

মদের গন্ধ ভুরভুর করছে সারা গা দিয়ে। চোখে ভারী ফ্রেমের চশমা। জিনসের উপরে না গোঁজা একটা সাদা নোংরা শার্ট। এসব সত্ত্বেও দেখে মনে হয় শিক্ষিত।

আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই হেসে বললেন, আর ইউ ফ্রম বেঙ্গল?

একটু অবাক হলাম। আমাকে দেখে ইউরোপে অন্তত চট করে কেউ বাঙালি ভাবে না। বরঞ্চ স্প্যানিশ ভেবে অনেকে ভুল করে। তাও এটা জুরিখ হলে বুঝতাম। কিন্তু ব্যার্নে? আমাকে কী চেনেন উনি?

সম্মতি জানিয়ে জিগ্যেস করলাম, আপনি কি বাংলাদেশে বা ভারতে গিয়েছেন? কী করে বুঝলেন?

উনি হেসে মাথা নাড়লেন। বললেন, না, যাইনি। তবে কী কারণে বুঝলাম, সেটা তোমাকে বললে তুমি অবাকই হবে। ওই যে ওদিকের বেঞ্চি ছেড়ে এদিকে এসে বসলে না। সেটা দেখে বুঝলাম ওই ক্যালিসাস ফুলের গন্ধ তোমার সহ্য

হচ্ছে না। যে কোনও বাঙালিরই একই অবস্থা হত। অথচ অন্য সবার ওই ফুলের মিষ্টি গন্ধ খুব ভালো লাগবে।

—মানে? এর সঙ্গে কোনো জেনেটিক সম্পর্ক আছে নাকি?

—ঠিক বলেছ। আসলে এটা খুব রেয়ার একটা ফুল। বাঙালিদের প্রায় সবার মধ্যে একটা বিশেষ জিন আছে, যার জন্য তারা এই গন্ধ সহ্য করতে পারে না। জেনেটিক মিউটেশনের জন্য এটা হয়েছে। কারণটা কী জানি না।

আমি হেসে বলে উঠলাম, হ্যাঁ, আমিও এরকম কিছু একটা সায়েন্স জার্নালে পড়েছিলাম—যে কোনও একটা বিশেষ গন্ধ আফ্রিকানদের কাছে খুব খারাপ লাগে। কিন্তু তাদের বাদ দিলে প্রায় সবার খুব ভালো লাগে। ওই বিশেষ গন্ধটা তৈরি করতে অ্যান্ড্রোস্টেনন নামের শুয়োরের ফেরোমন ব্যবহার করা হয়।

এটা নাকি জেনেটিক মিউটেশনের সঙ্গে কানেক্টেড। যখন থেকে মানুষ শুয়োর প্রতিপালন শিখল ও শুয়োর খেতে শিখল, তখন থেকে নাকি এরকম মিউটেশন হয়েছে, যার জন্য ওই গন্ধ আমাদের ভালো লাগে। কিন্তু আফ্রিকানদের মধ্যে সে পরিবর্তন হয়নি।

লোকটা আমার কথা শুনে উৎসাহিত হয়ে বলল, বাহ্! তোমার তো অনেক পড়াশোনা আছে দেখছি। হ্যাঁ, এটাও খানিকটা সেরকমই।

—আপনি কি এ বিষয়ে রিসার্চ করেন? গন্ধ নিয়ে?

লোকটা একটু যেন অন্যমনস্ক হয়ে বলল, হ্যাঁ, তা বলতে পারো। আগে করতাম। এখন শুধু গন্ধ বিশেষজ্ঞ বলতে পারো।

—কিন্তু এ বিষয় নিয়ে কি খুব বেশি রিসার্চের সুযোগ আছে? যদিও জানি এ নিয়ে দু-বছর আগে দুই বিজ্ঞানী নোবেল প্রাইজও পেয়েছেন। কোথায় যেন পড়েছিলাম আমরা শুধু গন্ধ শুঁকে মলিকিউলার লেভেলে দুটো উপাদানের মধ্যে তফাত করতে পারি।

লোকটা খানিকক্ষণ বিড়বিড় করে ফের বলে উঠল, তোমাকে ক'টা গল্প শোনাই। আসলে সাধারণত এমন কাউকে পাই না যে এত কিছু খবর রাখে। তুমি কে জানি না। জানতেও চাই না। এক্ষেত্রেও গল্প শোনার একটাই শর্ত হবে—আমার পরিচয় তুমি জিজ্ঞাসা করতে পারবে না।

তুমি তো জানতে চাইছিলে গন্ধ নিয়ে কী এত রিসার্চ করা যায়, তাই না?—একটু থেমে নাটকীয়ভাবে বলল লোকটা, গন্ধ দিয়ে পুরোনো স্মৃতি ফিরিয়ে আনা যায়। এমনকী গন্ধ দিয়ে মানুষকে খুনও করা যায়।

লোকটা সামনের দিকে তাকিয়ে গল্প বলতে শুরু করল। পাশে বসে থাকলেও মনে হচ্ছিল যেন হঠাৎ করে লোকটা অনেক দূরে চলে গেছে। হারিয়ে গেছে অন্য কোনো জগতে। এমনকী মাঝেমধ্যে জার্মান ভাষাতেও বলছিল।

এই জায়গাটা অনেকটা উঁচুতে। একটা ঘন কুয়াশা ভেসে বেড়াচ্ছিল

আমাদের চারদিকে। লোকটা তারমধ্যে যেন মাঝে মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছিল।

—আজ নয়, আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে একজন বলেছিল যে, মানুষ ঘ্রাণশক্তি দিয়ে অতি সূক্ষ্ম দুই কণার মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। কে আন্দাজ করতে পারো?

—ডেমোক্রিটাস।

—'আস-গে-যাইনেট!' অর্থাৎ অসাধারণ।

—দেখো আড়াই হাজার বছর আগে বলে গেলেও কুড়ি বছর আগেও আমরা ঘ্রাণশক্তি সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানতাম না। কিন্তু সেটাই বদলে দিল আমার এক বন্ধু। তার আবিষ্কার। মানুষের সবথেকে উন্নত অনুভূতি কী জানো?

—ঘ্রাণশক্তি।

—পারফেক্ট। মানুষের মতো উন্নত ঘ্রাণশক্তি খুব কম প্রাণীর মধ্যে আছে। এর পিছনে আছে 'অলফ্যাক্টরি এপিথেলাম রিসেপটর'।

প্রায় চারশ টাইপের রিসেপটর আছে, আর পাঁচ কোটির মতো রিসেপটর সেল আছে, যারা প্রত্যেকে আবার বিভিন্ন ধরনের গন্ধ চিহ্নিত করতে পারে। তার মাধ্যমে আমরা কত ধরনের গন্ধ পেতে পারি জানো তো?

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে লোকটা নিজেই তার প্রশ্নের উত্তর দিল, প্রায় লক্ষ কোটি। এ এক অসাধারণ ক্ষমতা। একটা হেপ্টানল সাতটা কার্বনের চেন দিয়ে তৈরি। আমরা গন্ধ শুঁকে তার সঙ্গে একটা অক্টানল বা আট কার্বন চেন যুক্ত অ্যালকোহলকে আলাদা করতে পারি। এসবের পিছনে আছে ওই সব জিন রিসেপটর। আবার এই জিনে সামান্যতম পরিবর্তন হয়ে যাওয়ার জন্য একটা লোকের ঘ্রাণশক্তি পুরো বদলে যেতে পারে।

আমার বন্ধু এসব নিয়ে রিসার্চ করছিল। প্রায় কুড়ি বছর কঠোর পরিশ্রমের পর সাফল্য আসে। সেই সব জিন রিসেপটরকে সে চিহ্নিত করতে পারে। বুঝতে পারে যে, এর উপরে নির্ভর করে বিভিন্ন ড্রাগ বিভিন্ন রোগীর উপরে প্রয়োগ করা যেতে পারে। চিকিৎসাবিজ্ঞানে সাড়া ফেলে দেওয়ার মতো এ এক দারুণ আবিষ্কার।

আমার বন্ধু শুধু একটা ভুল করেছিল। সে তার আবিষ্কারের সব খুঁটিনাটি কথা তার স্ত্রীকে বলত। রোজ বলত। তার স্ত্রীও বিজ্ঞানী ছিল। সে ছিল মলিকিউলার বায়োলজিস্ট। খুব মনোযোগ দিয়ে বন্ধুর সব কথা শুনত। এ বিষয়ে আলোচনা করত।

আমার বন্ধু কখনও পেটেন্ট-এর কথাও ভাবেনি। একদিন ওর সঙ্গে ওর স্ত্রীর ডির্ভোস হয়ে গেল। বন্ধু তখনও ভাবেনি ওর আবিষ্কার অন্য কেউ তার আবিষ্কার বলে দাবি করতে পারে। সে দিনরাত শুধু এই গন্ধের রহস্য সন্ধানে

ব্যস্ত ছিল। একই সঙ্গে অন্ধভাবে তার স্ত্রীকে বিশ্বাস করেছিল। এমনকী ডিভোর্সের পরেও।

কয়েকবছর বাদে এই আবিষ্কারের জন্য পেটেন্ট অ্যাপলাই করতে গিয়ে সে অবাক হল। তার আগেই এ বিষয়ে পেটেন্ট নিয়ে নিয়েছে দুজন। তার মধ্যে একজন তার প্রাক্তন স্ত্রী লিসা বাক।

কী অবস্থা তখন তার ভাবতে পারো?

—কী করল সেই লোকটা?

—কী আবার করবে? সে চায়নি তার স্ত্রীকে ছোট করতে। আবার ক্ষমাও করতে পারেনি।

আমি আমার বন্ধুকে একদিন জিগ্যেস করেছিলাম কী করে সে এত বড় অপরাধ ক্ষমা করতে পারল। সে আমার প্রশ্নের কোনো উত্তর দেয়নি।

—আপনার বন্ধু কি এখানেই থাকে?

—না, এখন সে লুসারনে থাকে। আগে সে ইউনিভার্সিটি অফ ব্যার্নে পড়াত। কিন্তু এসব ঘটনার পর থেকে সে শহর ছেড়ে চলে যায়। এখন ওখানে একটা পারফিউম সংস্থার রিসার্চের সঙ্গে যুক্ত।

তবে তার এখানে আসা-যাওয়া ছিল। আমার সঙ্গে এক পাবে নিয়মিত দেখা হত তার। এই শহরেই। সন্ধের পর সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেই পাবে ড্রিংক করে যেত। মনে হত যেন তার বেঁচে থাকার সব ইচ্ছেই চলে গেছে। সে তার অস্তিত্ব ভুলে যেতে চায়।

আসলে সবার কাছেই তার কাজের স্বীকৃতি খুব জরুরি। অনেকটা নিজের সন্তানকে হারিয়ে ফেলার মতো। সেটা কোনো আর্থিক মূল্যের উপরে নির্ভর করে না। শুনেছি সে দু-দুবার আত্মহত্যার চেষ্টাও করেছিল।

আজ অনেকদিন পর তার সঙ্গে পাবে দেখা হল। কিছুক্ষণ আগে। সে এখানে এসেছে তার স্ত্রীকে একটা উপহার দিতে। ওর নিজের হাতে তৈরি করা একটা পারফিউম উপহার দিতে।

—বলেন কী। এত কিছুর পরেও?

—তাহলেই ভেবে দেখো। শুধু তাই নয়। ডিভোর্সের সময় ও যে কুকুরটাকে ওর সঙ্গে রাখার অধিকার পেয়েছিল, স্ত্রীর প্রিয় সেই ডোবারম্যান কুকুরটাকেও একমাস আগে স্ত্রীর কাছে রেখে গেছে।

—তা আপনার বন্ধুর নাম কী?

—এই তো, আগেই বলেছিলাম আমার বা আমার বন্ধুর পরিচয় জিজ্ঞাসা করা যাবে না। আসলে গল্পের মজাই এখানে। বেশি জানলেই মুশকিল।

—আচ্ছা, দু-বছর আগে দুজনে মিলে এ বিষয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের

জন্য নোবেল প্রাইজও পেয়েছিল, তাই না। তার মধ্যে কি কেউ আপনার বন্ধুর স্ত্রী?

—হতে পারে। তুমি হয়তো ঠিকই আন্দাজ করছ। শুনেছি ওর স্ত্রী এখন চীনের একটা সংস্থার চিফ সায়েন্টিস্ট। অবশ্য এখানেই থাকে।

এতটা বলে লোকটা খানিকক্ষণ চুপ করে বসে থাকল। মনে হল যেন নেশার ঘোরে লোকটা ঘুমিয়ে পড়েছে। এমনিতেও কথা জড়িয়ে আসছিল। তার মধ্যেও আরও কিছু কথা বলতে থাকল, অস্পষ্ট স্বরে। আমি যদিও খুব মনোযোগ দিয়েই শুনছিলাম।

খানিকবাদে বলে উঠলাম, তা আপনি যে বলেছিলেন গন্ধ দিয়ে খুনও করা যায়। সেটার কী তাৎপর্য এখানে বুঝলাম না।

লোকটা আস্তে আস্তে বলে উঠল, এই যে অলফ্যাক্টরি রিসেপটর তা কিন্তু ম্যানিপুলেট করা যায় বা পরিবর্তন করা যায়। গন্ধ এতটাই খারাপ লাগতে পারে যে তুমি তার জন্য কাউকে আক্রমণও করতে পারো।—এতটুকু বলে লোকটা কাশতে শুরু করল।

তার কাশি থামতেই জিজ্ঞাসা করলাম—মানে? আচ্ছা, আপনার ওই বন্ধু ওই পারফিউমটা কি বিশেষ কোন পারফিউম? কারো খারাপ লাগতে পারে?

আমাকে থামিয়ে ভদ্রলোক বললেন, আমি কিছু বলতে চাইনি। আজ উঠি। এখন ঠান্ডা পড়ছে। গুটে নাখত। ইখ বিটে ফুর ডিসে ফ্রাউ।

—অর্থাৎ 'শুভ রাত্রি। আমি সেই মহিলার জন্য প্রার্থনা করি।'

বলে লোকটা উঠে দাঁড়াল। দেখলাম লোকটা মদের নেশায় টলমল করতে করতে বাগান থেকে বেরিয়ে গেল।

আমি আরও খানিকক্ষণ বসে থেকে উঠে পড়লাম।

খবরটা পেয়েছিলাম দুদিন বাদে প্যারিসে গিয়ে। নিউ ইয়র্ক টাইমসে দেখি দুটো ভারি অদ্ভুত খবর। আমি অবশ্য সেটা সেদিনই আন্দাজ করেছিলাম।

বিখ্যাত নোবেল বিজয়ী সায়েন্টিস্ট লিসা বাক কুকুরের আক্রমণে মারা গেছেন। বাড়ির ডোবারম্যান কুকুরটা তাকে হঠাৎ আক্রমণ করেছিল। উনি নাকি ড্রেসিংরুম থেকে বেরোনোর পরপরই বাড়ির কুকুর ওঁকে আক্রমণ করে। যেভাবে বারবার কামড় বসিয়েছে, সেই হিংস্রতা দেখে পুলিশও অবাক। কীভাবে বাড়ির পোষা কুকুর এরকম হিংস্র হয়ে উঠতে পারে, সেটাই ভাবাচ্ছে পুলিশকে। তবে এর পিছনে অন্য কিছুর যে হাত নেই, এ বিষয়ে পুলিশ নিশ্চিত।

সহেলী উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল, তার মানে লোকটার দেওয়া ওই পারফিউমে এমন কিছু ছিল যা ওই কুকুরের মধ্যে পরিবর্তন এনেছিল। তাই তো? সেটাই কুকুরটাকে হিংস্র করে তুলেছিল। সহ্য করতে না পেরে আক্রমণ করে।

—ঠিক বলেছিস। তাছাড়া আমার ধারণা ওই কুকুরের 'অলফ্যাক্টরি রিসেপটর'-এও পরিবর্তন আনা হয়েছিল, যাতে সে ওই গন্ধ একেবারে সহ্য করতে না পারে। হিংস্র হয়ে ওঠে। সেই সুযোগ ওই লোকটার বন্ধুর ছিল। কুকুরটা তো তার কাছেই ছিল।

—কিন্তু ওই লোকটা কে ছিল?

—খুব সম্ভবত ওই ভদ্রলোক নিজেই। বন্ধুর নামে নিজের কথাই বলছিল।

—তা তুমি পুলিসে জানাওনি?

—যারা এভাবে অন্যকে বঞ্চিত করে তাদের আবিষ্কার চুরি করে নিজের নামে চালায়, তাদের জন্য আমার খুব একটা সহানুভূতি হয় না। তাছাড়া আরেকটা কারণও অবশ্য ছিল, সেটা পরে বলছি।

—এটা কিন্তু গরুর রচনার মতো হল। যে বিষয় নিয়েই জিজ্ঞাসা করা হোক না কেন, ঠিক সেই গরুর মুখস্থ করা রচনা লিখতে হবে। কোথায় কোভিড, ঘ্রাণশক্তি আর চীন নিয়ে কথা হচ্ছিল আর কোথায় কুকুরের খেপে যাওয়ার গল্প। এবারে বিশ্বজিৎদা অনিলিখাদিকে সরাসরি আক্রমণ করে বসল।

অনিলিখাদি একটু হেসে বলল, আসলে লোকটা অস্ফুটে খুব দরকারি কয়েকটা কথা বলেছিল। যেমন বলেছিল যে, 'অলফ্যাক্টরি রিসেপটর'-এর মধ্যে মানুষের জেনেটিক পরিচয় লুকিয়ে থাকে। অর্থাৎ গন্ধের অনুভূতি দিয়ে মানুষ আলাদা করা যায়। ওর বন্ধুর স্ত্রীর কাছে নাকি চীন থেকে দুজন লোক এসেছিল কিছু তথ্যের সন্ধানে। ওরা নাকি জানতে চেয়েছিল যে, এমন ভাইরাস ডিজাইন করা যায় কিনা যা ঘ্রাণশক্তির বিচার অনুযায়ী মানুষকে প্রভাবিত করতে পারে। ওই ভদ্রমহিলা, লিসা বাক তাদের সাহায্য করার আশ্বাস দিয়েছিলেন। এটা অবশ্য বছর দুয়েক আগের কথা। সে কথাটা মনে পড়তেই এ ঘটনাটা বললাম।

—মানে? তুমি বলতে চাইছ এমনভাবে ভাইরাস তৈরি করা যায় যাতে যার যেরকম ঘ্রাণশক্তি, তার উপরে নির্ভর করে ঠিক সেরকম ভাবে প্রভাব ফেলে।

বিশ্বজিৎদা সোশ্যাল ডিস্টান্সিং-এর সব নিয়ম ভেঙে মাস্ক খুলে অনিলিখাদির এক ফুট কাছে এসে বলে উঠল।

—সহজ কথায় বললে, ঘ্রাণশক্তির সঙ্গে সরাসরি জেনেটিক যোগাযোগ থাকার জন্য তা দিয়ে লোক আলাদা করা যায়। পুরো সম্পর্কটাই জেনেটিক লেভেলে। এবারে ধরো, তুমি চাইলে এমন একটা ভাইরাস তৈরি করতে যা যারা আরশোলা বা ব্যাঙ ভালো খায় তাদের উপরে কম প্রভাব ফেলবে, যারা স্কচ এগ, ডিমের ডেভিল বা রেড ওয়াইন বেশি পছন্দ করে, তাদের উপরে অনেক বেশি প্রভাব ফেলবে, তাদের জন্য অনেক বেশি ডেডলি হয়ে উঠবে। কি এবার বুঝলে?

সর্বনাশ। তার মানে তুমি বলতে চাও কোভিড চায়নাতে তৈরি করা।

—দেখো যতক্ষণ চীনের বিরুদ্ধে পুরোপুরি প্রমাণ না পাওয়া যায়, ততদিন এটাকে শুধু একটা সম্ভাবনাই বলতে হবে। এটাও ঠিক ওই খুনেরই মতো।

একটু থেমে বিশ্বজিৎদা নার্ভাস হয়ে বলল, আচ্ছা, তুমি ডেভিল নিয়ে যে কথাটা বললে সেটা কি শুধুই উদাহরণ, নাকি ওই লোকটা বলেছিল?

অনিলিখাদি শুধু মিষ্টি হাসল, কোনো উত্তর দিল না।

উত্তর না পেয়ে বিশ্বজিৎদা ফের বলে উঠল, যাই হোক, তুমি একটা খুনিকে বাঁচিয়েছ। এর থেকে বড় অপরাধ আর কিছু হয় না।

অনিলিখাদি অন্যমনস্কের মতো বলে চলল, কখনও কখনও মানুষ আইনের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে যায়। তখন কিছুই করা যায় না। আমি সেজন্যই দুটো অদ্ভুত খবর পড়েছি বলেছিলাম। দ্বিতীয় খবরটা ছিল কয়েক দিন আগে 'লিসা বাক'-এর প্রাক্তন স্বামীর সুইসাইডের খবর। শুধু জানি না আমার সঙ্গে যখন দেখা হয়েছিল তখন তিনি ভূত না ভূতপূর্ব অবস্থায় ছিলেন।



মিস্টার পাই-এর শিকার

১৮ সেপ্টেম্বর

কমো এস্তাস প্রফেসরা পাই?

অর্থাৎ প্রফেসার পাই কেমন আছ?

ফোনের কণ্ঠস্বর শুনেই বুঝতে অসুবিধে হল না কে ফোন করেছে।

কার্লোস-এর ফোন!

মাদ্রিদে এসেছি [illegible] সপ্তাহ হল। কার্লোস যে মাদ্রিদ থেকে মোটে একঘণ্টা দূরে থাকে সেটা একদম ভুলে গিয়েছিলাম।

কার্লোসের সঙ্গে আমার এত বছরের আলাপ যে কবে, কোথায় প্রথম দেখা হয়েছিল, তাই ভুলে গেছি। ও জ্যু। গ্লোবাল ওয়ার্মিং ও প্রাণীজগতের উপরে তার প্রভাবের উপরে রিসার্চের জন্য বিজ্ঞানীমহলে ও সুবিদিত।

আমি এসেছি একটা বিখ্যাত সায়েন্স কনফারেন্সে। সেখানে অবশ্য কার্লোস আসেনি। কিন্তু আমি যে স্পেনে এসেছি সে খবরটা পেয়েছে।

ফোনে কার্লোস ফের, কবে আসছ তাহলে আমার বাড়িতে?

আগে ফোন না করার অপরাধে মনে মনে লজ্জিত ছিলাম। সে অপরাধবোধ থেকেই হয়তো যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলাম। এখানে আছি আরও দু দিন। সকালে গিয়ে বিকেলের মধ্যে ফিরে আসব এরকম জানালাম।

কিন্তু কার্লোস সেটা শুনে হাই-হাই করে উঠল। এক বেলা থাকলে হয় নাকি! কথাই হবে না। অন্তত একদিন রাতে থাকার প্ল্যান করে এসো। মনে আছে তোমাকে বলেছিলাম সেই নেকড়েটার কথা, যাকে আমি চারনোবিল থেকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলাম দু-সপ্তাহ আগে। তোমার মতো গবেষেকও ওকে দেখে অনেক চিন্তাভাবনার ইন্ধন পেয়ে যাবে। তাছাড়া এতদিন বাদে দেখা।

নেকড়ে? সেদিন যেন বেড়ালের কথা শুনেছিলাম। অবশ্য ভুল শুনে থাকতে পারি।

হ্যাঁ, নেকড়ে বলেছিলাম না! কোথায় নেকড়ে আর কোথায় বেড়াল! তুমি বেশ কয়েকবার বললে খুব ইন্টারেস্টিং।

উত্তরে কিছু বললাম না। হ্যাঁ, অস্পষ্ট মনে পড়ছে। এরকম একটা কথাবার্তা হয়েছিল বটে কয়েক সপ্তাহ আগের কথা। আসলে তখন আমার মন অন্য দিকে ছিল।

আমি তখন আমার বাড়ির ল্যাবে কাজ করছিলাম। খুব দরকারি একটা এক্সপেরিমেন্টের মধ্যে ছিলাম। আমার আবিষ্কৃত আরটিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স নির্ভর চুল কাটার যন্ত্র 'মেঘনাদ' দিয়ে গণেশের চুল কাটছিলাম। যন্ত্রটা তার কয়েক ঘণ্টা আগেই সবে তৈরি করেছি। যার চুল কাটবে তার মুখের শেপ অনুযায়ী, আর তাকে কয়েকটা প্রশ্ন করে তার স্বভাব বুঝে সেরকম মানানসই চুল কাটবে।

আইডিয়াটা পাড়ার কানা হাবুলগুন্ডার ঘাসের লনের মতো ছোট করে কাটা চুল আর লম্বা ঝুলপি দেখে পেয়েছিলাম।

যন্ত্রটা মেসিন লার্নিঙের এর উপরে নির্ভর করে কাজ করে। সেটা দিয়েই আমার সহকারী গণেশের উপরে পরীক্ষা করছিলাম। ওর মাথা ভর্তি ঝাকড়া ঝাকড়া চুল। একদম আইডিয়াল টেস্ট সাব্জেক্ট। নিজের উপরে তো আর পরীক্ষা করা যায় না। তার মধ্যে আমার ল্যাবের ফোনটা বেজে উঠেছিল। প্রথমে ধরিনি। দীর্ঘ রিংয়ের পরে থেমে গেল। তারপরে আবার যখন বাজতে শুরু করল, তখন বাধ্য হয়ে চুলকাটার যন্ত্রটাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে ফোন ধরলাম।

দেখি কার্লোসের ফোন। তখনই প্রথম এই বেড়ালের বা নেকড়ের কথা শুনি। ও তখন রীতিমতো উত্তেজিত। এরকম বুদ্ধিমান প্রাণী নাকি আগে কখনও দেখেনি। চারনোবিলের রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সেজন্য চারনোবিল থেকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে। বাড়িতে নিয়ে গিয়ে প্রাণীটার উপরে নানান ধরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে চায়।

স্বাভাবিক ভাবেই আমি তখন একটু অন্যমনস্ক ছিলাম। তাই অত মন দিয়ে কথা শুনিনি। ওই যে খানিকক্ষণ ফোনে কথা বলেছিলাম, তার জন্য সেদিন ফল খুব একটা ভালো হয়নি। গণেশের মাথায় ছোট ছোট বারোটা চুলের গোল আইল্যান্ড রেখে বাকিটা পুরো সাফ করে দিয়েছিল। আমার যে খুব খারাপ লেগেছিল তা নয়। তবে গণেশের আদৌ পছন্দ হয়নি।

তা কবে আসছ?

উল্টোদিক থেকে কার্লোস ফের বলে উঠল, আমি আমার ড্রাইভার সহ গাড়ি পাঠিয়ে দেব। তোমার আসতে কোনও অসুবিধে হবে না। কবে কখন আসতে পারবে শুধু জানিয়ে দিও।

সেরকমই কথা হল। গিয়ে এক রাত থেকে তার পরের দিন ফিরে আসব।

এখানে এত কাছে এসে ওর বাড়ি যাব না, এটা হয় না। তার উপরে সেই বিশেষ নেকড়ে দেখারও ইচ্ছে আছে। ওরা এখানকার পুরোনো পরিবার। শুনেছিলাম পুরোনোদিনের বিশাল ব্যারোক প্যালেসে থাকে। সেটাও দেখা যাবে।

আমার সঙ্গে এখানে আমার বন্ধু বিজ্ঞানী ডেভ বোল্টন আছেন। তাকেও সঙ্গে নিয়ে যাব ভাবছি।

২১ সেপ্টেম্বর

কাল সকাল আটটায় বেরোচ্ছি। কার্লোস–এর বাড়ি।

এখানে এ ক'দিন বেশ ব্যস্ততার মধ্যে কেটেছে। এরকম সায়েন্স কনফারেন্সে এলে বিভিন্ন বিজ্ঞানীদের সঙ্গে কথাবার্তা আলাপ আলোচনার সুযোগ হয়। অনেক সময় একই আবিষ্কারের পিছনে ভিন্ন ভিন্ন চিন্তাধারা কাজ করে। কথা বললে অনেক নতুন আইডিয়া আসে।

আমি অবশ্য আমার বড় আবিষ্কারগুলোর কথা এসব কনফারেন্সে বলি না। আমার বেশ কিছু আবিষ্কার সময়ের থেকে এতটাই এগিয়ে আছে যে সেটা উপস্থিত অন্য বিজ্ঞানীদের বিভ্রান্ত করবে। তাদের মনোবল ভেঙে দেবে। ছোটখাটো আবিষ্কারগুলোর কথাই বেশি বলি।

যেমন এবারে বলেছি আমার আবিষ্কৃত গিল্ট আডমিশন যন্ত্রটা নিয়ে। এটা

মাথায় পরালে অপরাধী দশ থেকে কুড়ি মিনিটের মধ্যে তার সব অপরাধ স্বীকার করে নেবে। এটা ব্রেণের হিপ্পোক্যাম্পাসের কিছু অংশকে এমন ভাবে উদ্দীপ্ত করে যাতে অপরাধীর অপরাধবোধ ক্রমশ তীব্রতর হয়। শেষে অপরাধী যদি জ্ঞানত অপরাধ করে থাকে তাহলে সে স্বীকার করতে বাধ্য।

বেশ কয়েকজন অপরাধীর উপরে কীভাবে এটা কাজ করেছে, সেই ভিডিও কনফারেন্সে দেখানো হয়েছিল। কীভাবে কাজ করে সেটা জেনে উপস্থিত সবাই মুগ্ধ। কনফারেন্সের পরে একটা সুইস ম্যানুফাকচারিং সংস্থার অধিকর্তার সঙ্গে কথা হল। তারা এটা বড় স্কেলে তৈরি করার ব্যাপারে খুব আগ্রহী। আমার তাতে আপত্তি নেই। তবে তার থেকে যা লাভ হবে তার পঞ্চাশ শতাংশ কার্বন ফুটপ্রিন্ট কমানোর কাজে খরচ করতে হবে। এখনও লোকে বুঝতে পারছে না গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর জন্য কী হতে চলেছে। তার জন্য অবিলম্বে ফসিল ফুয়েলের ব্যবহার কমাতে হবে। তবে তাতেও যে ২০৫০-এর আগে কিছু লাভ হবে না তা আমি জানি। একদিন নিজের ভিটেমাটি ছেড়ে যে অন্য জায়গায় উদ্বাস্তু হয়ে যেতে হবে সেটাও বোঝে না।

এত সহজে যে এরকম একটা যন্ত্র বার করা যায়, সেটাই অনেকের ধারণার বাইরে ছিল। ভারতীয় টাকায় এ যন্ত্র তৈরির খরচ পড়বে মোটে পাঁচশ কুড়ি টাকা।

আজ দুপুর একটা নাগাদ কনফারেন্স শেষ হয়ে গেল। তারপরে ঘুরে ঘুরে মাদ্রিদ শহরটা দেখেছি। রয়াল প্যালেস অফ মাদ্রিদ দেখেছি। এখানে অবশ্য এখন স্পেনের রাজা থাকেন না। থাকলে সমস্যায় পড়তেন। যে প্যালেসে ৩৪১৮ টা ঘর, সেখানে পথ হারানো খুব স্বাভাবিক।

তারপরে গ্র্যান্ড ভিয়া ধরে খানিকক্ষণ হাঁটলাম। বিশাল চওড়া রাস্তা। দু-ধারে পাব, রেস্টুরেন্ট, বড় বড় দোকান। জমজমাট পরিবেশ। আমার মূল আগ্রহ ছিল অবশ্য প্রাদো মিউজিয়াম। ফ্রান্সিসকো গয়া-র অনেক বিখ্যাত পেন্টিং আছে এখানে। 'লা মাহা ভেস্তিদা'-র মতো অনেক বিখ্যাত পেন্টিং আছে এখানে।

স্পেনের লোকেদের সঙ্গে ভারতীয়দের অনেক ব্যাপারে মিল আছে। খুব সহজে আলাপ করা যায়। ব্যবহারে একটা সহজ সরল ব্যাপার আছে, উষ্ণতা আছে।

আমার হাতে সাধারণত একটা ব্যাগ থাকে। আজ সেটা নিয়ে বেরোইনি। কীভাবে জানি না, অন্যমনস্ক হয়ে মেট্রো থেকে বেরোনোর পথে খেয়াল করলাম আজও আমার হাতে একটা ব্যাগ এসে গেছে। ভালো করে দেখলাম যে সেটা আমার কোনওভাবেই হতে পারে না। এর একটাই কারণ হতে পারে। ভুল করে অন্য কারুরটা নিয়ে চলে এসেছি।

কী আর করা যায়! ওখানেই অপেক্ষা করলাম খানিকক্ষণ। যদি কেউ

এসে খোঁজ খবর নেয়। ঠিক হলও তাই। দেখি এক টাকমাথা ভদ্রলোক হন্তদন্ত হয়ে কী সব বলে আমার হাত থেকে ওটা ছিনিয়ে নিয়ে ফের চলে গেলেন। মনে হল ব্যবহারে সেই উষ্ণতা আছে।

হোটেলে ফিরতে ফিরতে রাত এগারোটা হয়ে গেল।

কাল সকাল আটটায় আমাকে এখানে থেকে নিয়ে যেতে কার্লোসের গাড়ি আসবে।

একদিন থেকে পরশু দুপুরবেলা ফিরে আসব। পরশু রাতে আমার ভারতের ফ্লাইট। তবে আমি একা যাচ্ছি না। সঙ্গে ডেভ বোল্টনও যাচ্ছে। ডেভ কেম্ব্রিজের প্রফেসার। রোবটিক্সের রিসার্চের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে যুক্ত আছে। শুনেছি বর্তমানে আনম্যানড সম্পূর্ণ স্বশাসিত যুদ্ধজাহাজ তৈরির কিছু কাজে ব্যস্ত আছে। ডেভ শুধু নামকরা বিজ্ঞানী নয়, শুনেছি ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির সঙ্গে কাজ করে। ওর সঙ্গে অবশ্য কার্লোসের কোনও আলাপ নেই। তবে ও কার্লোসের নাম শুনেছে।

কার্লোসের বাড়ি দেখতে ডেভ খুব আগ্রহী। কার্লোস খুব ধনী পরিবারের। শুনেছি রাজপরিবারের সঙ্গেও ওদের রক্তের সম্পর্ক আছে। বাড়িতে নাকি রাজপরিবারের অনেক ব্যক্তিগত জিনিস আছে।

এখন শুয়ে পড়ি। দূরে গির্জার ঘড়িতে এগারোটার ঘণ্টা বাজল।

২২ সেপ্টেম্বর, বিকেল ৩টে

টলেডো তে কার্লোসের বাড়ি পৌঁছতে দু'ঘণ্টা লেগেছে। টলেডো খুব পুরনো শহর। একটা বড় অংশ জুড়ে ইউনেস্কোর হেরিটেজ সাইট। অবশ্য হবে নাই বা কেন! দীর্ঘ সময় ধরে এই শহরের পরিচিতি ছিল 'রাজার শহর' বলে। চার্লস ফাইভের প্যালেস ছিল এখানে। ১৫০০ থেকে ১৫৫৬ সাল অব্দি এখান থেকেই ইউরোপের একটা বড় অংশ জুড়ে রাজত্ব চালিয়েছেন চার্লস ফাইভ।

তারও অনেক আগে রোমান সাম্রাজ্যে এখানে ঘোড়ায় টানা রথের দৌড় হত এখানকার সার্কাসে। তখনকার দিনে সে সার্কাসে পনেরো হাজার লোকের বসার আয়োজন ছিল। রোম সাম্রাজ্যের পতনের পরে ভিসিগথিক রাজত্বের সময় টলেডোর গুরুত্ব আরও বেড়ে যায়। তখন প্রায় দুই শতক ধরে টলেডো ছিল রাজধানী। ক্রিশ্চান, মুসলিম, ইহুদি তিন ধর্মের মানুষই এ শহরে বহু শতক ধরে একসঙ্গে বাস করে। তাই গাড়িতে করে যেতে যেতেই চার্চ, মসজিদ আর সিনাগগ তিনটেই সমানভাবে চোখে পড়ল।

কার্লোসের বাড়ি শহরের বাইরে। দুশো বছর ধরে ওদের পরিবার এখানে

থাকে। পাঁচিল ঘেরা বিশাল বড় তিনতলা পাথরের বাড়ি। দেওয়াল জোড়া বিশাল বিশাল কাচের জানলা। কিছুদূর দিয়ে লিকলিকে কালো সাপের মতো বয়ে গেছে ট্যাগাস নদী। বাড়ির ভিতরে বিশাল দশ একর জমি। সেখানে শুনলাম বেশ কিছু ভেড়া, শুয়োর, গরু ঘোড়া এসব আছে। তাছাড়া বাড়িতে ভাইন ইয়ার্ড আছে। সেখান থেকে স্পেশাল রেড ওয়াইন তৈরি করা হয়।

আমরা আসায় কার্লোস অত্যন্ত খুশি। অনেকদিন পরে দেখলাম। ওর বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। মাথা জোড়া টাক। তবে দেখেই বোঝা যায় বেশ ফিট। রীতিমতো রেগুলার জিম করা চেহারা।

দুপুরে ট্যাপাস খাওয়ার পরে বাইরে বাগানে এসে বসলাম।

আমি কথায় কথায় বলে উঠলাম, তুমি যে তোমার ওই নেকড়ে বাঘ দেখাবে বলেছিলে, সেটা কোথায়। খাঁচায়?

কার্লোস হাতে একটা ওয়াইনের গ্লাস নিয়ে বসে ছিল। প্রশ্নটা শুনে যেন একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেলো। তারপরে আবার আমার দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকে বলে উঠল, কী, কীসের কথা?

ওই যে তুমি বলেছিলে না যে চারনোবিল থেকে একটা নেকড়ে বাঘ এনেছিলে!

ও, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার খেয়াল ছিল না। ডিয়েগো।

কার্লোস তারপরেই ওর এক কর্মচারীকে ডেকে বলল, ডিয়েগোকে এখানে আসতে বল।

লোকটা দেখি ওকে বলল, স্যার, ও তো এখন খাচ্ছে। খাওয়া হলে আসবে।

লোকটার কথা শুনে একটু অবাক হলাম। বলার ধরণ যেন বাড়ির পরিবারের কোনও সদস্যকে আসতে বলছে। সে যেন সব কথা বুঝতে পারে। আসতে বললে সে তার সময়মতো চলে আসবে।

কার্লোসকে জিগ্যেস করলাম, তা, চারনোবিলে গিয়েছিলে কেন? ওখানে তো সেই নিউক্লিয়ার প্ল্যান্টে বিস্ফোরণ হওয়ার পর থেকে আর কেউ থাকে না বলেই শুনেছি।

হ্যাঁ, সেজন্যই তো গিয়েছিলাম। আসলে আমরা সচরাচর প্রকৃতির কাছ থেকে সব কিছু কেড়ে নিই। উল্টোটা কমই হয়। কিন্তু সেটাই হয়েছে চারনোবিলে। ১৯৮৬ সালে সেই প্ল্যান্টের চার নম্বর রিয়াক্টরে বিস্ফোরণের কথা তো জানোই। তারপর থেকে ওই এলাকায় রেডিও অ্যাক্টিভিটির মাত্রা অস্বাভাবিক বেশি থাকার জন্য সবাই শুধু ওখান থেকেই নয়, আশেপাশের সব শহর ছেড়ে চলে যায়। বহু লোক মারা গিয়েছিল। এত বছরেও কোন মানুষের বাস নেই ওখানে। পরিত্যক্ত শহর জুড়ে এখন ঘন জঙ্গল। শুধু জঙ্গলের মধ্যে পড়ে আছে বিশাল

বিশাল বিল্ডিং। তার গা বেয়ে লতা পাতা, গাছ আগাছার রাজপাট।

ডেভিড পাশ থেকে বলে উঠল, শুনেছি কুড়ি হাজার বছর পর্যন্ত কেউ ওখানে আর থাকতে পারবে না। তা তুমি গেলে কী করে? এখনও রেডিয়েশনের মাত্রা নিশ্চয়ই বিপজ্জনক।

হ্যাঁ, সে অনেক সতর্কতা নিয়ে উপযুক্ত পোশাক পরেই গিয়েছিলাম একটা গ্রুপের সঙ্গে। আসলে আমাদের কাজ ছিল ওখানকার এই অস্বাভাবিক রেডিয়েশনে বন্য প্রাণীরা কীরকমভাবে আছে, তা দেখা। ওদের উপরে কোনও প্রভাব পড়ছে কিনা তা লক্ষ করা।

ওখানে কি বন্য প্রাণী আছে?

আছে মানে, তারা বেশ বহাল তবিয়তে আছে। ওখানে আর পাশের শহর প্রিপেয়াত, যেখানে ওই ফ্যাক্টরির কর্মীরা থাকত, সেখানে লোকজন আর নেই। সে জায়গা এখন দখল করে নিয়েছে বন-জঙ্গল আর বন্যপ্রাণী। আমি আর আমার সঙ্গে আরও তিন জনের দল ওই শহরের পরিত্যক্ত রাস্তাঘাট দিয়ে ঘোরার সময়ে মনে হচ্ছিল যেন অন্য কোন গ্রহে এসে গেছি। সে যে কী অদ্ভুত অভিজ্ঞতা কী বলব! ঠিক মনে হচ্ছিল যেন এক মৃত শহর। তারপরে বুঝলাম মৃত শহর নয়। মানুষ নেই বটে। তবে আরও অনেকে আছে। হরিণ, শেয়াল, নেকড়ে আরও অনেক বন্য প্রাণী। সেরকম কোনও প্রভাব পড়েনি ওদের উপরে। সেখানেই ডিয়েগোকে প্রথম দেখলাম। একাই ছিল। একটা রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে আমাদের লক্ষ করছিল।

একা ছিল? নেকড়েরা সাধারণত দলে ঘোরে।

হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। সাধারণত এরা মানুষ এড়িয়ে চলে। একটা দলে থাকে। সাধারণত মানুষ আক্রমণ করে না। তবে একটু দূরত্ব রেখে চলা ভালো। এদের সঙ্গে কিছু কুকুরের প্রজাতির অনেক মিল থাকলেও এরা অত সহজে পোষ মানে না। সেরকমই ধারণা ছিল যতক্ষণ না ডিয়েগোকে দেখি।

একটু থেমে ওয়াইনে ঠোঁট ঠেকিয়ে আবার যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেল কার্লোস। খানিকক্ষণ চুপ করে ফের বলল, তা যা বলছিলাম, আমরা একটা বিশেষ বিল্ডিংয়ের খোঁজ করছিলাম। খুঁজে পাচ্ছিলাম না। কেন জানি না, মনে হল ও যেন আমাদের আলোচনা বুঝতে পারছে। হঠাৎ দেখি আমাদের আগে আগে যাচ্ছে। ওই পথ দেখিয়ে ওই বিল্ডিং অব্দি নিয়ে গেল। তারপরেও আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই সারাদিন ছিল। যখন গাড়িতে উঠব, মনে হল যেন ও আমাদের সঙ্গে আসতে চায়। ওকে আমার এত ভালো লেগে যায় আমি জিপে করে ওকে আমাদের হোটেলে নিয়ে আসি। তারপরে এখানে।

ফের খুব আস্তে আস্তে বলে উঠল, এক দিক থেকে মনে হয় ও খুব সাধারণ নেকড়ে বাঘ। অন্যদিক থেকে মনে হয় ও যেন কোথায় একদম অন্যরকম।

বলে উঠলাম, নেকড়েরা এমনিতেই খুব বুদ্ধিমান হয়। এরা মূলত অসুস্থ প্রাণীদের শিকার করে। বলা হয় এভাবে নেকড়ে নাকি প্রাণীজগতে অসুস্থ প্রাণীর সংখ্যা বাড়তে দেয় না। মানুষদের শুনেছি খুব কমই আক্রমণ করে। তোমার বক্তব্য অনুযায়ী যদি ও তোমার সব কথা বুঝতে পারে সেটা অবশ্যই অস্বাভাবিক ক্ষমতা। কিন্তু তার বাইরেও অন্য কোনও ক্ষমতার কথা বলছ?

কার্লোস বলল, ঠিক বলে বোঝানো যাবে না। এই এখনই এখানে আসবে। তোমরাই দেখে নিও।

কার্লোস-এর কথার মধ্যেই দেখি একটা নেকড়ে বাঘ বাড়ির মধ্যে থেকে বেরিয়ে এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে। সত্যি বলতে কী দেখে একটু ভয়ই লাগছিল। খয়েরি রঙের। বেশ বড় সাইজের কুকুর যেরকম হয়। কিন্তু কানটা যেন ছোট ছুঁচলো। চোখে হিংস্র দৃষ্টি। ডেভিডও দেখি সতর্ক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে দেখছে।

ও আমাদের কাছে এসে দাঁড়াল।

ঠোঁটে একটু মুচকি হাসি নিয়ে কার্লোস নেকড়ে বাঘটাকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠল, ডিয়েগো, তুমি তো মিস্টার পাই-এর ছবি দেখেছ, কোনটা মিস্টার পাই বলতে পারবে?

বলতেই নেকড়েটা আমার দিকে তাকাল। কী আশ্চর্য যে সে দৃষ্টি। স্থির নির্মম চাহনি। একই সঙ্গে খুব গভীর দৃষ্টি। যেন আমাকে একটা মাইক্রোস্কোপের নিচে ফেলে দেখছে।

কার্লোস আমার মনের ভাব বুঝে আবার বলে উঠল, ওকে ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই। একঘণ্টা এখানে থাকলেই বুঝতে পারবে যে ও একদম অন্যরকম। এমনকী ও আমাদের সব কথাও বুঝতে পারে।

শেষ কথাটা অবশ্য তখনও বিশ্বাস হয়নি।

২২ সেপ্টেম্বর, রাত দশটা

নাহ্। দিনের শেষে বলতেই হবে ডিয়েগোর মতো বুদ্ধিমান প্রাণী আমি মানুষের বাইরে দেখিনি। হয়তো সেটাও বলা ঠিক হল না। অনেক মানুষের থেকে বুদ্ধি-বিবেচনায় এগিয়ে আছে। প্রত্যেকটা কথা বুঝতে পারে। উত্তর হাবেভাবে ঠিক বুঝিয়ে দেয়।

কার্লোসের ফার্মহাউসে অনেক ধরণের প্রাণী আছে। আমরা সন্ধে ছ'টা নাগাদ দেখতে গিয়েছিলাম। প্যাডকে চারটে ঘোড়া, প্রায় গোটা কুড়ি ভেড়া, গোটা দশেক শুয়োর, বেশ কিছু রাজহাঁস আছে।

কেন জানি না মনে হল ওদের সবার নেতা হল ডিয়েগো। ও যখনই তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে, সব ক'জন যেন ওর দিকেই তাকিয়ে আছে। ওর অদৃশ্য আদেশ মানছে। সে ভাষা আমরা না বুঝতে পারলেও বাকি সবাই যেন বুঝতে পারছে। মাঝে মধ্যে ডিয়েগো ডাকছিল। একটা অদ্ভুত সুরে। কেন জানি মনে হচ্ছিল ও যেন বাকিদের কিছু আদেশ দিচ্ছে। সবাই সেটা ফলো করছে।

ওর এই আশ্চর্য বুদ্ধির হাতে নাতে প্রমাণ পেলাম ডিনারের সময়। ডেভিড শোওয়ার ঘরে ফোন ফেলে এসেছিল। সেটা কথায় কথায় একবার শুধু বলেছিল। আমরা সবাই ড্রয়িং রুমে বসে গল্প করছিলাম। কিছু দূরে ডিয়েগো দাঁড়িয়ে ছিল।

খানিকক্ষণ ডিয়েগোকে দেখলাম না। খানিকবাদে দেখি মুখে করে একটা কাগজে জড়িয়ে ডেভিডের ফোন নিয়ে এসেছে যাতে দাঁতের চাপ ফোনে না লাগে। তার মানে শুধু আমাদের কথা বোঝা নয়, আমরা কে কোন ঘরে আছি সেটা পর্যন্ত লক্ষ করেছে। এত কিছু একটা নেকড়ে বাঘের পক্ষে করা সম্ভব! এতটাই ইন্টেলিজেন্ট!

ডেভিড ওর কাজের কথা বলছিল। রোবটিক্সের উপরে ও এখন কী কাজ করছে ইত্যাদি।

আমার দৃষ্টি ছিল ডিয়েগোর উপরে। দেখলাম ডিয়েগো মন দিয়ে শুনছে। কান খাড়া করে। যেন প্রত্যেকটা কথা বোঝার চেষ্টা করছে।

কথায় কথায় আমার বিভিন্ন আবিষ্কার নিয়েও আলোচনা চলছিল। ডিয়েগো যে শুনছে সেটার প্রমাণ পেলাম। কথায় কথায় আমার 'ডগ ল্যাঙ্গয়েজ ট্রান্সলেটর'-এর কথা উঠল যেটা কানে লাগিয়ে আমার বাড়ির বেড়াল ভূতো আশেপাশের বাড়ির বকাটে কুকুরগুলোর সঙ্গে আড্ডা মারে, সেটা। শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেভাবে মুখের ভাব করে আমার দিকে তাকাল, তাতে স্পষ্ট ব্যঙ্গের ছোঁয়া। ভাবখানা এরকম, এ আবার কী এমন আবিষ্কার!

২৩ সেপ্টেম্বর, সকাল সাতটা

রাতে ভালো ঘুম হয়নি। কেন জানি না একটা অদ্ভুত ভয় মনের মধ্যে দানা বাঁধছে।

একটু আগে থেকে শুরু করি। কাল একটা কথা মাঝেমধ্যে মনে হচ্ছিল। গতকাল শুরু থেকেই মনে হচ্ছিল কার্লোস যেন খুব অন্যমনস্ক। যেন অনেক কথা শুনেও শুনছে না। কার্লোস এমনিতে বেশ চালাক চতুর মিশুকে লোক,

একই সঙ্গে খুব সপ্রতিভ বা স্ট্রিটস্মার্ট বলা যায়। কিন্তু গতকাল অনেক দিন বাদে ওকে দেখে মনে হল ও যেন সব কিছু খুব শ্লথ গতিতে করছে, যেন এক কল্পনার জগতে মাঝে মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে।

রাত সাড়ে দশটার সময় ডেভিড শুতে চলে গেল। তার খানিক বাদে ডিয়েগো দেখি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আমি আর কার্লোস গল্প করতে লাগলাম। কার্লোস নিজেই বলল, ক'দিন থেকে আমার শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে নিজের চিন্তাভাবনাগুলো কীরকম যেন এলোমেলো, অবিন্যস্ত হয়ে যাচ্ছে।

ডাক্তার দেখিয়েছিলে?

হ্যাঁ, দেখিয়েছিলাম। কিছু ধরতে পারেনি। কিছুই অস্বাভাবিক খুঁজে পায়নি।

কাঁপা কাঁপা হাতে সামনে রাখা অরেঞ্জ জুসের গ্লাসটা তুলে নিয়ে ফের বলে উঠল, ডিয়েগোর বিশেষ ক্ষমতা কী বুঝতে পারলে?

আমি আশপাশ দেখে বলে উঠলাম, অবশ্যই খুব ইন্টেলিজেন্ট। তাছাড়া, কিছু একটা আছে ওর হাবেভাবে। মনে হয় যেন ওই বাড়ির মনিব।

বলেই মনে হল কী একটা অবান্তর কথা বলে উঠলাম। কার্লোস দেখি কিছুই বলল না। কী যেন চুপ করে ভাবছে মনে হল।

ও দাবা খেলতে বেশ ভালোবাসে জানি। কিন্তু দাবা খেলার অনুরোধ এড়িয়ে গেল। আমার সঙ্গে গল্প করার সময় দেখি একটা বই নিয়ে নাড়াচাড়া করছে।

যেখানে বসেছিলাম, সেখানে কিছু দূরে ফায়ার প্লেসে আগুন জ্বলছিল। দেখি বইটাকে পাশের টেবিলে রেখে ওই আগুনে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে কী যেন ভাবছে।

খানিকবাদে ফের বলল, ডিয়েগোর গায়ের রঙটা যেন একটু একটু করে পাল্টে যাচ্ছে। সবজেটে হয়ে যাচ্ছে।

সেরকম কিছু বোঝা যাচ্ছে না তো?

আমি খেয়াল করেছি। সেটা দেখে ওর উপরে বেশ কিছু টেস্ট করেছিলাম। শেষ রিপোর্টে কিছু অদ্ভুত জিনিস পেয়েছি।

কী?

ব্লাড রিপোর্ট দেখে মনে হচ্ছে ওর মধ্যে যেন কিছু ইনফেকশন হয়েছে। কী বুঝতে পারছি না।

কোনও ছত্রাক—ফাঙ্গাস ইনফেকশন।

আমার প্রশ্নটা শুনে অবাক হয়ে তাকাল কার্লোস। তারপরে বলে উঠল, হতে পারে।

যেখানে আমরা বসে আছি, সে ঘরে অন্য দেয়ালে চার দিকে বুক কেস। দেখি কার্লোস উঠে গিয়ে তার থেকে একটা বই নিয়ে এসে বসল। বইটা বিভিন্ন

ধরণের ছত্রাকের উপরে। তারপরে তার থেকে একটা চ্যাপ্টার বার করে পড়তে শুরু করল। অফিও করডিসেপ্স ফাঙ্গাস-এর উপরে। এই ফাঙ্গাস-এর কথা আমি অবশ্য আগে থেকেই জানি।

বলে উঠলাম, হঠাৎ করে ওদের উপরে পড়াশোনা শুরু করলে?

তুমি এদের কথা জানো?

হ্যাঁ, কিছুটা জানি। এদের সঙ্গে পিঁপড়েদের পরজীবীসম্পর্ক খুব অদ্ভুত। এরা পিঁপড়েদের প্রভাবিত করে কাছে টেনে আনে। কীভাবে সেটা করে সেটা অবশ্য আমরা জানি না। তারপরে পিঁপড়ের মধ্যে এরা এদের বীজবপন করে। শেষে সেই পিঁপড়েদের মেরে ফেলে। এক অদ্ভুত নিষ্ঠুর পরজীবী সম্পর্ক।

হ্যাঁ, ঠিক বলেছ।

আবার বইটা রেখে দিয়ে কার্লোস বলে উঠল। জানি না কেন, কোনও কিছুতেই মন বসাতে পারছি না।

একটু বাদে ফের বলে উঠল, আসলে প্রাণীজগত এত ইন্টারেস্টিং, আমরা আর কতটুকুই বা জানি। তুমি 'অ্যালকন ব্লু' প্রজাপতিদের কথা জানো তো?

—হ্যাঁ। আরেকটা ইন্টারেস্টিং জীবনচক্র। হাঙ্গেরিতে ওদের দেখা যায়। পড়েছিলাম ওই প্রজাপতি এক বিশেষ ধরণের গাছের পাতায় ডিম পাড়ে। সেই ডিম থেকে শুঁয়োপোকা যখন হয়, তখন তারা পাতা থেকে নীচের ঘাসের উপরে গিয়ে পড়ে। সেই শুঁয়োপোকা নাকি পিঁপড়েদের রানির মতো করে আওয়াজ করতে পারে। কীভাবে তারা এই আওয়াজ করতে শেখে, সেটাই আশ্চর্য। শ্রমিক পিঁপড়েরা তখন ওই শুঁয়োপোকাকে দেখে ওদের রানি ভেবে খাতির করে ওদের বাসায় নিয়ে যায়। তারপরে সে বাসায় নাকি বছর দুয়েক ভারি আদরযত্নে জামাই আদরে থাকে। শেষে প্রজাপতি হয়ে ওই বাসা ছেড়ে বেরিয়ে আসে।

তুমি যে কোন বিষয়টা জানো না মিস্টার পাই, তা ভেবেই অবাক হই। আজকাল বিজ্ঞানীরা এত স্পেসালাইজড হয়ে গেছে যে তারা নিজেদের বিষয়ের বাইরে অন্য কোনও কিছুরই খবর রাখে না। এই আমার কথাই ধর। আমি আমার বিষয়ের বাইরে কোথায় কী হচ্ছে, কিছুই খবর রাখি না। এখানে একটা কথা আরও বলি ওই প্রজাপতি হবার পরে ওরা কিন্তু আর মাত্র কয়েকদিন বেঁচে থাকে। কী অদ্ভুত লাইফসাইকেল, তাই না?

আরও কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা হল। কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ করছিলাম। ওর মধ্যে অদ্ভুত অস্থিরতা। কখনও ফায়ার প্লেসের সামনে গিয়ে বসছে। কখনও সোফায়। কখনও বা ঘরের ভিতরে হাঁটছে।

আমি বললাম, তোমার ফ্যামিলির সবাই ভালোই আছে তো?

ও কোনও কথা বলল না খানিকক্ষণ। তারপরে বলে বলল, না, আমার সঙ্গে আমার স্ত্রীর ডিভোর্স হয়ে যাচ্ছে। সেই আইনি প্রসেসটা চলছে।

বুঝতে পারলাম এজন্যই হয়তো ও টেনশনে আছে।

আমি আমার ব্যাগ থেকে খুলে একটা বড়ি দিলাম। এটা আমার তৈরি ভেষজ বড়ি। যে কোনও ধরণের উত্তেজনা প্রশমিত করে। আমাদের মনের বিভিন্ন ধরণের পরস্পরবিরোধী চিন্তাভাবনার স্রোতের মধ্যে কোনটা ঠিক করা উচিত, সেটা বুঝতে সাহায্য করে। কোন কাজটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেটা স্পষ্ট হয়ে যায়।

আমি বলার পরে ও আমাকে বিশ্বাস করে খেল। তার খানিকবাদে একটা ভারি অদ্ভুত কথা বলে বসল, কেন জানি না খুব হরিণ দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে। বড় হরিণ।

এ কথার কোনও অর্থ হয় না। হয়ত কোনও মানসিক চাপে ভুগছে।

রাত অনেক হচ্ছিল। বারোটা নাগাদ আমি শুতে চলে গেলাম। কিন্তু ঘুম আসছিল না।

আমার পাশে ডেভিডের ঘর। রাত একটা নাগাদ মনে হল ওর ঘরের থেকে সামান্য আওয়াজ আসছে। মনে হল যেন কিছু একটা ওর ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাঝে কাঠের দেওয়াল। খেয়াল করতে বুঝলাম একটা চারপেয়ে কিছুর ঘুরে বেরোনোর, নিশ্বাস প্রশ্বাসের আওয়াজ।

ডেভিডের ঘরে কি ডিয়েগো এসে ঢুকেছে? কিন্তু এত রাতে! এখানকার ঘরগুলো বন্ধ করার উপায় নেই। দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলাম। মিনিট দুয়েক বাদে দেখি আমার ধারণা ঠিক। ডেভিডের ঘর থেকে ডিয়েগো বেরিয়ে এল। বেরিয়ে প্যাসেজ দিয়ে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলো। আমার দিকে একবার ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে আমার উপস্থিতি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে ফের ওদিকে এগিয়ে গেল। ডেভিডের দরজা সামান্য খোলা ছিল। ঠেলে ওর ঘরে ঢুকলাম। ল্যাম্পের আলোয় দেখলাম ডেভিড নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। বিরক্ত না করে আবার আমার ঘরে ফিরে এলাম।

কিন্তু ঘুম আর এল না। ফের খানিকক্ষণ শোওয়ার চেষ্টা করে উঠে পড়লাম। আমার ঘরে জানলা দিয়ে পূর্ণিমার চাঁদের আলো এসে ঢুকেছে। জানলার কাছে এসে বাইরের দৃশ্য দেখতে লাগলাম। অপূর্ব দৃশ্য। জানলা দিয়ে কার্লোস এর বিশাল বাগানটা দেখা যাচ্ছে। আশেপাশে কোনও বাড়ি নেই। বাগান দূরে যেখানে শেষ হয়েছে, তার পরে ঘন জঙ্গল। দূরে পাহাড় দেখা যাচ্ছে। যেন চাঁদের আলোর ক্যানভাসে আঁকা কোনও শিল্পীর ছবি।

হঠাৎ দেখলাম ডিয়েগো বাড়ির পিছনের গেট দিয়ে বাগানে বেরিয়ে এল। জঙ্গলের দিকে যেতে শুরু করল। সে যেতেই পারে। কিন্তু ওর পিছু পিছু কে যাচ্ছে? কার্লোস? এত রাতে? ওদিকে কেন যাচ্ছে?

ডিয়েগোর বাধ্য শিষ্যের মতো কার্লোস ওর পিছু পিছু যাচ্ছে। আস্তে আস্তে দূরে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল ওরা। আমি ওদিকে তাকিয়ে রইলাম। মিনিট পাঁচেক বাদে দূর থেকে একটা নেকড়ে বাঘের ডাক বা হাউলিং শুনতে পেলাম। চারদিক নিস্তব্ধ বলেই হয়তো মোটা কাচের জানলার এপার থেকে শুনতে পেলাম।

কীরকম যেন গায়ে শিহরন জাগানো ডাক। উ উ উ। আবার দ্বিতীয়বার ডাকটা শুনলাম।

২৩ সেপ্টেম্বর, রাত দশটা

চুপ করে অন্ধকারের মধ্যে বসে আছি। এখন একটু ঠান্ডাও লাগছে। এটা যে কোথায় তা জানি না। তবে এই বিশাল প্রাসাদোপম বাড়ির অজস্র ঘরের মধ্যে কোনও একটা, সেটা জানি।

মাথায় এখনও অসহ্য যন্ত্রণা। মাথা ফেটে যায়নি তো! মাথায় হাত বোলালাম। নাহ্, বেশ খানিকটা ফুলে গেছে বটে। কিন্তু ফেটে যায়নি। তাহলে চুল ভিজে থাকত। মনে হচ্ছে আমার ঝাকড়া চুলই আমাকে বাঁচিয়েছে। তা না হলে...

মনে করার চেষ্টা করলাম শুরু থেকে। উফ, কী ভয়ানক!

সকালে ন'টা নাগাদ নীচে ড্রয়িং রুমে গিয়ে দেখি সেখানে ডেভিড বসে আছে। আমাকে দেখেই বলল, আচ্ছা, তুমি কার্লোসকে দেখেছ? সকাল থেকে কাউকে এখানে দেখছি না। বাড়ির কাজের লোকেরাও উধাও।

আমিও একটু অবাক হলাম। সত্যি, তাই। আমি নিজেও আগে নীচে চলে আসতাম কার্লোসের ডাক পেলে।

বাইরে সব চুপচাপ দেখে ভাবছিলাম, হয়তো কারুর ঘুম ভাঙেনি। ব্যাগ থেকে বার করে 'অদ্বিতীয় টেনিদা' পড়ছিলাম। এরকম কিছু বাংলা বই সবসময় আমার সঙ্গে থাকে। পড়তে পড়তে সময়ের খেয়াল ছিল না।

এখানে সবাই তাড়াতাড়ি ব্রেকফ্রাস্ট করে। আটটার মধ্যে। কোথায় গেল সবাই?

এই কথার মধ্যেই দেখি পায়ের শব্দ ড্রয়িংরুমের দিকে এগিয়ে আসছে। কার্লোস-এর এক কর্মচারী, গতকাল দেখেছি, নামটা জানা হয়নি, আমাদের ব্রেকফাস্ট দিয়েছে। ডাইনিং রুমে ডাকছে। কার্লোস কোথায় জিগ্যেস করতে ভারি অদ্ভুত উত্তর পেলাম। কার্লোস বাড়ি নেই। কোথায় গেছে তারও কোনও খবর জানে না।

শুনেই জিগ্যেস করলাম, ডিয়েগো কোথায়?

লোকটার উত্তর দেওয়ার দরকার পড়ল না। দেখি আমাদের ড্রয়িং রুমের দরজার কাছে ডিয়েগো দাঁড়িয়ে আছে। কীরকম যেন হিংস্র দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। কুকুর আর নেকড়ে বাঘের মধ্যে যে অনেক তফাৎ আছে, সেটা ওই চোখের দৃষ্টি বুঝিয়ে দিচ্ছে।

আমি ডেভিডকে বললাম, গতরাতের ঘটনা। রাতে দেখেছি ডিয়েগোর সঙ্গে

কার্লোসকে বাগানে যেতে।

ওর এই কর্মচারীকে উদ্দেশ্য করে বললাম, এখানকার পুলিসে খবর দেওয়া দরকার। এখানে ওর কোনও আত্মীয় আছে?

না, স্যার এখানে একাই থাকেন। কাছাকাছি কেউ থাকে না। তবে স্যারের বোন আছেন বারসিলোনায়। ওকে ফোন করবেন? দাঁড়ান, নাম্বারটা দিচ্ছি। কিন্তু তার আগে আরেকটু দেখে নিলে হত না?

এই বাড়িতে এখন আর কে আছে?

এই আপনারাই।

মানে? গতকাল তো আরও বেশ কয়েকজন কাজের লোক ছিল। তারা কোথায়?

তারা সব আজ ছুটিতে। আজ রোববার। ওদের রোববার ছুটি দেওয়া হয়।

আমি বেশ অবাক হলাম। আমরা দুজন এখানে আসছি, সেটা জেনেও কার্লোস সবাইকে ছুটি দিয়েছে? লোকটাকে সেটাই বলে উঠলাম।

লোকটা ফের বলে উঠল, জানি না, স্যার কী ভেবে দিয়েছিলেন। হয়তো আগে জানতেন না বলে।

আমার মনে কিছু অশুভ চিন্তা আসছিল। খেতে ইচ্ছে হল না।

বললাম, চলো, আমরা আগে ভালো করে বাড়িটা দেখে আসি। আমার সঙ্গে এসো।

বলে দরজার দিকে এগোলাম।

দেখি ইতিমধ্যে ডিয়েগো ঘরের মধ্যে ঢুকে এসেছে। একটা দিকে সরে দাঁড়িয়ে আছে। ড্রয়িংরুম থেকে বেরিয়ে প্যাসেজে এসেছি, ঠিক তখনই কেউ যেন আমার মাথায় ভারী কিছু দিয়ে আঘাত করল। ব্যাস। তারপরেই চোখে অন্ধকার।

খানিক আগে জ্ঞান ফিরেছে। ফোনটা জ্যাকেটের মধ্যে ছিল। নেটওয়ার্ক নেই এখানে। এখন সময় দেখাচ্ছে রাত ন'টা। মাঝে এতক্ষণ অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম!

এবারে আমি ফোনের আলোয় ঘরটাকে দেখলাম। মনে হল একটা সময় এ ঘর আস্তাবলের কাজে ব্যবহার করা হত। কাঠের পার্টিশন দিয়ে আলাদা করা চারটে ঘোড়া রাখার জায়গা। খড়-বিচুলিও ছড়ানো আছে। কিন্তু ঘোড়া নেই। শুধু নেই তাই নয়, মনে হয় না যে সেই কাজে এটা বহু বছর ব্যবহার করা হয়েছে। সেটা এই ঘরের চেহারা দেখে বোঝা যায়। চারদিকে নোংরা, আবর্জনা ছড়ানো। মাটিতে পায়রা জাতীয় কোনও একটা পাখির কঙ্কাল পড়ে আছে।

ঘরে কোনও জানলা নেই। উঁচু ছাদ। ঘরের একদিকে দুই পাশে বিশাল উঁচু কাঠের দরজা। দুটোই বাইরে থেকে বন্ধ। দরজার কাঠ যা মোটা তাতে এ দরজা ভাঙা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। বেশ খানিকক্ষণ দরজায় ধাক্কাধাক্কি করলাম। কিন্তু কোনও সাড়া পেলাম না।

ঘরের অন্ধকার আমার চোখে সয়ে এলেও, কীরকম যেন দমবন্ধ লাগছে। ঘরের মধ্যে এমন কিছু নেই যা দিয়ে কোনও দরজা খোলার চেষ্টা করা যায়। ফোনের চার্জ কমে আসছে।

২৫ সেপ্টেম্বর

এখন টলেডো রয়্যাল হাসপাতালে আছি। শরীর খুব দুর্বল লাগছে। আসলে প্রায় দু'দিন ঘরে বন্দী ছিলাম। জলখাবার কিছুই পাইনি। তাছাড়া বন্ধ ঘরের বাতাসে অক্সিজেনের অভাব অনুভব করছিলাম।

একটু আগে থেকে পুরো ঘটনাটা বলার চেষ্টা করি।

কী হচ্ছে ব্যাপারটার একটা ধারণা করতে পারছিলাম। কিন্তু এই ঘর থেকে বেরোনোর কোনও উপায় খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

একটাই ভরসা—কল্যাণগড়ের ল্যাবে আমার তৈরি রোবট লিও জানে যে আমার দিক থেকে কখনো আটচল্লিশ ঘণ্টার বেশি কোনও নির্দেশ না এলে আমার বড় কিছু একটা বিপদ হয়েছে। সেক্ষেত্রে ও প্রথম আমাকে যোগাযোগ করার চেষ্টা করবে। সেটা না করতে পারলে গণেশকে জানাবে। তারপরে ও আর গণেশ মিলে পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করবে।

কিন্তু কলকাতায় থাকলে একরকম। আমি এখন স্পেনে। খোঁজাখুঁজি করলে আমি যে এখানে এসেছি সেটা অবশ্য ওরা ঠিক বুঝতে পারবে। সেটা বোঝার অনেক উপায় আছে। আমার ফোন ট্রেস করা যেতে পারে। আরও অনেক কিছু। কিন্তু তার জন্য সময় লাগে।

কিন্তু তার আগেই যে-কোনও মুহূর্তে বিপদ এগিয়ে আসতে পারে, তা জানতাম। যদি এ ঘরে ডিয়েগো আসে।

ঠিক সেটাই হল। আমি ক্লান্ত হলেও সজাগ ছিলাম। হঠাৎ বুঝতে পারলাম বন্ধ দরজার সামনে একটা চতুষ্পদ জীব এসে দাঁড়িয়েছে। কার্লোসের যা হয়েছে, একই জিনিস হতে চলেছে আমার ভাগ্যে।

সাধারণত আমার কাছে আত্মরক্ষার্থে একটা পেন থাকে, যা থেকে হাইভোল্টেজ ইলেক্ট্রিক শক দেওয়া যায়। কিন্তু ঘটনাটা এত আচমকা হয়েছে যে আমার কাছে কিছুই নেই এখন।

একটা জান্তব গন্ধ দরজার ওপার থেকে আসছে। কিন্তু ডিয়েগো কি একা—নাকি সঙ্গে সেই চাকরটাও আছে যে আমাকে পিছন থেকে মাথায় ভারী কিছু দিয়ে আঘাত করেছিল?

মনে হয় সেই লোকটাও আসছে। আর তার জন্যই অপেক্ষা করছে ডিয়েগো। নেকড়ে বাঘের যতোই বুদ্ধি থাকুক না কেন তার পক্ষে একা দরজার

লক খোলা সম্ভব নয়। লোকটার পায়ের শব্দ দরজার সামনে এসে থামল।

কিছুক্ষণের মধ্যে দরজা খুলে গেল। বাইরের থেকে একরাশ আলো এসে চোখ ধাঁধিয়ে দিল। আর তার পরক্ষণেই আমার দিকে এগিয়ে এল ডিয়েগো। ওর সরু হিংস্র হলুদ চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠল। একটা চাপা গর্জন করে উঠল। তখন দেখতে পেলাম ওর ধারালো দাঁতগুলো।

আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি, প্রস্তুত হচ্ছি ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার, এর মধ্যে হঠাৎ করে গুলির আওয়াজ হল। দু'দুটো। দেখি ডিয়েগো ছিটকে দূরে গিয়ে পড়েছে।

তারপরে আরও বেশ কয়েকটা গুলি। একটা দেখলাম ওই চাকরটার পায়েও লেগেছে। লোকটা চিৎকার করে বসে পড়েছে।

ডেভিড দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

ডিয়েগো আহত। তবু ডেভিডের দিকে না গিয়ে এগিয়ে আসছিল আমার দিকে। ডেভিডের আরও একটা গুলিতে ওর নিথর দেহটা এবারে দূরে ছিটকে পড়ল।

২৫ সেপ্টেম্বর

টলেডোর পুলিশের ডিটেক্টিভ ইন্সপেক্টরকে বলছিলাম ঘটনাটা। ডেভিডও শুনছিল। সঙ্গে ছিল আইবেরিয়া পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের আরও বেশ কয়েকজন।

এখানে বলে রাখি কার্লোসের ক্ষত বিক্ষত দেহটা ওর বাড়ির পিছনের দিকে ঘন জঙ্গলের মধ্যে গতকাল পাওয়া গিয়েছে।

ওর মৃত্যু যে নেকড়ের আক্রমণে তা নিয়ে ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের কোনও দ্বিধা নেই। দাঁত আর নখের দাগ ডিয়েগোর সঙ্গে মিলে গেছে। প্রশ্ন, কেন ডিয়েগো আক্রমণ করেছিল ওর মনিবকে? নেকড়ে কুকুরের মতো অত প্রভুভক্ত হয় না ঠিকই, কিন্তু এরকম মানুষকে আক্রমণের কথাও খুব বেশি শোনা যায় না।

অবশ্য এখানে প্রশ্ন মনিব কে? ডিয়েগো না কার্লোস?

আমি বলে উঠলাম, বাড়িতে ঢোকার পর থেকেই আমার ধারণা হয়েছিল যে বাড়ির আসল কর্তা আর কেউ নয়, ডিয়েগো। এটাই ছিল ডিয়েগোর আসল বিশেষত্ব। সে শুধু কার্লোসকে নিয়ন্ত্রণ করত না, করত বাড়ির সবাইকে। এমনকী খামারবাড়ির অন্য জীবজন্তুদের। কিন্তু তাতে দোষ ডিয়েগোরও ছিল না।

তবে? অবাক চোখে আমার দিকে তাকাল ইন্সপেক্টর ন্যাকো।

ডিয়েগোকেও নিয়ন্ত্রণ করত অন্য এক অনুজীবী। আমার ধারণা একধরনের অজানা ছত্রাক। যার প্রমাণ আপনারাও পাবেন ডিয়েগোর শরীরে। পরজীবীর মতো

ডিয়েগোর শরীরে আশ্রয় নিয়ে ছিল। ওর চিন্তাভাবনা নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করেছিল ওর শরীরে বাসা বেঁধে।

আন বিলিভেবল। ইনক্রেডিবল। হ্যাঁ, আমরাও ওর উপরে কিছু টেস্ট করব।

আমার ধারণা চারনোবিলের রেডিয়েশনের মাত্রা অস্বাভাবিক হওয়ার জন্য এরকম নতুন ছত্রাক গড়ে উঠেছিল চারনোবিলে। সেই ছত্রাকই বাসা গড়ে ডিয়েগোর শরীরে। ডিয়েগোই ছিল ওই ছত্রাকের প্রাইমারি হোস্ট। হয়তো ওখানে গেলে আরও কেউ সংক্রামিত হতে পারে। ডিয়েগোর শরীরে ওই ছত্রাক পাওয়া গেলে আমাদের এ বিষয়ে ইউক্রেন সরকারকে সঙ্গে সঙ্গে জানানো হবে।

যাক, আপনার জন্যই হয়তো আমরা আসল রহস্যের সন্ধান পাব। অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু আমাদের দেশে এসে যে আপনাকে এরকম বিপদে পড়তে হল, তার জন্য আমার খারাপ লাগছে। ডিটেক্টিভ ইন্সপেক্টর।

আমি বলল, আমাকে ধন্যবাদ দিয়ে কী হবে। ধন্যবাদ দিন ডেভিডকে। যে আমাকে উদ্ধার করল ওই ঘর থেকে।

বলতে গিয়েই থেমে গেলাম।

ডেভিডকে কেন ডিয়েগো নিয়ন্ত্রণ করতে পারল না? এ প্রশ্নটা আগে মাথায় আসেনি কেন! ডিয়েগো তো যথেষ্ট সময় পেয়েছিল।

৩০ সেপ্টেম্বর, কল্যাণগড়

আজ সকালে ডেভিডের মৃত্যুর খবরটা পেয়েছি। তখন থেকে মন খুব খারাপ। খুব ভালো লোক ছিল। মাদ্রিদের একটা নামকরা হাসপাতালে মারা গেছে। নামি ডাক্তাররাও কিছু করে উঠতে পারেনি। তবে আমার অনুমান ঠিক। ডিয়েগোর মতো ওর মধ্যেও ওই এক ছত্রাকের ইনফেকশন পাওয়া গেছে। ছত্রাক মারা যাওয়ার আগে তার বসতিও ধ্বংস করে গেছে।

সেদিন পুলিশের সঙ্গে কথা বলার সময় হঠাৎ খেয়াল হল ডিয়েগো কেন ডেভিডকে প্রভাবিত করতে পারেনি। একটু ভাবতেই আসল উত্তরটা খুঁজে পেলাম। এর পিছনে একটাই কারণ থাকতে পারে।

ওই বিশেষ ছত্রাক বুঝতে পেরেছিল যে তাদের নতুন হোস্ট দরকার। বিশেষ করে এমন এক হোস্ট যে এরকম আন-ম্যানড স্বশাসিত যুদ্ধজাহাজ রিসার্চের সঙ্গে যুক্ত আছে। ঠিক সে জন্যই প্রথম রাতে ওই ছত্রাক চলে আসে ডেভিডের শরীরে। ডিয়েগোর মাধ্যমে। সেজন্যই ডেভিডের ঘরে ডিয়েগো এসেছিল।

এসেছিল তার নতুন বাড়ি, বসতি খুঁজতে। আরও ক্ষমতাশালী হোস্ট খুঁজতে। হয়তো এরকম কিছু হোস্টের মাধ্যমে মানব জগতকে আস্তে আস্তে নিয়ন্ত্রণ করত শুরু করত ওরা।

এটুকু বলতে পারি সেই চেষ্টা আপাতত ব্যর্থ করে এসেছি। কিন্তু ওরা আসবে। ওরা আবার খোঁজ করবে নতুন শিকারের। ওরা শিকারের অপেক্ষায় থাকবে ওদের ওই চারনোবিলের রাজত্বে।

কিন্তু আমিও বসে থাকব না। আমাকে জানতে হবে ওদের কোষীয় গঠন। আমার ল্যাবে আমি এমন ন্যানোবট তৈরি করতে চলেছি, যারা ওদের ধ্বংস করবে ওদেরই কৌশলে, ওদেরই খেলায়।

প্রশ্ন হতে পারে আমি ওই ফাঙ্গাস পাব কোথায়?

আমি নিজে জানি আমার মধ্যেও ওরা আছে। আমিও ওই বিশেষ ছত্রাকের শিকার। তবে আমাকে ওরা এখনও কাবু করতে পারেনি। পারবেও না।

ড্রয়িং রুমে আমার ফোন রিং হচ্ছে। বললাম, গণেশ, দেখো তো কার ফোন?

খানিকবাদে গণেশের উত্তর আসে।

স্যার, অনিলিখা ফোন করছে।

অনিলিখা?

অনিলিখার ফোন ধরতে উঠে যাই সঙ্গে সঙ্গে।

ফোন ধরে বললাম, কী ব্যাপার অনিলিখা? কোনও খোঁজখবর নেই গত দুই সপ্তাহ। কোথায় তুমি?

কিন্তু ওর কথা স্পষ্ট শোনা গেলো না। কথা কেটে কেটে যাচ্ছে।

কী বলছ? শুনতে পাচ্ছি না? তুমি কোথায়? তোমার দিকের নেটওয়ার্ক খুব খারাপ। কিছুই শোনা যাচ্ছে না।

আরও কিছু অস্পষ্ট কথা ভেসে এল উল্টোদিক থেকে।

নাহ্, কোথায় আছ বলো তো? কীসের বিল?

এতক্ষণে একটু যেন কথা শোনা গেল উল্টোদিক থেকে।

মিস্টার পাই, আমি ইউক্রেনের চারনোবিল থেকে বলছি।

সর্বনাশ। চারনোবিল?

হ্যাঁ, আমি আপনার সঙ্গে একটা জরুরি ব্যাপারে কথা বলতে চাই ফোন কেটে যাওয়ার আগে। এখানে আমরা খুব দরকারি অভিযানে এসেছিলাম। কিন্তু আমার সঙ্গে যে তিনজন এসেছিল, তাদের সবাই গতকাল থেকে নিখোঁজ। আমি এখন এখানে একটা জায়গায়—

ফোন কেটে গেল।

হ্যালো, অনিলিখা, হ্যালো। শুনতে পাচ্ছ?

কোন উত্তর এল না।



আত্মহত্যা নাকি অন্য কিছু?

১৫ জানুয়ারি

হিন্দোল সাহা মৃত। এই খানিক আগেই মারা গেছে। হার্ট অ্যাটাক।

কী বলছিস? আর ইউ সিরিয়াস। তন্ময় বলে উঠল।

আমরাও সবাই প্রায় একসঙ্গে বলে উঠলাম।

বিশ্বজিৎদা সোফা ছেড়ে লাফিয়ে উঠতে গিয়ে পাশে বসা তন্ময়ের চায়ের কাপ চলকে দিয়ে বলল, বলিস কী রে প্রতীক? কখন হল? কোথায় খবর পেলি? তুই অর্থমন্ত্রী হিন্দোল সাহা-র কথা বলছিস তো?

হ্যাঁ, তাঁর কথাই বলছি। এই তো সবে ফেসবুকে দেখছি। বেশ কয়েকজন পোস্ট করছে। অলরেডি ভাইরাল হয়ে গেছে খবরটা।

ফেসবুকের খবরের উপরে পুরোপুরি বিশ্বাস নেই। অর্ধেক জেনেও কেউ একটা পোস্ট করলে খবর ভাইরাল হয়ে যায়। টিভিটা চালা একটু। অনিলিখাদি পাশ থেকে বলে উঠল।

আমরা সবাই শনিবারের আসরের উদ্দেশে যথারীতি প্রতীকের বাড়িতে জমায়েত হয়েছি। আজ অনিলিখাদিও সঙ্গে আছে। মিনিট পাঁচেক আগে ঘরে ঢুকেছে। কালো জিন্সের উপরে উজ্জ্বল লাল টপ পরে। সঙ্গে অবশ্য আজ শিঙাড়া বা চকলেট নেই। তার বদলে হাতে একটা গাছ নিয়ে ঢুকেছে। অবশ্য গাছ দেখে আমরা অবাক হইনি।

এখন গ্লোবাল ওয়ারমিং-এর বিরুদ্ধে সচেতনতা বাড়াতে অনিলিখাদির সঙ্গে প্রতি সপ্তাহে আমরা একশোটা করে গাছ লাগাই। সব খরচ, ব্যবস্থাপনা অনিলিখাদিই করে। এসব ব্যাপারে অনিলিখাদির উৎসাহ উদ্দীপনা খুব বেশি। এমনিতেই অনিলিখাদির এনার্জির কোনও অভাব নেই।

ভেবেছিলাম সে জন্যই কিছু বলতে হয়ত এই গাছটা নিয়ে এসেছে।

কিন্তু সে ব্যাপারে কিছু প্রশ্ন করার আগেই প্রতীকের কাছে এই চাঞ্চল্যকর খবরটা পেলাম। হিন্দোল সাহা শুধু জনপ্রিয়তম নেতা নয়, বহু বছর ধরে নানান কুকীর্তির জন্য খবরের হেডলাইনে থাকে, আবার বিপুল ভোটে জিতে ফিরেও আসে।

আমাদের শনিবারের আসরে একটা নিয়ম আছে। প্রতীকদের বাড়ির যে ঘরে আমরা সবাই আড্ডায় বসি, সেই ঘরে টিভি থাকলেও কোনওদিন টিভি চালানো হয় না। অনিলিখাদির নিয়ম। আমরা সবাই নাকি টিভি, কম্পিউটার ও ফোনের দৌলতে কথা বলতে ভুলে যাচ্ছি। টিভি চালানো থাকলে অনিলিখাদির পরিভাষায় 'বিশুদ্ধ আড্ডা' হতেই পারে না।

তবে এরকম খবর দেখার পরে তো আর না চালিয়ে থাকা যায় না।

টিভি চালাতেই দেখলাম সব চ্যানেলেই দেখাচ্ছে। ব্রেকিং নিউজ। হিন্দোল সাহা মারা গেছে।

রোববার হিন্দোলবাবুর মদ্যপান দুপুর বারোটা থেকে শুরু হয়। মদ্যপানের পরে দুপুর তিনটে নাগাদ খান। এই একটা দিন এই সময় তিনি একাই থাকেন। ভিতর থেকে বন্ধ করে দেন দরজা। দাপুটে সাহেবকে এসময় কারও বিরক্ত করার নিয়ম নেই। আজকেও সে নিয়মের কোনও পরিবর্তন হয়নি। কিন্তু সেখানে তিনটের জায়গায় চারটে বেজে যাওয়ার পরেও আজ বাবু ঘর থেকে বেরোননি। খেতে আসেননি। শেষে চাকর এসে বেশ খানিকক্ষণ ধরে ঘরের দরজার সামনে

থেকে ডাকাডাকি করে। সাড়া না পেয়ে বাড়ির অন্যদেরও তখন ডেকে আনা হয়। অনেক ধাক্কাধাক্কির পরেও কোনও সাড়া না পেয়ে শেষে দরজা ভেঙে ফেলা হয়।

দেখা যায় সোফার উপরে নিস্পন্দভাবে বসে আছেন। মাথাটা শুধু সামনের দিকে একটু ঝুঁকে আছে। বসে বসেই হার্ট অ্যাটাক হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

নিথর দেহ। পালস নেই। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার ডেকে আনা হয়। তিনি দেখেই কনফার্ম করেন যে হিন্দোলবাবুর মৃত্যু হয়েছে। বড় রকমের কোনও হার্ট অ্যাটাক।

এখন অবশ্য বডির ফরেনসিকস হবে। তারপরে মৃত্যুর কারণ নিশ্চিতভাবে বোঝা যাবে।

সহেলী বলল, কী ভাগ্য দেখো। এক বছর জেলে থাকার পরে এত কাণ্ড করে ছাড়া পেল। এত জায়গায় বিক্ষোভ, আগুন, এত লোক রাজনৈতিক হানাহানি হিংসায় মারা গেল, সব কিছুর পরে লোকটা ছাড়া পেয়ে হঠাৎ করে মারা গেল!

বিশ্বজিৎদা পাশ থেকে বলল, উঁহু, এসব লোকেদের হার্ট তোর আমার মতো দুর্বল নয়। এদের হার্ট অ্যাটাক চট করে হয় না। ডালমে জরুর কুচ কালা হ্যায়।

অনিলিখাদিও বলল, আমারও কিছুটা সন্দেহ হচ্ছে। লোকটা এত অপরাধ করেছে যে এর শত্রুর অভাব নেই। আইন আদালতকে ফাঁকি দিয়ে জেল থেকে বেরিয়েছে, কিন্তু শত্রু আর অপরাধ তো কিছু তাতে কমেনি! যাই হোক, ভালোই হয়েছে। কত লোকের সর্বনাশ যে এর জন্যে হয়েছে, কে জানে!

আমরা সবাই সায় দিলাম। এমনকী বিশ্বজিৎদাও।

আবার টিভির খবরের দিকে চোখ পড়ল। এখন ওঁর আপ্তসহায়ক রঞ্জন ভড় উত্তেজিত ভাবে বলছেন। রঞ্জনবাবুরও ধারণা মৃত্যু স্বাভাবিক নয়। হিন্দোলবাবুর হার্ট রিলেটেড সমস্যা আগে কোনদিন হয়নি।

সে বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। টিভিতে এরকম কোনও বিষয় পেলে সঙ্গে সঙ্গে আসর বসে যায়। একটা চ্যানেলে বিভিন্ন দলের বেশ কয়েকজন প্রতিনিধি হাত পা ছুড়ে একসঙ্গে কথা বলে যাচ্ছে। কারও কথাই শোনা যাচ্ছে না। সঞ্চালক হাসি হাসি মুখ করে কী করবে বুঝতে না পেরে সেই চিৎকারের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

শুধু মাঝে মধ্যে 'ব্রেকিং নিউজ' বলে ঘটনাস্থলে থাকা সাংবাদিক ভোলাকে লেটেস্ট আপডেট দিতে বলছে।

আরেকটা চ্যানেলে রাজ্য সরকারের এক প্রাক্তন ডিটেক্টিভ দেখি এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হিসেবে বলে যাচ্ছেন, না, না এটা মার্ডার, সেরকম ভাবার

এখনও কোনও কারণ নেই। জানা গেছে ঘরের ভিতর থেকে দরজা জানলা বন্ধ ছিল। এমনিতেও তিনি খুব সাবধানী ছিলেন। এবারে জেল থেকে বেরনোর পর থেকে আরও সাবধানী হয়ে গিয়েছিলেন। শুনলাম ওঁর দুজন খুব বিশ্বস্ত লোক আছে, যারা তিনি কোনও কিছু খাওয়ার আগে সে খাবার বা ড্রিঙ্ক টেস্ট করে দেখে। আজকেও করেছে, এগারোটা নাগাদ। তারপরে অন্য দিনের মতো বারোটায় ঘরে ঢুকে তিনি ঘরের দরজা বন্ধ করে দেন। মাঝে কেউ আসেনি দেখা করতে। ঘরের বাইরে একজন বিশ্বস্ত গার্ড সারাক্ষণ বসে ছিল। যখন চারটে নাগাদ দরজা ভেঙে ঢোকা হয়, তখনও সব জানলা দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল।

এমনিতেও সবার লক্ষ এড়িয়ে কেউ বাড়ির বাগানের দিকের তিনতলার জানলা দিয়ে ঢুকে, আবার সবার অলক্ষ্যে বেরিয়ে যাবে, এটা ভাবা স্বাভাবিক নয়। ফরেনসিকস-এর রেজাল্ট পেলে নিশ্চিতভাবে বলা যাবে।

মিলন শুনে বলল, তবে? বাইরে থেকেও কেউ আসেনি! জানলাও বন্ধ ছিল। মার্ডার কী করে করবে? মনে হয় হার্ট অ্যাটাকই হয়েছে। এসব কি আর বলে কয়ে হয়! এই আগের বছরে আমার পিসতুতো ভাই সুজিতের মোটে তিরিশ বছর বয়সে হার্ট অ্যাটাক হল। সে তো রীতিমতো স্পোর্টস পার্সন ছিল। দারুন হেলথ। ওর-ও যে হার্ট-এর প্রবলেম আছে, এমন কারও আগে জানা ছিল না।

এই তোর মুশকিল। সব কিছু আগে থেকেই জেনে গেছিস। আমি নিশ্চিত এটা মার্ডার। ফরেনসিকসটা আসতে দে। ওই গোয়েন্দা যাই বলুক না কেন, আমি সাতটা সন্দেহের কারণ খুঁজে পেয়েছি। চোখ খোলা রাখলে, ঘটনার পারম্পর্য বিচার করলেই এই সন্দেহের কারণগুলো যে কোনও ইন্টেলিজেন্ট লোক বুঝতে পারত। তন্ময় বলে উঠল।

একটা নয়, টিভি দেখে কিছু না জেনে সাত-সাতটা সন্দেহের কারণ খুঁজে পেয়ে গেলি! আর কত গুল মারবি?

ব্যাস, মিলন ও তন্ময়ের মধ্যে তুমুল ঝগড়া বেঁধে গেল।

একটা খবরের চ্যানেলে আবার এর মধ্যে হিন্দোলবাবুর বসার ঘর দেখাতে শুরু করেছে।

সঞ্চালিকা চিলচিৎকার করে বলে চলেছেন, আমাদের চ্যানেল এখন পৌঁছে গেছে হিন্দোলবাবুর বসার ঘরে। ঠিক কী হয়েছিল কয়েক ঘণ্টা আগে? সবার আগে সবার জন্য সবকিছুর খবর। আমাদের চ্যানেল এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে।

অনিলিখাদি বলে উঠল, এবারে বন্ধ করে দে। এসব এখন সারাদিন চলবে। কিছু না জেনে শুধু কথা বলে যাওয়া। যতক্ষণ না ফরেনসিক হচ্ছে, তদন্ত কমপ্লিট হচ্ছে, কিছুই নিশ্চিত ভাবে বলা যায় না। দুটোই হতে পারে, ডিপেন্ড করছে কারো হত্যা করার সুযোগ ছিল কিনা। এই টিভি চালানো থাকলে আর কোনও গল্প করা যাবে না। তার থেকে তোদের এই গাছটার কথা বলি। যে জন্য এটাকে নিয়ে এলাম। পরশু দিন মিস্টার পাই-এর বাড়িতে গিয়েছিলাম। দেখি পুরো বাড়িকে প্রায় জঙ্গল বানিয়ে ফেলেছেন। শুধু বাগানে যে নানান ধরণের গাছ লাগিয়েছেন, তাই না, ঘরের মধ্যেও নানান ইনডোর প্ল্যান্ট। আমাকে তার মধ্যে থেকে একটা গাছ উপহার দিলেন। মাঝে মধ্যে এমন এক একটা গবেষণা নিয়ে মেতে ওঠেন, এখন...

অনিলিখাদির কথা থেমে গেল। চোখ আবার টিভি চ্যানেলের দিকে।

প্রতীক ব্যস্ত হয়ে টিভি বন্ধ করতে যাচ্ছিল। অনিলিখাদি বারণ করে উঠল, দাঁড়া, দাঁড়া, বন্ধ করিস না।

অনিলিখাদি এবার টিভির দিকে তাকিয়ে উঠে দাঁড়ালো। টিভির খুব কাছে গিয়ে দেখতে থাকল। কিছু একটা দেখে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। ক্যামেরায় হিন্দোলবাবুর বসার ঘরটা নানান দিক থেকে দেখাচ্ছে।

খানিকবাদে অনিলিখাদি ফের উত্তেজিতভাবে স্বগতোক্তি করে উঠল, ইন্টারেস্টিং।

কী হয়েছে অনিলিখাদি!

টিভিতে দেখি তখনও হিন্দোলবাবুর ড্রয়িংরুমটা দেখিয়ে যাচ্ছে। এটাকে ড্রয়িংরুম বলা যায় কিনা জানি না। এরকম নাকি আরও সাতটা ড্রয়িংরুম আছে বাড়িতে। তবে প্রতি রোববারে একা পানীয় খাওয়ার জন্য এই ঘরটাই বেছে নিতেন হিন্দোলবাবু। সেদিক থেকে পানীয়রুম বলা ভালো।

কিন্তু অনিলিখাদি হঠাৎ এরকম বলে উঠল কেন। ঘরে একটা সাপ, বিছে, ভেঙে পড়া ফুলদানি, রক্ত—এরকম কিছু একটা অন্তত দেখলে বুঝতাম। সেরকম কিছুই নেই যা দেখে এরকম কিছু মন্তব্য আশা করা যায়। সবই স্বাভাবিক।

টিভিতে যা দেখাচ্ছে তার উপর নির্ভর করে ঘরটাকে একটু বিশদে বর্ণনা করা যাক। বিশাল একটা ঘর। মার্বেলের মেঝের উপরে ঘরের মাঝখানে মোটা গালিচা পাতা। নানান ধরণের দামি ক্রিস্টাল ঘরের চারদিকে সাজানো। চারটে পাথরের নগ্ন নারী মূর্তি আছে ঘরের চারকোণে। দেওয়াল জুড়ে নানান অয়েল পেন্টিং। ঘরের ফলস সিলিংয়ে হালকা হলুদ আলো জ্বলছে।

ঘরের মধ্যে বিশাল দামি লেদারের সোফাসেট, যেখানে হিন্দোলবাবুর দেহ পাওয়া গেছে। সোফা সেটের সামনে একটা বেশ কারুকার্য করা কাঠের টেবিল

যেখানে এখনও কিছু খাবার রাখা আছে। আছে একটা গ্লাস ও একটা দামি পানীয়ের বোতল। এসব দূর থেকে দেখানো হচ্ছে। এখন ঘরে ঢোকা যাচ্ছে না।

ঘরের এক দিকে বেশ বড় একটা বার। তাতে নানান ধরণের দামি পানীয় সাজানো আছে। পাশে বড় একটা ফ্রিজ।

বিশ্বজিৎদা বলল, ব্লু লেভেল স্কচ, কনিয়াক, শ্যাম্পেন। বেশ দামি দামি পানীয় দেখছি। রাজা-রাজড়ার ব্যাপার।

ঘরের একটা দেওয়াল জুড়ে বিশাল একটা টিভি। সেটা অবশ্য বন্ধই ছিল। অর্থাৎ ঘরের মধ্যে কোন আওয়াজ হলে বাইরে থেকে গার্ড ঠিক শুনতে পেত।

বারবার করে দেখালেও ঘরে এমন কিছু নেই, যা নিয়ে সামান্যতম সন্দেহ হয়। একই সঙ্গে সেই অবসরপ্রাপ্ত গোয়েন্দা পুলিশ প্রধানও একই কথা বারবার বলে চলেছে। বলছে সন্দেহের কিছুই নেই ঘরের মধ্যে।

সেখানে টিভিতে দেখে অনিলিখার হঠাৎ করে ওই মন্তব্যের কী কারণ থাকতে পারে!

অনিলিখাদি যেন প্রথমে দেখে চমকে উঠেছিল। এখন অবশ্য চমকে ওঠার ভাবটা আর নেই। শুধু ঠোঁটের কোণে একটা রহস্যময় হাসি লেগে আছে।

কী ব্যাপার অনিলিখাদি? কী হল?

কিছু না।

কিছু একটা লুকোচ্ছ অনিলিখা। বিশ্বজিৎদা বলে ওঠে। কিছু চোখে পড়েছে?

অনিলিখাদি একটু দ্বিধা করে আমাদের উদ্দেশে বলে ওঠে, আচ্ছা, ওই ঘরের মধ্যে আর আমাদের এই ঘরের মধ্যে কী মিল আছে, বল তো?

ফ্যান, তন্ময় বলে উঠল।

ধুর। তা না। আর কী?

সোফা, টেবিল, জলের গ্লাস, জানলা, ডাস্টবিন, অয়েল পেন্টিং—প্রায় সব কিছুই আমরা এক এক করে বলে গেলাম।

উহু, আরেকটা জিনিস আছে। তবে সবকিছুর মধ্যে এমন ভাবে মিশে আছে যে বোঝা যাচ্ছে না।

কী সেটা?

ধুর, তোদের সামান্যতম অবসারভেশন পাওয়ার নেই। তবে সে ব্যাপারে এখন কিছু বলা যাবে না। একটু অপেক্ষা করতে হবে। তবে হিন্দোলবাবুর মৃত্যুতে তার কোনও ভূমিকা নেই, এরকমও হতে পারে।

কী বলো না!

অনিলিখাদি এবারে আবার সেই মনমাতানো মিষ্টিহাসি হেসে বলে উঠল, এর উত্তর আজ থেকে ঠিক কয়েক মাস বাদে দেব। এখন বলা যাবে না।

আমরা সবাই বেশ খেপে উঠলাম। কিন্তু অনিলিখাদি বলবে না তো বলবেই না। কিছুক্ষণ পরে আমরা সবাই ক্ষান্ত হলাম। আলোচনা অন্য দিকে ঘুরে গেল।

১৮ জুলাই

গত কয়েকদিন ধরে একটানা বৃষ্টি হয়েছে। বর্ষাকাল। এসময় অস্বাভাবিক কিছু নয়। আমাদের পাড়াও আবার সেই বর্ষাকালের চেনা পরিচিত ছবিতে ফিরে গেছে। পুরো রাস্তা হাঁটু জলে ভাসছে। নানান ধরণের ময়লা বর্জ্য কাগজ ন্যাকড়া ভেসে বেড়াচ্ছে জলে। তবে সেসব সত্ত্বেও আমরা সবাই শবিবারের আসরে উপস্থিত।

তার কারণ অবশ্যই অনিলিখা ফ্যাক্টর। অনিলিখাদি কিছুদিন আগে বেলজিয়াম থেকে ফিরেছে। আমরা নিশ্চিত বেশ কিছু বেলজিয়ান চকলেটের দেখা মিলবে আজ। অবশ্য সেটা যত বড় আকর্ষণই হোক না কেন, অনিলিখাদি তার থেকে অনেক বেশি বড় আকর্ষণ।

অনিলিখাদি ঠিক সময় মতোই ঢুকল। শালোয়ারের উপরে রেনকোট পরে। এক হাতে ছাতা, অন্য হাতে চটি ও একটা বড় চকলেটের বাক্স নিয়ে ঘরে ঢুকল।

মুখের সামনে থেকে চুল সরাতে সরাতে বলল, কলকাতা আছে কলকাতাতেই। এত জল!

তারপরে চকলেটের বাক্সটা টেবিলে রেখে বাথরুমে পা ধুতে চলে গেল। যখন ফিরে এল তখন আমাদের মধ্যে টি-২০ নিয়ে উত্তপ্ত আলোচনা চলছে।

এমন সময় নানান কথার মধ্যে অনিলিখাদি হঠাৎ করে বলল, আজ ছ'মাস হল। মনে আছে কী বলেছিলাম ছ'মাস আগে?

কী কথা? বলতে গিয়েই আমার খেয়াল হল। হিন্দোল সাহা?

হ্যাঁ, তাই তো, হিন্দোল সাহার মৃত্যু। সেটা নিয়ে? ওরেবাবা, তোমার ঠিক খেয়াল আছে তো!—প্রতীকও পাশ থেকে বলে উঠল।

বাসি খবরে কোনও কাজ নেই। কেস ক্লোজড। বিশ্বজিৎদা বলে উঠল।

প্রতীক অনিলিখাদিকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠল, হ্যাঁ, সেটা তো স্বাভাবিক মৃত্যু, নর্মাল হার্ট অ্যাটাক ছিল। সেটা তদন্তে প্রমাণও হয়ে গেছে। তুমি কি এখনও কোনও সন্দেহ করছ?

তার আগে বলি, মনে আছে সেদিন আমার হাতে কী ছিল? একটা গাছ। তাই না!

একটা অচেনা ধরণের ছোট গাছ ছিল তোমার হাতে।

সেদিন আমার হাতের ওই গাছ সম্বন্ধে কিছু বলা হয়নি।

কিন্তু সেই গাছের সঙ্গে এই ঘটনার কী সম্পর্ক।

আমাকে ওই গাছটা উপহার দিয়েছিলেন মিস্টার পাই। তার কয়েকদিন আগে, তাঁর বাড়ি গেছি, দেখি তিনি বাগান জুড়ে অনেক নতুন চারাগাছ লাগিয়েছেন। খুব ব্যস্ত। কিন্তু আমাকে সে ব্যাপারে কিছুই বললেন না। অন্য নানান গল্পের পরে তিনি আমাকে ওই চারাগাছটা উপহার দিলেন।

বুঝতেই পারছিস, তিনি কিছু দিয়েছেন, মানে সেটা স্পেশাল কিছু যে হবে তা তখনই বুঝে গিয়েছিলাম। গাছের পাতা, ডাল দেখে অনেকটা তুলসীর মতো মনে হলেও পাতাগুলো যেন একটু অন্যরকম ছিল।

কী গাছ জানতে চাইলে তিনি আমার প্রশ্ন বারবার এড়িয়ে গেলেন। শুধু বললেন এটা কোনও ঘরে রাখলে আমি নাকি মশা থেকে নিষ্কৃতি পাব।

বাড়িতে ফিরে এসে একটা ঘরে আলাদা করে রেখেছিলাম গাছটা। কয়েকদিন পরে দেখি গাছটার পাশে বেশ কিছু মশা মরে পড়ে আছে। লক্ষ করলাম গাছটা যেখানে রাখা হয়, সেখানে মশা থাকে না। এটা বোঝার পরে তোদের দেখাতে সেদিন গাছটা এনেছিলাম।

মানে? পতঙ্গভুক গাছ?

না, তা নয়, তবে তিনি কী করেছেন, সেটা আমি আন্দাজ করতে পেরেছিলাম। CRISPR কথাটা শুনেছিস?

কী সেটা?

জিন এডিটিং। কোনও গাছের ডিএনএ প্রয়োজনমতো পরিবর্তন করে নতুন গাছ সৃষ্টি, যার মাধ্যমে সেই গাছের মধ্যে ইচ্ছেমতো কিছু বৈশিষ্ট্য বা ক্ষমতা আনা সম্ভব। আমার সন্দেহটা মিস্টার পাইকে ফোন করতেই নিশ্চিত হয়ে গেলাম। গাছের জেনোম পরিবর্তন করে তিনি এমন কোনও গাছ করেছেন, যে সে গাছ ঘরে রাখলে মশা মারা যায়।

এরকম আবার সম্ভব হয় নাকি?

হ্যাঁ, করা সম্ভব। এরকম বেশ কিছু রিসার্চ এখন হচ্ছে। তবে তিনি তো প্রায় সবার থেকেই বিজ্ঞান গবেষণাতেই অনেক এগিয়ে থাকেন। তিনি নিশ্চয়ই এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সফল হয়েছেন। আমাকে সেদিন সেরকম একটা গাছ দিয়েছিলেন যা এমন কিছু শব্দ বা নয়েজ তৈরি করে, বা এমন কিছু কেমিক্যাল বাতাসে ছাড়ে যা মশারা সহ্য করতে পারে না।

এরকম হয় নাকি? এ তো সায়েন্স ফিকশনের মতো শোনাচ্ছে।

মোটেই না। ওঁর কথা যে ঠিক সে প্রমাণ আমি পেয়েছি। তোরা জানিস কিনা জানি না, ইভনিং প্রিমরোসের মতো এমন কিছু গাছ আছে, যারা মৌমাছি ওড়ার শব্দ পেলে আরও বেশি করে মিষ্টি মধু তৈরি করে যাতে মৌমাছিরা

তাদের ফুলে আকৃষ্ট হয়। এই গাছটাও সেরকমই কিছু করে, যা মশারা সহ্য করতে পারে না। জিন এডিটিং-এর মাধ্যমে এটা হয়তো করা যায়। তিনি করেছেন।

কাম টু দ্য পয়েন্ট অনি। এসবের সঙ্গে হিন্দোলবাবুর মৃত্যুর সম্পর্ক কী? বিশ্বজিৎদা পাশ থেকে চোখ সরু করে বলে উঠল।

ঠিকই। হিন্দোলবাবুর সঙ্গে আমি মশার তুলনা করছি না। মশাও হিন্দোল সাহার মতো অতটা ক্ষতিকর প্রাণী নয়। কিন্তু একই ভাবে এমন গাছ কি তৈরি করা সম্ভব নয়, যা মানুষ মারতে পারে। একই রকম ভাবে জিন এডিটিং টেকনোলজি ব্যবহার করে! সেদিন টিভিতে তোরা যেটা খেয়াল করিসনি তা হল হিন্দোলবাবুর বাড়িতে শুধু যে একটা গাছ ছিল, তাই নয়, তার উপরে একটা নাম ছোট করে লেখা ছিল। CU.

CU—Culicidae হল মশার বৈজ্ঞানিক নাম। যেটা আমার গাছে লেখা ছিল ছোট করে। ঠিক একই ভাবে ওই টিভিতে দেখা হিন্দোলবাবুর ঘরের গাছের পাশে লেখা ছিল HS

মানে হোমো স্যাপিয়েন্স? মানুষ! সহেলী পাশ থেকে বলে উঠল।

হয়তো তাই। তবে ওটা দেখেই আমার মনে হয় যে আমি যে গাছটা পেয়েছি ও ওই হিন্দোলবাবুর ঘরের গাছটা একই লোকের হাতে তৈরি। উদ্দেশ্য সেটা কোনও এক বিশেষ মানুষকে মারবে।

মানে? ওটাও মিস্টার পাই-এর হাতে তৈরি! কী বলছ? তন্ময় চেঁচিয়ে বলে উঠল।

কিন্তু তারপরে ওই গাছটা অন্য কাউকে মারল না কেন? ওই ঘরে তো আরও অনেকে গেছে নিশ্চয়ই। তাদেরও তো মরা উচিত ছিল। প্রতীক বলে উঠল।

ভালো প্রশ্ন। কিন্তু এরকম যদি হয় যে একবার মানুষ মারার পরে সেই গাছটা শুকিয়ে যায়, নিজেই মারা যায়, তাহলে তো আর সেটা হবে না? জিন এডিটিং-এর মাধ্যমে এটাও করা যায়। আমার ধারণা ঠিক ছিল। গাছটা কেউ পরে লক্ষ করেনি শুকিয়ে যাওয়ায়। শুকিয়ে যাওয়ায় ওরা ফেলেও দেয়।

তুমি এটা কনফার্ম করতে মিস্টার পাইকে সরাসরি এই ব্যাপারে জিগ্যেস করোনি?

করেছিলাম। সেদিন এখান থেকে ফিরে গিয়েই আমি ওনাকে এ ব্যাপারে ফোনে জিগ্যেস করি। অবশ্য প্রশ্নটা অন্যভাবে করেছিলাম। কী কারণে সন্দেহ করছি, সেটা উল্লেখ না করে। প্রশ্ন করেছিলাম, জিন এডিটিং-এর মাধ্যমে তৈরি কোনও গাছ কি শুধু কোনও এক বিশেষ মানুষকে মারতে পারে? যাকে বলে টার্গেটেড মার্ডার।

কেন করেছিলাম, তা নিশ্চয়ই তোরা বুঝতে পেরেছিস। ওই গাছ নিশ্চয়ই বেশ কিছু হাত ঘুরে হিন্দোলবাবুর হাতে এসেছে। বাকিদের কিছু হল না কেন?

তা তিনি কী বললেন? প্রতীক বলে উঠল।

তিনি বললেন, হ্যাঁ, হতেই পারে যে একটা গাছকে এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যা অ্যালকোহলের গন্ধ আদৌ সহ্য করতে পারে না। হয়তো সেরকম কোনও গন্ধ পেলে বিষাক্ত কোনও কেমিক্যাল নিষ্ক্রমণ করে। তখন পাশে বসে থাকা কোনও নেশাগ্রস্ত লোকের জন্য সেই গাছ খুব ডেঞ্জারাস। সেভাবে অবশ্যই একটা গাছ তৈরি করা যেতে পারে। বা এমনভাবে তৈরি করা যেতে পারে যে কোন এক বিশেষ জেনেটিক প্রোফাইলের মানুষের জন্যই এই ধরণের গাছ খুব ডেঞ্জারাস।

এমনভাবে বললেন যেন এটা বেশ ইন্টারেস্টিং রিসার্চের বিষয় হতে পারে।

তারপরে হেসে বলেছিলেন, কেন হঠাৎ করে এই প্রশ্ন। টিভিতে এরকম কিছু দেখেছ?

একটু থেমে ফের বলেছিলেন, আমরা অনেক সময় খুব বড় অপরাধীদের বিরুদ্ধে কিছু করতে পারি না। আইন আদালতও কিছু করতে পারে না। কারণ সমাজে বাজে লোকেদের সংখ্যা অনেক বেশি।

বুঝতে পারলাম তিনিও বুঝতে পেরেছেন যে আমি সবটা আন্দাজ করতে পেরেছি।

প্রশ্ন করতে পারতাম তিনি কীভাবে এই গাছ হিন্দোলবাবুকে দিয়েছিলেন। সেটা সরাসরি না করে জিগ্যেস করেছিলাম, কিন্তু এরকম একটা গাছ হিন্দোলবাবুর কাছে কীভাবে এল, সেটা কিছু আন্দাজ করতে পারলেন?

হ্যাঁ, সেটাও আন্দাজ করা যায়। বলে গলা খাঁকরিয়ে ফের বলে উঠলেন, শুনলাম ফ্লাওয়ার শো এর সেরা গাছটা নাকি প্রতি বছর ওঁকে উপহার দেওয়া হয়। খুব পাওয়ারফুল সমাজসেবী লোক তো। এভাবে ফ্লাওয়ার শো-এর তরফ থেকে ওঁকে উপহার দেওয়ার যে একটা অলিখিত নিয়ম থাকে, সেটা কারও জানা থাকতেই পারে। সে হয়তো এটাও জানত যে তার ফুলগাছ সেরা হবেই। তবে এরপরেও কেউ কী করে জানবে যে যাদের জন্য ওই গাছটা এতো বিপজ্জনক সেই জেনেটিক প্রোফাইলের সঙ্গে ওই, ওই যে কী নাম বললে না, হাবলা না কল্লোল কী যেন, তার জেনেটিক প্রোফাইল মিলে যাবে। পুরো ব্যাপারটা এরকম ভাবে হয়ে থাকতেই পারে। তবে এটা আবার একটা সামান্য সম্ভাবনার বাইরে কিছু নয়।

বিশ্বজিৎদা এতক্ষণ চুপ করে শুনছিল। হইহই করে চেঁচিয়ে উঠল, এ তো একটা বিশাল ষড়যন্ত্র। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে তোমার ওই মিস্টার পাই রীতিমতো মার্ডারার, খুনী। তারপরেও তুমি চুপ করে বসে আছ, অনিলিখা? তোমার মতো একজন যে নাকি কোনওদিন অন্যায় সহ্য করে না, সে তার বিজ্ঞানী বন্ধুকে বাঁচাচ্ছে। অসাধারণ। দ্যাটস নট রাইট।

অনিলিখাদি মুচকি হেসে বলল, উঁহু, ওঁর বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ নেই। তিনি তো আর নিজে হাতে গাছটা হিন্দোলবাবুকে দেননি। হয়তো তিনি এটাও জানতেন না যে হিন্দোলবাবু একা ঘরে পানীয় সেবন করতে করতে গাছটাকে পাশে নিয়ে বসবেন। এসব ধারণা বা সম্ভাবনার উপরে দাঁড়িয়ে কি কাউকে অপরাধী বলা যায়। সবথেকে বড় কথা, আমার মশা মারার গাছটা আর ওই গাছটা দুটোই আজ নেই। দুটোই ফেলে দেওয়া হয়েছে। ওঁর বিরুদ্ধে আজ কোনও প্রমাণ-ই নেই।

ঠিক এজন্য তুমি সেদিন এই কথা বলতে চাওনি, তাই তো! এখন সব প্রমাণও তুমি সরিয়ে দিয়েছ। ইউ আর ইকুয়ালি পার্টনার টু দা ক্রাইম। তুমি নিশ্চয়ই জানো, এসবই মিস্টার পাই-এর প্ল্যান। তিনি সব জেনেশুনেই করেছিলেন। জানতেন এটা প্রমাণ করা অসম্ভব হবে, বিশ্বজিৎদা ফের বলে উঠল।

অনিলিখাদি একটু থেমে থেকে বলল, মনে আছে চারবছর আগে গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে কলকাতার এক বস্তিতে বড়সড়ো আগুন লেগেছিল! চোদ্দজন মারা যায়। তার মধ্যে চারজন বাচ্চা। হাজারো লোক গৃহহীন হয়ে পড়ে। সেই বস্তির জায়গায় দু বছর আগে একটা বিশাল বড় শপিংমল হয়েছে। আগুন লাগা থেকে সবথেকে উপকৃত হয়েছিল যারা, তাদের মধ্যে অবশ্যই সেই শপিংমলের মালিকও পড়েন। সে ব্যক্তি আর কেউ নয়, হিন্দোলবাবু। এরকম আরও অনেক কীর্তি আছে ওঁর। কিন্তু লোকটা প্রত্যেকবার এমন ভাবে কাজটা করত, যে কিছুতেই শেষে ওঁর বিরুদ্ধে সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া যেত না। মজা দেখো, এখানে ঠিক সেরকমই যেন হল। মার্ডার জানলেও কে খুনী তা প্রমাণ করা আদালতে অসম্ভব।

অনিলিখাদি চুপ করল কিছুক্ষণের জন্য। তারপরে ফের বিশ্বজিৎদাকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠল,

এখন অন্য প্রসঙ্গে যাই। ওহ্ ইন্সিডেন্টালি তোমাকে যে গাছটা উপহার দিয়েছিলাম, সেটা কি এখনও আছে? ওটাও তো মিস্টার পাই-এর থেকেই উপহার পাওয়া।

বিশ্বজিৎদা দেখি প্রশ্নটা শুনে কিছুক্ষণ হতবাক হয়ে বসে থাকল। তারপরে

লাফিয়ে উঠে বলে উঠল সর্বনাশ। কোন গাছ? কী হয় সেই গাছে?

তারপরে ফের বলে উঠল, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। ইনফ্যাক্ট, আমি কী ইডিয়ট। সেই গাছটা তো আমার ড্রয়িংরুমে রাখা। ওটাতেও যেন কী একটা লেখা ছিল। কিছু দিন আগে চোখে পড়েছিল।

হ্যাঁ, ওটাতে BM লেখা ছিল।

বাহ, তোমার দারুণ মেমারি তো। যাক HS বা হোমো স্যাপিয়েন্স লেখা নেই।

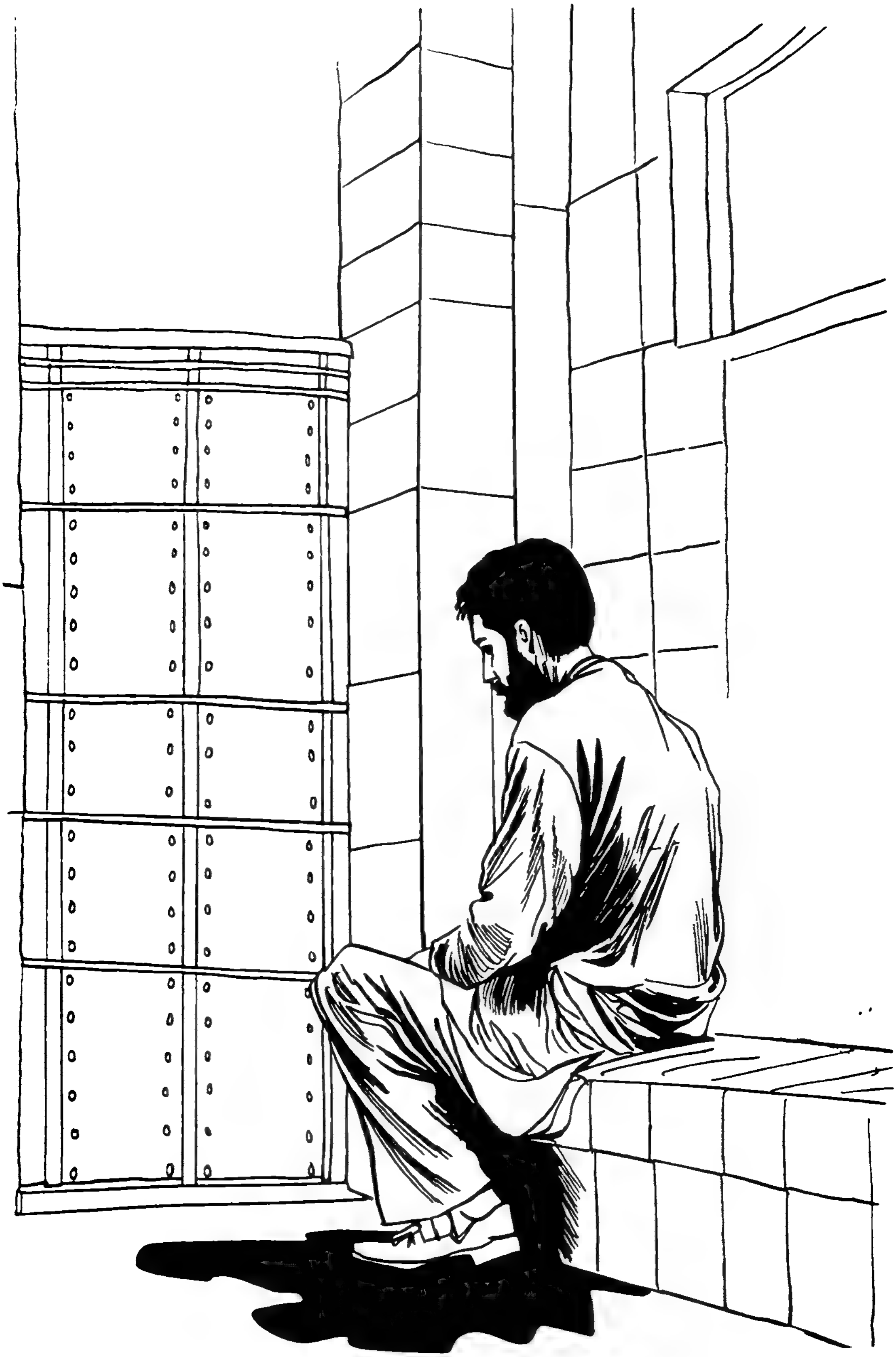
মানে মানুষের কোনও ক্ষতি করে না আমার গাছটা। তাই না, অনি?

অনিলিখাদি উঠে দাঁড়িয়ে যেতে যেতে বলল, বেরোতে হবে। অনেক দেরি হয়ে গেলো কথায় কথায়। তবে যাওয়ার আগে তোমার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাই। HS মানে কী নিশ্চিতভাবে জানি না। তবে HS মানে হোমো স্যাপিয়েন্স না হয়ে হিন্দোল সাহাও হতে পারত। ঠিক যেমন BM বলতে বিশ্বজিৎ মিত্র বোঝানো হতে পারে। মানে পুরোপুরি টারগেটেড জিন এডিটিং।

মানে? বিশ্বজিৎদা আর্তনাদ করে উঠল।

অনিলিখাদি ততক্ষণে চটি পরে ঘরের বাইরে পা দিয়েছে। শুধু একবার ঘুরে দাঁড়িয়ে বিশ্বজিৎদার দিকে মিষ্টি হেসে বলল, দেখো, গাছের পাশে বসে আবার সিগারেট বা কোন অ্যালকোহল পান করো না। কী জানি কী হতে পারে! গাছটা কী সহ্য করতে পারে না ঠিক জানি না, তবে মিস্টার পাই ওই দুটোই একেবারে সহ্য করতে পারেন না।

উপন্যাস



অনিলিখা ও সেই সন্ত্রাসবাদী ছেলেটা

Arajakata Exclusive

গল্পের আগের গল্প

প্রফেসার কেলভিন আজ খুব খুশি। কিছুক্ষণ আগেই শেরিং-এর উপরে তাঁর ল্যাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করছিলেন। সে পরীক্ষা সফল। বলা যায় চূড়ান্ত সফল।

এ পরীক্ষা মানুষের উপর সফল হলে অনেক কিছুই পাল্টে দিতে পারে। এখনও অবশ্য মানুষের উপরে পরীক্ষাই করা হয়নি। করা হয়েছে জিনগত দিক দিয়ে মানুষের সবথেকে কাছাকাছি থাকা একটা প্রাণীর উপর।

শেরিং হল আফ্রিকার উগান্ডার থেকে নিয়ে আসা একটা শিম্পাঞ্জি।

মানুষের ডিএনএ-এর সঙ্গে ৯৮.৮ শতাংশ ডিএনএ-এর মিল এই শিম্পাঞ্জির। মানুষের নিকটতম আত্মীয়।

এর আগে তিনি ইঁদুর, স্লাগ থেকে শুরু করে নানান ধরনের প্রাণীর উপরে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়েছেন। কিন্তু শেরিং-এর উপরে পরীক্ষায় সাফল্যের তাৎপর্য অন্যরকম। শেরিং-এর উপর সফল হওয়ার অর্থ মানুষের জন্যও সফল ড্রাগের সন্ধান পাওয়া। হয়ত কয়েকবছরের মধ্যেই মানুষের জন্য এরকম ড্রাগ তৈরি করা যাবে।

কেলভিন ও তাঁর অ্যাসিস্ট্যান্ট মারিয়া একটু দূর থেকে লক্ষ করছিলেন। কেলভিন মাঝে মধ্যেই উত্তেজিত হয়ে হাঁটতে শুরু করছিলেন। আর উত্তেজনায় বারবার দাঁত দিয়ে হাতের নখ কামড়াচ্ছিলেন। তারপরে আবার চেয়ারে বসে উত্তেজনায় পা দুটো সমানে নাড়াচ্ছিলেন। ওঁর কাজ একটাই, শেরিং কী করে সেটা পর্যবেক্ষণ করা। সামনে আসার উপায় নেই। সেক্ষেত্রে শেরিং-এর সাধারণ ব্যবহারের উপরে প্রভাব পড়বে।

শেরিং-এর জন্য ল্যাবের একটা জায়গায় স্টিলের প্লেটের উপরে খাবার রাখা আছে। সেখানে রান্না করা গাজর আর মিষ্টি আলু রাখা। শেরিং-এর প্রিয় খাবার। ঘরে ব্যাকগ্রাউন্ডে বেথোভেনের ফিফথ সিম্ফনি চলছে।

শিম্পাঞ্জির কাছে গান বা সুর সাধারণত কোনও অর্থ বহন করে না। ওরা পছন্দ বা অপছন্দ কোনওটাই করে না। বিশেষ করে সামনে এরকম প্রিয় খাবার থাকলে। আমাদের সামনে একপাশে বিরিয়ানি আর একপাশে মুড়ি থাকলে

যেরকম হতো, সেইরকম আর কী।

তবে এক্ষেত্রে একটু অন্যরকম পরীক্ষা। বেথোভেনের ফিফথ সিম্ফনির একটা বিশেষ জায়গায় ওই খাবারের প্লেটের মাধ্যমে ওকে শক দেওয়া হচ্ছে। বেশ জোরালো শক।

চতুর্থবার করার সময় শেরিং এই যোগাযোগটা ঠিক খেয়াল করতে পারল। ঠিক নোটের ওই জায়গা আসার আগেই দূরে সরে দাঁড়াল। পঞ্চমবারও তাই। ও তার মানে মনে রাখতে পারছে। গানের ঠিক কোন জায়গায় শকটা খেতে হচ্ছে, সেটা বুঝতে পারছে। তাই আগের থেকে সাবধান হয়ে সরে দাঁড়াচ্ছে।

কয়েকবার পরীক্ষা করার পরে এবার দ্বিতীয় পর্যায়ের পরীক্ষা শুরু করলেন প্রফেসার কেলভিন। এটাই আসল পরীক্ষা।

এবারে শেরিংকে তাঁর আবিষ্কার করা ড্রাগটা ইঞ্জেক্ট করলেন। আবার একই রকম ভাবে শক দেওয়া শুরু করলেন। সেই একই নোটে। এবারে শেরিং সরে তো দাঁড়ালই না উল্টে ঠিক সেই সময় প্লেটটা আরও ভালো করে হাত দিয়ে ধরল। তারপরে শক খেয়ে চমকে উঠে চিৎকার করে প্লেটটা আবার রেখে দিল। শকটা বেশ জোরদার। চিৎকার করা বেশ স্বাভাবিক।

কয়েকবার একই রকম করলেন প্রফেসার কেলভিন। প্রত্যেকবার একই ফল। শক খাবে জেনেও প্লেটটা নিচ্ছে। তারপরে শক খেয়ে যন্ত্রণায় কাতরে উঠে আবার রেখে দিচ্ছে।

এর কারণ ড্রাগের মাধ্যমে শেরিং-এর স্মৃতিতে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে একটা অন্য ঘটনার স্মৃতি। তার জন্য ওর শক খাবার শখ বেড়ে গেছে। যন্ত্রণা হলেও ও ইলেক্ট্রিক শকের আকর্ষণ এড়াতে পারছে না।

অতীতে ও একটা ইলেক্ট্রিক ফেন্সে ঘেরা জায়গায় থাকত। একবার শেরিং ওর খুব প্রিয় বান্ধবিকে খুঁজে পেয়েছিল এরকমই ইলেকট্রিক ফেন্সের অন্যদিকে। সেদিনও বেশ কয়েকবার এরকম ইলেকট্রিক শক খেয়েছিল।

ড্রাগের মাধ্যমে ওর ব্রেনের ঠিক যে অংশে এই ঘটনার স্মৃতি আছে, সেই অংশকে উদ্দীপ্ত করে এই সুখস্মৃতিকে সামনে নিয়ে আসা হচ্ছে। অন্য যন্ত্রণার স্মৃতিকে আড়াল করা যাচ্ছে। সেজন্য ও এখন বারবার অপেক্ষা করছে শক খাওয়ার। সে অভিজ্ঞতা যন্ত্রণার হলেও।

উত্তেজনায়-আনন্দে কাঁপছিলেন কেলভিন। পরীক্ষা সফল। এটা পুরো গবেষণার সবথেকে শক্ত একটা মাইলস্টোন অতিক্রম করা।

তবে আরও অনেক কাজ বাকি। দেখতে হবে শুধু পুরোনো স্মৃতি ফিরিয়ে নিয়ে আসা নয়, বা দরকার মতো অতীতের স্মৃতি ভুলিয়ে দেওয়া নয়, কীভাবে নতুন নতুন স্মৃতি এভাবে তৈরি করা যায়। সে স্মৃতি সত্যি না হলেও।

শিম্পাঞ্জিদের এই ক্ষুরধার বুদ্ধির জন্যই ওদের পোষ মানানো শক্ত হয়। ওদের শাসন করাও শক্ত। একদম নিয়ম মানতে চায় না।

এই তো কয়েকবছর আগে শেরিংকে যখন কেলভিনের কাছে প্রথম আনা হয়েছিল, তখন খেপে গিয়ে ওর হাতের আঙুলে কামড়ে দিয়েছিল। কিন্তু যদি ওদের মধ্যে এমন কিছু স্মৃতি তৈরি করে মনের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া যায় যেখানে ওরা মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণের জন্য বিশেষ কিছু উপহার পেয়েছে, সেক্ষেত্রে পোষ মানানো অনেক সহজ কাজ হবে। সেখানেই এই ড্রাগের সম্ভাবনা। তবে এ ড্রাগ শিম্পাঞ্জিদের কথা ভেবে তৈরি নয়। এর আসল উদ্দেশ্য অন্যরকম।

এ ড্রাগ সেক্ষেত্রে অনেকের ভূত-ভবিষ্যৎ ঠিক করে দেবে।

১। কাওয়ামা, কঙ্গো

কাওয়ামা আফ্রিকার কঙ্গোর দক্ষিণপ্রান্তের একটা গ্রাম। কাওয়ামাতে লোকেরা— বাচ্চা, ছেলে, বুড়ি সবাই একটাই কাজ করে। সেটা হল কোবাল্ট খনিতে আইনি কাজ, বা সেরকম আইনি কাজ জোগাড় না করতে পারলে খনিতে বেআইনি কাজ।

এখানে খুব বড় কিছু নামকরা মাইনিং কোম্পানি আছে। তারা এখানকার বেশিরভাগ খনির মালিক। তবে তাদের বাইরে অবৈধ ছোটখাটো খনিও আছে, যেখানে অনেকে কাজ করে।

ইলেক্ট্রিক গাড়ি, ফোনের ব্যাটারি তৈরি করতে কোবাল্ট লাগে, যার বেশিরভাগটা পাওয়া যায় শুধু কঙ্গোতে। বিশ্বের প্রায় ষাট শতাংশ কোবাল্ট আছে কঙ্গোর এসব খনিতে। ভবিষ্যতে সারা বিশ্বকে কঙ্গোর উপরেই ভরসা করতে হবে কোবাল্টের জন্য। আগামীদিনে তেলের জায়গা নেবে কোবাল্ট। এ কাজ বিপজ্জনক হলেও একটা বড় অংশের মানুষের কাছে এটাই রোজগারের একমাত্র উপায়।

কিন্তু কয়েক মাস হল সে নিয়ম বদলেছে। এখানকার লোকেরা কাওয়ামা ছেড়ে অন্য জায়গায় চলে যাচ্ছে। কানাঘুষো শোনা যাচ্ছে যে এখানে কাজ করার অর্থ কয়েক বছরের মধ্যে ক্যান্সারে মৃত্যু। সে জন্য কাজের লোক পাওয়া যাচ্ছে না। শোনা যাচ্ছে চীনের একটা খুব বড় মাইনিং কোম্পানি এসব ডামাডোলের মধ্যে খনিগুলি একে একে করে কিনে নিচ্ছে। তারা সুদক্ষ কর্মী নিয়ে আসছে চীন থেকে।

একই জিনিস হচ্ছে কলওয়াজিতে। সেটাও এখানকার মতো খনির শহর। সেখানে তামা ও কোবাল্টের অনেক খনি আছে। সেখানেও একের পর এক খনির দখল চলে যাচ্ছে চীনের হাতে।

কঙ্গোর বর্তমান প্রেসিডেন্টের সঙ্গে চীনের এই কোম্পানির গভীর যোগাযোগ আছে। চীনের এই কোম্পানি অবশ্য চীন সরকারের সরাসরি অধীনে। সেজন্যে এদের অর্থের অভাব নেই। বর্তমান প্রেসিডেন্টের দিক দিয়ে সবরকম সাহায্য পাচ্ছে চীনের এই কোম্পানি। অবশ্য বর্তমান প্রেসিডেন্ট সাহায্য করবে নাই বা কেন, শোনা যায় চীনের সাহায্য ছাড়া আগের প্রেসিডেন্টকে সরানো যেত না। বর্তমান প্রেসিডেন্ট সে ঋণ ভোলেননি। এখন চীনের এই ঋণ শোধ করতে চান। সেজন্য চীনের দিকে সবরকম সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাছাড়া বেশ কিছু দিক থেকে ওনার আর্থিক সুবিধেও হচ্ছে। সেটা কীভাবে তা না বললেও বুঝে নিতে অসুবিধে হওয়ার কোনও কারণ নেই।

কঙ্গো জুড়ে পাশাপাশি গড়ে উঠছে চীনের ক্যাসিনো, ঝাঁ চকচকে বিশাল অফিস। চীনের বিশাল বিশাল হোটেল। গ্রাম ছেড়ে আসা মানুষজন এখানে এসে কাজ করছে।

অনেকে বলছে এভাবে একটা সময় পুরো কঙ্গোই হয়তো কিনে নেবে চীন যাতে কোবাল্টের খনির উপরে ওদের পুরো নিয়ন্ত্রণ থাকে। আপাতত এসব গ্রামের লোকেরা যাচ্ছে শহরের ক্যাসিনোতে ভাগ্য সন্ধানে। অন্য চাকরির খোঁজে। কী দরকার জীবনের এত ঝুঁকি নিয়ে এখানে পড়ে থাকার।

শুধু সামান্য কিছু লোক জানে কোবাল্ট খনিতে কাজ করার জন্য ক্যান্সার হওয়ার কোনও কারণ নেই। এটা শুধুই অপপ্রচার।

২। বামাকো, মালি

মালিকে বলা যায় ল্যান্ড লকড দেশ। অর্থাৎ চারদিকে স্থলভূমি ও অন্য দেশ দিয়ে ঘেরা আফ্রিকার এই দেশের লোকজন মূলত চাষবাস ও খনিতে কাজ করে কাটায়। পুরো বিশ্বের সোনার একটা বড় অংশ এখানকার মাটির নীচে আছে।

মালি একসময় ফ্রান্সের কলোনি ছিল। তার প্রভাব এখনও এখানকার ভাষায় রয়ে গেছে। ফ্রেঞ্চ এখানকার প্রধান সরকারি ভাষা।

আজ মালির রাজধানী বামাকোতে অনেকে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে। তবে তার থেকে অনেক বেশি সংখ্যক লোক উৎসব পালন করছে দেশ জুড়ে। তার কারণ? প্রায় দুশো জন জেহাদি সন্ত্রাসবাদীকে ছাড়া হচ্ছে আজ। কিন্তু তার জন্য বিক্ষোভ

হওয়াটা স্বাভাবিক। উৎসব হওয়ার কারণ কী?

কয়েকবছর আগে মালিতে বেশ কিছু সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ হয়েছিল। সে সব ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ছিল এরা। সেই সব মূল অভিযুক্তদের আজ ছাড়া হচ্ছে। তার পরিবর্তে বিপক্ষ দলের এক ফ্রেঞ্চ মহিলা নেতাকে ছাড়া হবে। কিন্তু সেই মুক্তির ব্যাপারটা যে এক্ষেত্রে গৌণ, তাকে ছাড়া না হলেও যে এই সন্ত্রাসবাদীদের ছাড়া হত তা অনেকেই জানে।

আসলে আল কায়দার মতো টেররিস্ট সংস্থার সঙ্গে যুক্ত জেএমআইএম-এর চাপে বর্তমান সরকার এদের ছাড়তে বাধ্য হচ্ছে। বলতে গেলে জেএমআইএম-ই এখন এখানকার সরকার চালায়। তাই এদের না ছেড়ে কোনও উপায় আছে?

এমনিতেও এক বছর আগে ক্যু-এর মাধ্যমে অর্থাৎ হঠাৎ করে মিলিটারি অভ্যুত্থানের মাধ্যমে এই সরকার এসেছে। সামনে ভদ্রলোক গোছের কিছু শাসককে সামনে রেখে সেই মিলিটারি শাসন এখন মালির সারা দেশ জুড়ে। এ নিয়ে আমেরিকা, ফ্রান্স আরও বেশ কিছু পশ্চিমী দেশের বড় রকম উদ্বেগ আছে। ইউ এন-এর দিক থেকে প্রায় পনেরো হাজার শান্তিরক্ষক এখন এ দেশে মোতায়েন। যেকোনো সময় একটা বড় জেহাদি অভ্যুত্থান গড়ে উঠতে পারে এখানে। এখানে থেকে সে অশান্তির আগুন ছড়িয়ে পড়তে পারে আফ্রিকার আশেপাশের দেশগুলোতে। কিন্তু আগ বাড়িয়ে কিছু করার উপায় নেই। সেটা মালির নিজস্ব ব্যাপার। তাতে মাথা গলানো যাবে না।

এসব সন্ত্রাসবাদীদের ছাড়া পাওয়াই তার প্রমাণ। তবে শুরুতে এদের ছাড়ার পিছনে এতটা জনরোষ ছিল যে কেউ ভাবতেও পারত না যে এদের ছাড়ার কথা কোনওদিন ভাবা হবে। এরা বাইরে এলে যে এরকম সন্ত্রাসবাদের আরও ঘটনা ঘটবে সে নিয়ে কারুর সংশয় ছিল না।

কিন্তু সে জনমত বদলে গেছে। এখন বেশিরভাগ লোক চায় এদের ছাড়া হোক। কিন্তু এই মত পরিবর্তনের কারণ? এর কারণ দেশ জুড়ে এদের সপক্ষে মত তৈরি করা হয়েছে ক্যাম্পেনের বা প্রচারের মাধ্যমে। কে বা কারা এই ক্যাম্পেনের পিছনে তা অবশ্য বোঝা যায়নি। এখন যে-কোনও সময় আবার বড় ধরনের অশান্তি শুরু হয়ে যেতে পারে মালি জুড়ে। সমস্যা হল সে আগুন শুধু এ দেশে থেমে থাকবে না। ছড়িয়ে পড়তে পারে আফ্রিকার অন্য বেশ কিছু দেশেও।

এর পিছনে যে কোনও বিদেশি শক্তি আছে, তা অনেকেই জানে। আসলে আফ্রিকায় যেকোনও রকম ডেমোক্রাসি থাকুক বা শান্তি থাকুক, তা তারা চায় না। তারা চায় আফ্রিকা জুড়ে আবার অশান্তি, যুদ্ধ শুরু হোক। যাদের আজ ছাড়া

হল, তারা আগামী দিনে আফ্রিকায় ও সারা বিশ্বে যুদ্ধের আগুন ছড়াতে বড় ভূমিকা নেবে।

৩

কেন ওই মহিলা কাঁদছেন?

ভিসা শেষ হয়ে গেলে নতুন করে ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করা একটা যন্ত্রণা। যাই হোক, কাজের জন্য প্রয়োজন হলে করতে তো হবেই। হাজার রকম তথ্য দিতে হবে যার অর্ধেক অপ্রয়োজনীয়। কবে কোথায় কোন দেশে গিয়েছিলেন, জীবনে কোনওদিন জেলে গিয়েছিলেন কিনা, কোনওরকম সন্ত্রাসবাদী সংস্থার সঙ্গে যুক্ত কিনা, কোনও মানুষ মেরেছেন কিনা-এরকম নানান ধরনের তথ্য।

কেউ কি সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে যুক্ত থাকলে বলবে, আমি সন্ত্রাসবাদী! তবু এসব অজস্র হাস্যকর প্রশ্নেরও জবাব দিতে হবে।

অনিলিখার ভিসার অ্যাপয়েন্টমেট আজ। শেক্সপীয়ার সরণির ইউ এস ভিসা অ্যাপ্লিকেশন সেন্টারের সামনে ভিসার লাইনে দাঁড়ালেই মোটামুটি বোঝা যায় যে এখনও অনেকেই স্বপ্ন দেখে ভারত ছেড়ে আমেরিকায় যাওয়ার। একটা বড় অংশের কাছে দেশের বাইরে যাওয়াই একমাত্র মন্ত্র। তা না হলে নিয়মিত এত বড় লাইন হয়! সাপের মতো দীর্ঘ লাইন এঁকেবেঁকে এগিয়ে গেছে ভিসা অ্যাপ্লিকেশন সেন্টারের দিকে। দূর থেকে ঢোকার দরজা দেখা যাচ্ছে।

হঠাৎ অনিলিখা লক্ষ করল একজন বছর ষাটেকের মহিলা ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করতেই ভেতর থেকে একজন গার্ড এগিয়ে এসে মহিলাকে লাইন থেকে বার করে দিল। অনেকক্ষণ ধরে লাইনে দাঁড়িয়ে ছিলেন মহিলা। মহিলা কাঁচুমাঁচু মুখ করে কী যেন বললেন। লোকটা বিশ্রীভাবে কী সব বলে মহিলাকে লাইন থেকে বার করে দিল। মহিলা ধমক খেয়ে অন্যদিকে চলে গেলেন।

এরা ভারতীয়দের এখনও মনে করে যেন অনেক পিছিয়ে থাকা দেশের অধিবাসী। হতে পারে মহিলা কোনও প্রসেস হয়তো ফলো করে নি। কিন্তু একই কথা কি ভালো করে বলা যায় না!

নেহাত লাইনে বেশ খানিকটা পিছনে ছিল অনিলিখা। তাই ব্যাপারটা কী হল, মহিলার কী দোষ ছিল, তা বুঝতে পারল না।

দু'ঘণ্টা বাদে ভিসার ইন্টারভিউ থেকে বেরিয়ে জীবনদীপ বিল্ডিং-এর দিকে খানিকটা এগোতেই অনিলিখা লক্ষ করল সেই মহিলা এখনও রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে আছেন। দূর থেকে ওই ভিসা অ্যাপ্লিকশন সেন্টারের দিকে তাকিয়ে আছেন।

একটু কাছে যেতে অনিলিখার মনে হল মহিলা কাঁদছেন। দেখেই বোঝা যায় খুব সাধারণ পরিবারের। ভিড়ের মধ্যে আলাদা করে নজরে পড়ার মতো কিছু নয়। চারদিকে ব্যস্ত লোকের যাতায়াত। কলকাতায় অফিস টাইম দেরিতে শুরু হয়। এখন সেই সময়। ধাক্কা খেতে খেতে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছে চারপাশের লোকজন। এ সময়ে অহেতুক কৌতূহল দেখানোর সময় নেই কারুর। অনিলিখার কেন জানি খুব খারাপ লাগল। কী মনে হতে এগিয়ে গেল মহিলার দিকে।

কাছে গিয়ে বলল, আপনার কি কোনও অসুবিধে হয়েছে? আমিও ভিসার লাইনে ছিলাম। দেখলাম আপনাকে বার করে দিল। কী হয়েছিল?

মহিলা চোখ মুছে খানিকক্ষণ চুপ করে থাকলেন। তারপরে বললেন, জানি না আমি কী করব। আমাকে ওরা কিছুতেই আমেরিকার ভিসা দেবে না। আমি যতবার অ্যাপ্লাই করি, সব বার রিজেক্ট করে। জানতেও পারি না কেন করে। ওখানে আমাকে যেতেই হবে। আমার ছেলের সঙ্গে দেখা করতে চাই। কিন্তু কিছুতেই ওরা আমাকে ওখানে যেতে দেবে না। কী করব বুঝতে পারি না। যদি কারুর সঙ্গে কথাও বলা যেত একবার। কিন্তু কারও সঙ্গে কথা বলার কোনও উপায় নেই।

কেন? ছেলে চাইলেই তো আপনি ভিসা পেতে পারেন। এতে তো সমস্যা হওয়ার কোনও কারণ নেই। আপনার ছেলে ওখানে থাকলে, সেই তো আপনাকে সব কিছু বলে দিতে পারে। আপনার ভিসিটর ভিসাতে ওখানে যাওয়ার কোনও অসুবিধে হওয়ার কোন কারণ তো থাকতে পারে না, যদি অবশ্য ও চায়। অন্য কোনও কিছু অসুবিধে আছে কি?

মহিলা ফের কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন।

হয়ত পারিবারিক কোনও সমস্যা আছে। হয়তো ছেলেই চায় না যে মা আমেরিকা যায়। তাই অনিলিখা দ্বিতীয়বার এ বিষয়ে প্রশ্ন করল না।

মহিলা একটু সময় নিয়ে নিচুস্বরে বললেন, ও আমেরিকায় আছে। কিন্তু ঠিক কোথায় আছে জানি না। ওখানে টেররিজম-এর কোনও একটা ঘটনার কারণে ও অভিযুক্ত হয়। তারপর থেকেই কোনও কিছুর খবরই যেন পাওয়া যায় না। আমিও ওর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছি না।

মহিলা এমনভাবে বললেন যেন এটা সামান্য চুরি ডাকাতির ঘটনা। এধরনের চার্জে অপরাধীর যে কী হতে পারে, তা অনিলিখা খানিকটা আন্দাজ করতে পারে। কিছু বিষয়ে অপরাধীকে কোনও সাহায্য করা যায় না। এটা সেরকম বিষয়। এখন খানিকটা বোঝা গেল কেন এই মহিলাকে ওরা ঢুকতে দিচ্ছে না।

মহিলা আবার কাঁদতে শুরু করেছেন। রাস্তার ধারে একটা বাড়ির দেওয়ালে হেলান দিয়ে যেন কোনওরকমে দাঁড়িয়ে আছেন।

অনিলিখার মনে হচ্ছিল মহিলা বুঝি এখনই অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবেন। ও এগিয়ে গিয়ে মহিলার হাত ধরে নিল। তারপরে উল্টোদিকে খানিকটা দূরে একটা ক্যাফে ছিল। তার টেবিলে নিয়ে গিয়ে বসাল।

অন্যদের দৃষ্টি যাতে অহেতুক আকর্ষণ না করা হয়, তাই মৃদুস্বরে বলে বলল, আপনি আমার মায়ের মতো। আপনি আমাকে খুলে বলুন। কাঁদবেন না। আমি যদি কোনওভাবে সাহায্য করতে পারি, অবশ্যই করব। আপনার বাড়িতে আর কে আছে?

মহিলার চোখে যেন আশার ঝলক দেখা গেলো। বললেন, সত্যি করবে? একটু থেমে আবার মৃদু স্বরে ফের বলল, অনেকেই বলেছিল। কিন্তু পরে ঘটনা শুনে আর কেউ এগিয়ে আসেনি। আমার আর কেউ নেই। কেউ নেই। শুধু আমার ছেলে সাফিন ছিল। সে যে এখন কোথায় আছে?

আবার যেন মহিলা হাহাকার করে উঠলেন। অনিলিখা আবার বলল, আপনার স্বামী নেই?

মারা গেছেন। একবছর হল। এ খবরটা শোনার দু'দিন বাদেই হার্ট অ্যাটাক হয়। আসলে এ কারণেই। খবরটা সহ্য করতে পারেননি। শোনার পর থেকেই কথাবার্তা প্রায় বন্ধ করে দিয়েছিলেন। খুব ভালোমানুষ ছিলেন। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ কলেজে বাংলা পড়াতেন। আসলে এ খবরটা পেয়ে আমরা দুজনেই বিশ্বাস করতে পারিনি। একটাই ছেলে আমার। ছোটবেলা থেকেই খুব ভালো ছিল পড়াশোনায়। খড়্গাপুর আইআইটি থেকে পাশ করে বাইরে যায়।

ওখানে স্ট্যানফোর্ড থেকে এমএস ও পিএইচডি করার পরে একটা কোম্পানিতে চাকরি শুরু করে। আমরা আমেরিকাতে কয়েকবার গিয়েছি। ওর আসার কথা ছিল।

এর মধ্যে হঠাৎ করে একদিন শুনি ওকে নাকি পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে। তখনও এতটা বুঝিনি। পরে শুনি ওকে নাকি টেরোরিজমের জন্য ধরেছে। ওর বাড়িতে নাকি বোমা ছিল যা দিয়ে ও সানফ্রানসিসকোতে কিছু জায়গায় বিস্ফোরণ করার চেষ্টা করছিল।

ও কি কোনও খারাপ সংসর্গে পড়েছিল? অনেক সময় কিছু সন্ত্রাসবাদী সংস্থা এভাবে ব্রেনওয়াশ করে ভালো লোককেও সন্ত্রাসবাদী করে তোলে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রচার চালিয়ে অন্য দেশ থেকে অনেক এরকম ভালো ছেলেদের দলে টানার চেষ্টা করে। সেরকম কিছু হতে পারে কি?

আমি জানি ও কোনওভাবেই এ কাজ করতে পারে না। আমাকে বিশ্বের সবাই বললেও আমি বিশ্বাস করব না যে ও এ কাজ করতে পারে। অসম্ভব। আমরা মুসলিম। কিন্তু ওর মধ্যে কোনওরকম ধর্মীয় গোঁড়ামি ছিল না। সত্যি কথা

বলতে কী, ও কোনও ধর্মেই বিশ্বাস করত না। আমাদের বাড়িতেও আমরা সবাই খুব মুক্তমনা। কোনওদিন কাউকে ক্ষতি করার কথা ভাবতেই পারি না। রাতারাতি তো ছেলেটা একদম পাল্টে যেতে পারে না। তাছাড়া যে ছেলে রক্ত দেখলেও সহ্য করতে পারে না, যে-কোনওদিন কাউকে সামান্যতম আঘাত করেনি, সে এরকম কিছু কোনওদিন করতে পারে। সবরকম হিংসাকে ও মনের গভীর থেকে ঘৃণা করত। খবর কাগজে সন্ত্রাসবাদের কোনও ঘটনা বা খুন এরকম কিছু দেখলে উত্তেজিত হয়ে উঠত। মনে হত ওর কোনও আপনজনকে যেন কেউ মেরেছে। সে নিজে এরকম কখনও করতে পারে। কিন্তু কেন যে ওকে ধরল? কী করে যে এরকম হল, তা ভাবতেই পারছি না।

মহিলা মাথা নীচু করে বসে থাকলেন। অনিলিখা ওঁকে বসতে বলে উঠে কাউন্টার থেকে দুটো ক্যাপুচিনো নিয়ে ফিরে আসল। একটা তাঁর সামনে এগিয়ে দিয়ে বলল, আপনি কি কোনও ভালো লইয়ার বা সলিসিটারের সাহায্য নিয়েছিলেন?

করেছিলাম। আমার পক্ষে যতটা করা সম্ভব। এখানে থেকে তো কিছু করা যায় না। ওখানে গিয়ে ছেলের সঙ্গে কথা বলে যদি এসব কিছু করা যায়। কিন্তু ভিসাই তো দেয় না। ওর সঙ্গেও কোনওভাবে কথা বলতে দেয় না।

আবার চোখ মুছলেন মহিলা। আমি যাকেই বলেছি পুরোটা শুনে আর সাহস পায় না। সাহায্য করে না। ভয় পায়। আমি কিন্তু জানি আমার ছেলে এটা করতে পারে না। কিছুতেই করতে পারে না।

অনিলিখা আশ্বস্ত করল, আপনি আপনার ছেলের নাম, ডিটেলস আমাকে দিয়ে দেবেন। আমি দু সপ্তাহের মধ্যে আমেরিকায় আমার নিজের কিছু দরকারি কাজে যাচ্ছি। আমি ওখানে অনেককেই চিনি। আমি আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করব।

মহিলা অবাক হয়ে খানিকক্ষণ অনিলিখার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তারপরে অনিলিখার হাত জড়িয়ে ধরে বললেন, সত্যি বলছ? তুমি চেষ্টা করবে। আমি আর কিছু নয়। একবার শুধু ছেলের মুখ থেকে শুনতে চাই যে ও এ কাজটা করেছিল। যদি বলে হ্যাঁ, ও এরকম করেছে, ওটাই হবে শেষ কথা। আর যদি বলে না, আমি তাহলে আমার সর্বস্ব দিয়ে ওকে বাঁচাতে চাই। আমার মতো ওকে আর কে জানে। আমি জানি ও এটা করতে পারে না। তুমি যদি কিছু করতে পার, আমি তোমার কাছে চিরঋণী থাকব। তবে জানি এ কাজ সহজ নয়।

অনিলিখা আরও বেশ কিছু দরকারি খবর নিয়ে নেয়। কোথায় ছিল, কী করত ইত্যাদি। সকাল এগারোটাতে একটা জায়গায় জরুরি কাজ ছিল একটা জমি কেনার ব্যাপারে। দেরি হয়ে গেছে। আর যাওয়া যাবে না। কিন্তু একজন অসহায় বৃদ্ধাকে সাহায্য করার থেকে বেশি দরকারি আর কী কাজই বা থাকতে পারে?

মহিলা আবার মুখ নীচু করে কাঁদতে শুরু করেছে। ক্যাফের বাইরে উঁচু বাড়িগুলোর ভিড়ে শহরের প্রাণ, মানুষে মানুষে অনুভূতির টান যেন কীরকম উধাও হয়ে গেছে। এই ক্যাফের জানলার বাইরের পৃথিবী যেন এক সাদা কালো ছবির মতো থেমে আছে। তাতে কোনও জীবনের স্পর্শ নেই।

৪। সাফিনের বন্ধুর সঙ্গে কথা

সাফিন-এর সঙ্গে দশ বছর একই স্কুলে পড়েছে মণিময়। মণিময় ডাক্তার। কলকাতার এক নামকরা হাসপাতালের সঙ্গে এখন যুক্ত।

অনিলিখা সাফিনের মার কাছ থেকে মণিময়-এর কথা শুনেছিল। সাফিনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। সাফিন কলকাতায় এলেই দুই বন্ধুর মধ্যে আড্ডা হত।

হাসপাতালটা অনিলিখার অফিসের থেকে খুব দূরে নয়। ব্যস্ত ডাক্তার হলেও সাফিনের কথা বলতেই সময় পেতে অসুবিধে হল না। বাইরে রোগীর ভিড় থাকলেও অনিলিখা আসা মাত্র ভেতরে ডেকে নিলেন।

দেরি না করে সরাসরি সাফিনের কথায় চলে এল অনিলিখা।

আপনি সাফিনের কথা জানেন নিশ্চয়ই।

হ্যাঁ, মাসিমা ফোন করেছিলেন। আমার সঙ্গে তারপরে বেশ কয়েকবার কথা হয়েছে। ভাবতে পারি নি যে ওর বিরুদ্ধে এরকম চার্জ আনা হতে পারে। আপনি ওকে কীভাবে চেনেন?

আমি চিনতাম না। ওর মার সঙ্গে কিছুদিন আগে দেখা হয়। তাঁর কাছ থেকে সব শুনি। আমি কয়েকদিনের মধ্যে আমেরিকায় যাচ্ছি। ভাবছি একটু খোঁজখবর নিয়ে দেখব।

খুব ভালো। সত্যি কী করে যে এরকম হল বুঝতে পারলাম না।

ওকে দেখে কখনও এরকম কিছু মনে হয়েছে? বিশেষ করে রিসেন্টলি?

না না, আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না। সাফিনের মধ্যে ধর্মের ব্যাপারে কোনও গোঁড়ামি ছিল না। এমনকী ধর্ম নিয়ে আমরা নিজেদের মধ্যে অনেক তর্কবিতর্ক করেছি। ও বলত ধর্ম একসময় সমাজে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে, সমাজ যাতে ভেঙে না পড়ে, সে ব্যাপারে অনেক সাহায্য করেছে। রাজনীতি আর ধর্ম সেজন্য চিরকালই হাত ধরাধরি করে এগিয়েছে। কিন্তু শিক্ষার ও সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ধর্মকে আজ আর সেই দায়িত্ব নিতে হবে না। বললে বিশ্বাস করবেন না, মুসলিম ধর্ম নিয়ে ও যেসব কথা সাহস করে বলত, তা আমিও বলতে সাহস করব না। বলতে গেলে সব ধর্ম নিয়েই। কিন্তু একই

সঙ্গে আমার মনে হয়েছে ও কখনও কারও ধর্মের বিশ্বাসে আঘাতে করতে চাইত না।

সেটা কী করে বুঝতেন?

না বোঝার কী আছে। আমাদের বাড়িতে দুর্গাপুজো হত। সেক'দিন আমরা সবাই মিলে হইচই করলেও ও কিন্তু দেখতাম কিছু কিছু ব্যাপারে সচেতন থাকত যাতে ওর উপস্থিতির জন্য বাড়ির বয়স্ক লোকেদের ধর্মবিশ্বাসে কোনও আঘাত না লাগে। সেই ছেলেটার বিরুদ্ধে যে কীভাবে এরকম একটা অভিযোগ এল, তা সত্যি ভাবতে পারি না।

আপনার ধারনা ও এর মধ্যে যুক্ত নয়?

অবশ্যই নয়। তেল আর জল কি কখনও মেশে? যাদের মগজ ধোলাই হওয়ার তাদের অনেক আগেই হয়ে যায়। এই বয়সে গিয়ে হয় না। আর তাছাড়া ওদের বাড়িতে আমিও অনেকবার গিয়েছি। মাসিমা মেসোমশাইকে দেখেই বোঝা যেত তাঁরা কত মুক্তমনা। একটাই পরিচয় ছিল ওদের, সেটা হল বাঙালি।

ওর সঙ্গে এই ঘটনার আগে কথা হয়েছিল?

মাঝে মধ্যে কথা হত। আমি সুন্দরবনের দিকে একদিন করে যাই বিনা পয়সায় চিকিৎসা করতে। ও এইসব প্রান্তিক মানুষদের খবর নিতে খুব উৎসাহী ছিল। কোনভাবে সাহায্য করা যায় কিনা সেটা ভাবত। ওদের নানান সমস্যায় ও অর্থসাহায্যও করত। গ্লোবাল ওয়ার্মিং নিয়ে খুব চিন্তাভাবনা করছিল। বড় ঝড় এলে, সমুদ্রের তলায় সুন্দরবনের দ্বীপগুলো ডুবে গেলে ঘর বাড়ি হারিয়ে এসব অসহায় মানুষ কোথায় যাবে, এসব নিয়ে চিন্তা করত।

ওর মধ্যে পরিবর্তন আসছিল, এরকম, কখনও আপনার মনে হয় না?

না। নেভার। আই ক্যান ভাউচ ফর হিস ইনোসেন্স।

বলেই একটু থেমে মণিময় ফের বলল, একটাই অনুরোধ। আমাকে এর সঙ্গে সরাসরি জড়াবেন না। আমাদের কিছু দিনের মধ্যে অ্যামেরিকা বেড়াতে যাওয়ার কথা আছে। কীসে কী হয় বুঝতে পারছেন তো। এমনিতেই ভয় পাচ্ছি এরকম একজন টেররিস্ট, আই মিন বেসড অন দ্য কারেন্ট আন্ডারস্টান্ডিং। ওর সঙ্গে কোনও রকম যোগাযোগ খুঁজে পেলে আমাদেরও বিপদে পড়তে হবে। ভিসাই হয়তো পাব না।

অনিলিখা সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত করে উঠে দাঁড়াল। বাইরে রোগীদের দেরি করানোর কোনও মানে হয় না। অন্যায় করতে দল লাগতে পারে। কিন্তু অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে দল লাগে না। শুধু নিজেকে প্রস্তুত করতে হয়। একলা কঠিন পথ চলার জন্য।

তবে মণিময় বা সাফিনের মা দুজনেই সাফিনের খুব কাছের লোক। তারা

সাফিন সম্বন্ধে ভালো বলবে এটাই স্বাভাবিক। তাছাড়া দুজনেই এদেশে ছিল। এমন কারও কাছ থেকে খবর নিতে হবে যে এ খবরটা আরেকটু বেশি জানে। অতীন। হ্যাঁ, অতীনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

৫। সাফিন কি সত্যি টেররিস্ট?

অতীনের সঙ্গে কথা বলছি?

হ্যাঁ, অতীন। কে বলছেন?

আমি অনিলিখা।

অনিলিখা। হোয়াট অ্যা সারপ্রাইজ। অচেনা নাম্বার দেখে ভাবছিলাম ধরব কিনা। তা এতদিন বাদে হঠাৎ করে সানফ্রানসিসকোর কাকভোরে কল?

তুই কি এখনও 'এন এস এ' (ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সি)-র সঙ্গে যুক্ত আছিস?

হ্যাঁ, আছি। কিন্তু কেন বল তো?

একটা খুব দরকার ছিল। সাফিন আলি বলে কারুর খবর জানিস? আমেরিকাতে টেররিজম-এর জন্য জেলে আছে। একবছর আগে একটা সম্ভাব্য সন্ত্রাসবাদের ঘটনায় ওকে ধরা হয়। কিন্তু এখন আর কোনও খবর পাওয়া যাচ্ছে না। আমার ভিসার অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে গিয়ে ওর মার সঙ্গে হঠাৎ করে দেখা হল। ভদ্রমহিলার শরীর খুব খারাপ। হাজব্যান্ডও মারা গেছেন। ছেলের সঙ্গে কোনওভাবে যোগাযোগ করতে পারছেন না। যাওয়ার জন্য ভিসাও পাচ্ছেন না।

তা ছেলেকে যখন টেররিস্ট বানিয়েছে, তখন ভুগতে তো হবেই, তাই না!

মহিলা খুব নিশ্চিত যে ওর ছেলে এরকম কাজ করতে পারে না।

সব মা-ই এরকম কথা বলে। এটা নতুন কিছু কথা হল?

তা তুই কি কিছু জানিস কেসটার ব্যাপারে?

দেখ, আমি সরাসরি এতে যুক্ত ছিলাম না। তবে কিছুটা জানি। এটা যদ্দুর মনে পড়ে গতবছর মে মাসের ঘটনা। ছেলেটা সানফ্রানসিসকোতে একটা বড় ইভেন্ট হওয়ার সময় ওখানে বোমা বিস্ফোরণের প্ল্যান করে। আল কায়দা বা ওরকম কোনও একটা সন্ত্রাসবাদী সংস্থার হয়ে কাজ করছিল। এখানে টেররিস্ট স্ক্রিনিং সেন্টার ওর কার্যকলাপ আগে থেকেই জানত। ওর উপরে নজরদারি করত। একদম ঠিক সময়ে হাতেনাতে ধরে ফেলে। এফ বি আই-এর জয়েন্ট টেররিজম টাস্ক ফোর্স বা JTTF-এর হাতে ধরা পরে। গাড়িতে করে বোমা নিয়ে যাওয়ার

প্ল্যান ছিল। ঠিক আগের রাতে ওরা ধরে ফেলে। তারপরে একটু কড়া দাওয়াই পড়তেই ছেলেটা সব অপরাধ স্বীকার করে নিয়েছিল।

তার মানে কোনওরকম সন্দেহ নেই বলছিস?

আরে এরকম ক্ষেত্রে কি আর কেউ ভুল করে? হিউমান রাইটস সংস্থাগুলো ঘাড়ের উপরে বসে নিশ্বাস ফেলছে। একেবারে নিশ্চিত না হলে ধরে না। মাসের পর মাস ধরে এরা অপরাধীদের ঘিরে জাল বিছায়। এই যে টেররিস্ট স্ক্রিনিং সেন্টার—এরা দু-তিন মাস ধরে অপরাধীর খুঁটিনাটি সব কিছু লক্ষ করে। সব রকম গতিবিধি খেয়াল করে। কী কিনছে, কার সঙ্গে মিশছে সব কিছু লক্ষ রাখে। অপরাধী যে অপরাধ করবে তা নিশ্চিত ভাবে প্রমাণ করতে হবে। অপরাধ হয়ে যাওয়ার পরে এটা প্রমাণ করা অনেক সহজ কাজ। এসব ক্ষেত্রে অপরাধী তো কোনও অপরাধই করেনি। ঘটনার আগেই তাকে ধরা। তাই অনেক বেশি প্রমাণ সংগ্রহ করা দরকার। কোনওরকম কাঁচা কাজ করলে হয় না। তোকে একটা কথা বলি। এটা পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে-র মতো একটা ঘটনা। কোনও সন্দেহের কারণই নেই।

খুব ব্রিলিয়ান্ট ছেলে ছিল। শুনেছি ধর্ম নিয়েও কোনরকম মাতামাতি করত না। হঠাৎ করে কী করে এতটা পরিবর্তন হল সেটাই প্রশ্ন?

আমিও জানি। এখনও মনে আছে। ব্রিলিয়ান্ট ছেলে। কিন্তু এদেরকেই তো সন্ত্রাসবাদী সংস্থাগুলো টার্গেট বেশি করে। যেভাবে এদের ব্রেন-ওয়াশ করা হয়, দেখলে তুই অবাক হয়ে যাবি। এটা খুব একটা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

কিছু কি করা যায়?

কোনও আশাই নেই। এতদিন তাও এখানকার সিভিলিয়ান কোর্টের আন্ডারে ছিল। খুব শিগগিরি ওকে 'গুয়াতানামো বে'-তে পাঠিয়ে দেবে শুনেছি। ব্যাস, তারপর তো জানিসই কী হয়। সূর্যের আলোও অপরাধীদের খবর পায় না।

একটু থেমে অতীন উল্টোদিকের নীরবতা দেখে ফের বলল, শোন, এ সবের মধ্যে জড়াস না। কীসে যে কী হয়। অনেক কিছুই নিয়মের বাইরে হয় এসব ক্ষেত্রে। শুধু শুধু তোর কেরিয়ারে কীভাবে যে কালো দাগ পড়ে যাবে তা নিজেও জানবি না। আর আমাকেও এর মধ্যে টানিস না। শেষে চাকরি যাবে।

ঠিক আছে। ভালো থাকিস। ছাড়ছি তা হলে।

শোন। জানি তুই যেরকম জেদি মেয়ে তাতে এরপরেও এর মধ্যে ঠিক জড়াবি। আমার দিক থেকে কিন্তু কোনও সাহায্য আশা করিস না। ও একটু থেমে অতীন আবার বলল, আর যখনই এখানে আসিস না কেন, আমাকে জানাস। তোর সঙ্গে কতদিন দেখা হয়নি। তবে এ বিষয় নিয়ে কিন্তু কোনওরকম

আলোচনা করা যাবে না।

সামান্য আরও দু-একটা সৌজন্যমূলক কথা বলে ফোন ছেড়ে দিল অনিলিখা। অতীনের কাছেও কোনও সাহায্য পাওয়া যাবে না।

মনের মধ্যে এখনও অনেক প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। এত সহজে ছেড়ে দিলে চলবে না। বিশেষ করে অনিলিখা যখন এ ব্যাপারে শেষ অব্দি দেখার অঙ্গীকার করেছে এক অসহায় মায়ের কাছে, তখন কথা রাখতেই হবে।

৬। শনিবারের আসরে অনিলিখা

দেখি দেখি তোর ভিডিওটা কীরকম এসেছে, বলে সহেলীর ভিডিওটা আমরা সবাই দেখতে শুরু করলাম।

একটা নতুন অ্যাপ এসেছে ফেসবুকে। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পরে বেঁচে থাকলে কীরকম দেখতে হব। কীরকম ভাবে কথা বলব, কীভাবে হাঁটাচলা করব—তার উপরে চার মিনিটের ভিডিও তৈরি করে দিচ্ছে। খুব ইন্টারেস্টিং। এমনকী কারুর কথা বলার ধরণ বয়স হলে কীভাবে পরিবর্তন হয়ে যাবে, ঠিক কীরকম দেখতে হবে—তা সবই অনুমান করছে নিজের সম্বন্ধে দেওয়া এখনকার সব তথ্যের উপরে ভিত্তি করে। আমাদের প্রত্যেকেরই এমন ভিডিও এসেছে যে, তাতে অবিশ্বাস করার কিছু খুঁজে পাইনি।

আমাদের ফোন শুধু হাত বদল হয়ে একহাত থেকে আরেক হাতে যাচ্ছে।

এসব নিয়ে আমরা এতটাই হইচই করছি যে খেয়াল করিনি কখন অনিলিখাদি ইতিমধ্যে ঘরে ঢুকে পড়েছে। ঠোঁটের কোণে মুচকি হাসি নিয়ে একটু দূরে দাঁড়িয়ে লক্ষ করছে।

অনিলিখাদির আসার কথাই ছিল। সে খবর পেয়েই আমরা আজ সবাই এসেছি। কিন্তু তারপরে এই অ্যাপ-এর সঙ্গে পঞ্চাশ বছর এগিয়ে গিয়ে আজকের দিনটার কথা, বর্তমানের কথাই দিব্বি ভুলে গেছি।

অনিলিখাদি শিঙাড়া আর মাছের কচুরির ঠোঙাটা প্রতীকের হাতে দিয়ে সোফায় বসে পড়ল। বলল, সবার জন্যে এনেছি। কিছু প্লেট নিয়ে আয়।

অনিলিখাদি আজ বেশ সুসজ্জিত। একটা সিল্কের কালো শাড়ি পরেছে।

ব্যাপার কী অনিলিখাদি? এত সাজ? সহেলী বলে উঠল।

আর বলিস না। একটা ইভেন্টে ভাষণ দিতে হবে। নারী স্বাধীনতার উপরে। তাই ভাবলাম একটু সেজেগুজে যাই।

তার মানে তুমি আজ এখানে থাকছ না বেশিক্ষণ?

একঘণ্টা বাদে বেরোলেই হবে। কলেজ স্ট্রিট যেতে হবে। তা তোদের আজকের এত হইচই-এর কারণ কী?

রাজর্ষি সোল্লাসে বলল, তুমি কি এ অ্যাপটা দেখেছ? দেখি তো তোমার কীরকম ভিডিও তৈরি করে। তন্ময় তো বুড়ো বয়সে হাঁটতেই পারছে না। ও ওর মা-বাবার বাতের ব্যথার কথা লিখেছিল। ব্যাস। অ্যাপ সেজন্যে এরকম ভিডিও করে দিয়েছে ওরও ওই বয়সে বাত হবে এ কথা ভেবে নিয়ে। আমার ভিডিও কিন্তু দারুণ এসেছে।

অনিলিখা হেসে বলল, তোরা পারিসও বটে। একটা অজানা অ্যাপকে বিশ্বাস করে সবরকম তথ্য দিয়ে দিস। এই অ্যাপগুলো তৈরির আসল উদ্দেশ্য জানিস তো? তোর সম্বন্ধে নানানধরনের তথ্য জানা বা ডেটা পয়েন্ট বার করা। সব সময় যে তার পিছনে খারাপ উদ্দেশ্য থাকে, তা অবশ্য নয়। কিন্তু তোর সম্বন্ধে অনেক কিছু তথ্য ওদের কাছে থেকে যায়, যা ওরা অন্য কাজে ব্যবহার করতে পারে। যেমন হয়তো তুই জানিয়েছিস তোর বাবা ডায়েবেটিক পেশেন্ট। ও তোর মতো আরও হাজারটা লোকের দেওয়া ডেটার উপরে নির্ভর করে বাঙালিদের মধ্যে ডায়াবেটিক লোকের সংখ্যা কীরকম হতে পারে তার একটা আন্দাজ করতে পারে।

ফেসবুক চলে কীসের উপরে জানিস তো? তোর দেওয়া ওই তথ্যই হল বলতে পারিস ওদের টাকা। এই ডেটাই ওদের রোজগারের আসল কারণ।

একটু থেমে অনিলিখাদি ফের বলল, একটা সময় তেলের জন্য যুদ্ধ হয়েছে। কিছুদিন বাদে দেখবি এই ডেটার জন্য যুদ্ধ হবে। আগে যেমন তেলের কোম্পানিগুলো খুব ধনী ছিল, আগামীদিনে যে কোম্পানির কাছে যত ডেটা থাকবে, যতবেশি তথ্য থাকবে, সে তত ধনী হবে। এজন্য দেখবি এসব কোম্পানিগুলো এত শক্তিশালী হয়ে গেছে যে আগামীদিনে সব সরকার এদেরকে সবথেকে বেশি ভয় পাবে।

তারমানে এসব অ্যাপ ব্যবহার করা একদম নিরাপদ নয় বলছ?

হ্যাঁ, অবশ্যই। এটা করার জন্য তোকে নিশ্চয়ই অনেক প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়েছে। এগুলো কিন্তু ওদের কাছে থেকে যায়। আমরা আধার কার্ড নিয়ে ডেটা প্রাইভাসি—ডেটা প্রাইভাসি ক্ষুণ্ণ হচ্ছে বলে এত চেঁচামেচি করি, অন্যদিকে যেখানে তথ্য দেওয়ার কোনও দরকারই নেই, সেখানে যা চায় তাই অন্ধ বিশ্বাসে দিয়ে দিই।

তা অনিলিখাদি আজকে আর কোনও গল্প শোনাবে না?

না রে, আজ আর কোনও গল্প শোনানোর সময় নেই। আজ তোদের সঙ্গে এই শিঙাড়া খেয়েই উঠে পড়তে হবে। আমাকে পরের সপ্তাহে কিছু কাজ

নিয়ে আমেরিকা যেতে হবে। ওখান থেকে ফিরে এসে তোদের গল্প শোনাব। এবারে কিছু ইন্টারেস্টিং অভিজ্ঞতা হবে মনে হচ্ছে। হয়তো একজন টেররিস্ট এর সঙ্গেও দেখা করার-ও, কথা বলারও সুযোগ হবে।

বলো কি?

অনিলিখাদি সাফিন আলির কথা জানায়, যেটুকু আপাতত জেনেছে তা সবাইকে জানিয়ে বলে, আমার মন বলছে, কিছু একটা যেন গন্ডগোল হচ্ছে। একজন মা ছেলেকে চিনতে এতটা ভুল করে না। তাছাড়া আমি ছেলেটার সম্বন্ধে যেটুকু খোঁজ পেয়েছি, মুখের মধ্যে এমন একটা ইনোসেন্ট ভাব আছে যে কিছুতেই বিশ্বাস হয় না যে, এ ছেলে সন্ত্রাসবাদী হতে পারে। তবে যাই হোক। আমার ওর সম্বন্ধে যাওয়ার আগে আরেকটু খোঁজ খবর নেওয়া দরকার। ফিরে এসে কথা দিচ্ছি আমার কী অভিজ্ঞতা হল সে বিষয়ে বলব।

যাক, এবারের অ্যাডভেঞ্চারটা তাহলে একটু অন্যরকম হবে। অন্যবার টেররিস্ট ধরতে যাও, এবারে টেররিস্ট বাঁচাতে যাচ্ছ।

আমরা সবাই হেসে উঠলাম।

আরও খানিকক্ষণ কথা বলার পরে অনিলিখাদি উঠে দাঁড়াল। দরজার থেকে মুখ ঘুরিয়ে ফের বলল, কেউ ইচ্ছে করে টেররিস্ট হয় না। তার পিছনে কোনও একটা কারণ থাকে। এক্ষেত্রে সেই কারণটাই এখনও বুঝে উঠতে পারিনি। সেটাই খুঁজে বার করতে হবে।

৭। সাফিনের খোঁজে আমেরিকায় অনিলিখা

সানফ্রানসিসকো ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে উবের নিল অনিলিখা।

জুলাই এর প্রথম দিক। এখন এখানে একটু গরম পড়েছে। কুড়ি ডিগ্রির কাছাকাছি উষ্ণতা। কলকাতা থেকে এসে অবশ্য গরম লাগে না। তবে সরাসরি সূর্যের আলোর জন্য সানগ্লাস ব্যবহার করতে হয়। তা না হলে চোখ যেন ঝলসে যায়। তাকানোই যায় না। কলকাতায় দূষণ আর মেঘে ঢাকা আকাশের জন্য সরাসরি আলো চোখে এসে পড়ে না।

অনিলিখার গন্তব্য স্ট্যানফোর্ডের অ্যাসিস্টান্ট প্রফেসার জাকির ডুরুমেরিকের বাড়ি। জাকিরের আন্ডারেই পিএইচডি করেছিল সাফিন চার বছর ধরে। তাই অন্তত আশা করা যায় জাকির সাফিন সম্বন্ধে কিছুটা বলতে পারবে। ওর মধ্যে কোনও

ধরনের পরিবর্তন দেখেছিল কিনা তাও বলতে পারবে।

জাকিরের বাড়িটা স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির খুব কাছে। ছিমছাম একটা পাড়ায় দোতলা বাড়ি।

জাকির অনিলিখার জন্য অপেক্ষাই করছিল। কলিংবেল টিপতেই দরজা খুলে ড্রয়িং রুমে নিয়ে এসে বসাল অনিলিখাকে।

জাকিরের বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। সুদর্শন। মুখে একটা প্রশান্তির ছাপ। দেখেই মনে হয় খুব বিনয়ী। আগে আলাপ না থাকলেও অনিলিখা তাঁর নাম শুনেছে। প্রফেসার হিসেবে বেশ নাম আছে। কাজাখস্থানের লোক। এখানে দ্বিতীয় প্রজন্ম।

চা না কফি?

কফি। তবে আপনি ব্যস্ত হবেন না।

না, না, ব্ল্যাক-কফি আমার করাই থাকে। আপনি শুধু চিনি আর দুধটা আপনার মতো মিশিয়ে নেবেন।

অনিলিখা উঠে গিয়ে কফি নিয়ে এসে বসল। আসলে কফি খাওয়ার তেমন ইচ্ছে না হলেও যাতে প্রফেসার খোলা মনে উত্তর দেন, সে জন্যই অনিলিখা কফিতে সায় দিয়েছিল।

আমি কিন্তু আপনার নাম আগেই শুনেছি। তা না হলে আমি এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলতাম না। জাকির বলে উঠল।

হেসে উঠল অনিলিখা, সুনাম না বদনাম?

নিজে অপরাধী হলে হয়তো আপনার সম্বন্ধে বদনাম শুনেছি বলতাম, হেসে বলে উঠলেন প্রফেসার। বিশ্বজুড়ে আপনি যে সব কাণ্ড করে বেরিয়েছেন, তা বিশেষ কিছু মহলে গেলেই শোনা যায়। তবে আপনি যে এতটা ইয়ং সেটা আমি আশা করিনি।

হেসে উঠে মূল প্রসঙ্গে সরাসরি চলে গেল অনিলিখা।

সাফিন কীরকম ছাত্র ছিল?

অসাধারণ। খুব মেধাবী। খুব পরিশ্রমী। বিশেষ করে সাইবার সিকিউরিটিতে ও যেভাবে কাজ করছিল, আমি সত্যি মুগ্ধ হয়েছিলাম। যেকোনো কোড দেখে তার দুর্বলতা কী, কীভাবে কোন ভাইরাস তাকে অ্যাটাক করতে পারে, সেসব মুহূর্তে বলে দিতে পারত। ওর মতো গিফটেড এথিকাল হ্যাকার খুব কম হয়। ওর মতো ম্যালওয়্যার এক্সপার্ট খুব কম দেখেছি। আপনি তো নিজেই এ বিষয়ে কাজ করেন। কী আর বলব।

এ ধরনের ম্যালিসাস সফটওয়্যার তো আজকাল অনেক কারণেই তৈরি হয়। অভিযোগ ওঠে কখনও কোনও বিশেষ সংস্থার বিরুদ্ধে, কখনও কোনও দেশের বিরুদ্ধে। এমনকী গ্লোবাল ওয়ার্মিং হচ্ছে বলে তার বিরুদ্ধে যারা আন্দোলন

করে, তারাও আজকাল ম্যানুফ্যাকচরিং কোম্পানিগুলোর বিরুদ্ধে সমানে এরকম ম্যালওয়ার তৈরি করে যাচ্ছে। উদ্দেশ্য, যাতে এ ধরনের কোম্পানিগুলোর কাজ করতে অসুবিধে হয়। নানান ভাবে ক্ষতি করার চেষ্টা করে। একদিন কাজ বন্ধ হয়ে গেলেও গ্লোবাল ওয়ার্মিং কম হবে। এ এক ধরনের প্রতিবাদের ভাষা আর কী!

ও কিন্তু ঠিক সেটা ধরে ফেলতে পারত। মাঝে মধ্যে মনে হত জিনিয়াস। মনে হয়েছিল ও পরে বিশাল কিছু একটা কাজ করবে। কিন্তু কী যে হল! এরকম যে হবে তা কোনওদিন বুঝতে পারিনি।

এখানে থাকাকালীন কোনও পরিবর্তন দেখেছিলেন?

না, এমনিতে ও ঠিক আড্ডাবাজ ছেলে ছিল না। পড়াশোনা, রিসার্চ এসব নিয়েই ব্যস্ত ছিল। আমার সঙ্গেও কাজের বাইরে কথা খুব কমই হত। তবে তেমন কোনও পরিবর্তন এখানে থাকাকালীন চোখে পড়েনি।

এমনিতে ও খুবই অনুভবী, বিনয়ী ছেলে ছিল। হয়তো সেজন্যই ওকে এর শিকার করেছে।

আপনি কি মনে করেন ও এটা করেছে?

তা না হলে এর তো আর কোনও ব্যাখ্যা হতে পারে না। এখান থেকে বেরোনোর পরে ও মাইক্রোসফটে কাজ করছিল। সে সময় আমার সঙ্গে বিশেষ যোগাযোগ ছিল না। শুনেছি ওই সময়েই ওকে নাকি আস্তে আস্তে ব্রেনওয়াশ করা হয়েছিল। এরকম আরও ঘটনা হয়েছে আগে।

ওর সঙ্গে আরও কাউকে এ অপরাধের জন্য ধরা হয়েছিল কি?

না, যতদূর জানি ও একাই কাজ করছিল। তবে ওর সঙ্গে নাকি হিজবুল্লা গ্রুপের যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল। তারাই এসব করিয়েছে ওকে দিয়ে। এসবই রিপোর্টে ছিল। আই ফিল রিয়ালি স্যাড ফর হিম। তুমি যেটা ওর হয়ে করছ, তার জন্য অনেক ধন্যবাদ। এটা অন্য কেউ করত না। যদি সত্যি ও নিরপরাধ হয়, আমি খুব খুশি হব।

আরও কিছু কথা বলার পর অনিলিখা উঠে দাঁড়াল। বলল, অনেক ধন্যবাদ প্রফেসার। কোনও কিছু মনে পড়লে জানাবেন।

ও দাঁড়াও, একটা কথা বলা হয়নি। ওর একজন বন্ধু ছিল। সেও এখানে রিসার্চ করত। আব্দুল মজিদ ছেলেটার নাম। তার কাছেই তুমি ওর সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাবে। আমার কাছে ওর একটা নাম্বার ছিল। আব্দুল আবার ওর ঠিক উল্টো। খুব চালাক চতুর ছেলে। আমার সঙ্গে এখনও যোগাযোগ রেখেছে। ও অবশ্য সাফিনের মতো প্রতিভাবান ছিল না, বলে প্রফেসার একটা কাগজে নাম্বারটা লিখে দিলেন।

ধন্যবাদ জানিয়ে অনিলিখা বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এল। নীল আকাশে

উদাসী সাদা মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে। যেন সবার মতো ওদেরও ধারণা, এখানে কিছুই করার নেই।

৮। সাফিন—এক টেররিস্ট-এর ডায়েরি

আমি জানি না কেন এরকম করলাম। কখনও তো ভাবতেও পারিনি যে আমি কিছু নিরীহ লোককে মারার জন্য এ ভাবে বোমা তৈরি করব। আমার মধ্যেই কি কোনও পশু লুকিয়ে ছিল? না, পশু বলাও ঠিক নয়। ওরা অনেক ভালো হয়।

অশিক্ষা মানুষে মানুষে বিভেদ বাড়ায়। প্রকৃত শিক্ষা তা দূর করে। আমার মধ্যেও কি কোনও অশিক্ষিত মানুষ লুকিয়ে ছিল যাকে আমি কোনওদিন চিনতে পারিনি।

তা না হলে দিনের পর দিন কেন বোমার উপাদান তৈরি করেছি। একটু একটু করে ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস IED তৈরি করেছি। তৈরি করেছি পাওয়ার সাপ্লাই, ট্রিগারিং ডিভাইস, ডেটোনেটর। ফেনল, সালফিউরিক অ্যাসিডের মতো তরল জোগাড় করে বিস্ফোরক কেমিক্যাল তৈরি করেছি।

না, আর ভাবতে ইচ্ছে করছে না। এতদিন কেন এরা আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে কে জানে। এ পৃথিবীতে বাঁচার যোগ্য আমি নই।

ছোটবেলা থেকে বাবা শিখিয়েছে সবসময় অসহায়ের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে। বলত যে মুহূর্তে ধর্মের জন্য মনে হবে যে অন্য কোনও মানুষের ক্ষতি করবি, সেই মুহূর্তে বুঝবি যে সেই ধর্ম তুই ঠিকভাবে বুঝিসনি।

সেই বাবা পারবে তো এ আঘাত সহ্য করতে যখন শুনবে যে তার একমাত্র ছেলেই এ ধরনের মানুষ মারার কাজ করতে উদ্যত হয়েছিল।

মা হুমায়ূন আহমেদের লেখার খুব ভক্ত ছিল। ওঁর লেখা থেকে অংশ তুলে বলত, 'বেঁচে থাকার আনন্দের মতো আর কিছুই হয় না। কত অপূর্ব দৃশ্য চারদিকে। যখন সময় শেষ হয়ে যায়, তখনই শুধু হাহাকারে হৃদয় পূর্ণ হয়ে যায়।'

আর সে জীবনকে অস্বীকার করে আমি শুধু আমার মৃত্যু নয়, কিছু অসহায় মানুষের মৃত্যু চেয়েছিলাম। কেন?

আমার মনে আছে প্ল্যানটা। আমার সঙ্গে থাকবে একটা বিশেষ কোম্পানির লোগো লাগানো ব্যাকপ্যাক। তার মধ্যে একটা ল্যাপটপও থাকবে যাতে কেউ সন্দেহ না করতে পারে। ফোনের থেকে পেজিং সিগন্যাল পেয়ে বোমার ফায়ারিং সারকিট কার্জ শুরু করবে। তার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই বোমাটা ফাটবে।

সানফ্রানসিসকোতে ওই ইভেন্টে লক্ষ লক্ষ লোক আসে। সব থেকে বেশি ভিড়ের মধ্যে গিয়ে ব্যাগটা রেখে একটু দূরে গিয়ে সেলফি তোলার অভিনয় করে বোমাটাকে ট্রিগার করব। তাতে সবথেকে বেশি লোকজন মারা যাবে। যত লোক মারা যাবে বোমাতে, তার থেকে অনেক বেশি লোক মারা যাবে স্টামপেডে—ধাক্কাধাক্কিতে।

কী করে ভাবতে পেরেছিলাম এরকম শয়তানের প্ল্যান।

ছোটবেলাতে মা আমাকে বলত রোজ মনে মনে কবিগুরুর এই কবিতাটা বলতে।

'ভগবান, তুমি যুগে যুগে দূত পাঠায়েছ বারে বারে
দয়াহীন সংসারে
তারা বলে গেল 'ক্ষমা কর সবে', বলে গেলো 'ভালোবাসো'
অন্তর হতে বিদ্বেষ বিষ নাশো,
বরণীয় তারা, স্মরণীয় তারা, তবুও বাহির-দ্বারে
আজই দুর্দিনে ফিরানু তাদের ব্যর্থ নমস্কারে।'

আমাকে তোমরা ক্ষমা করো। পারলে ক্ষমা করো।

আমার বাবা-মা এসব জানার অনেক আগেই যেন আমার মৃত্যু হয়।

মাসে আধঘণ্টা কোনও একজনের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাওয়া যায়। অবশ্য তার জন্য অনেক আগে থেকে অনুমতি নিতে হয়। কিন্তু আমি কার সঙ্গে কথা বলব? বাবা-মার সঙ্গে কথা বলার কোনও অধিকার কি আর আছে আমার?

আমি এখন শুধু একজনের সঙ্গেই কথা বলতে পারি। সে মৃত্যুর সঙ্গে যাকে আমি এত আপনার ভেবেছিলাম। জেলের শূন্য ঘরে যেন সেই সবসময় থাকে আমার সঙ্গে। শুধু আমার কাছে আসতে চায় না। আমাকে দূর থেকে দেখে হাসে, বলে আমার কাছে আসা এত সহজ নয়। তোমার মতো অপরাধীর পক্ষে আমার কাছে আসাও সহজ নয়।

৯। আব্দুল মজিদ কি কিছু জানে?

আপনি কি আব্দুল মজিদ বলছেন?

হ্যাঁ, বলছি। আপনি কে?

বেশ ভারী গলায় বলে ওঠে। স্পষ্ট আমেরিকান অ্যাক্সেন্টে।

অনিলিখা নিজের পরিচয়, কোথা থেকে আব্দুলের নাম্বার পেয়েছে তা জানিয়ে বলে, সাফিনের ব্যাপারে আপনার সঙ্গে জরুরি কিছু কথা বলতে চাই।

হ্যাঁ, বলুন। আমি কিন্তু আগেই তিনবার পুলিশের সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলেছি। জানি না, নতুন কী বলব। এমনিতেও তো শেষের দিকে আমার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ ছিল না। ওর পুরো ব্যাপারটা আমার কাছে এতটাই বেদনার যে আলোচনা করতেও ভালো লাগে না।

প্রায় পাঁচবার চেষ্টার পরে আব্দুলের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাওয়া গেছে। খুব ব্যস্ত মানুষ। খুব কম বয়সেই নিজের একটা বড় সফটওয়্যার প্রোডাক্ট কোম্পানি খুলে বসেছে। সময় না পাওয়াটা স্বাভাবিক।

অনিলিখা সময় নষ্ট না করে বলত শুরু করে—আমি সরাসরি মূল প্রসঙ্গে চলে আসি। বুঝতে পারছেন সাফিনের বাবা মারা গেছেন। মা একা। আমার সঙ্গে হঠাৎ করে পরিচয়। তিনি এখানে আসার ভিসাও পাচ্ছেন না। কী হয়েছে ওখানে বসে কিছু বুঝতেও পারছেন না। আমি এখানে অন্য কাজে এসেছিলাম। কিন্তু চেষ্টা করছি যাতে এক অসহায় মাকে তার ছেলের সঙ্গে দেখা করাতে পারি। যদি সে নিরপরাধ হয়, সেটা প্রমাণ করতে পারি।

আপনি কি প্রাইভেট ডিটেকটিভ নাকি? একটু যেন ব্যঙ্গ করে বলে উঠল আব্দুল। দেখুন এখানকার বিচারব্যবস্থায় কিন্তু কোনও ফাঁক-ফোঁকর থাকে না। তাই সত্যি কথা বলতে কী আমার নিজের প্রথমে বিশ্বাস না হলেও এটুকু বলতে পারি ওর বিরুদ্ধে অকাট্য সব প্রমাণই পাওয়া গেছে। সব থেকে বড় কথা ও নিজেই সব স্বীকার করেছে। আমি নিজেও তাই একটা পয়েন্টের পরে ওকে আর সাহায্য করিনি। ওকে সাহায্য করা মানে তো সে অন্যায়কে সমর্থন করা। আমাদের কারুরই কিছু করার নেই।

আপনার সঙ্গে তো ওর স্ট্যানফোর্ডেই আলাপ, তাই না?

হ্যাঁ, আমিও ওখানেই পিএইচডি করি। তবে আমার বিষয় কম্পিউটার সায়েন্স হলেও আগ্রহের বিষয় ছিল অনেকটাই আলাদা। তা যাই হোক, তারপরেও আমাদের মধ্যে যোগাযোগ ছিল। মাসে অন্তত একবার আমার সঙ্গে ওর দেখা হত। ও খুব একটা মিশুকে ছেলে ছিল না। মূলত আমার উদ্যোগেই যোগাযোগ বজায় ছিল।

তা আপনি কখনও টের পাননি যে ওর মধ্যে এতটা পরিবর্তন এসেছে?

সেটাই অবাক ব্যাপার। তেমন কিছুই বুঝতে পারিনি। তবে শেষের দিকে কিছু একটা ঘটেছিল, সেটা বুঝতে পারছিলাম। মনে হচ্ছিল ও যেন খুব টেনশনে ভুগছে। কিন্তু কী কারণ, সেটা বুঝতে পারিনি। তার পরে তো এই ব্যাপার শুনলাম।

তা ঘটনার দিন বা তার কয়েকদিনের মধ্যে আপনার সঙ্গে দেখা হয়নি?

হয়েছিল, তার দুদিন আগেই হয়েছিল। আমরা একসঙ্গে একটা পাবে গিয়েছিলাম। ফেরার পথে ওর বাড়িতে মিনিট দশেক ছিলাম। কিন্তু তখনও কিছু আন্দাজ করতে পারিনি। শুধু মনে হচ্ছিল ও যেন কারুর সঙ্গে দেখা করার অপেক্ষায় আছে। একটু উত্তেজিত।

আপনার উচ্চারণ শুনে মনে হয় আপনি আমেরিকায় বড় হয়েছেন। আপনি কি এখানেই পড়াশোনা করেছেন?

আমি এখানেই বড় হয়েছি। তবে আমার বাবা-মা সৌদি থেকে এসেছিল চার দশক আগে। আমি সৌদি বললে অবশ্য ভুল বলা হবে। সেরকমভাবে দেশের সঙ্গে যোগাযোগটাই গড়ে ওঠেনি।

ওর এই পরিবর্তনের পিছনে, এই ঘটনার পিছনে কোনও সংস্থা ছিল সেটা কি জানা গেছে?

হ্যাঁ, হিজবুল্লা ছিল এর পিছনে। এসব খবর তো এখন সবাই জানে, পাবলিক ডোমেনে আছে। ওর এই মগজ ধোলাই-এর পিছনে মূলত ছিল ইরান। বুঝতেই তো পারছেন ইরান আর আমেরিকার মধ্যে সম্পর্কের অবনতি তো আর হঠাৎ করে হয়নি। বেশ কয়েক বছর ধরেই হয়েছে। সে জন্যই ওর সাহায্য নিয়ে এরকম ঘটনা ঘটাতে চেয়েছিল ইরান।

কিন্তু ওকেই সিলেক্ট করল কেন? ওর সঙ্গে ইরানের কোনও যোগাযোগ ছিল না।

সেটা বলা খুব শক্ত আমার পক্ষে। এই সব সন্ত্রাসবাদের জগতে কী হয় তা বলা খুব মুশকিল। কার সঙ্গে কার কীভাবে যোগাযোগ থাকে। এমনিতে ভারতও ইরানের লং-টার্ম অ্যালাই বা বন্ধু রাষ্ট্র। তার মানে অবশ্য এই নয় যে ভারতের সঙ্গে এর কোনও যোগাযোগ আছে। তবে সাফিন তো শুধু ভারতীয় নয়, ও শিয়া মুসলিম। ইরানের ৯৫ শতাংশ মুসলিম কিন্তু শিয়া। এটাও খেয়াল রাখতে হবে।

আরও কিছুক্ষণ কথা বলার পরে অনিলিখা ফোন ছেড়ে দিল। আব্দুলের কাছ থেকে আর খুব বেশি তথ্য পাওয়া যাবে না।

অনিলিখা ওর সম্বন্ধে ওর কোম্পানি সম্বন্ধে সার্চ করে দেখে নিল। পড়াশোনায় ছোটবেলা থেকেই খুব ভালো ছেলে। পি এইচ ডি-র পরে একটা নতুন ব্যবসা শুরু করে। মূলত বিভিন্ন কোম্পানিকে প্রোডাক্ট মার্কেটিং-এ সাহায্য করে। ভালোই ব্যবসা করছে।

এত কম বয়সে এতটা সাফল্য। শুধু পড়াশোনায় ভালো হলে হয় না। অন্য স্তরের উদ্যম থাকা দরকার।

আবার ফোন আসছে। আব্দুল মজিদের ফোন।

হ্যালো অনিলিখা, আপনাকে একজন ভালো সলিসিটারের নাম পাঠালাম।

আপনি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারেন। এ বিষয়ে কী করা যেতে পারে, তিনি আপনাকে সে বিষয়ে পরামর্শ দিতে পারবেন। তবে আমাকে এর মধ্যে বেশি টানবেন না। আমার সুনাম ওর সঙ্গে যুক্ত থাকলে নষ্ট হতে পারে। বুঝতেই পারছেন এত বড় একটা কোম্পানির সিইও হিসেবে আমাকে আমার কোম্পানির স্বার্থ দেখতেই হবে।

অনেক ধন্যবাদ। বলে ফোন রেখে ফোনে পাঠানো নামটা দেখেই চমকে উঠল অনিলিখা। সলিসিটারের নাম 'অনর্থ দত্ত।'

এর থেকে ভালো যোগাযোগ সত্যি হতে পারে না। একজন বাঙালিকেই এই বিপদের দিনে সব কিছু অসঙ্কোচে বলা যায়। তবে ওনার সঙ্গে কথা না বলে সেটা ভাবাই ভুল। যেখানে বাংলার বাইরে এসে পাঁচ বছরে লোকে বাংলা ভুলে যাচ্ছে, সেখানে একজন এত বছর বাইরে থাকার পর বাঙালিয়ানা বজায় রাখবে, এটা আশা করাই ভুল।

১০। তেরো মাস আগের কথা

কেউ কি বোমা তৈরির চেষ্টা করছে?

এফ বি আই-এর জয়েন্ট টাস্ক ফোর্স ফর টেররিজম বা সংক্ষেপে যাকে জে টি টি এফ বলা হয়, তার বিশেষ এজেন্ট রবার্ট—সকালে কফি খেতে খেতে মেল চেক করছিল। ইতিমধ্যে একটা অ্যালার্ট মেসেজ এসেছে ফোনে।

কেউ দশ বোতল তরল ফেনল-এর অর্ডার দিয়েছিল। সেটা এসে গেছে। সেটা পাঠানোর আগে একটা ক্যালিফর্নিয়ার ট্রান্সপোর্ট কোম্পানি 'এফ বি আই'-কে সেটা জানিয়েছে। এটা নিয়মমাফিক জানাতেই হবে।

এটা সাধারণের জানা নেই যে যেকোনও রাসায়নিক যা দিয়ে কোনওরকম ধ্বংসাত্মক কাজ করা যায়, যা দিয়ে বোমা বানানো যায়, এরকম যে-কোনও কিছু কেনাকাটি করলে তার উপর লক্ষ রাখা হয়, নজরদারি চলে। সতর্কতা হিসেবে মেসেজ আসে এফ বি আই-এর কাছে।

এমনিতে ফেনল তো কেনাই যেতে পারে। কিন্তু এত একসঙ্গে কেনা, তার কী কারণ থাকতে পারে। সে জন্য এফ বি আই-এর কাছে খবর আসে। ক্রেতা এসব কথা জানতেও পারে না।

ক্রেতার নাম, ঠিকানা পাঠিয়ে দিয়েছে। স্যানহোসের অ্যাড্রেস। কেনার কারণ হিসেবে জানানো হয়েছে যে ক্রেতা ঘর পরিষ্কার করার একটা নতুন রাসায়নিক বানানোর চেষ্টা করছে। তার জন্যই ফেনল লাগবে। কারণ ফেনল এ ধরনের ক্লিনিং ফ্লুইডের একটা মূল উপাদান।

একটু ভুরু কুঁচকে খানিকক্ষণ ভেবে কফি তাড়াতাড়ি করে শেষ করে টেররিজম স্ক্রিনিং সেন্টারে যোগাযোগ করলেন। ওই ক্রেতার নাম সন্দেহের তালিকায় আছে কি?

যদি সে ব্যক্তি অতীতে কোনও ধরনের সন্দেহজনক কাজ করে থাকে, কোনওরকম টেররিজম সংক্রান্ত অপরাধের সঙ্গে যুক্ত থাকে, তবে অবশ্যই তার নাম, যাবতীয় তথ্য এর ডেটাবেসে পাওয়া যাবে।

কিন্তু সেরকম কোনও তথ্য খুঁজে পাওয়া গেল না ক্রেতার সম্বন্ধে। অর্থাৎ অতীতে কোনও খারাপ কাজ করার রেকর্ড নেই ওই ক্রেতার নামে। তবে তার অর্থ এই নয় যে তাকে সন্দেহ করা হবে না। বরঞ্চ বলা যায়, এই নতুন নামটি জুড়ে গেল সেই সন্দেহের তালিকায়, যাদের উপরে ভবিষ্যতে নজরদারি চালাতে হবে, তার লিস্টে।

সাম্প্রতিককালে ঠিক কী কী জিনিস কেনা হয়েছে, কী জিনিস অর্ডার করা হয়েছে ওই ঠিকানা থেকে তার পুরো লিস্ট দেখতে চাইলেন রবার্ট। পেয়েও গেলেন সে লিস্ট পরবর্তী একঘণ্টায়। সেটা দেখেই চক্ষু চড়কগাছ। নড়ে চড়ে বসলেন রবার্ট।

এক মাসের মধ্যেই কেনা হয়েছে ২ গ্যালন কনসেন্ট্রেটেড সালফিউরিক অ্যাসিড। কেনা হয়েছে নাইট্রিক আসিডের দুই বাক্স যার সঙ্গে ক্লিনিং ফ্লুইডের কোনও সম্পর্ক থাকতে পারে না। পরিমাণ কম বলে আগে এ সব ক্ষেত্রে সতর্কতা আসেনি।

সব কটাই বোমা তৈরিতে ব্যবহার করা যেতে পারে।

কিছু একটা গন্ডগোল আছেই। কারণ আরও কিছুদিন আগেই আমাজন থেকে ওই ক্রেতাই অর্ডার দিয়েছে হাইড্রোজেন পার অক্সাইড-এর এক বোতল। হাইড্রোজেন পার অক্সাইড অন্য কাজে লাগলেও এর সঙ্গে বোমা তৈরির এক গভীর যোগাযোগ আছে। TATP বা ট্রাইঅ্যাসিটোন ট্রাইপারক্সাইড—জঙ্গিরা বোমা তৈরিতে ব্যবহার করে। তার মূল উপাদানই হল হাইড্রোজেন পার অক্সাইড।

তাহলে কি ওই ব্যক্তি বোমা তৈরি করার জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছে?

এ ধরনের ক্ষেত্রে প্রথমেই সে ক্রেতার বাড়িতে সারভেল্যান্স ক্যামেরা বসানোর চেষ্টা করা হয়। ক্যামেরা বসানোর সবথেকে ভালো উপায় এসি বা ওয়াশিং মেসিন মেন্টেনান্স-এর লোক সেজে ওই বাড়িতে গিয়ে সার্ভেল্যান্স ক্যামেরা বসিয়ে দিয়ে আসা, যাতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নজর রাখা যায়। বোঝা যায় কী করা হচ্ছে। হাতেনাতে ধরার সময় এইসব তথ্য প্রমাণ হিসেবে দেওয়া হয়।

কিন্তু খেয়াল রাখতে হয় যেন যার উপরে নজরদারি করা হবে সে যেন কোনওভাবে বিন্দুমাত্র টের না পায়। সাধারণত এ ধরনের সন্ত্রাসের প্ল্যান একজনে

করে না। এর সঙ্গে আরও অনেকে যুক্ত থাকে। সেজন্য সতর্ক হতে হয় যাতে পুরো টেররিস্ট নেটওয়ার্কটাকে ধরা যায়। এর পিছনে যে আসল মাথা তাকে খুঁজে বার করা যায়।

খুব দ্রুত ওই ক্রেতার ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করে নিল রবার্ট। অত্যন্ত উচ্চশিক্ষিত ও বুদ্ধিমান। এক্ষেত্রে সারভেল্যান্স ক্যামেরা বসালে ঠিক বুঝতে পেরে যাবে।

একই সঙ্গে ফেনল কেনার জন্য যা কারণ বলেছে, সেটা কেনার কারণ হতে পারে না। ক্রেতার ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পূর্ণ আলাদা। যে সফটওয়্যার নিয়ে মাতামাতি করে, সে ভাইরাস ক্লিন করার কথা ভাববে, হঠাৎ করে ক্লিনিং ফ্লুইড তৈরি করা নিয়ে গবেষণা করতে যাবে কেন?

সবার আগে দরকার ওই বাড়িতে প্রয়োজনমত ঢোকার অধিকার। বিশেষ করে যখন ওই ব্যক্তি থাকবে না, তখন ঘর তল্লাশি চালানোই হবে এক্ষেত্রে সেরা উপায়। এই অনুমতি অবশ্য কয়েকদিনের মধ্যেই পাওয়া যাবে।

ফিসা বা ফরেন ইন্টেলিজেন্স সারভেল্যান্স অ্যাক্টের সাহায্য নিয়ে সম্ভাব্য অপরাধীর উপর তারপরে সবরকম নজরদারি করাই সম্ভব। তার জন্য অনুমতি দরকার।

এখানে একটু সাবধান হতে হবে কারণ এক্ষেত্রে এই সম্ভাব্য অপরাধী যথেষ্ট প্রতিভাবান। নাম সাফিন আলি। কোনওভাবে যেন সাফিন টের না পায় যে ওর উপর নজরদারি চালানো হচ্ছে। তাই উপযুক্ত সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

সাফিন গুগলে কী সার্চ করে, তার মেলে কী আসে সব কিছুর উপর লক্ষ রাখতে হবে। অবশ্য যে নিজে সাইবার এক্সপার্ট সে যে এ বিষয়েও খুব কাঁচা কাজ করবে না, এ বিষয়ে নিশ্চিত।

দু'দিন বাদে এরকমই একটা মেল দেখে চমকে উঠল রবার্ট। অজানা একটা মেইল আই ডি থেকে একটা মেল এসেছে সাফিনের কাছে।

অন্যান্য কথার মধ্যে হঠাৎ করে একটা প্রশ্ন—নুন আর তেল পেয়ে গেছ কি?

মেলটার অবশ্য কোনও উত্তর দেয়নি সাফিন।

কিন্তু নুন আর তেল—এ কথার অন্য কোনও অর্থ থাকতে পারে না। নিশ্চয়ই বোমার কোনও উপাদান নিয়ে কথা হচ্ছে। বিশেষ করে এমন কোনও উপাদান যা বোমা বিস্ফোরণের পিছনে বড় ভূমিকা পালন করবে।

অর্থাৎ কাজ শেষের দিকে। হাতে আর বেশি সময় নেই। সবসময় সজাগ থাকতে হবে। এরকম সময়ে সামান্য অসাবধানতার জন্য খুব বড় কোনও বিস্ফোরণ হতে পারে। এই লোকটার পিছনে থাকা সংগঠন সম্বন্ধে আরও কতটা বেশি তথ্য

জানা দরকার আর লোকটা কখন আঘাত হানতে পারে—এটা বুঝে ঠিক সময়ে ধরা খুব বড় ব্যালান্সিং অ্যাক্ট। সেরকম কোনওরকম সম্ভাবনা দেখলেই সাফিনকে ধরতে হবে। সামান্যতম দেরি হলে সব শ্রম পণ্ড হয়ে যাবে।

১১। সলিসিটার অনর্থবাবুর বাড়ি

সামান্য কয়েক দিনের জন্য আমেরিকায় আসা। তার মধ্যে অন্য অনেক কাজও আছে।

সানফ্রানসিসকোর সঙ্গে ভারতের টাইম ডিফারেন্স সাড়ে তেরো ঘণ্টার। অর্থাৎ সানফ্রানসিসকোর মধ্যদুপুর মানে ভারতে মধ্যরাত। এজন্য এখানে আসার পর দু'তিন-দিন জেট ল্যাগ থাকে। দিনের বেলাতেও ঘুমে চোখ জুড়িয়ে আসে। ভোরে উঠতে আলস্য লাগে।

তবু দেরি না করে রোববারেই সকাল সকাল সলিসিটার অনর্থ দত্তর সঙ্গে দেখা করার কথা ঠিক করল অনিলিখা। ফোনে সামান্য কথা হল। এখন অবশ্য অনর্থবাবুর মধ্যে কতটা বাঙালি পরিচয় আছে কে জানে! যেভাবে ফোনে 'অ্যান্ড ড্যাট' বললেন তাতে অনিলিখার আর আগ বাড়িয়ে বাংলায় কথা বলা হল না। যা কথা ইংরেজিতে হল। তবে রোববার হলেও দেখা করতে রাজি। কিন্তু বাড়িতে যেতে হবে।

সে ঠিকানা নিয়ে সকাল সাতটার সময় বেরিয়ে পড়ল অনিলিখা।

একটা রেন্টাল কার এই ক'দিনের জন্য অনিলিখা নিয়ে নিয়েছে। গাড়ি সঙ্গে থাকলে কোথাও যেতে অনেক সুবিধে হয়। এখানকার ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকলেই হল। আমেরিকাতে পাবলিক ট্রান্সপোর্টের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। বিশেষ করে মূল শহরের বাইরে যেতে হলে। সানফ্রাসিসকোর মধ্যে অবশ্য গাড়ি চালানোর অতটা দরকার হয় না।

অনর্থবাবুর বাড়িটা সানফ্রানসিসকো থেকে গাড়িতে প্রায় দেড় ঘণ্টার পথ। মূল শহরে না থেকে অনেকে এরকম আশেপাশের ছোট ছোট গ্রামে থাকতে পছন্দ করে। এমনিতে এসব গ্রামেও শহরের সবরকম সুযোগ সুবিধা থাকে।

বাড়ির সামনে অনেকটা পার্কিং-এর জায়গা। নুড়ি পাথর ফেলা রাস্তা। গাড়িটা সামনে রেখে কলিংবেল টিপতেই ভেতর থেকে রট-ওয়েলার কুকুরের গম্ভীর ডাকার শব্দ শুনতে পেল অনিলিখা। বাইরে আবার ইংরেজিতে লেখা 'আমার পোষা কুকুরের আক্রমণে আক্রান্ত অনুপ্রবেশকারীর মৃত্যুর ঘটনার জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত। অন্যায়ভাবে অনুপ্রবেশ করার চেষ্টা করবেন না। আপনার মৃত্যুর জন্য আমাকে দায়ী করবেন না।'

ভদ্রলোক বাড়িতে এরকম একটা সাংঘাতিক কুকুর আছে, সেটা আগে বলেননি তো।

খানিকক্ষণ পরে এক মাঝারি হাইটের চওড়া গোঁফওয়ালা চশমাপরা পায়জামা পাঞ্জাবি পরিহিত ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। মুখটা গোলমতো। সামান্য ভুঁড়ি আছে।

মুখে নাম যাই বলুন না কেন, তাঁকে রাস্তায় দেখলেও বাঙালি হিসেবে চিনতে ভুল হত না অনিলিখার।

ভেতরে আসব? কুকুরটা? বাংলাতেই বলল অনিলিখা।

ওসব কিছু নেই। ওরকম রেকর্ডিং চালিয়ে রাখি যাতে চোর ডাকাত ভয় পায়। লেখাটাও সেজন্য। আসুন আসুন। এসব দিকে কুড়ি বছর আগে ডাকাতি হত। তাই সাবধানতা। তা আপনার কী নাম যেন?

অনিলিখা।

কী সুন্দর নাম। কাল বাংলায় কথা বলিনি। আসলে অনেকে বাঙালি হলেও বাংলায় কথা বলতে চায় না। অনেকে আবার দ্বিতীয় প্রজন্মের বাঙালি। এখানেই বড় হয়েছে। তাদের অনেকের ক্ষেত্রে নাম ছাড়া বাঙালিত্ব আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। আপনি বাঙালি শুনেই আমার এ কেসটা নেওয়ার আগ্রহ অনেক বেড়ে গিয়েছিল, বলে ড্রয়িংরুমে নিয়ে গিয়ে বসালেন অনর্থবাবু। ড্রয়িংরুমের দেওয়ালে সারি দিয়ে বুককেস। তার মধ্যে আইনের অজস্র বই-এর সঙ্গে বেশ কিছু বাংলা বইও আছে।

অনর্থবাবু ফের বলল, আপনার নামটা খুব শুনেছি শুনেছি বলে মনে হয়।

না সেরকম শোনার কথা নয়। খুব একটা কমন নাম নয়। বিশেষ করে এদেশে আপনার জানার কথা নয়।

উঁহু, দাঁড়াও দাঁড়াও, এবার মনে পড়েছে। প্রতিবছর শারদীয়া কিশোর ভারতীর পাতায় অনিলিখা নামের এক মহিলা চরিত্রের একটা অভিযান নিয়ে উপন্যাস থাকে। সেখান থেকেই মনে হচ্ছিল নামটা কোথায় পড়েছি। ঠিক কিনা।

তা আপনি বাংলা পত্র পত্রিকা পড়েন?

পড়ি মানে? বাংলা সাহিত্যই তো আমার জীবন। নেহাৎ এখানে থেকে যেতে হয়েছে। তা আপনার সঙ্গে সেই অনিলিখার কোনও পরিচয় আছে কি? আমি তার খুব বড় ফ্যান। খুব প্রিয় চরিত্র। অবশ্য সেটা শুধু ফিকশনও হতে পারে।

মুচকি হাসল অনিলিখা—আমিই সেই অনিলিখা।

সত্যি বলছেন? প্রায় চমকে উঠে সোজা হয়ে বসলেন অনর্থবাবু।

মাথা নাড়িয়ে সায় দিল অনিলিখা।

উরেব্বাস। ভদ্রলোক লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তারপরে এগিয়ে এসে হ্যানডশেক করে বলে উঠলেন—আমি তো আপনার ভক্ত। আপনি আর বলব না। তুমি বয়সে আমার থেকে অনেক ছোট। তুমি বলেই বলছি। তোমার প্রত্যেকটা অভিযান আমার পড়া। তা এখানে? দাঁড়াও, আমার গিন্নিকে ডাকি। ওর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। এই শুনছ। যা জোরে হাঁক পাড়লেন ভদ্রলোক যে সেটাও রেকর্ডিং করে রাখলে রট-ওয়েলারের আওয়াজের থেকে কিছু খারাপ হত না।

যিনি এলেন তাঁকে দেখেও মনে হয় যেন তিনি কলকাতাতেই আছেন। ভারি সুন্দর লাল পাড় সাদা তাঁতের শাড়ি পরা। এরকম পরতে কলকাতাতেও আজকাল দেখা যায় না। কলকাতা ও অনিলিখার কিছু পূর্ব অভিযান প্রসঙ্গ নিয়ে নানান কথাবার্তা হল। বিশেষ করে মাঝে মাত্র চব্বিশ দিনের সুমাত্রার সেই উপজাতিদের সম্বন্ধে অনর্থবাবুর খুব আগ্রহ ছিল। সে বিষয়ে বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পরে সাফিন প্রসঙ্গ আলোচনা শুরু করার সুযোগ এল। অনিলিখা শুরু করতে গিয়েই বাধা পেল।

তার আগেই অনর্থবাবু একটা মোটা খাতা বার করেছেন। বলে উঠলেন, দাঁড়াও, এত ব্যস্ততা কীসের। ধীরে সুস্থে ঘটনাটা শুনব। তোমাকে তার আগে আমার কয়েকটা কবিতা শোনাই। বলে একের পর একটা খান বারো কবিতা শুনিয়ে গেলেন।

বলা উচিত নয়। কিন্তু কবিতাগুলো শুনে আদৌ কবিতা বলে মনে হল না অনিলিখার। ফের মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসতে চাইল অনিলিখা।

দাঁড়াও, চিকেন পকোড়া আর বাসা মাছের কাটলেট আসছে, তারপরেই না হয় শোনা যাবে। ততক্ষণ না হয় আরও কিছু কবিতা শোন।

আরও খান চারেক কবিতা শোনার পরে চিকেন পকোড়ার জন্য নিষ্কৃতি পাওয়া গেল।

কীরকম লাগল?

খুব ভালো—মিথ্যে কথা বলতে হল না কারণ অনিলিখার বক্তব্য ছিল পকোড়ার সম্বন্ধে। তিনি বেশ খুশি হয়ে আরও দুটো শোনাতে চাইলেন।

না না। ওটা এখন থাক—প্রায় আর্তনাদ করে উঠল অনিলিখা। তার থেকে এখানে কীভাবে এলেন, কীরকম লাগছে, আপনার সেসব অভিজ্ঞতা—সেটাই শোনান ততক্ষণ।

এখানে তো ভুল করে চলে এসেছি। তখন কি আর বুঝতে পেরেছি, কী মিস করতে চলেছি। এখানকার জীবন পুরো নুন-চিনি-তেলহীন রান্নার মতো। এখন ছেলে, নাতি এ সবের জন্য এখানে পড়ে আছি। মনে হয়—

আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে—এই বাংলায়
হয়তো মানুষ নয় হয়তো বা শঙ্খচিল কাকের বেশে
হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে
কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠাল-ছায়ায়;

শুনে খুকখুক করে কেশে উঠল অনিলিখা—ওটা শঙ্খচিল শালিখের বেশে হবে।

ওই হল, একটা পাখি হলেই হল বুঝলে। তাছাড়া কাককে আমরা চিরকাল অবজ্ঞা করে এসেছি। উপযুক্ত সম্মান দিইনি। কিন্তু কী উপকারি পাখি। কাকের উপরে আমার বেশ কয়েকটা কবিতা আছে। শোনাই?

না, না, যা বলছিলেন, সেটাই আগে শুনতে চাই।

তা যা বলছিলাম, এখানে কোনও প্রাণ নেই। সব কিছু যেন একইভাবে ফিরে ফিরে আসে। জীবনের উষ্ণতা যা বলে তা শুধু পাওয়া যায় বাংলায়। সব সময় একটা নতুন কিছু হতে পারে। জানা নেই কী হতে চলেছে। ব্রিজের নীচ দিয়ে যাচ্ছ। ব্রিজ ভেঙে পড়তে পারে। বাড়ি কিনছ, কোনওদিন না তৈরি হতে পারে। পরীক্ষা দিচ্ছ, তার ফল কোনওদিন না বেরোতে পারে। চাকরি পাচ্ছ, কিন্তু সে চাকরিতে কোনওদিন যোগ দেওয়ার দরকার না হতে পারে। ট্রেন মাঝ রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়তে পারে। এক্সাইটিং ব্যাপার স্যাপার। এখানে সব কিছু বোরিং। কথা বলার লোকই পাওয়া যায় না।

ইতিমধ্যে এক প্লেট ফিশ কাটলেট নিয়ে তার স্ত্রী এসে গেছেন। অনিলিখা বলতে শুরু করবে, তিনি ফের বলে উঠলেন, নাহ, তোমাকে দেখে আজ যেন সব কবিতাগুলো ভিড় করে ফিরে আসছে।

সব পাখি ঘরে আসে—সব নদী; ফুরায় এ-জীবনের সব লেনদেন;
থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।

কার বলো তো?

জীবনানন্দ দাশ।

ফুল মার্কস। আমার ফেভারিট কবি। আমার একটা কবিতাও ওই পর্যায়ের হল না।

এবারে ওকে বলতে দাও। ও তো সারাক্ষণ তোমার কথাই শুনে গেল—

পাশ থেকে তাঁর স্ত্রী বলে ওঠে, আর বলবেন না, ও কোর্টে গিয়েও মাঝে মধ্যে কবিতা লিখে ফেলে। আমাকে তো সারাক্ষণ শোনাচ্ছে। কিছুই তেমন বুঝি না।

অবশেষে কিছু বলার খানিক সুযোগ পায় অনিলিখা। পুরো ঘটনাটা বিস্তৃত বলে। সাফিনের মার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকে সাফিন সম্বন্ধে যা কিছু জেনেছে, সব কিছু।

সব শোনার পরে তিনি বলে, বুঝলে এই ক্ষেত্রে কিছু করা খুব শক্ত। বিশেষ করে যেখানে অপরাধী নিজে সব অপরাধ স্বীকার করে নিয়েছে। সেখানে বলা যায় কেস ক্লোজড। এখানে একবার সন্ত্রাসবাদের ছাপ লেগে গেলে তার জন্য কিছু করা খুব শক্ত। কেউ সাহায্য করতে, কোনও ধরনের তথ্য দিতেও এগিয়ে আসবে না। তবে আমার মনে হয় ও যেখানে থাকত, সেখানে আমাদের যাওয়া দরকার। এখানে কেউ কারুর খোঁজ রাখে না। তবু যদি কেউ কিছু দেখে থাকে, তাহলে হয়তো কাজে লাগতে পারে। তারপরে আমি চেষ্টা করে দেখব, যদি ওর সঙ্গে দেখা করা যায়। অন্তত সামনাসামনি কথা বললে নিশ্চিত হওয়া যাবে। সত্যি যদি এর সঙ্গে ওর যোগাযোগ থাকে, তাহলে তো তুমি বা আমি কেউ ওকে বাঁচাতে চাইব না।

অনিলিখা আরও কিছু কথার পরে উঠতে যাচ্ছিল। তিনি ধমক দিয়ে বলে উঠলেন, আরে বসো, আমাদের সঙ্গে লাঞ্চ করে যাবে। ততক্ষণ আমার বাকি কবিতাগুলো শোনাই।

দুপুরের রান্না অবশ্য সত্যি দারুণ হয়েছিল। অনর্থবাবুর স্ত্রী খুব ভালো রান্না করেন। তাঁর মুখে অনর্থবাবুর বিভিন্ন কীর্তিকলাপ শোনাও গেল। ভদ্রলোক কবিতার কথা সব সময় ভাবেন বলে অনেক সময় অনেক কিছু খেয়াল করেন না। বাড়িতে মাইক্রোওয়েভে ডাল গরম করতে গিয়ে ক'দিন আগে অন্যমনস্ক হয়ে ল্যাপটপ ঢুকিয়েছিলেন। ফল ভালো হয়নি, এটুকু বলাই ভালো।

ভীতু মানুষ। সেজন্য কুড়ি বছর আগে এ পাড়ায় এক ডাকাতির ঘটনার জেরে এখনও সারাক্ষণ বাড়ির নিরাপত্তা নিয়ে খুব চিন্তায় থাকেন। কয়েকদিন আগে বাড়িতে ছোটজামাই এসেছিল। অন্ধকারে জামাইকে না দেখতে পেয়ে কুকুরের ডাক শুনিয়ে আর ইলেকট্রিক শক খাইয়ে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছেন।

উনি কি সত্যি পারবেন এরকম একটা শক্ত কেস হ্যান্ডেল করতে? কে জানে!

আব্দুল মজিদের একটা জমি কেনার ব্যাপারে সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু এরকম জটিল কোনও কেস লড়ার অভিজ্ঞতা আছে বলে অনিলিখার মনে হল না।

অবশ্য প্রথম সাক্ষাতেই একজনের দক্ষতা বোঝা মুশকিল। শুধু ঠিক হল

সাফিন যেখানে থাকত, সেখানে একদিন একসঙ্গে গিয়ে প্রতিবেশিদের সঙ্গে কথাবার্তা বলবে।

১২। কেউ কি কিছু দেখেছিল সেদিন?

১১৮ ব্র্যাডওয়েল স্ট্রিট। স্যানহোসে।

এখানেই থাকত সাফিন আলি। ছিমছাম বাংলো প্যাটার্নের বাড়ি। সামনে কিছুটা জায়গা বাঁধানো, কিছুটা ঘাসের লন। কিন্তু যত্নের অভাবে সেটা এখন জঙ্গল হয়ে গেছে। একতলার সামনে বড় পার্কিং। পিছনে খানিকটা বাগানও আছে।

এখানে সব বাড়িগুলোই নতুন। উচ্চবিত্তদের পাড়া। বাড়ির ভেতরে যাওয়া যাবে না। দুদিন আগে এখানে এসেছিল অনিলিখা। সেটা বৃহস্পতিবার, কাজের দিন ছিল। অনিলিখা কাউকে তেমন প্রশ্ন করার মতো খুঁজে পায়নি। নিজেরও অন্য কাজে তাড়া ছিল। এদিক ওদিক খানিকটা ঘুরে দেখে ফিরে গিয়েছিল।

আজ অনর্থবাবু সঙ্গে আছেন। ছুটির দিন।

আশেপাশের কোনও বাড়িতে সাফিন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করতে হবে।

উল্টোদিকের বাড়িতে ডোরবেল টিপল অনিলিখা। এ বাড়ির ড্রয়িংরুম থেকে সাফিনের বাড়িটা ভালো করে দেখা যায়। খানিকবাদে একজন মাঝবয়সি ভদ্রলোক বেরিয়ে এল। অনিলিখা নিজের পরিচয় দিল। কীজন্য এসেছে জানাল। সাফিনের নামটা উল্লেখ করা মাত্রই মুখের মধ্যে কীরকম যেন পরিবর্তন হল লোকটার। যেন একটু দ্বিধা-ভয় মুখের মধ্যে ফুটে উঠল। তারপর কী ভেবে ভেতরে আসতে বলল ওদের।

ওরা ড্রয়িংরুমের লাগোয়া কনসারভেটরিতে এসে বসল। একটা বছর আটেকের ছেলে আছে ভদ্রলোকের। ছেলেটা ওখানে একটা ল্যাপটপ নিয়ে বসে গেম খেলছিল।

হঠাৎ অনিলিখার দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে ছেলেটা বলে উঠল, তোমার গলার হারটা কোথায় গেলো? খুব সুন্দর নীল পাথর লাগানো হারটা। ওটা কী পাথর?

অনিলিখা হঠাৎ প্রশ্নটা শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিল। এ ছেলেটা কী করে জানল যে ওরকম একটা হার অনিলিখা পরে? আজ পরেনি। কাল একটা পাথর খুলে পড়ায় আজ পরেনি। কিন্তু ও কী করে জানল? শুধু মুচকি হেসে বলে উঠল, হ্যাঁ, ওটাকে বলে টোপাজ। কিন্তু তুমি কী করে দেখলে?

ছেলেটার দিক দিয়ে কোনও উত্তর এল না।

ওর বাবা ফ্রান্সিস হেসে বলল, আপনি কি এখানে আগে এসেছেন? ও নিশ্চয়ই আপনাকে দেখেছে।

হ্যাঁ। গত পরশু এসেছিলাম। কিন্তু একটু পরেই কাউকে দেখতে না পেয়ে চলে গিয়েছিলাম। ও হয়তো দেখেছে। কিন্তু ও কী করে মনে রাখল?

এটা তো কিছুই না। ও যা দেখে সবকিছু মনে রেখে দেয়। সব কিছু। প্রত্যেকটা ডিটেলস। এটা ওর একটা অসুখও বলতে পারেন।

ওর কি HSAM বা হাইলি সুপিরিয়র অটোবায়োগ্রাফিক মেমারি আছে?

হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন। অনেকেই এটার কথা অবশ্য জানে না।

জানবে কী করে? এটা অত্যন্ত রেয়ার ক্ষমতা। অসুখ বলব না। কোটিতে একজনের থাকে কিনা সন্দেহ।

ছেলেটা ল্যাপটপ ছেড়ে অনর্থবাবুর পাশে এসে বসে অনর্থবাবুকে খুব খুঁটিয়ে দেখছিল। তিনি পাঞ্জাবি পরে এসেছেন। সেটাই দেখছিল পাশ থেকে। অনর্থবাবু সেটা দেখে আর এসব কথা শুনে সামান্য শঙ্কিত হয়ে বাংলায় অনিলিখাকে বলল, কী ব্যাপার? কামড়ে টামড়ে দেয় না তো?

অনিলিখা হেসে উত্তর দিল, না না। আপনার পাশে যে ছেলেটি বসে আছে, তার পাশে বসাটাই সৌভাগ্যের। ও এক আশ্চর্য ক্ষমতার অধিকারী। ও যা দেখছে তা আজ থেকে কুড়ি বছর বাদেও বলতে পারবে। ওকে যদি জিগ্যেস করা হয় একবছর আগে কোনও একটা দিন সকালে ও কী ব্রেকফাস্ট খেয়েছিল, বা যদি জিগ্যেস করা হয় সেদিন স্কুলে কার কার সঙ্গে কথা বলেছিল, ওর কোন কোন টিচার কী পোশাক পরেছিল সেদিন, সেটা পর্যন্ত ও একদম ঠিকঠাক বলে দেবে। বলে ফ্রান্সিসকে লক্ষ্য করে ইংরেজিতে আবার বলল, ওকে নিয়ে রিসার্চ হওয়া উচিত। বলতে গেলে আমরা এখনও আমাদের মস্তিষ্ক কীভাবে কাজ করে তা এখনও কিছুই বুঝি না। ওর ব্রেন কীভাবে কাজ করে জানলে আমরা মানুষের ব্রেন কীভাবে কাজ করে সে বিষয়ে কিছুটা জানব।

ওর উপরে এখন এখানে রিসার্চ হচ্ছে। জনকে আমরা প্রতি সপ্তাহে একদিন ইউনিভার্সিটির মধ্যে একটা ব্রেন রিসার্চ সেন্টারে নিয়ে যাই। বলা যায় ওদের অনুরোধেই যাই। সেখানে ওর ব্রেন স্ক্যান করে ডাক্তাররা দেখে। সাধারণ মানুষের ব্রেন থেকে জন-এর ব্রেন কোথায় আলাদা, কীভাবে অন্যরকমভাবে কাজ করে তা সায়েন্টিস্টরা বোঝার চেষ্টা করে।

আরও কিছু কথার পরে অনিলিখা আসল প্রসঙ্গে ফেরে।

ফ্রান্সিস সাফিন সম্বন্ধে বলে, খুব ভালো ভদ্র ছেলে ছিল। আমার সঙ্গে ভালোই আলাপ ছিল। ঘটনার কিছুদিন আগেও একটা চ্যারিটি ফুটবলে আমরা একসঙ্গে খেলেছিলাম। এখানে অন্য কারুর সঙ্গে তেমন মিশত না। তেমন কাউকে আসতেও দেখতাম না ওর বাড়িতে। একটু সিরিয়াস টাইপের ছিল।

দাবাতে খুব ইন্টারেস্ট ছিল। এখানে আমাদের একটা চেস ক্লাব আছে। ওখানেও মাঝেমধ্যে যেত। আমিও একটু দাবায় ইন্টারেস্টেড। তাই ওখানেও মাঝে

মধ্যে দেখা হত। ও সকাল সকাল কাজে বেরিয়ে যেত। আমারও তাই। ও ছুটির দিন বাগানের পিছনে অনেকটা সময় দিত। বেশ কিছু চ্যারিটির সঙ্গেও যুক্ত ছিল। অ্যালজাইমার সোসাইটির জন্যও কাজ করত। জন মাঝে মধ্যে ওর বাড়িতে যেত। কাকুকে খুব পছন্দ ছিল।

কেন? বিশেষ কোনও কারণ?

ওর ওখানে অনেক ল্যাপটপ, অনেক কম্পিউটার। জন গিয়ে তার একটাতে বসে পড়ত। বোধহয় সেগুলোর প্রসেসিং স্পিড অনেক ভালো ছিল। ওখানে গিয়ে নিশ্চিন্তে খেলতে পারত। এখানে আমাদের চোখের সমানে থাকলে অনেক সময় আমরা বারণ করি। ওখানে ওর পূর্ণ স্বাধীনতা। সেরকম বারণ করারও কেউ ছিল না। সে জন্যই হয়তো। তা ছাড়া সাফিনের ব্যবহার খুব ভালো। বাচ্চাদের পছন্দ করত খুব।

সাফিনকে তো এখান থেকেই অ্যারেস্ট করেছিল। তাই তো?

হ্যাঁ, মাঝরাতে। আমরা ঘুমোচ্ছিলাম। হঠাৎ পুলিশের গাড়ির আলো ও আওয়াজে ঘুম ভেঙে যায়। দেখি চারদিক পুলিশে পুলিশে ছয়লাপ। কী হচ্ছিল কিছু বুঝতে পারছিলাম না। শুধু দেখলাম ওকে নিয়ে একটা ভ্যানে তুলল। সকালে উঠে পুরোটা শুনেছি।

আমারও তো পরের দিন স্যানফ্রানসিসকোর ওই ইভেন্টে যাওয়ার কথা ছিল। গিয়েও ছিলাম। ও যদি কিছু করত কী হত তা এখন ভাবলেই ভয় লাগে। সেদিন ওখানে লক্ষ লক্ষ লোকের ভিড় ছিল। অন্য অনেক দেশ থেকে লোক এসেছিল। একটা বোমা ফাটলে প্যানিকে লোকে যদি চারদিকে ছুটোছুটি করত, তাহলেই একটা বড় অংশ মারা পড়ত।

সেদিন সন্ধেতে কাকুর বাড়িতে দুজন লোক এসেছিল সন্ধেবেলা। অনেকক্ষণ ছিল। হঠাৎ করে খেলার মাঝে বলে উঠল জন।

তার মানে? ওর বাবাও অনিলিখার সঙ্গে একই সঙ্গে বলে উঠল।

জন কোনও উত্তর না দিয়ে ফের মন দিয়ে খেলতে লাগল।

অনিলিখা কাছে গিয়ে ফের জন-কে জিগ্যেস করল। কখন লোকগুলো চলে গিয়েছিল মনে আছে?

না তা দেখি নি। যখন এসেছিল তখন দেখেছি। তখন বাজে ঠিক চারটে।

তুমি জানলে কী করে?

সে সময় আমাদের বাড়ির ঘড়িতে পাখিটা চারবার ডেকে উঠেছিল। বলে ছেলেটা আঙুল দিয়ে দেখাল। আমি এখান থেকেই দেখেছিলাম। কাকুর ড্রয়িংরুমে বসে ছিল। একটা লোকের চোখে চশমা ছিল। তাকে এখানে আগেও কয়েকবার

আসতে দেখেছি। অন্যজনকে আগে দেখিনি। তার বেশ লম্বা চওড়া চেহারা। খানিকবাদে আবার যখন দেখি, তখন ওরা সামনের ঘরে ছিল না। অন্য কোথাও ছিল।

কী করে বুঝলে?

বাইরে তখনও ওদের সাদা গাড়িটা ছিল।

তুমি লোকটাকে বা গাড়িটাকে দেখলে চিনতে পারবে?

হ্যাঁ। ওরা তার দু'দিন আগেও এসেছিল। ওই একই গাড়িতে। জন ফের বলে উঠল, আচ্ছা, ইখফা মানে কী?

সেটা আবার কী? কোথায় শুনেছ?

কাকু ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে নিজের মনে বলত। ইখফা। ইখফা।

তার আবার কী মানে হতে পারে?

অনিলিখা শুধু কথাটা একবার সার্চ করে দেখল। অ্যারাবিক শব্দ। শব্দের অর্থ 'লুকিয়ে থাকা'।

আচ্ছা, কাকুকে কোনওদিন কম্পিউটারে কাজ করা ছাড়া অন্য কিছু তৈরি করতে দেখেছ?

হ্যাঁ, কাকু নিজের হাতে অনেক কিছু তৈরি করতে ভালোবাসত। আমাকে একটা পাখির বাসাও তৈরি করে দিয়েছিল। ওই সব কাজ একটা পিছনের দিকের ঘরে বসে করত। তবে আমি ওদিকে যেতাম না। ওখানে বসে কাকু অনেক সময় কাজ করত।

তুমি অনেক দরকারি কথা বলেছ। এরকম আর কিছু মনে পড়ছে যা হয়েছিল ওই সন্ধেতে বা তার আগের কিছু দিনে?

না, সে সময় আমার পরীক্ষা চলছিল, তাই কাকুর ওখানে কয়েকদিন যাইনি।

এবারে জনের বাবার দিকে তাকিয়ে অনিলিখা বলল, কোনও দরকার হলে আমি আবার জনের কাছে আসতে পারি।

অবশ্যই। সাফিন শুধু আমার প্রতিবেশী ছিল না, বন্ধুও ছিল। এরকম বিপদে ওঁর কোনও কাজে লাগতে পারলে আমার ভালোই লাগবে।

আরও কিছু কথা বলার পরে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে অনিলিখা ও অনর্থবাবু বেরিয়ে এল।

বেরোনোর সময় অনর্থবাবু শুধু বললেন, ইন্টারেস্টিং। তার মানে ওই দিন সন্ধেতে আরও দুজন সঙ্গে ছিল। তাদের কি এর সঙ্গে কোনও যোগাযোগ ছিল? এটা কি এফবিআই জানতে পেরেছিল?

জানি না। শুধু তাই না। ছেলেটা যা বলল তাতে বোঝা গেল একটা

লোক আগেও এসেছে এখানে। পুলিশ যখন ওর বাড়িতে হানা দেয়, তখন অবশ্য ও একাই ছিল। আরও কিছু কথা মাথায় রাখতে হবে। এই ছেলেটা ওর বাড়িতে গিয়ে খেলত।

তাতে কি এসে যায়?

তার মানে ও খুব সাবধানী ছিল না। ওর বাড়ির অন্য কম্পিউটারগুলো অন্য কেউ ব্যবহার করতে পারত।

তা ঠিক।

১৩। বোমা কি তৈরি হয়ে গেছে?

দশটা নাগাদ শুয়ে পড়ে রবার্ট। আবার সকাল পাঁচটা নাগাদ উঠে পড়ে। রোজ সকালে অফিসে যাওয়ার আগে জিমে যাওয়ার অভ্যেস রবার্টের।

সেজন্য রাত ন'টার পরে একটা বিশেষ নাম্বার থেকে ফোন না এলে আর ফোন ধরে না রবার্ট। সেই নাম্বার থেকে ফোন এসেছে।

ফোনটা ধরল রবার্ট।

উল্টোদিকে মার্কের গলা। মার্ক রবার্টের টিমে কাজ করে। এরকম সময়ে খুব দরকারি কিছু না হলে মার্ক ফোন করবে না।

কয়েক ঘণ্টা আগে সাফিনের ওই ঠিকানা থেকে একটা মেইল গেছে। বিষয়টা খুব চোখে পড়ার মতো। তাতে লেখা—আমি বিয়ের জন্য প্রস্তুত।

ইমেইল কি ওর ইমেইল আই ডি থেকে গেছে?

না, অন্য একটা অজানা ইমেইল আই ডি থেকে। কিন্তু ওই বাড়ি থেকেই ইমেলটা করা হয়েছে।

তুমি শিওর?

হ্যাঁ, সেটা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। যে ইমেলটা ব্যবহার করা হয়েছে সেটা আগেই আমাদের সন্দেহের তালিকায় ছিল। কয়েকমাস আগে আফগানিস্তান থেকে আলকায়দার ট্রেনিং করে যারা এখানে এসেছিল, তাদের একজন এই ইমেইল একবার ব্যবহার করেছিল।

তাদের তো এখনও খোঁজ পাওয়া যায় নি? তাই তো?

হ্যাঁ। এখনও খোঁজ পাওয়া যায়নি।

আমার মনে হচ্ছে আর রিস্ক নেওয়া উচিত হবে না, আজ রাতেই ওকে অ্যারেস্ট করো। কাল সানফ্রানসিসকোতে একটা বড় ইভেন্ট আছে। লক্ষ লক্ষ লোক সেখানে থাকবে। সেটা যদি টার্গেট করে, ও কোনওরকম ভাবে বোমা নিয়ে পৌঁছে গেলে মারাত্মক ব্যাপার হবে। আর কোনও রিস্ক নেওয়া যাবে না।

ঠিক আছে। আমরা একঘণ্টার মধ্যে বিয়ে ভাঙার ব্যবস্থা করছি।

সাবধানতা নিয়ে যেও। কোনভাবে যেন পালাতে না পারে।

ওকে স্যার।

১৪। সাফিনকে এফ বি আই-এর জেরা

তুমি কি আই-ই-ডি বোমা তৈরি করার চেষ্টা করছিলে?

হ্যাঁ।

কেন?

ইরানের উপরে দীর্ঘদিন ধরে যে অন্যায় হচ্ছে তার বদলা নেওয়ার জন্য। ইরানের উপরে একের পর এক স্যাংকশন এনে ইরান-এর অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করা হয়েছে। ইরানের পরমাণু গবেষণা নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। সেখানে ইরানকে এ বিষয়ে বাধা দেওয়ার কী অধিকার আছে আমেরিকার?

তুমি কি কোনও গ্রুপের সঙ্গে কাজ করো?

না। আমি একাই এটা করার কথা ভেবেছি।

এতে কি কেউ তোমাকে সাহায্য করেছে?

না, তবে আমি হিজবুল্লাদের থেকে কিছু সাহায্য ও উৎসাহ পেয়েছি।

ওদের সঙ্গে প্রথম আলাপ হয় কী ভাবে?

ওদের অনলাইন ভিডিও দেখে ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করি এক বছর আগে। তার পরে একবার আমি ভারতে যখন যাই, ওরা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। পরে আমাকে আফগানিস্তানে যেতে বলে।

আফগানিস্তানে?

হ্যাঁ, কান্দাহারে। ওরা আমাকে আই-ই-ডি তৈরির ট্রেনিং দিতে চেয়েছিল। পরে অবশ্য যাওয়ার দরকার হয়নি। আমার পক্ষে অনলাইন ভিডিও দেখে শিখে নেওয়া সম্ভব হয়েছিল।

তুমি এখানে আর কারুর সঙ্গে কাজ করছিলে?

না। আমি একাই কাজ করছিলাম।

তোমার উদ্দেশ্য কী ছিল?

সানফ্রানসিসকোর ওই ইভেন্টের মধ্যে বোমা বিস্ফোরণ।

কতজন মারা যেতে পারত এই বিস্ফোরণে?

আমার হিসেবে ওর তিরিশ মিটারের মধ্যে কেউ বাঁচত না।

এ ব্যাপারে অন্য কেউ কি জানত?

না।

তোমার মূল উদ্দেশ্য কী ছিল?

আমেরিকার যতটা সম্ভব ক্ষতি করা। সবার মনের মধ্যে ভয় সৃষ্টি করা। আরও কিছু জায়গায় এরকম বিস্ফোরণ ঘটাতাম।

তোমার সঙ্গে কি কেউ এই পরিকল্পনায় জড়িত ছিল?

না, এর দায়িত্ব, প্ল্যানিং সম্পূর্ণ আমার। এ জন্য এটা তৈরি করতে আমার কিছুটা সময় বেশি লেগেছিল।

এত সহজ সরল উত্তর আর স্বীকারোক্তি পাওয়ার অভিজ্ঞতা নেই রবার্টের। অন্য একটা ঘর থেকে ইন্টারোগেশন প্রসেসটা দেখছিল। এত সহজে সব কিছু স্বীকার করে নেবে এটা ভাবা যায়নি।

কিছু একটা অস্বাভাবিকতা আছে অবশ্য। এত সহজে কেউ স্বীকার করে নেয় না।

এখান থেকে অন্য কেউ জড়িত নেই, সেটাও পুরোপুরি বিশ্বাস করা যায় না। সেটা এরকম টেররিস্টরা অনেক সময়ই বলে থাকে। এদের নেটওয়ার্ক বা দল সম্বন্ধে কিছু জানাতে চায় না। আরেকটু কড়া ওষুধ পড়লে সব কিছু বলে দেবে।

১৫। কী এই ইখফা?

কতদিন কেটে গেছে জানি না। এখানে একটা ছোট ঘরে সারাদিন বসে থাকি। এই নির্জনতাই আমার একমাত্র সঙ্গী। মাঝে মধ্যে যখন খুব একা লাগে নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলি। নিজেই প্রশ্ন করি। নিজেই উত্তর দিই। নিজের উপরে রেগে যাই। তারপরে নিজেকে শান্ত করি। নিজেকে নিয়ে মজা করি।

খুব ইচ্ছে হয় বাবা-মা কেমন আছে জানতে, দেখতে। কিন্তু তারপরেই মনে হয় জেনে কী করব। যোগাযোগের সে অধিকার আমি হারিয়েছি।

জেলের ওয়ারডেনকে বলেছিলাম আমাকে একটা খাতা-পেন দিতে। দিয়েছে। লিখতে লিখতে অনেক সময় কেটে যায়।

একটা সময় আমার বেশির ভাগ সময় কাটত কম্পিউটার নিয়ে। কোড লিখে। এখন কেন জানি না আমার সে আগ্রহ চলে গেছে। তার থেকে আমার এই খাতা পেন অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য বন্ধু। মনের অনেক গভীরে গিয়ে কথা বলে।

ওয়ারডেন লোকটা ভালো। প্রথমে আমার সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করত। হয়তো টেররিস্ট বলেই। করাই উচিত। এখন আমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে। আমি চাওয়ায় আমাকে কিছুদিন আগে গীতাঞ্জলি এনে দিয়েছে। আমি রোজ

কবিতাগুলো পড়ি আর শব্দগুলোর মধ্যে যখন নিজেকে খুঁজে পাই তখন কাঁদি। বলে উঠি—

অন্তর মম বিকশিত করো
অন্তরতর হে।
নির্মল করো, উজ্জ্বল করো,
সুন্দর কর হে।
জাগ্রত করো, উদ্যত করো,
নির্ভয় করো হে।

মাঝে মধ্যে এত জোরে বলে ফেলি যে ওরা একদিন ঘরের একমাত্র ছোট জানলা দিয়ে লক্ষ করছিল। ভাবছিল আমি বোধহয় আবার কোনও মানুষ মারার মন্ত্র পড়ছি।

আমার সঙ্গে এখানে কারুর দেখা করার অনুমতি নেই। একটা ম্যাক্সিমাম সিকিউরিটি জেলে আছি। শুনেছি জায়গাটা ডেনভারের কাছে। আমার কাছে অবশ্য জায়গাটা কোথায় তার কোনও অর্থ নেই।

এখানে আমার কাছে জায়গা মানে হল ছয় ফুট বাই আট ফুট একটা ঘর, যার একটা স্টিলের দরজা আছে। সে দরজার উপরের দিকে একটা ছোট জানলা আছে। ওটাই আমার আর বাকি পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র যোগাযোগ। আমার সঙ্গে এই জেলের অন্য কোনও কয়েদিরও কোনও যোগাযোগ নেই। আমার এ পৃথিবীতে আকাশ নেই, মাটি নেই, প্রিয়জনের ভালোবাসা নেই। আছে শুধু একটা ছোট জানলা।

মাঝে মধ্যে নানান চিন্তাভাবনায় মন খুব বিক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। কখনও ঘুমই আসে না। নানা ধরনের বিক্ষিপ্ত চিন্তা আসে। মনে হয় আমি 'সেভ দ্য চিল্ড্রেন ফান্ড'-এ যে টাকা দিতাম, সেটা না দেওয়াতে ওদের কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো। হয়তো আফ্রিকার কোনও একটা বাচ্চা পানীয় জল পাচ্ছে না। হয়তো কারুর পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। হয়তো সিরিয়ায় কোনও অনাথ মেয়ে কোনও শয়তানের হাতে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। অ্যালজাইমার সোসাইটির জন্য যে অর্থ সাহায্য করতাম, তা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কত পেশেন্টের অসুবিধে হচ্ছে। বাবা মার কথা সব সময় খেয়াল হয়। কীরকম আছে তারা? কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো? আমি যে টাকা পাঠাতাম, তা তো বহু দিন পাঠাতে পারিনি। কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো? তাদেরকে আমার জন্য অপমানিত হতে হচ্ছে না তো?

তারপরেই আমার মধ্যে আবার একটা শয়তান জেগে ওঠে।

বলে ওঠে তোমার একটাই উদ্দেশ্য। জিহাদ। তার জন্য তোমাকে ইসলামের

শত্রুদের মেরে শেষ করতে হবে। যত সম্ভব বেশি লোক মারতে হবে এই পবিত্র যুদ্ধে। ঠিক যেমন ওই ইভেন্টে হত। আমার ব্যাগের মধ্যে রাখা বোমা বিস্ফোরণে কত লোক মারা যেত। এদিক ওদিক লোকেদের দেহ পড়ে থাকত। লোকে ভয়ে ছুটোছুটি করত।

মাঝে মধ্যে আবার সব কিছু গুলিয়ে যায়। আমি তো এরকম শয়তান ছিলাম না। কী যেন একটা কোড। 'ইখফা'। লুকিয়ে থাকা। আমি সেই লুকিয়ে থাকাটাকেই ধরে ফেলেছিলাম। কী যেন একটা হতে চলেছিল। ইরান। হ্যাঁ, ইরানেই। খুব বড় একটা কিছু।

মনে হয় এক স্বপ্ন। সে স্বপ্ন যেন অনেক সময় বাস্তবের চেহারা নেয়।

আবার সব গুলিয়ে যায়। আমার জীবনের সত্য-মিথ্যে, ভালো-মন্দ সব একজায়গায় মিশে যায়। সাদা কালো লাল হলুদ সব রঙ যেন এক মনে হয়।

১৬। সাফিনের বন্ধু র‍্যালফায়েলের সঙ্গে কথা

আমি র‍্যাঁ ফায়েল বলছি। আপনি কি অনিলিখা?

হ্যাঁ, অনিলিখা বলছি। আপনি?

আমি আপনার নাম্বারটা প্রফেসার জাকিরের কাছ থেকে পেয়েছি। তাঁর কাছেই শুনলাম যে আপনি সাফিনের সম্বন্ধে খোঁজ নিচ্ছিলেন।

হ্যাঁ, কিন্তু আপনি? একটু সতর্ক হয়ে যায় অনিলিখা। এ কাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকা কোনও অপরাধী নয় তো?

আমি ওর সঙ্গে কাজ করতাম মাইক্রোসফটে। আমরা ভালোই বন্ধু ছিলাম। মাঝে মধ্যে আর্ট একজিবিশন, চ্যারিটি এসব ইভেন্ট অরগানাইজ করতাম। ওর এসব বিষয়ে খুব আগ্রহ ছিল। আমারও।

তা আপনি কি আমেরিকাতেই বড় হয়েছেন?

না, আমি ইজরায়েলে বড় হয়েছি। এখানে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে আসি। সাফিনের সঙ্গে কর্মসূত্রে আলাপ। সাফিন খুব ভালো ছেলে ছিল। ওর বিরুদ্ধে অনেক অকাট্য প্রমাণ আছে। ও স্বীকারও করে নিয়েছে। সেটা যদি না করত আমি কোনওভাবে বিশ্বাস করতাম না যে ও এটা করে থাকতে পারে।

আপনি তো ইজরায়েলের। ইরান আর ইজরায়েলের মধ্যে সম্পর্ক তো ভালো নয়। তা ওর ব্যবহারে কি কোনও ধর্মীয় উগ্রবাদীর পরিচয় পেয়েছিলেন কোনওদিন?

না, কোনওদিন পাইনি। বিন্দুমাত্র না। ও ধর্মই সেভাবে বিশ্বাস করত না। ও যদি সত্যি করে সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে যুক্ত হত, অন্য ধর্মের মানুষকে ঘৃণা করত,

তাহলে কি তার ছাপ কোনওভাবে আমার সঙ্গে ওর ব্যবহারে ধরা পড়ত না? তবে ওর মধ্যে শেষের দিকে একটা বড় পরিবর্তন এসেছিল। কিছু একটা যেন বলতে চাইত। কিন্তু সাহস করে বলতে পারত না। আমাকে একবার বলেছিল একটা খুব দরকারি কথা বলবে। কিন্তু তার আগেই এসব কাণ্ড ঘটে গেল।

আচ্ছা, ও কি 'ইখফা' বলে কোনও কথা বলেছিল?

আশ্চর্য। আপনি কী করে জানলেন? ও এসব ঘটনার কয়েকদিন আগে আমাকে জিগ্যেস করেছিল 'ইখফা'-র মানে কি?

আমি বলতে পারি নি। কিন্তু কেন জিজ্ঞাসা করেছিল প্রশ্ন করতে ও কিছু বলেনি।

র‍্যাফায়েল কথায় কথায় বলল, আমার এক আত্মীয় এখানে ফেডারাল কোর্টে জাজ হিসেবে কাজ করে। তাঁর সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ করতে পারেন। যদি কোনওভাবে সাহায্য করতে পারে।

অনেক ধন্যবাদ। অবশ্যই তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারলে ভালো হবে। আমরা অনেকটাই অন্ধকারে পথ হাতড়াচ্ছি। তাঁর পরামর্শ পেলে খুব ভালো হয়। আমারও মনে হয় সব বিষয় মাথায় রাখা দরকার। এখানে অবশ্যই ওর বিরুদ্ধে অনেক প্রমাণ ছিল। ও সব স্বীকার করে নিয়েছে। সে জন্যই অন্য অনেক প্রশ্ন বিচার করে দেখা হয়নি। আমি নিজে মনে করি না যে ছেলে নানান ধরনের চ্যারিটির সঙ্গে যুক্ত ছিল, সে হঠাৎ করে এক সন্ত্রাসবাদী হয়ে উঠতে পারে।

ঠিক তাই। আমারও তাই মনে হয়। ও খুব আবেগী টাইপের ছিল। রাস্তায় কোনও হোমলেস মানুষ দেখলে কিছু না কিছু দেবেই। একদিন রাস্তায় পড়ে থাকা অসুস্থ এক ভিখারিকে দেখে ওর কী মন খারাপ। বাড়িতে নিয়ে এসে তার চিকিৎসা করায়। তবে সাফিন তো শেষে নিজেই স্বীকার করে নিয়েছে। এখন আর কোনও প্রশ্ন থাকার কথা নয়।

আরও কিছু কথা বলার পর ফোন ছেড়ে অনর্থবাবুকে ফোন করল অনিলিখা।

ঠিক কী ছিল সাফিনের বিরুদ্ধে চার্জশিটে সেটা অনর্থবাবুর জোগাড় করার কথা ছিল। সেটা পেয়েছেন কিনা জানতে হবে।

১৭

সাফিনের সঙ্গে দেখা করার কি কোনও উপায় নেই?

বেশ কয়েক দিন হয়ে গেছে। এখনও সাফিনের সঙ্গে দেখা করার কোনও

পারমিশন পাওয়া যায়নি। যেখানে যেখানে অ্যাপিল করা সম্ভব সব ক'টা জায়গাতেই চেষ্টা করেছেন অনর্থবাবু ও অনিলিখা। যেখানে যেখানে ফোন করা যায়, অনুরোধ করা যায়, কিন্তু সদর্থক কিছু হয়নি।

একটা ক্যাফেতে বসে বাধ্য হয়ে বলেই ফেললেন অনর্থবাবু, বুঝলে মনে হচ্ছে না কিছু করা যাবে। যে দিকেই এগোই, মনে হচ্ছে পুনর্বিচারের সব রাস্তা বন্ধ। আমাদের ওর পক্ষে খুব জোরালো কিছু প্রমাণ চাই। তা না হলে কিছু করা যাবে না।

হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হচ্ছে। কিছু একটা প্রমাণ চাই। তা না হলে কিছু করা যাচ্ছে না। এদের মধ্যে এমনিতেও আবেগ, অনুভূতি একটু কম। কমনসেন্স কম। তাই আমাদের কাছে যেখানে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে, সেটা এদের কাছে কোনও প্রশ্নই নয়। এদের কাছে প্রমাণ দরকার।

ওর মা কেমন আছেন?

আমার সঙ্গে আজও কথা হয়েছে। কী করে জানি না আমার উপর বড় ভরসা করে ফেলেছেন। তাঁর এ বিষয়ে কোনও ধারণাই নেই যে ওর ছাড়া পাওয়া প্রায় অসম্ভব।

ওর বিরুদ্ধে এফ বি আই কী কী চার্জ এনেছে, তা তো দেখেছ?

হ্যাঁ, আপনি পাঠানোর পরে ভালো করে পড়েছি। চার্জশিটে কিন্তু বোমা তৈরির কথা উল্লেখ আছে, কিন্তু বোমার কোনও উল্লেখ নেই। সেটা দেখেছেন? ও যদি কয়েক ঘণ্টা পরেই সেই বোমা দিয়ে বিস্ফোরণ ঘটাতে চাইত, সেটার কি কোনও স্পষ্ট উল্লেখ ওই ষাট পাতার চার্জশিটে থাকত না। সেটা কোথায়? কতটা শক্তিশালী ছিল সে বোমা? কিছুই লেখা নেই। একটা ছেলে যে এতগুলো চ্যারিটির সঙ্গে যুক্ত ছিল, সবার জন্য ভালো কাজ করত, সে হঠাৎ করে মানুষ মারতে উদ্যত হল? কে এসেছিল সেই সন্ধেতে? আমি এমনিতেও ওই এফ বি আই এজেন্ট রবার্টের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করব। দরকার হলে দেখাও করব। দেখা যাক কী হয়। ওই যে 'ইখফা' শব্দটা, তার মধ্যেও একটা বড় রহস্য আছে।

—কিন্তু মনে রেখো ইন্টারোগেশনের সময় ও কিন্তু সব কিছু স্বীকার করেছে। কীভাবে তৈরি করছিল—সেসব কিছু বলেছে। কী করত তাও বলেছে। ও কি কাউকে আড়াল করার চেষ্টা করছিল?

কথা শুনতে শুনতে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল অনিলিখা। ক্যাফেতে ফক্স নিউজ চলছিল। আমেরিকার একটা সারভেল্যান্স ড্রোন ইরান গুলি করে নামিয়ে দিয়েছে। ইরানের বক্তব্য ওটা ইরানের আকাশ সীমার মধ্যে চলে এসেছিল। সে নিয়ে দু দেশের মধ্যে টেনশন এখন চূড়ান্ত পর্যায়। আলোচনা হচ্ছিল নতুন করে ইরানের ব্যবসার উপর চাপানো নতুন নিষেধাজ্ঞা নিয়ে।

২০১৬ সালে ইরান তাদের প্রতিশ্রুতি মতো পরমাণু নিরস্ত্রীকরণের জন্য বেশ কিছু স্টেপ্স নেয়। তখন ইরানের সঙ্গে বাণিজ্যের উপরে যা যা নিষেধাজ্ঞা ছিল, সব তুলে নেওয়া হয়। কিন্তু ২০১৮ সালে ট্রাম্প এসে আবার সে নিষেধাজ্ঞা চালু করে। তবে থেকেই আবার করে টেনশন শুরু।

অনিলিখা বলল, জানেন তো অনর্থদা, ইরানকে পরমাণু প্রযুক্তি কিন্তু আমেরিকাই প্রথম দিয়েছিল ১৯৫৭ সালে। তখন প্রথম নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর তৈরিতে আমেরিকা সাহায্য করেছিল। ওদেরকে উন্নত ইউরেনিয়ামও দিয়েছিল। ১৯৭২ সাল অব্দি আমেরিকার সঙ্গে ইরানের সম্পর্ক খুব ভালো ছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নকে রুখতে মধ্য এশিয়ায় ইরানই ছিল আমেরিকার সবথেকে বড় বন্ধু। তারপরে যখন জিমি কারটার প্রেসিডেন্ট ছিলেন, সে সময়েও সম্পর্ক খুব ভালো ছিল। দুই দেশের সম্পর্ক খারাপ হতে শুরু করে ১৯৭৯ সাল থেকে, যখন শাহের জায়গায় আয়েতোল্লা খোমানি ইরানের প্রধান নেতা হয়ে আসেন। তারপরে তো সেই ১৯৭৯ সালের হোস্টেজ ক্রাইসিস যেখানে ৫২ জন আমেরিকার দূতাবাসের কর্মীকে ইরানে বন্দি করে রাখা হয়।

এখন তো ইরান থেকে যাতে ভারত, চীন, জাপান বা দক্ষিণ কোরিয়া তেল না নেয় তার জন্য এ সব দেশকেও আমেরিকা হুঁশিয়ারি দিয়েছে। উদ্দেশ্য ইরান যাতে তেল সরবরাহ থেকে কোনওরকম রোজগার না করতে পারে। ইরানের অর্থনীতি ভেঙে পড়ে। পরমাণু যুদ্ধের জন্য যেটুকু উন্নত ইউরেনিয়াম দরকার, তা কিন্তু ইরানের কাছে আছে। এটা কয়েকদিন আগের খবর।

তা তুমি হঠাৎ করে ইরান নিয়ে এত ব্যস্ত হয়ে পড়লে কেন?

চুপ করে রইল অনিলিখা। খানিকবাদে বলল, মনে রাখবেন সাফিনকে ধরা হয়েছে ইরানের জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্য। অনেকে বলে আমেরিকা ও ইরানের মধ্যে সম্পর্ক যাতে আরও খারাপ হয় তার জন্য সৌদি আরব সবসময় চেষ্টা করে। সৌদি আরব ও ইরানের মধ্যে শত্রুতা সুবিদিত। ইরানের সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্ক ভালো হয়ে গেলে মধ্য এশিয়ার রাজনীতিতে ইরানের একটা বড় প্রভাব থাকবে, যা সৌদি আরবের ক্ষেত্রে ভালো হবে না।

আপনাকে এটা বলতে গিয়ে একটা ইন্টেরেস্টিং কথা মনে পরে গেল—ইখফা কিন্তু আরবি শব্দ। হঠাৎ করে ওই শব্দ সাফিন বলল কেন? এর সঙ্গে অন্যকিছুর যোগাযোগ নেই তো।

একটু থেমে অনিলিখা ফের বলল, কিছু জিনিস মিলছে, আবার অনেক কিছুই মিলছে না।

আমারও মিলছে না।

কী কী মিলছে না আপনার হিসেবে? আমার মতে এক, ওই সন্ধেতে সাফিনের বাড়িতে দুই লোকের আসা। কিন্তু তাদের নিয়ে কোনও তদন্ত হয়নি।

সাফিনও তাদের কথা কেন বলেনি। দুই, ইখফা। লুকিয়ে থাকা। কিছু কি লুকিয়ে ছিল সাফিনের বাড়িতে? তিন, সাফিনের স্বভাবে হঠাৎ করে পরিবর্তন ও বিনা প্রতিবাদে ওর সব কিছু স্বীকার করে নেওয়া। চার, ইরান ও আমেরিকার মধ্যে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক অবস্থান। এরকম আরও বেশ কিছু আছে।

অনর্থদা তাঁর খাতাটা বার করে বললেন, আমার না মেলাটা অন্যরকম। তুমি কি মনে কর আমি ওই বোরিং খবরের আলোচনা শুনছিলাম। একটা কবিতার লাইন মেলানোর চেষ্টা করছিলাম। বিয়ের উপরে আমার লেখা একটা আনন্দের কবিতা। কিন্তু 'খবর' এর সঙ্গে যে শব্দের মিল মাথায় আসছে, সেটা হল 'কবর'। কিন্তু বিয়ের ব্যাপার তো, তাই ভাবছিলাম ওই শব্দের ব্যবহার ঠিক হবে কিনা। দাঁড়াও, তোমাকে পুরোটা শোনাই।

১৮। ইংল্যান্ডের পথে অনিলিখা

আব্দুল মজিদ ঠিক কীসের ব্যবসা করে?

এয়ারপোর্টে বসে ওর কোম্পানির ওয়েবসাইটটা দেখছিল অনিলিখা। কোম্পানির নাম 'সেলিং ইয়র ড্রিম'। মার্কেটিংয়ের কোম্পানি। কোম্পানির বিজ্ঞাপনে লেখা 'ডেটা ড্রিভেন মার্কেটিং কোম্পানি'।

অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের তথ্যকে বিশ্লেষণ করে কোনও কোম্পানি কীভাবে তার গ্রাহকদের কাছে আরও ভালোভাবে পৌঁছবে, আরও ব্যবসা বাড়াতে পারে, সে বিষয়ে সাহায্য করে।

মোটে দু'বছরের মধ্যে ব্যবসা কয়েক বিলিয়ন ডলারে পৌঁছে গেছে। এমনকী 'সেলিং ইয়র ড্রিম' বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলোকেও ক্যাম্পেনের ক্ষেত্রে সাহায্য করে যাতে তারা আরও বেশি করে জনগনের কাছে পৌঁছতে পারে। জনসাধারণের সমর্থন পায়। এমনকী সাম্প্রতিক কালে আফ্রিকার বেশ কিছু ঘটনার পিছনে এদের ক্যাম্পেনের ভূমিকা আছে বলে সন্দেহ করে 'ইকনমিস্ট'-এ একটা খবর আছে।

ওদের বেশ কিছু সফটওয়ার প্রোডাক্টও আছে। আব্দুল ছাড়াও এই কোম্পানির আরেকজন অধিকর্তা আছে। তার নাম অ্যান্ডি রবার্ট।

কয়েকদিনের জন্য ইংল্যান্ড যেতে হচ্ছে অফিসের কাজে। তারপরে আবার আমেরিকা ফিরে আসতে হবে। আপাতত আমেরিকায় থেকে সাফিনের জন্য কিছুই করা যাচ্ছে না। কিছুই এগোচ্ছে না। ইংল্যান্ডে অফিসের কাজের ফাঁকে সাফিনের ব্যাপারে কয়েকজনের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে আছে অনিলিখার। গতবছর

MI 6-এর মাইকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল অনিলিখার, যার কথা 'অনিলিখা ও সেই লোকটা'-র সূত্রে অনেকের জানা। গত এক বছরে কয়েকবার ফোনে কথা হয়েছে মাইকের সঙ্গে। খুব ভালো লোক। ঠিকই ছিল লন্ডনে এলে দেখা করবে ওর সঙ্গে।

অনিলিখা সাফিনের ব্যাপারে ওর সঙ্গে কথা বলতে চায়। ও যদি কিছু পরামর্শ দিতে পারে। এমনিতেও আমেরিকা ও ইংল্যান্ডের মধ্যে অনেক বিষয়ে যোগাযোগ থাকে, বিশেষ করে সন্ত্রাসবাদীদের উপরে ইনটেলিজেন্স-এর তথ্য শেয়ার করা হয়।

ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ-এর প্লেন ছাড়তে এখনও আধঘণ্টা বাকি। এর মধ্যে সাফিনের মাকে একবার ফোন করে নেওয়া যায়। তিনি এখনও আশা করে আছেন যে তাঁর ছেলেকে নিয়েই অনিলিখা ফিরবে। তাই ফোন করতেও সামান্য অস্বস্তি হয় ওর। কিন্তু সত্যিটা না জানিয়েও উপায় নেই। ফোনটা করে অনিলিখা।

উল্টো দিকে থেকে অনিলিখার গলা শুনেই বলে ওঠেন, কেমন আছ মা?

আমি ভালো আছি। আমি এখনও তেমন কিছু এগোতে পারিনি। চেষ্টা করছি। এখনও সাফিনের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি পাইনি। আমাকে দেখা করতে দিচ্ছে না। একজন সলিসিটারের সাহায্য নিচ্ছি। তিনিও সাধ্যমত সাহায্য করছেন। দেখি কী হয়।

তুমি কি মনে করো ও এই অপরাধ করেছে?

জানি না। এখনও অব্দি সব প্রমাণ ওর বিরুদ্ধেই। যদিও আমার বেশ কিছু প্রশ্ন আছে। কিন্তু ওকে সাহায্য করবে এরকম কোনও প্রমাণ পাচ্ছি না। তবে আমি আশাবাদী। এখন আমি ইংল্যান্ডে যাচ্ছি। দেখি সেখানে আমার এক বন্ধু কোনওভাবে সাহায্য করতে পারে কিনা।

তিনি চুপ করে রইলেন। অহেতুক আশা দেখানো পছন্দ নয় অনিলিখার।

উল্টো দিক থেকে সাফিনের মা ফের বলে উঠলেন, খুব ছোট একটা কথা। কিন্তু মনে হল বলি। রোজ সকালে উঠেই অন্য কাজ শুরুর আগে প্রথম আমাকেই ফোন করত। যেদিন ঘটনা ঘটে সেদিন ফোনে ও কথার মাঝে হঠাৎ বলে, এ শয়তানের দেশে ও থাকতে চায় না। আমি জানি না কেন ও এটা বলেছিল। এর আগে কখনও ওকে এটা বলতে শুনিনি। ও কখনও এ ধরনের কথা আমেরিকা সম্বন্ধে বলত না। এটা অবশ্য খুব ছোট কথা। তবু মনে হল তোমাকে জানিয়ে রাখি। যদি তোমার কোনও কাজে লাগে।

হুঁ। বলে ভালোই করেছেন। এরকম আর কিছু মনে পড়লে জানিয়ে দেবেন।

ফোনটা রেখে দিয়ে একটু ভাবল অনিলিখা। তাহলে কি একটা পরিবর্তন ওর মধ্যে এসেছিল শেষের দিকে?

১৯। কামরানের সঙ্গে হঠাৎ দেখা

এই সময়টা ইংল্যান্ডে আবহাওয়া খুব উপভোগ্য। চারদিকে লোকের ভিড় থাকলেও একটা শীতল হাওয়া বইছে। আজ মেঘলা। তবে বৃষ্টি নেই। রাস্তায় সুসজ্জিত নারী পুরুষের ভিড়। অক্সফোর্ড স্ট্রিট-এর দুধারে নামী ব্র্যান্ডের দোকানের সারি। বেশিরভাগ এদিকে কেনাকাটা করতে আসে। এখানে সবসময় যেন পুজোর কলকাতা।

অক্সফোর্ড সার্কাস আন্ডারগ্রাউন্ড স্টেশন থেকে বেরিয়ে অক্সফোর্ড স্ট্রিটের ঠিক কোন দিকে যাবে ভাবছে, এর মধ্যে হঠাৎ অনিলিখা দেখল একটা লম্বা-চওড়া চেহারার দাড়িওয়ালা লোক ওর দিকে হাসতে হাসতে এগিয়ে আসছে। একটু কাছে আসতেই ও চিনতে পারল। কামরান।

পুরো নাম কামরান পাশা। একসঙ্গে একসময় আমেরিকার ইউনিভার্সিটিতে পড়েছে। পাকিস্তানের ছেলে। খুব একটা ভালো স্বভাবের ছেলে ছিল না যদিও।

কামরান এগিয়ে এসে বলল, বহু বছর বাদে দেখা। তুই কি ইংল্যান্ডে থাকিস নাকি?

না, না। আমি এখানে কয়েকদিনের জন্য এসেছিলাম। তুই?

ব্যবসা করি। 'সেলিং ইয়র ড্রিম' কোম্পানির নাম শুনেছিস? ওটা আমার।

নামটা শুনে চমকে উঠল অনিলিখা। একেই বলে যোগাযোগ।

হ্যাঁ, শুনেছি। খুব ফাস্ট গ্রোয়িং মার্কেটিং কোম্পানিদের মধ্যে একটা। তাহলে তুই তো বিলিওনেয়ার। দারুণ ব্যাপার।

হেসে উঠল কামরান। তা বলতেই পারিস। আমরা তো বড় বড় রাজনৈতিক দলের হয়েও কাজ করি। ওদের ইলেকশনের ক্যাম্পেন তৈরি করে দিই। এই নে আমার কার্ড।

বলে একটা কার্ড এগিয়ে দিল কামরান। তাতে লেখা অ্যান্ডি রবার্ট.

সে কী! নাম পরিবর্তন। কামরান পাশা থেকে অ্যান্ডি রবার্ট।

অবাক হচ্ছিস তো নামটা দেখে? আসলে কামরান পাশা নামটা দেখলে অনেকে ব্যবসা করতে চাইবে না। তাই নামটা আগেই চেঞ্জ করে নিয়েছি। তা তুই এখন কী করছিস?

ভারতে কাজ করি। তবে অনেক জায়গায় নিয়মিত কাজের সূত্রে যেতে হয়।

ওখানে পড়ে থাকে কেউ? এখানে চলে আয়। ভারত এখনও মধ্য যুগে পড়ে আছে।

অনিলিখার কথাটা একেবারে পছন্দ হয়নি। ভারতের সম্বন্ধে কোনও অপমানকর কথা ও সহ্য করতে পারে না।

ও বলল, সেটা পাকিস্তানের ক্ষেত্রে হতে পারে। ভারতের ক্ষেত্রে নয়। আমাদের ওখানে জীবনের মূলস্রোতে এখনও ধর্মীয় মৌলবাদ আর জঙ্গীদের কোনও জায়গা নেই। সেজন্যেই ভারত প্রায় সর্বক্ষেত্রে দ্রুত এগোচ্ছে। ইকোনমিক গ্রোথ থেকে স্পেস সায়েন্স। পাকিস্তান পড়ে আছে কাশ্মীর, ধর্মান্ধতা আর সন্ত্রাসবাদ নিয়ে। সেজন্যে সব দিক দিয়ে পিছচ্ছে।

থাক সে কথা। ভারত-পাকিস্তান করে কী হবে? আমরা সবাই এখন গ্লোবাল সিটিজেন। তা এর মধ্যে একদিন সময় করে আমার বাড়ি চলে আয়।

ঠিক আছে আসব। ঠিকানাটা আমায় মেসেজ করে পাঠিয়ে দে। বলে ফোন নাম্বারটা জানিয়ে দেয় অনিলিখা। আরও কিছু কথার পরে অক্সফোর্ড স্ট্রিট-এর জন লুইসের দোকানের দিকে এগিয়ে যায় অনিলিখা।

একটা কালো মেঘ আকাশ ঢেকে দিচ্ছে। জিগ-স পাজলের মতো আরেকটা কালো মেঘের সঙ্গে এসে মিশল। সঙ্গে এক পশলা বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। অক্সফোর্ড স্ট্রিট কিছুক্ষণের মধ্যে ছাতার তলায় হারিয়ে গেল। এটাই ইংল্যান্ড। কিছু রোদ, কিছু বৃষ্টি। অনিলিখা অবশ্য ছাতা খুলল না। পাশের এক মলে ঢুকে পড়ল।

২০। কামরানের বাড়িতে অনিলিখা

এটাকে বাড়ি বলা ঠিক হবে না। ম্যানসন বলা উচিত। লন্ডনের কাছে সারেতে বাড়ি কামরানের। এটা উচ্চবিত্তদের এলাকা। এখানে বাড়ির দাম এমনিতেই বেশি। সেখানে বেশ কয়েক একর জায়গা জুড়ে কামরানের বিশাল ম্যানসন।

বেশ কয়েকটা গেট, নুড়িপাথর বিছানো পথ ও দুটো বাগান পেরিয়ে অনিলিখা বিশাল কাঠের দরজার সামনে আসতে একজন বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। সুট-টাই পরিহিত বৃদ্ধ এক ইংরেজ। কামরানের সেক্রেটারি। তিনি অনিলিখাকে নিয়ে এসে ড্রয়িংরুমে বসালেন।

জানালেন কামরান মিটিং-এ আছে। দশ মিনিটের মধ্যেই মিটিং শেষ করে চলে আসবে।

এমনিতে অনিলিখার সঙ্গে কথা বলার জন্য ঠিক এই সময়টাই দিয়েছিল কামরান। বলেছিল তার পরে আর সময় হবে না।

অনিলিখা হয়তো দেখা করতে আসত না, যদি না কামরানের ওই কোম্পানির সঙ্গে যোগাযোগ থাকত। হয়তো কিছুই নয়, তবু বলে, যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখো তাই। যদি এর সঙ্গে কোনওরকম যোগাযোগ থাকে।

কামরানের যে মধ্যএশিয়ার সঙ্গে, পাকিস্তানের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ আছে তা এখনও এই ঘরটাতে এলেই বোঝা যায়। সোনার আর রুপোর নানান জিনিসে সাজানো এই ঘর। রুপোর হুকো, সোনার জলের ঝাড়বাতি, পাকিস্তানী বটিসিনো মার্বেল পাথরের ঘোড়া, টেবিল, কারুকার্য করা আয়না। সব মিলিয়ে মনে হয় কোনও এক আরব্য রজনীর প্রাসাদে এসে উপস্থিত হয়েছে।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হল অনিলিখাকে। তবে কিছুটা সময় পাশের লাগোয়া বিশাল লাইব্রেরিতে ছিল অনিলিখা। প্রায় এক ঘণ্টা পরে কামরান এসে উপস্থিত হল।

একটা খুব আর্জেন্ট কল এসে গিয়েছিল এখানকার এক এম পি-র থেকে। নিতেই হল। তা তুই কী খাবি বল? লাঞ্চ করেই যেতে হবে।

না। না। অফিসের কাজে এসেছি। নিজের ব্যবসা তো নয়। এমনিতেও অনেক দেরি হয়ে গেল। তাই কিছুক্ষণ পরেই বেরোতে হবে। খাওয়া নিয়ে ব্যস্ত হোস না। তোকে তো দেখছি এখানকার বড় পলিটিকাল টেকনোলজিস্ট বলা হচ্ছে। ইন্টারেস্টিং রোল। এরকম কাজের পরিচয় আগে শুনিনি।

হেসে উঠল কামরান। হ্যাঁ, আমরা ব্যবসা শুরু করার পর থেকেই ওই শব্দটা প্রচলিত হয়ে গেছে। আসলে আমরা মানুষের মনের ডিজিটাল ভার্সান বানাই। একটু বুঝিয়ে বলি। এই যে আমেরিকার ইলেকশন হল কয়েক বছর আগে। লক্ষ লক্ষ ভোটার। আমরা তাদের পারসোনালিটি প্রোফাইল তৈরি করি। ফেসবুক, ফেসবুকের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন অ্যাপ-এর মাধ্যমে কোনও ব্যক্তির, সে ব্যক্তির বন্ধুদের পারসোনালিটি প্রোফাইল তৈরি করি। প্রত্যেকের সম্বন্ধে প্রায় ৫০০০ ডেটা পয়েন্ট জোগাড় করি। সে কীসে কীসে লাইক দেয়, কী ভালোবাসে, কোথায় যেতে ভালোবাসে, কী ধরনের আলোচনায় সহজে যোগ দেয়, কী অপছন্দ করে, কোন ধরনের বন্ধু পছন্দ করে, কোনও বিশেষ নীতি বা আদর্শে বিশ্বাস করে কিনা, পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতনতা আছে কিনা। কী ধরনের তথ্য সেই ব্যক্তি আগ্রহ নিয়ে পড়বে। কোনটায় মন্তব্য করবে সব আমরা এভাবে জেনে নিই। এরকম নানান রকম তথ্য আমাদের কাছে থাকে।

কিন্তু সে তো লক্ষ লক্ষ লোক। এতজনের এত ডেটা পয়েন্ট জোগাড় করা তো সহজ কাজ নয়। বলা যায় তোরা এভাবে একজনের স্বভাবের ডিজিটাল ইমেজ তৈরি করিস।

সেজন্য আমাদের রোজগারও কম হয় না। এবারে এরকম হাজার হাজার লোকের পারসোনালিটি মডেলের উপরে নির্ভর করে আমরা বুঝি কোন কোন

মেসেজ তাদের কাছে ইন্টারেসটিং হবে। তাদের কাছে কীভাবে পৌছতে হবে। তাদের উদ্দেশে ভিডিও বা মেসেজ তৈরি করে ফেসবুকে ও আরও অন্যান্য সোশ্যাল চ্যানেলে ছড়িয়ে দিই। দরকার মতো খবর তৈরি করে। অনেকে যাকে ফেক নিউজ বলে। ব্যাস।

কিন্তু এর মাধ্যমে ভোটে প্রভাব সৃষ্টি করিস কীভাবে? অনিলিখা বিষয়টা খুব ভালো করে জানলেও চাইছিল ওর থেকে আরও কিছু তথ্য বার করে নেওয়ার।

এটা কিন্তু খুব বেশি বলা যাবে না। তবে এখানে আমেরিকার উদাহরণ দিই। ধরে নে আমেরিকার ৫০ টা স্টেটের মধ্যে আমরা জানি কোন কোন স্টেট কলোরাডো না ফ্লোরিডার মতো সুইং স্টেট, যেখানে রিপাবলিক আর ডেমোক্র্যাটিক এই দুটি মেনপার্টির প্রেসিডেনশিয়াল ক্যান্ডিডেট এর মধ্যে যে কেউ জিততে পারে। সেখানে ওই রাজ্যকে আমরা আরও ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে দেখে নিই, দেখি কোন কোন অঞ্চল ভোটের জন্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ। পুরো ইলেকশনে কে জিতবে সেটা কিন্তু এই সব জায়গার লোকজনই মূলত ঠিক করে।

এবারে তাদের উপরে ফোকাস করি। তাদের কাছে আমাদের ক্লায়েন্টের মেসেজ পৌছাই, যেটা তাদের মতামতকে প্রভাবিত করে, পরিবর্তন আনে। এই তো আমরা কিছুদিন আগে ত্রিনিদাদে ক্যাম্পেন চালালাম।

ওখানে একদিকে ভারতীয়দের এক দল, অন্যদিকে আফ্রিকানদের এক দল। দেখলাম ভোটে কে জিতবে তা মূলত নির্ধারণ করবে ২৫ থেকে ৩৫ বছরের ভোটাররা। আমাদের ক্লায়েন্ট ছিল ভারতীয়দের পার্টি। আমরা পারসোনালিটি প্রোফাইল দেখে বুঝলাম ভারতীয়দের ওই বয়সি ছেলেমেয়েদের সমাজ ও পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ অনেক বেশি। আমরা মেন ক্যাম্পেন চালালাম যাতে আফ্রিকানদের ওই বয়সি ছেলেমেয়েরা ভোট না দেয়। তাদের জন্য আমরা এমন ভাবে ক্যাম্পেন করলাম, র‍্যাপ গান তৈরি করলাম, যাতে তারা ভোট বয়কট করে। তারা ঠিক তাই করল।

অন্যদিকে ভারতীয় ভোটারদের আমরা ভোটে নিয়ে আসার জন্য আসল সমস্যাগুলোর কিছু অংশ সামনে তুলে ধরলাম। মজার কথা কী জানিস দেখা গেল ভারতীয়দের ওই অংশের ৭০ শতাংশ ভোট দিয়েছে, অন্যদিকে আফ্রিকানদের ওই অংশ মোটে দশ শতাংশ ভোট দিয়েছে। এটা শুধু একটা বিশেষ গ্রুপ থেকে বললাম। এরকম আরও ১৪ টা গ্রুপের উপরে একই ভাবে ক্যাম্পেন চালানো হয়েছিল কোনওটা ধর্মের উপরে নির্ভর করে, কোনওটা বিশেষ কিছু অঞ্চলের উপরে নির্ভর করে, কোনওটা শুধু মেয়েদের জন্য। এবার বুঝতেই পারছিস কেন ভোটে ভারতীয়দের ওই দলটা বিশাল মার্জিনে জিতেছিল।

একটু থেমে কামরান ফের বলল, তোকে একটা প্রস্তাব দিচ্ছি। তোর মতো

ট্যালেন্টেড মেয়ে খুব কম হয়। হার্ভার্ডেও তোর মতো মেধা খুব কমজনের ছিল। কেন নিজের ভবিষ্যৎ ভারতে থেকে নষ্ট করছিস। এখানে চলে আয়। আমার সঙ্গে কাজ কর। কোম্পানির বোর্ডে নিয়ে নেব। আমাদের বোর্ডে বড় বড় রাজনীতিবিদরাও আছেন।

অনিলিখা আগ্রহ দেখানোর ভান করে বলল, কিন্তু একজনের ওই পাঁচ হাজার ডেটা পয়েন্টের থেকে বেছে নিয়ে ঠিক কোন কোন ডেটা পয়েন্টের উপরে নির্ভর করে ক্যাম্পেন করবি, কীভাবে কোন গ্রুপটা সিলেক্ট করবি, কোনটা ভোটারের ব্যবহারে পরিবর্তন আনতে পারবে—সেটা বোঝাই হল আসল চ্যালেঞ্জ।

ঠিক বলেছিস। ওখানেই আমাদের বারবার বিভিন্ন পারসোনালিটি মডেল করে করে দেখতে হয়। যেমন ধর এই মহিলা। বলে কামরান আই প্যাড থেকে একজনের ছবি বার করে দেখায়।

তিনি একটা বিখ্যাত কোম্পানির প্রেসিডেন্ট। খুব কম কথা বলেন। খুব কম লোকের সঙ্গে মেশেন। অবিবাহিত। কেউই তাই বিশেষ জানে না তাঁর সম্বন্ধে যা জানা তাঁর কোম্পানির সঙ্গে ব্যবসার জন্য অত্যন্ত জরুরি। এর সব ডেটা পয়েন্ট বিশ্লেষণ করে দেখা গেল, তিনি সাংঘাতিকরকম ডলফিনভক্ত ও পিটার জেমসের লেখার ভক্ত। এই দুই বিষয় সম্বন্ধে কারুর জানা থাকলে তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা তার সঙ্গে আলোচনা করে যেতে পারেন। এক অচেনা ব্যক্তিও ওই দুই বিষয়ের উপরে নির্ভর করে চট করে তাঁর সম্পূর্ণ আস্থা পেতে পারবে।

এবারে এই ছেলেটার কথায় আসি। আরেকটা ছবিতে গেলো কামরান।

এর পাঁচ হাজারের বেশি ডেটা পয়েন্ট আমাদের কাছে আছে। আমরা জানি ছেলেটা মুসলিম হলেও ধর্মে বিশ্বাস করে না। চাইনিজ খেতে ভালোবাসে, কিছু চ্যারিটির সঙ্গে খুব বেশি রকম যুক্ত। দাবায় আগ্রহ আছে। বই পড়তে ভালোবাসে। কিছু সময় একা থাকতে ভালোবাসে। সময় পেলে বাগানের কাজ করতে ভালোবাসে। ফুল ভালোবাসে। পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতনতা আছে। সেজন্য পাবলিক ট্রান্সপোর্ট ব্যবহার করে মাঝেমধ্যে। খুব সহজে অন্যদের বিশ্বাস করে। অন্যদের সম্বন্ধে বিচার না করে আগে থেকেই ভালো লোক বলে ভেবে নেয়। এরকম হাজার হাজার ডেটা পয়েন্ট। এবারে কীভাবে এর সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হবে, কোন বিষয়ে এ বেশি আগ্রহী হবে এটা জানা অনেক সোজা। যদি চাই এসব তথ্যের উপরে নির্ভর করে খুব সহজে এর সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করতে পারি।

এজন্য আমাদের কোম্পানিতে বড় বড় ডেটা সায়েন্টিস্ট কাজ করে। বিভিন্ন ভোটার সেগমেন্টের সাইকোলজিকাল প্রোফাইল এরাই তৈরি করে। সেভাবে আমরা তারপরে ক্যাম্পেন চালাই। ভালো ফল হতে বাধ্য।

এর উপরে নির্ভর করে বন্ধুত্বও ঠিক করে দেওয়া যায়। তাই না?

একদম। অনেক সময় আমরা যখন খুব হাই প্রোফাইল ব্যক্তির উপরে কাজ করি, তখন আমাদের আরও খবর জোগাড় করতে বিশেষ এজেন্ট পাঠাতে হয়। তবে সে ধরনের সংখ্যা খুব কম হয়। আমরা জানি ঠিক কোন লোকটাকে ওই ব্যক্তির সামনে রাখলে খুব সহজে সে লোকটা এর বন্ধু হয়ে উঠবে, খুব সহজে বিশ্বাস ভাজন হয়ে উঠবে খুব কম সময়ের মধ্যে। মানুষ যে কত তাড়াতাড়ি বিশ্বাস করে বসে তা তুই ভাবতেও পারবি না। এক মাসের মধ্যে যাকে তুই জানিসই না, সে তোর সবথেকে বড় বন্ধু হয়ে উঠতে পারে। শুধু তাকে জানতে হবে তুই কী ভালোবাসিস, কী পছন্দ করিস, তোর বিভিন্ন ডেটা পয়েন্ট। ব্যাস।

আরও কিছু কথা বলার পরে অনিলিখা হঠাৎ বলল, তা তুই ভারতে এরকম কিছু করতে চাস না?

চাই তো! ইনফ্যাক্ট আমরা ছোটখাটো কিছু কাজও করেছি। এখানে ইংল্যান্ডে ব্রেক্সিটেও তো আমরাই কাজ করেছি।

তবে ইংল্যান্ড আর ভারত তো আর একরকম নয়। অত বড় দেশ, কোটি কোটি মানুষের পারসোনালিটি প্রোফাইল তৈরি করা, তাদের বোঝা, তাদের মতামত ইনফ্লুয়েন্স করা সহজ কাজ নয়।

একটা কথাই বলব। আমার উপরে ব্যাপারটা ছেড়ে দে। আমরা আরও অনেক বড় টপ সিক্রেট ক্যাম্পেন করছি, যার কথা আমি আমার সবথেকে বড় বন্ধুকেও বলতে পারব না। ভারতীয়দের একটা বড় অংশ নিরক্ষর, বোকা। আসলে কী হচ্ছে তার খবর রাখে না। তুই যা বোঝাবি, তাই বুঝবে। তাই বিশ্বাস করবে। তাই ক্যাম্পেনের মাধ্যমে প্রভাবিত করা আরও সহজ কাজ।

অনিলিখা বলল, শোন। ব্যাপারটা খুব গোপনীয় রাখতে হবে। আমি একজনের সঙ্গে তোর আলাপ করাতে চাই। যে ব্যাপারটা নিয়ে বলছিলাম। পরবর্তী লোকসভা ইলেকশান নিয়ে একজন তোদেরকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করতে আগ্রহী। কিন্তু সে সরাসরি তোর সঙ্গে কথা বলতে চায় না। নিজের পরিচয়ও আপাতত দিতে চায় না। আমি কাল তোর সময় হলে, তোর সঙ্গে মিটিং রাখতে পারি। অবশ্য তোর সময় হলে।

টাকার অংকটা ভালো হলে, সময় ঠিক হয়ে যাবে। আমাকে সময় আর ঠিকানা এই দুটো শুধু মেসেজ করে দিস।

অবশ্যই।

আরও কিছু কথার পরে অনিলিখা বেরিয়ে এল।

একেই বলে যোগাযোগ। মাঝে মধ্যে মনে হয় সত্যি কেউ যেন আড়ালে থেকে আমাদের খেলা দেখছে। তা না হলে এত কেসের মধ্যে হঠাৎ সাফিনের ছবিটা কামরান অনিলিখার সামনে তুলে ধরে!

প্রশ্ন সাফিন সবার কাছে এত দরকারী হয়ে পড়েছিল কেন? এমন কী হয়েছিল যে তার জন্য বন্ধু খোঁজার দরকার হয়েছিল। তার পারসোনালিটি প্রোফাইল বিশ্লেষণ করে দেখার দরকার পড়েছিল। নিশ্চয়ই সাফিন এমন একটা বিশাল বড় ষড়যন্ত্রের মধ্যে জড়িয়ে গিয়েছিল, যার মাত্রা আন্দাজ করাও শক্ত।

কিন্তু সেটা কী? অনিলিখা বুঝল আসল রহস্যের যতটা কাছে, ঠিক ততটাই দূরে এখনও ও। এটা কি এফ বি আই থেকে করেছিল যাতে ওর সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা যায়? কিন্তু সেটা করার দরকার একটা সরকারি এজেন্সির হবে কেন?

বেশ খানিকক্ষণ এসব ভাবতে ভাবতে হাঁটতে গিয়ে ও আন্ডারগ্রাউন্ড স্টেশনটা পিছনে ফেলে এসেছিল। শেষে বাসস্ট্যান্ড থেকে একটা বাসই নিয়ে নিল। হাঁটা আর নিরাপদ নয়, কারণ কামরানের বাড়ি থেকে বেরোনোর পর থেকেই একটা কালো আফ্রিকান লোক ওর পিছু নিয়েছিল। লন্ডনে বর্তমানে ছুরিকাঘাত অনেক বেড়ে গেছে। কামরান যেরকম কাজ করে তাতে ওর বাড়িতে যারা আসে যায়, তাদের ফলো করাটাই স্বাভাবিক।

২১

সাফিন কি কিছু জেনে গিয়েছিল?

এই রেস্টুরেন্টের কথা তো জানতাম না। ছোট, কিন্তু বেশ ভালো। চারদিক সতর্ক নজরে একবার দেখে নিয়ে বলল কামরান। একটু বেশি অন্ধকার। অনিলিখার সঙ্গে রেস্টুরেন্টে ঢুকেই বলে উঠল কামরান।

আজ কামরান সাদা শার্টের উপরে একটা দামি ব্লেজার পরে এসেছে। হাতে একটা ছোট আই প্যাড। বোঝাই যাচ্ছে একদম বিজনেস মিটিং-এর জন্য প্রস্তুত।

হ্যাঁ, ভালো স্প্যানিশ টাপাস রেস্টুরেন্ট লন্ডনে খুব বেশি নেই। ভাবলাম তোর এটা ভালো লাগবে। তাছাড়া সব জায়গায় তো এসব কথা বলা যায় না।

না , গুড চয়েস। সেটাই বলছি। তা অন্যজন কখন আসবে?

ওই তো এসে পড়েছে। মাইক ঠিক সেই সময় ভেতরে ঢুকছিল। অনিলিখা দেখাতেই কামরান বলল, আমি ভেবেছিলাম ভারতীয় কেউ হবে।

টেবিলে মাইক ইতিমধ্যে এসে বসতেই অনিলিখা বলল, মাইক এ বিষয়ে আমার ক্লায়েন্টকে রিপ্রেসেন্ট করবে। তোর সম্বন্ধে ক্লায়েন্ট এখনই খুব ভালো করে না জেনে সরাসরি কথা বলতে চায় না।

মাইক নিজের আসল পরিচয় না দিয়ে অন্য একটা পরিচয় দিল।

কিছু খাবার আইটেম সিলেক্ট করার পরে আসল কথা বলতে শুরু করল অনিলিখা।

কামরানকে জিগ্যেস করলো, তুই কি আমেরিকা, ইরান আর সৌদির পারস্পরিক সম্পর্ক ও রাজনীতির উপরে কিছু কাজ করছিস?

কাঁটা-চামচ দিয়ে মুখে একটা পর্কের টুকরো মুখে ঢোকাচ্ছিল কামরান। আবার নামিয়ে রাখল কামরান। পাথরের দৃষ্টিতে অনিলিখার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল। কামরানের মধ্যে যে একটা আদিম হিংস্রতা লুকিয়ে আছে, তা ওই দৃষ্টি দেখলেই বোঝা যায়।

আবার কাঁটা-চামচটা মুখে নিয়ে খানিকটা খেয়ে ফের বলল, তোর তাতে কী দরকার?

আসলে এধরনের কাজের অভিজ্ঞতা না থাকলে তো এরকম বড় কাজ দেওয়া যায় না। দেশটাকে ছোট ছোট ভাগে ভেঙে ফেলতে হবে। বিভেদ না বাড়ালে পাওয়ারে আসা যায় না, তাই না? ভোটের রাজনীতি মানেই তো বিভেদের রাজনীতি।

এতক্ষণে যেন একটু স্বাভাবিক হল কামরান। ইরান আর সৌদির ব্যাপারটা নিয়ে ইচ্ছে করেই আন্দাজে ঢিল ছুড়েছিল কামরানের প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য।

অনিলিখা শুধু শুধু একঘণ্টা গতকাল ওখানে নষ্ট করেনি। ওই সময়ে ড্রয়িংরুমের পাশের লাইব্রেরিতে ঢুঁ মেরেছিল। কী কী ম্যাগাজিন আছে, কোন কোন দেশের কাগজ রাখা আছে, সবই দেখেছিল। তাতে এটা নিশ্চিত হয়েছে যে ইরান ও আমেরিকার মধ্যে উত্তেজনা বাড়ানোর পিছনে ওর একটা সরাসরি ভূমিকা আছে।

তা না হলে তেলের দাম, এ সব দেশের রাষ্ট্রনায়কদের রাখা বিবৃতি, গত দু'বছরের ছোটখাটো প্রত্যেকটা ঘটনা এত সুন্দরভাবে হাইলাইট করে পড়াশোনা করবে কেন কামরান। এত বই-ই বা থাকবে কেন ওই সব বিষয়ের উপরে।

খানিকক্ষণ বাদে উত্তর এল।

হ্যাঁ, আমার এজেন্সির এব্যাপারে কিছুটা ইনভলভমেন্ট আছে। আমরা ওই তিনটে দেশের জনমতের উপরে কিছু সার্ভে করেছি। জনমত বোঝার চেষ্টা করেছি। কোন ইস্যুগুলোর উপরে ক্যাম্পেন চালানো যায়, তা নিয়ে ভেবেছি।

শুধু তাই নয়, জনমত তৈরিও করেছিস, বেশ কিছু মিথ্যে খবর ছড়িয়েছিস যাতে বিশেষ করে ইরান আর আমেরিকার মধ্যে টেনশন তৈরি হয়, সম্পর্কের আরও অবনতি হয়, তাই তো? কয়েকদিন আগে ইরানে যে অয়েল ট্যাঙ্কারটা আটকে রাখা হয়েছে, সেটাও তো তারই প্রভাব। তাই না?

এ ব্যাপারে আমি কোনও কথা বলতে চাই না। তবে হ্যাঁ, ভারতের জন্য আমরা ঠিক একইরকম কাজ করতে পারি। বিভেদ বাড়াতে পারি। বিক্ষোভ বাড়াতে পারি। অশান্তির আগুনও ছড়িয়ে দিতে পারি।

অনিলিখা এবারে কামরানের চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, সাফিনকে তুই কতটা জানিস?

যেন ইলেক্ট্রিক শক খেয়ে চমকে উঠল কামরান। চোখটা ক্ষুধার্ত বাঘের মতো জ্বলে উঠল। চারদিক একবার তাকিয়ে নিয়ে ঘসঘসে গলায় বলল, সাফিন? হঠাৎ করে সাফিন?

একটু থেমে চাপা গলায় ফের গর্জে উঠল, আমার সঙ্গে কোনও চালাকি করলে বেঁচে ফিরতে পারবি না, অনিলিখা। এই এখান থেকে বেরোনোর দশ মিনিটের মধ্যে তোর ডেডবডি রাস্তায় পড়ে থাকবে। এমন ভাবে দেহ বিকৃত হয়ে পড়ে থাকবে যে তোর আত্মীয় পরিজনও চিনতে পারবে না। আমাকে এখানে ডেকেছিস কেন?

কিছুই না। আমি সাফিন সম্বন্ধে আরেকটু জানতে চাই। সাফিন কী ক্ষতি করেছিল যে ওকে টেররিস্ট হিসেবে সাজাতে হল সবার সামনে? উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বন্ধুত্ব স্থাপন করে ওর বাড়িতে এক সন্ত্রাসবাদীর মাধ্যমে বোমার সব সরঞ্জাম পৌঁছে দিতে হল যাতে ওর উপরে পুরো দোষটা গিয়ে পড়ে। উদ্দেশ্যটা আমি বলে দিচ্ছি। একদিকে আসল সন্ত্রাসবাদী যাকে এফ বি আই খুঁজছে, তাকে বাঁচানো, আইনের নজর থেকে আড়াল করা। ওরা ভাববে যে তাকে ধরে ফেলেছে। একই ইমেইল আইডি থেকে ইমেইল এসেছে। একই রকম কর্মপদ্ধতি। একই উদ্দেশ্য। দুই, সেটা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এমন কিছু সাফিন জেনে ফেলেছিল যা জানার সঙ্গে সঙ্গে ও বাঁচার অধিকার হারিয়েছিল। এমন কিছু যা ছিল অত্যন্ত গোপনীয়। ওর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সেই সাংঘাতিক ষড়যন্ত্রটা সম্বন্ধে আর কেউ জানতে পারবে না। এটাই বোধহয় প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, তাই না।

মুহূর্তে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল কামরান। অনিলিখার দিকে আঙুল তুলে বলল, ইউ আর ডেড। তুই খুব বড় ভুল করে ফেলেছিস অনিলিখা। এটা লুডো খেলা নয়। আমার সঙ্গে এরকম যে করে তার অস্তিত্ব থাকে না।

আরও হয়তো কিছু বলত কামরান। কিন্তু ঘাড়ের কাছে একটা ধাতব ঠান্ডা স্পর্শ অনুভব করে থেমে গেল।

কামরান ঘাড় ঘুরতেই খেয়াল করল যে দুজন ওয়েটারবেশী এজেন্ট বন্দুক নিয়ে ওর দিকে নিশানা করে অপেক্ষা করছে। ফের ঘুরে অন্যদিকে তাকাতেই দেখল মাইক টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। ওর দিকে বন্দুক নিয়ে নিশানা করে আছে।

মাইক আস্তে করে ইঙ্গিত করল ওকে ফের বসে যেতে।

কামরানের মুখ মুহূর্তে ভয়ে বিহ্বল হয়ে উঠল। বিস্ফারিত চোখে ফের চেয়ারে বসে পড়ল।

অন্য দুজন এসে ততক্ষণে ওর হাতে কড়া পড়িয়ে দিয়েছে।

শান্ত ভাবে অনিলিখা বলল,—এই রেস্টুরেন্টে আমরা সবাই প্রথম এলাম। তোকে জামাই আদর করার জন্যই এটা আমরাই বানিয়েছি। এমনিতেও এরা বুঝে উঠতে পারছিল না ব্রেক্সিট-এর পিছনে কে আছে। কে এখানকার ভোটারদের ডেটা প্রাইভাসি রাইট উল্লঙ্ঘন করে তার উপর নির্ভর করে ভুল তথ্য ছড়িয়ে, ক্যাম্পেন চালিয়ে এভাবে ব্রেক্সিট-এর সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করেছে। এটুকু বুঝতে পারছিল যে বড় কয়েকজন রাজনীতিবিদ কাউকে আড়াল করতে চাইছে। কিন্তু সে যে কে সেটা সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পারছিল না।

একটু থেমে অনিলিখা ফের বলল, আমি কিন্তু এখনও উত্তর পাইনি আমার প্রশ্নের। সাফিনকে সন্ত্রাসবাদী সাজানো হয়েছিল কেন?

কামরানের চোখ রাগে লাল হয়ে গেছে। ফের ঘসঘসে গলায় অনিলিখাকে উল্লেখ করে বলল, আমার কী লেভেলের কানেকশন আছে, তা তোর জানা নেই অনিলিখা। শুধু তোকে নয়, তোর দেশটার সর্বনাশ করে দেব। এমনিতেও কাশ্মীর নিয়ে আমি কিছু কাজ করছি। দেখব ওটাকে ভারতের মধ্যে রাখিস কীভাবে!

দু'মাস তারমধ্যেই ওখানে লক্ষ লক্ষ জিহাদী তৈরি করব। তারা শুধু কাশ্মীর নয়, সারা দেশে ছড়িয়ে পড়বে। তোর ভারতকে টুকরো টুকরো করে দেব তোর দেহর মতো। দেখি তুই আটকাস কীভাবে। অনিলিখাকে লক্ষ্য করে থুথু ফেলল কামরান।

সঙ্গে সঙ্গে মাইকের একটা জোর থাপ্পড় গালে পড়তেই চেয়ার শুদ্ধু উল্টে পড়ল কামরান।

চেয়ারশুদ্ধু ওকে আবার টেনে তোলা হল।

মাইক বলল, এটা কিন্তু আর রেস্টুরেন্ট নয়। MI 6-এর ইন্টারোগেশন চেম্বার। এখানে আমাদের কারুর ফোনেরও এখন নেটওয়ার্ক নেই। চাইলেও কেউ আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবে না। মেরে এমনভাবে বডি উধাও করে দেব যে-কোনও দেশের প্রধানমন্ত্রী বা প্রেসিডেন্টও খোঁজ পাবে না। এদেশের প্রধানমন্ত্রীও না। এরকম বেশ কিছু কাজ আমরা প্রতি মাসেই করে থাকি। কী নাম যেন, কামরান বা অ্যান্ডি রবার্টসের একমাত্র স্মৃতি চিহ্ন, একটা ছবি শুধু আমাদের একটা গোপনীয় ফাইলে থেকে যাবে।

অনিলিখা ইস্পাত কঠিন শীতলতার সঙ্গে বলে উঠল, আমি এমনিতেও

যারা নাম ভাঁড়িয়ে পরিচয় পরিবর্তন করে অন্য পরিচয় ব্যবহার করে, তাদের বিশ্বাস বা ভয় কোনটাই করি না।

বলে নিজের ভারতীয় পাসপোর্টটা টেবিলের উপরে রেখে বলল, আমার নাম আজও অনিলিখা। আমি ভারতীয়। আমি বাঙালি। আমি হিন্দু। এটাই আমার পরিচয়। একই সঙ্গে আমি অন্য পরিচয়ের মানুষদেরও একইরকম শ্রদ্ধা করি। মনে রাখি আমার পরিচয় যেন কারুর সঙ্গে দূরত্ব না তৈরি করে, আমি যেন কখনও অন্য কোনও পরিচয়ের মানুষকে এ জন্য সামান্যতম আঘাত না করি। সেটা যখনই করবে, তখনই জানব যে আমি ভুল পরিচয়ের পিছনে ছুটছি। আর ভারতকে টুকরো করা কখনই সম্ভব হবে না। আমরা সবাইকে আপন করতে জানি। যুগ যুগ ধরে আমরা সব বহিরাগতকেও আপনার করে নিয়েছি। জানি জঙ্গীদের থেকে কীভাবে নিজেকে রক্ষা করতে হবে। আমাদের ভেতরের অন্তরের বাঁধন এতটাই শক্তিশালী যে তাকে অপপ্রচার চালিয়ে দুর্বল করে ফেলা যায় না। আমরা আমাদের ভূখণ্ডে পাকিস্তানের মতো ৬৪টা টেররিস্ট গ্রুপ তৈরি করি না যাদের কাজ শুধু অন্য দেশের নিরীহ মানুষদের সর্বনাশ করা। কিন্তু আমরা জানি আমাদের মানুষদের কীভাবে রক্ষা করতে হবে।

পাশ থেকে মাইক বলে উঠল, এ জন্যই আমরা সবাই তোমাকে সম্মান করি অনিলিখা। তাদেরকে আমরা সন্দেহ করি যারা নিজেদের পরিচয় খুব তাড়াতাড়ি ভুলে অন্যদের মতো হওয়ার চেষ্টা করে।

অনিলিখা ফের কামরানকে উদ্দেশ্য করে বলল, এখনও উত্তর পেলাম না। সাফিনকে কেন টার্গেট করেছিলে? আমি এখনই উত্তরটা জানতে চাই।

এতক্ষণে বাঘের চেহারার থেকে শেয়ালের চেহারায় রূপান্তর হয়েছে কামরানের।

কাঁদোকাঁদো গলায় বলল, আমি এসব শুধু টাকার জন্য করি। এটুকু জানি যে সাফিন একটা বিশেষ প্রোগ্রামের কথা জেনে গিয়েছিল, সে প্রোগ্রাম সম্বন্ধে খোঁজখবর শুরু করেছিল। তাই সেটা যাতে জানাজানি না হয় সেজন্য আমাকে বলা হয়েছিল শুধু বিশেষ একজনকে তৈরি করে দিতে যাতে সে খুব সহজে সাফিনের সঙ্গে মিশতে পারে। ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে পারে। ওর সম্পূর্ণ বিশ্বাস পেতে পারে। সে জন্যই ওর স্বভাব, সাইকোলজিকাল প্রোফাইল আমাকে বুঝতে হয়েছিল।

এতে আব্দুল মজিদও তো সঙ্গে ছিল, তাই তো?

হ্যাঁ, ওই প্রথম সাফিনের কথা আমাকে বলেছিল। ওর জন্যেই তো এটা সহজে করা সম্ভব হয়েছিল।

যাকে তৈরি করেছিলে সেই তো সাফিনকে বিপদে ফেলেছিল। ওর বাড়িতে

বসে বোমা তৈরির সরঞ্জামের অর্ডার, ওর ঠিকানা ব্যবহার করা ইত্যাদি। তার নাম কী?

আমি বলতে পারব না। আমি এর বাইরে কিচ্ছু জানি না। এটুকু শুধু জানি এর পিছনে খুব বড় কোনও শক্তি আছে।

অনিলিখা মাইককে একটু আড়ালে ডেকে বলল, আমার সামনে ওকে মারধোর দেওয়ার দরকার নেই। আমি নিশ্চিত ও সেই আসল সন্ত্রাসবাদীর নাম, পরিচয় জানে। হয়তো এখনও সে লোকটা কোথাও ওই বোমা বিস্ফোরণের প্ল্যান করছে। আমি নিশ্চিত তোমরা খানিকক্ষণের মধ্যেই সে ডিটেলস পেয়ে যাবে ওর কাছ থেকে। তবে আমার সন্দেহ আছে ও অন্য বিষয়টা জানে কিনা। সেটা আরও অনেক বড় মাপের কিছু।

সাফিন অন্য যে প্রোগ্রামটার কথা জানতে পেরে গিয়েছিল, তাই তো?

হ্যাঁ, ঠিক তাই। আমার ধারণা তার মূলে আছে 'ইখফা'। ওর সব কম্পিউটার, নোটস খুঁটিয়ে দেখা উচিত। ওকে জিজ্ঞাসা করা উচিত। ওটাই আসল রহস্য। তোমাদের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এফ বি আই আর এন এস এ-র সঙ্গে যোগাযোগ করে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। তোমরা তো আগেও অনেক জায়গাতে একসঙ্গে কাজ করেছ।

হ্যাঁ, আমি ওদের কিছু লোককে ভালো করে চিনি। তুমি যে লোকটা মানে JTTF এজেন্টের কথা বললে, তাকেও ভালো করে চিনি। একটু বোকা, বলে হেসে উঠল মাইক। তোমার সঙ্গে তুলনা করছি আর কী!

অনিলিখা ফের বলল, আমাদের মনে রাখতে হবে সাফিন কিন্তু সাইবার সিকিউরিটি এক্সপার্ট। এজন্যই আমি এন এস এ-এর সাইবার সিকিউরিটি এক্সপার্টদের সাহায্য চাইছি। আমাকে হয়তো ওরা সব ডকুমেন্টে অ্যাক্সেস দেবে না। তা না হলে আমিও কিছুটা সাহায্য করতে পারতাম।

তোমার মনে হয় কী হয়েছে?

আমার ধারণা সাফিন কোনও একটা ম্যালওয়ার প্রোগ্রাম খুঁজে পেয়েছিল, যার নাম 'ইখফা'। সেটা যে কী তা আমরা কেউ জানি না, শুধু এটুকু জানি যে সেটা একটা অ্যারাবিক শব্দ। ও নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিল যে এর সঙ্গে কোনও বড় ধরনের বিপর্যয়ের সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে। ও তখন—একটু থামল অনিলিখা—

ও মাই-গড। এত বড় যোগাযোগটা তো আগে মাথায় আসেনি। আব্দুল মজিদ আসলে আরবের লোক। আমি বা তুমি হলে কী করতাম, বন্ধুকে বলতাম, বিশেষ করে যদি জানতাম যে সে ওই ভাষা ভালো করে জানে। ওই শব্দের অর্থ সে জানবে। ও নির্ঘাত তাই করেছিল। আব্দুল মজিদকে জিগ্যেস করেছিল।

আব্দুল মজিদ এর অর্থ বুঝেছিল। ওই নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে অন্যদের জানায় ও পুরো বিষয়টার তাৎপর্য বুঝে সাফিনকে ষড়যন্ত্রের শিকার করে। ইমিডিয়েটলি আব্দুল মজিদকেও অ্যারেস্ট করে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে।

আর একে?

একে তোমার সতীর্থদের উপরে ছেড়ে দাও। এর থেকে ওই হবে আমাদের প্রধান লক্ষ্য। আমার মনে হয় আব্দুল মজিদ আরও অনেক কিছু জানে। আসল রহস্যটা খুঁজে বার করতে হবে।

২২। একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ বন্দর চলে যাচ্ছে চীনের নিয়ন্ত্রণে

লন্ডনের টাওয়ার ব্রিজের পাশেই টমসন রয়টার্সের অফিস। সেই আকাশচুম্বী বিল্ডিংয়ের দেওয়ালে লাগানো বিশাল টিভি স্ক্রিনে ব্রেকিং নিউজগুলো সমানে একের পর এক ঘুরে ঘুরে আসে। একটা লাইন দেখিয়ে আবার পরের খবরে চলে যায়।

ক্যানারি হোয়ারফ আন্ডারগ্রাউন্ড স্টেশন বেরিয়ে ওই স্ক্রিনে কী যেন দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল অনিলিখা। জীবুতির মূল বন্দরের দায়িত্ব চীনের ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দিচ্ছে জীবুতি সরকার। খবরটা হয়তো আলাদাভাবে তেমন কিছু নয়।

২০১৭ সালে আফ্রিকার জীবুতিতে চীন একটা মিলিটারি বেস তৈরি করেছে। জীবুতির এই বন্দর রেড সি ও সুয়েজ ক্যানেলের খুব কাছে। খুব গুরুত্বপূর্ণ এই অবস্থান যার মাধ্যমে ভবিষ্যতে সি রুট নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। যুদ্ধজাহাজ হোক, কী ব্যবসার জন্য জাহাজ চলাচল—তার জন্য ট্রেডিং রুটের উপরে বড় প্রভাব ফেলতে পারে চীনের এই নিয়ন্ত্রণ। এতটাই গুরুত্বপূর্ণ এই বন্দরের অবস্থান।

ম্যাম, ডু ইউ নিড এনি হেল্প? একজন পুলিশ এগিয়ে এসে অনিলিখাকে জিগ্যেস করল।

আসলে ওই খবরটা দেখে অনিলিখা প্রায় বড় রাস্তার মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়েছিল।

একটু লজ্জিত হয়ে 'না, আমি দুঃখিত' বলে রাস্তা থেকে সরে এল অনিলিখা।

কয়েক বছর আগে শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট মাহিন্দ্রা রাজাপক্ষ-এর সঙ্গে চীনের খুব ভালো সম্পর্ক ছিল। সে সময় ২০১০ সালে শ্রীলঙ্কার হ্যামবানটোটায় বন্দর

তৈরি করার জন্য শ্রীলঙ্কা সরকারকে অনেক ঋণ দেয় চীন। শ্রীলঙ্কার দক্ষিণতম প্রান্তে। বিশ্বের সব থেকে ব্যস্ত সি রুটের থেকে কয়েক মাইল দূরত্বে এই বন্দর। কিন্তু সে ঋণ শোধ না করতে পারায় ২০১৭ সালে সেই বন্দর ৯৯ বছরের জন্য লিজে নিয়ে নেয় চীনের ব্যবসায়ীরা। বলতে গেলে সেই বন্দর চলে আসে চীন সরকারের অধীনে। অর্থাৎ সেই বন্দরের মাধ্যমে ভারত মহাসাগরের উপরে জাহাজের চলাচলের পথে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ পাবে চীন। কলম্বো বন্দরেও একই জিনিস হতে চলেছে।

একই ঘটনা ঘটেছে শুধু শ্রীলঙ্কায় নয়, বিভিন্ন দেশে। এরকম বন্দর, ট্রান্সপোর্ট হাব তৈরি করার জন্য আগ্রহের সঙ্গে অন্য কিছু দেশকে অনেক অনুদান দিয়েছে চীন। যাদের দিয়েছে তাদের বেশিরভাগেরই আর্থিক অবস্থা ভালো নয়। বলা যায় সঙ্গীন। এরা কেউই এই ঋণ কোনওদিন শোধ করতে পারবে না।

ঠিক যেরকম হ্যামবানটোটায় হয়েছিল। শেষে শুধু ওই বন্দর নয়, তার আশেপাশের অনেক জায়গা চীনের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হয় শ্রীলঙ্কা। সে জন্যই ওখানে এখন চীনের মিলিটারি বেস তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। ম্যালেশিয়ার কোয়ান্টান, পাকিস্তানের গোয়াডার মতো সব গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় চীন বন্দর তৈরি করছে। প্রায় বিনা সুদে ধার দিচ্ছে। খুব ভালো করে জানে এরা কোনওদিন এই ধার শোধ দিতে পারবে না। যখনই পারবে না, তখন এসব জায়গা চীনের অধিকারে চলে আসবে।

এ সব বন্দরই আছে বিশ্বের সব থেকে ব্যস্ত সি রুটের উপরে।

এর আড়ালে অন্য কিছু আছে কি? চীনের মতো আমেরিকা বিরোধী দেশগুলোর কি একসঙ্গে কিছু করতে চায় আগামীদিনে।

সিল্ক রুটের কথা মনে পড়ে গেল অনিলিখার। চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এই সিল্ক রুট দিয়ে সাতবার অভিযান করেছিল জেং হী। সে অভিযানগুলোকে মূলত বাণিজ্যিক ও শান্তি স্থাপনের কারণে বলা হলেও আসলে এর পিছনে ছিল চীনের আগ্রাসন নীতি। জেং হী-এর সঙ্গে থাকত সুসজ্জিত শক্তিশালী সামরিক বাহিনী। খানিকটা আমাদের অশ্বমেধ ঘোড়ার মতো। কার সাহস আছে সে ঘোড়া আটকানোর আটকে দেখাও। সামান্য কিছু হলেই যুদ্ধে যেতে ও ক্ষমতা প্রদর্শন করতে দ্বিধা করত না জেং হী-র বাহিনী।

কিন্তু সেই একই জিনিস কি ফের করতে চলেছে চীন? অনুদান ও সাহায্যের আড়ালে কি চীন বিশ্বময় তার নিজস্ব প্রভাব বিস্তার করছে, যাতে যে-কোনও সময় যুদ্ধ বাধলে সমুদ্রের জাহাজ চলাচলের উপরে তাদের পূর্ণ অধিকার থাকে। সেক্ষেত্রে সৈন্যবাহিনীর চলাচল, গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধসামগ্রীর আদান প্রদান সব কিছুর উপরে চীনের কন্ট্রোল থাকবে। ভবিষ্যতে গ্যাস বা তেলের পাইপলাইন তৈরি করতেও ওদের সুবিধে হবে। অন্যদের যুদ্ধজাহাজকেও ওরা

থামিয়ে দিতে পারবে। তাহলে কি ওরা আসন্ন কোনও যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে? এ সব কী কোনও তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের অশনি সংকেত?

চিন্তায় বাধা এল। দূর থেকে একজন এগিয়ে আসছে অনিলিখার দিকে।

২৩। গালফ অফ ওমানের শিপিংরুট বন্ধ— যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি

খানিকবাদে ফোন এল। মাইকের। অনিলিখা তখনও পথে। হোটেল পৌঁছোয়নি।

অনিলিখা, আব্দুল মজিদকে প্রশ্ন করা নিয়ে একটা টেকনিক্যাল অসুবিধে হচ্ছে। এফ বি আই আমাদের সঙ্গে এ তদন্ত একসঙ্গে এখনই করতে চায় না। এটা ওদের সম্পূর্ণ নিজস্ব ব্যাপার বলছে। ওদেরকে যতটা সম্ভব বলেছি। ওরা বিবেচনা করে দেখবে। আমরা একজন আমেরিকান নাগরিককে সব নিয়ম ভেঙে হঠাৎ করে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারি না। বিশেষ করে ও যখন ওখানেই আছে। আপাতত আমাদের খুব বেশি কিছু করার নেই।

তা আমরা কি সাফিনের সঙ্গে কথা বলতে পারব?

না, সেটারও বিশেষ আশা নেই এখনই।

কিন্তু এ দুটোই আমাদের ইমিডিয়েটলি করা দরকার। একটা অন্য উপায় আছে। তুমি ওদের প্রেসিডেন্টের অফিসের মাধ্যমে ওদের উপর চাপ দাও।

ওদের সঙ্গে কথা বলা তো আরও শক্ত। ওরাই বা শুনবে কেন?

কিছুই না, বলো যে অ্যান্ডিকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। আমেরিকার গত ইলেকশনে ওর ওই 'সেল ইওর ড্রিম' সংস্থার কী প্রভাব ছিল তা নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। ব্যাস, ওদের প্রতিক্রিয়া দেখো। তারপর এই কেসটায় এক্ষুনি সম্পূর্ণ সহযোগিতা যেন করে তা করতে বলো।

গুড আইডিয়া। জানি আগুন নিয়ে খেলা। তবু এখনই জানাচ্ছি। ওদের দিক থেকে কী রেসপন্স আসে বুঝে তোমার সঙ্গে কাল কথা বলব।

অনিলিখা আর ওখানে দাঁড়ায়নি। হোটেলে চলে আসে।

ফিরে এসে খানিকবাদে টিভি চালায়।

ব্রেকিং নিউজ দেখাচ্ছে। একজন আমেরিকান দম্পতিকে ইরানের তেহেরানে আটক করা হয়েছে স্পাই হিসেবে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বলেছেন একদিনের মধ্যে ওদের না ছাড়া হলে ইরানের এক্সপোর্টের উপর আরও কড়া নিষেধাজ্ঞা জারি করা হবে। খানিকআগে আবার টুইট করেছেন যে যদি ওদেরকে কালকের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া না হয়, তাহলে আমেরিকা ইরানের উপরে এয়ার স্ট্রাইক করবে।

যাবতীয় প্রাণদায়ী ওষুধ যেটা এতদিন নিষেধাজ্ঞার বাইরে ছিল, তাও নিষিদ্ধ করে দেওয়া হবে কাল থেকে। অর্থাৎ কোনও দেশ এ সব ওষুধ ইরানকে পাঠাতে পারবে না। এর মারাত্মক ফল হতে পারে।

অন্যদিকে ব্রিটেনের যে তেলের ট্যাঙ্কার ইরানের জলসীমায় ঢুকে পড়ার জন্য আটকে পড়েছিল, তার মধ্যে থেকে ক্যাপ্টেনকে নামিয়ে নিয়ে অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তার সঙ্গে ওই জাহাজের বাকিদের সঙ্গেও আর যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। ব্রিটেনের ফরেন অফিস এ ব্যাপারে ইরানকে চরম হুঁশিয়ারি দিয়েছে।

অন্যদিকে গালফ অফ ওমানের শিপিং রুট ইরান সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিয়েছে। এখান দিয়ে বিশ্বের ৩০ শতাংশ তেল সরবরাহ হয়। এর ফলস্বরূপ তেলের দাম খুব বেড়ে গেছে।

ইরানের সবথেকে শক্তিশালী নেতা হল ওদের ধর্মীয় নেতা। তারই অধীনে ওখানকার আর্মি, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, সব কিছু। প্রেসিডেন্ট-এর পজিশনও দেশের এই সুপ্রিম লিডারের পরেই। প্রেসিডেন্টকে ভোট দিয়ে নির্বাচন করা হয়। ইরানের মূল রোজগার এই তেল আর গ্যাস বিক্রি করে। সেটা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ইরানে ইতিমধ্যে খাবারের দাম অনেক বেড়ে গেছে।

'অ্যাল জাজিরা' চ্যানেলে খবর দেখতে শুরু করল অনিলিখা। বিভিন্ন চ্যানেলে একই খবর, তবে তার ভার্সানটা একটু আলাদা। অ্যাল জাজিরা সৌদি আরবে নিষিদ্ধ। এটা কাতারের অধিকৃত টিভি চ্যানেল। কাতার ইরানের বন্ধু। তাই একটু অন্য রকমভাবে খবরগুলো পাওয়া যায়, একটু অন্য লেন্স থেকে দেখা। সেখানে দেখাচ্ছে ইরানের রাস্তায় হাজার হাজার লোক আমেরিকার পতাকা পোড়াচ্ছে।

অনিলিখার মন বলছে কিছু একটা হতে চলেছে। যেন অনেকগুলো ঘটনার সমাপতন হচ্ছে কারুর ইচ্ছে মতো। জিগ-স পাজলের বিভিন্ন পিসগুলো এক সঙ্গে আসতে চলেছে।

হঠাৎ এর মধ্যে ফোন এল।

মাইকের ফোন, উচ্ছ্বাসিত হয়ে বলতে শুরু করল, তোমার ট্যাকটিক্স কাজ করেছে ম্যাজিকের মতো। এখনই ফোন পেলাম। ওরা আমাদের সঙ্গে কাজ করতে রাজি। একই সঙ্গে তোমার কথা মতো NSA এখনই সাফিনকে প্রশ্ন করবে 'ইখফা'র উপরে। ও কিছু জানে কিনা। তুমি কি একটু আমাদের দপ্তরে চলে আসতে পারবে? এখনই। তোমার হোটেলের বাইরে গাড়ি পাঁচ মিনিট বাদে দাঁড়িয়ে থাকবে।

হ্যাঁ, এখনই যাচ্ছি।

ঠিক পাঁচ মিনিটের মধ্যে রেডি হয়ে নীচে নেমে এল অনিলিখা। হোটেলের বাইরে শুধু তিন ডিজিটের বিশেষ নাম্বার প্লেটের ল্যান্ডরোভার গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে।

২৪। আব্দুল মজিদের সুইসাইড। দুপুর বারোটা

দেখতে দেখতে চোদ্দ ঘণ্টা কেটে গেছে। অনিলিখা, মাইক, MI 6-এর যারা এ তদন্তের সঙ্গে যুক্ত ছিল, তারা কেউ রাতে ঘুমোয়নি। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে কাজ হয়েছে। কিছু কিছু সময়ে গোপনীয়তার কারণে অনিলিখাকে অবশ্য রুমের বাইরে যেতে হয়েছে। আলাদা আলাদা ছোট ছোট গ্রুপে কাজ হয়েছে।

একটা দুর্ঘটনা ইতিমধ্যে ঘটে গেছে। আব্দুল মজিদ সুইসাইড করেছে। একঘণ্টার মধ্যেই ওর বাড়ি পৌঁছে গিয়েছিল এফ বি আই-এর টিম। কিন্তু জেরা চলাকালীন তিন ঘণ্টা বাদে ও বাথরুম যেতে চায়।

বেরোচ্ছে না দেখে দরজা ভেঙে ঢুকে দেখে ও উপুড় হয়ে ওখানে পড়ে আছে। মনে হয় ওর কাছে পটাশিয়াম সায়ানাইডের ক্যাপসুল কোথাও লুকোনো ছিল।

ওর কাছ থেকে অনেক জেরার পরেও 'ইখফা'র সম্বন্ধে কিছু জানা যায়নি। তবে আব্দুল মজিদ স্বীকার করেছে যে ওর কাছেই প্রথম 'ইখফা'র কথা জানায় সাফিন, যার কথা ও আরেকজনকে জানায়।

তার নির্দেশেই সব কিছু সাজায় আব্দুল মজিদ। কিন্তু সেই ব্যক্তির নাম-পরিচয় ও কিছুতেই বলেনি। শুধু স্বীকার করেছে যে সাফিনকে বিপদে ফেলার মূলে প্রধান ভূমিকা ওর। সাফিনের বাড়িতে ও মাঝে মধ্যেই যেত। তারই সুযোগ নিয়ে ও আরেকজনকে সাফিনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয় যে কিছুদিনের মধ্যেই সাফিনের বাড়িতে নিয়মিত যাতায়াত শুরু করে। তার সঙ্গে আলকায়দার যোগ ছিল। বোমা তৈরির সব সরঞ্জাম এসে যাওয়ার পরে সে কিছু জিনিস নিয়ে চলে যায়। পরবর্তীকালে সে বোমা প্রায় তৈরি করে ফেলেছিল।

আব্দুল মজিদ মারা গেলেও সেই সন্ত্রাসবাদীকে চিহ্নিত করতে পেরেছে পুলিশ। ভোরবেলায় তার বাড়িতে হামলা চালিয়ে তাকে তুলে এনেছে।

কিন্তু 'ইখফা' সম্বন্ধে কিছু জানা যায়নি ওর কাছ থেকে।

অন্য দিকে একটা অন্য টিম সাফিনের সঙ্গে কথা বলা শুরু করেছে। কিন্তু সাফিন কীরকম একটা ঘোরের মধ্যে আছে। মাঝেমধ্যে অতীত, বর্তমান সব যেন কেমন গুলিয়ে ফেলছে। কোনটা আসল স্মৃতি, কোনটা নকল স্মৃতি— সেসব নিয়েও ওর মধ্যে একটা ভ্রম তৈরি হয়েছে। মাঝে মধ্যে এক ঘটনা থেকে

হঠাৎ করে অন্য ঘটনায় চলে যাচ্ছে। হঠাৎ করে রবীন্দ্রনাথের কবিতা বলতে শুরু করছে।

তবু ওর কাছ থেকে ভোর পাঁচটা নাগাদ জানা যায় যে 'ইখফা' হল একটা ম্যালওয়ার বা ম্যালিসাস সফটওয়ার যা খুব সহজে ওয়াই ফাই নেটওয়ার্কে যুক্ত সব কম্পিউটারে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু তৎক্ষণাৎ কিছু করে না। নিষ্ক্রিয় হয়ে পরে থাকে।

ও সেই ম্যালওয়ারের কোড ডিকোড করতে গিয়ে বোঝে যে ওটা শুধু একটা বিশেষ কম্পিউটারকে খুঁজছে। যার মধ্যে ওই ম্যালওয়ার ঢুকতে পারলে, তবেই সেই ম্যালওয়ার সক্রিয় হয়ে উঠবে।

তার পরে সেটা একটা বিশেষ প্রোগ্রাম চালাবে ওই কম্পিউটার পরিচলিত একটা পি এল সি-তে। পি এল সি-র পুরো কথা হল প্রোগ্রামেবল লজিক কন্ট্রোলার যা বিভিন্ন মেশিন ও যন্ত্রের কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। খুব জটিল সেই প্রোগ্রামিং। কোনও দেশ সামরিক কারণেই এটা করে থাকতে পারে।

সে কম্পিউটারটা কোনটা সেটা সাফিন বুঝে উঠতে পারেনি।

সেটা বুঝতে না পারলেও ও এই প্রোগ্রামের পরের স্টেপগুলো বুঝতে পারে। কোনও একটা বিশেষ প্রোগ্রামেবল লজিক কন্ট্রোলারের কোড পরিবর্তন করার জন্য এটা লেখা হয়েছে।

এটা একটা বিশেষ ক্লক স্টার্ট করছে। একটা নির্দিষ্ট সংখ্যায় পৌঁছনোর পরে তা একের পর এক নির্দেশ দিতে শুরু করবে। সেই বিশেষ প্রোগ্রামেবল লজিক কন্ট্রোলারটা যে বিখ্যাত কোম্পানি সিমেন্সের সেটুকু ও বুঝতে পারে। কিন্তু যা বুঝতে পারেনি, তা হল ওই কম্পিউটারটা কোথায় আছে। ওই প্রোগ্রামেবল লজিক কন্ট্রোলারটা কোথায় লাগানো আছে!

হয়তো 'ইখফা' শব্দের মধ্যেই তার সন্ধান লুকিয়ে আছে। এ বিষয়টা সাফিন কথায় কথায় আব্দুলকে জানায়। আব্দুল মজিদ আশ্বস্ত করে ও এব্যাপারে কিছু জানতে পারলে জানাবে। আব্দুল বুঝেছিল যে ওর হাতে সময় নেই। ও আগে থেকেই সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে যুক্ত ছিল। তাই হয়ত খানিকক্ষণের মধ্যেই ওদের কোনও নেতার সঙ্গে কথা বলে বুঝতে পারে যে সাফিন যে প্রোগ্রামের কথা জানতে পেরে গেছে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোনওভাবে যেন সাফিন এফ বি আই-কে তা না জানায়। হয়তো এক-দুদিনের মধ্যেই সেটা ও জানানোর চেষ্টা করবে।

অন্যদিকে সাফিন জানত না যে শুধু মার্কেটিং এজেন্সি নয়, বেশ কিছু সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ ছিল আব্দুলের। সেটারই সুযোগ নেয় আব্দুল। যে সন্ত্রাসবাদী এফ বি আই-এর সন্দেহের তালিকায় ছিল, তার সঙ্গে সাফিনের আলাপ করিয়ে দেয়। সাফিনের সম্বন্ধে অনেক কিছু জানাই ছিল,

তাই তার পক্ষেও বন্ধুত্ব বাড়াতে সময় লাগেনি।

একই সঙ্গে আরেকটা জিনিস আব্দুল করে যাতে পুরো দোষটা সাফিনের উপরে চাপানোর কাজটা অনেক সহজ হয়ে যায়। আব্দুল ওদের সংস্থার আবিষ্কৃত এক ড্রাগের সাহায্য নেয় যা দিয়ে নকল মেমারি (যা আগে থেকে প্রোগ্রাম করা যায়) মনের মধ্যে স্মৃতি হিসেবে রেখে দেওয়া যায়। বলা যায় ভুল স্মৃতি তৈরি করা যায়। সাফিনকে যেদিন ধরা হয় সেদিন সন্ধেবেলাতে ওর বাড়িতে দুজন এসেছিল। তার মধ্যে একজন ওকে সেই ড্রাগ দেয়। আগেও দিয়ে থাকতে পারে। কিন্তু সে যাই হোক, সাফিনের মধ্যে এ বিশ্বাস গড়ে তোলা হয় যে ও নিজে এক সন্ত্রাসবাদী যে এসব কাজ করছে শুধু বোমা তৈরির জন্য।

এজন্য এফ বি আই-এর কাছে ও সহজেই সব কিছু স্বীকার করে নেয়। এরকম আরও কোনও কেস আছে কিনা তাই এখন দেখা হচ্ছে, যেখানে আসল অপরাধীকে আড়াল করার জন্য নিরীহ মানুষকে হয়তো অপরাধী সাজিয়ে সামনে তুলে ধরা হয়েছে।

একই সঙ্গে 'ইখফা'র রহস্য সমাধানে 'এফ বি আই'-এর আরেকটা টিম কাজ করছিল। তারা ভোর ছ'টায় সিমেন্সের সঙ্গে যোগাযোগ করে কোথায় ওই 'প্রোগ্রামেবল লজিক কন্ট্রোলার' বা পিএলসি লাগানো হয়েছে তা জানতে চেয়েছে। সিমেন্সের সারা বিশ্বে এরকম যত ইন্সস্টলেশন আছে, যেখানে যেখানে ব্যবহার হচ্ছে, তা সব দেখে ওই বিশেষ পিএলসি-টাকে খুঁজে বার করার চেষ্টা চলছে।

আপাতত কিছু জানা যায়নি।

অনিলিখা অত্যন্ত ক্লান্ত, কিন্তু ফিরে এসে এরকম দিনের বেলা আর ঘুম আসছিল না। আজ আর অফিস যাবে না। বাইরের বিশ্বে কী হচ্ছে দেখার জন্য টিভি চালাল অনিলিখা। ব্রেকিং নিউজ।

সেই ওয়েল ট্যাঙ্কারের ক্যাপ্টেনের মৃতদেহ পাওয়া গেছে। ব্রিটেন এ ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। ইরানের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেবে বলে নাম্বার টেন থেকে জানানো হয়েছে।

সৌদি আরব জানিয়েছে যে, তাদের কাছে তথ্য আছে যে ইরান একটা 'লং রেঞ্জ ব্যালিস্টিক মিশাইল' ছোড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে যেটা জেনেভা কনভেনশনের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে। মিড রেঞ্জ ছাড়া অন্য কোনও মিশাইল টেস্টও নিষিদ্ধ।

আমেরিকা সে প্রসঙ্গে জানিয়েছে যে, ইরান ওরকম কিছু করলে সঙ্গে সঙ্গে তেহেরানের উপর এয়ার স্ট্রাইক শুরু করবে। অর্থাৎ পুরো যুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে।

হঠাৎ অনিলিখার মনে হল ও খানিকটা বুঝতে পেরেছে কী হতে চলেছে। ছুটে গিয়ে ফোন করল মাইককে।

মাইক, আমার মনে হয় আমি আন্দাজ করতে পারছি কী আছে ওই ম্যালওয়ারে। আমার মনে হচ্ছে ওই পিএলসি ইরানের কোনও নিউক্লিয়ার রিয়াক্টরের কন্ট্রোল সেন্টারকে নিয়ন্ত্রণ করে। অথবা ইরানের কোনও লং রেঞ্জ ব্যালিস্টিক মিসাইল লঞ্চ করে। ওই ম্যালওয়ারটা তৈরি করা হয়েছে যাতে এভাবে পিএলসির কোড পরিবর্তন করে এমন কিছু কাণ্ড ঘটনা ঘটানো যায়, যাতে বিশ্ব রাজনীতিতে ইরান আরও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। একই সঙ্গে তা কিন্তু তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি করবে। ইরানের সঙ্গে চীনের সম্পর্ক বেশ ভালো। চীন ইরানের তেলের প্রধান ক্রেতা। হয়তো রাশিয়াও ইরানের পাশে এসে দাঁড়াবে। আফ্রিকার বেশ কিছু দেশ বাধ্য হবে এই অ্যালায়েন্সে যোগ দিতে কারণ তাদের চীন নিয়ন্ত্রণ করবে।

মাইক বলে উঠল, একটু দাঁড়াও। আমি এখানে আলোচনা করছি। সিমেন্সের সঙ্গে আবার যোগাযোগ করছি। দরকার হলে আমরা ইরানের সঙ্গেও কথা বলব। তবে ওদের সঙ্গে যা সম্পর্ক কতটা সাহায্য করবে কে জানে।

২৫

হাই স্ট্রিট কেন্সিংটন স্টেশনের ঢিল ছোড়া দূরত্বে পাবটা। ওয়াইল্ড হর্সেস। খুব ব্যস্ত থাকে এই সময়। লন্ডনের উচ্চবিত্ত এলাকার মধ্যে এটা পড়ে। কিছু দূরে ইম্পেরিয়াল কলেজ, হাইড পার্ক, কেন্সিংটন প্যালেস।

মাইক-এর কথা মতো ঠিক আটটায় অনিলিখা পাবের সামনে এসে দাঁড়াল। পাবের বাইরে বেশ কিছু কমবয়সি মহিলা-পুরুষ বিয়ারের মাগ হাতে সিগারেট খাচ্ছে। অনিলিখা সপ্রতিভভাবে ভিড়ের মধ্যে দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেলো।

কিন্তু ভেতরে এতটা ভিড় আশা করেনি অনিলিখা। তিল ধারণের জায়গা নেই। বসার সামান্য কিছু টেবিল তাও ফাঁকা। প্রায় সবাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ড্রিংক করছে। পাবের মধ্যে আলো কম। এর মধ্যে কাউকে সনাক্ত করা বেশ শক্ত কাজ। এর মধ্যে যদি কেউ অনিলিখাকে মারার চেষ্টা করে তাকে ধরা বেশ শক্ত হবে।

অনিলিখা কেন এখানে সেটা একটু জানা দরকার। আজ অনিলিখার এখানে এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে আসার কথা ছিল সন্ধে আটটায়। চারঘণ্টা আগে ফোন এল মাইকের কাছ থেকে।

তুমি কি সন্ধে আটটায় 'ওয়াইল্ড হর্সেস'-এ যাচ্ছ?

প্রশ্নটা শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিল অনিলিখা। মাইক কী করে জানল? ওর তো কোনওভাবে জানার কথা নয়। ইংল্যান্ডের ইন্টেলিজেন্স MI 6 কী অনিলিখার উপরেও গোয়েন্দাগিরি করছে?

অনিলিখা বিস্ময় কাটিয়ে, কী করে জানলে?

শুধু আমি নয়। আরও কোনও একজন জানে। তাকেই আমরা খুঁজছি। সে এই পুরো চক্রান্তের কেন্দ্রে। একটু থেমে মাইক বলল—শোনো অনিলিখা, তোমার এই যাওয়া ক্যান্সেল করে দাও। তোমার উপরে সন্ত্রাসবাদী হামলা হতে পারে। কোনও অদৃশ্য শত্রু তোমার উপরে প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করছে। আমরা কোডেড মেসেজ ইন্টারসেপ্ট করেছি ঠিক পনেরো মিনিট আগে। তোমাকে মারবে ওরা।

কিন্তু কে এর পিছনে থাকতে পারে?

অনিলিখা, ঠিক দশ মিনিট আগে কী হয়েছে জানো তো? এখনও খবরটা মিডিয়ার কাছে আসেনি। লেবাননে হিজবুল্লার ক্ষমতাশালী নেতা আব্দুল নাজরাল্লার উপরে হামলা হয়েছে। খুব সম্ভবত মারা গেছে। এর পিছনে ইজরায়েল থাকতে পারে। আবার অন্য কোনও দেশও থাকতে পারে। কিন্তু মজার কথা হল, যার কাছ থেকে তোমার ব্যাপারে আজকের এই মেসেজ পেয়েছি, তার কাছ থেকেই এ ব্যাপারে একটা মেসেজ আমরা কাল ইন্টারসেপ্ট করেছিলাম যেখানে আব্দুল নাজরাল্লার উপরে আক্রমণের ব্যাপারে মেসেজ পাঠানো হয়েছিল। এখন বুঝতে পারছি তার উদ্দেশ্য কী ছিল। এরকমও হতে পারে যে এসব ঘটনার অনেক কিছুর সঙ্গে সে যুক্ত আছে। আব্দুল মজিদের সঙ্গেও তার নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। এরকমও হতে পারে যে সে আমাদের ইন্টেলিজেন্সের মধ্যেই আছে বা খুব ক্ষমতাশালী কোনও পদে আছে। এর উদ্দেশ্য খুব পরিষ্কার। আরেকটা বিশ্বযুদ্ধের দিকে আমাদেরকে ঠেলে দেওয়া।

আমার জন্য চিন্তা কোরো না। আমি যাব। হয়তো এটাই তোমাদের কাছে সে লোকটাকে আইডেন্টিফাই করার সুযোগ। হয়তো ইরানে কী হতে চলেছে সেটা এই লোকটা খুব ভালো করে জানে।

হ্যাঁ, সেটা আমাদেরও ধারণা। তবে তুমি কী বলছ সেটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ? আমি তোমাকে এরকম ভাবে কোনও বিপদে ফেলতে চাই না। ইউ আর টু প্রেসাস ফর অল দিস।

কিন্তু আমাকে তুমি ক'বার বাঁচাবে। সে তো আমাকে আরও অনেক জায়গায় মারার সুযোগ পাবে। তার থেকে আমার মাধ্যমে যদি এ লোকটার সন্ধান পাওয়া যায়, তাহলে তা আমাদের রহস্য উদ্‌ঘাটনে সাহায্য করবে।

ঠিক আছে। ইফ ইউ ইনসিস্ট। তবে তুমি একা থাকবে না। আমরাও থাকব। এটা নিয়ে সন্দেহ নেই যে এই ডেঞ্জারাস লোকটাকে ধরতে পারলে

আমদের কাজের অনেক সুবিধে হবে। অনেক রহস্যের সন্ধান পাওয়া যাবে। অল দা বেস্ট অনিলিখা।

এর ঠিক দু'ঘণ্টা বাদে অনিলিখা লন্ডন ট্যাক্সি করে বেরিয়ে এসেছে। সঙ্গে মাইকের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য একটা বিশেষ ফোন যাকে কোনওভাবে ট্র্যাক করা যাবে না। কিন্তু পাবের এই ভিড়ে সেই লোককে খুঁজে বার করার আগেই আক্রান্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

এর মধ্যে যদি ওর খোঁজে কেউ লুকিয়ে থাকে তাকে সনাক্ত করা বেশ শক্ত। তার আগেই এই ভিড়ের মধ্যে অনিলিখার উপরে আক্রমণ করে তার পালানোর সুযোগ থাকবে।

ঠিক এই সময় অনিলিখার কাছে মাইকের কাছ থেকে রেডিও মেসেজ এল।

আমরা পাবের চারধারে আছি। তুমি ড্রিংক শুরু করো। সবুজ আপেল ওখানেই আছে।

সবুজ আপেল বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে সেটা অনিলিখা জানে। এখানে যে অনিলিখাকে মারতে আসবে, তার নাম হল সবুজ আপেল।

এটা হল MI 6-এর একটা কোড ওয়ার্ড। এই অপারেশনের নাম দেওয়া হয়েছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড।

অনিলিখার সঙ্গে এখানে অ্যানা-র দেখা হওয়ার কথা। অ্যানার সঙ্গে অনেক দিন বাদে দেখা। এখানে একটা নামি টেলিকম কোম্পানির ভাইস প্রেসিডেন্ট অ্যানা। অনিলিখা এসেছে শুনে অ্যানা এখানে ওর সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছে। এর কোনও কিছুই জানা নেই ওর।

অনিলিখা ঢুকেই পাবের টয়লেটে আগে চলে গেল যাতে চোখ এই আলোতে অভ্যস্ত হয়ে যায়। একই সঙ্গে আসা যাওয়ার পথে কোনও সন্দেহজনক লোককে সনাক্ত করা যায়। পাবের পিছন দিক দিয়ে বেরনোর পথও দেখে নেওয়া যাবে।

ফিরে এসে বারের দিকে এগোতেই অ্যানাকে খুঁজে বার করতে অসুবিধে হল না। একটা উজ্জ্বল সবুজ পোশাক পরে অ্যানা এসেছে। বলা যায় অনিলিখা ও অ্যানাকে দূর থেকে চিনে নেওয়া বেশ সহজ কাজ। অন্যদিকে যাকে অনিলিখা খুঁজছে সে এই ভিড়ের মধ্যে কোথাও মিশে আছে। শুধু চোখের দৃষ্টি দেখে বুঝতে হবে।

দুজনে একটা টেবিলে গিয়ে বসল। অনিলিখা খয়েরি গ্লাসে করে বিয়ার নিয়ে এসেছে। আসলে খাওয়ার ইচ্ছে নেই। কালার্ড গ্লাসে কে কতটা খাচ্ছে,

সেটা বোঝা যায় না। অনিলিখা কথা বলতে বলতে সজাগ দৃষ্টিতে আশেপাশের উপরে নজর রেখেছিল।

ওর ফোনে ঠিক এই সময় মেসেজ এল 'সবুজ আপেলকে আমরা মনে হয় চিনতে পেরেছি। আমরা আসছি। কালো টি শার্ট।'

বিয়ার খেতে খেতে অনিলিখা একবার আশেপাশের টেবিলে তাকাল। অন্তত তিন বা চার জন আছে যাদের কালো টিশার্ট। দ্বিতীয়বার তাকাতেই অনিলিখার মনে হল কে সেই ব্যক্তি সেটা ও বুঝতে পেরেছে। রাজনীতির পরিচিত মুখ। স্কটল্যান্ডের এক বিরোধী দলের নেতা। দৃষ্টিতে এমন কিছু আছে যা ঠিক স্বাভাবিক নয়। অনিলিখার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই অন্যদিকে তাকাল। কিন্তু মাইক কোথায়?

কিন্তু ঠিক এরকম সময় এমন একটা ঘটনা ঘটল যার জন্য অনিলিখা আদৌ প্রস্তুত ছিল না। বারের সামনের দিকে দুজন লোকের মধ্যে বেশ বাকবিতন্ডা হাতাহাতি শুরু হয়েছে। সেটা যেন খুব দ্রুত দুটো দলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। খুব সম্ভবত চেলসি ফুটবল ক্লাবের কয়েকজন মাতাল সমর্থক ও ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড দলের সমর্থকদের মধ্যে বাকবিতন্ডা। আজ ওদের একটা খেলা ছিল।

অনিলিখার কাছে আবার মাইকের মেসেজ এসেছে। তুমি বেরিয়ে এসো। ওখানে থাকার রিস্ক নিও না।

অনিলিখা ও অ্যানা দ্রুত পাব থেকে বেরিয়ে এল। আবার রেডিও মেসেজ এল তুমি উত্তরের দিকে হাঁটো। ওদিকটা ফাঁকা।

অ্যানাকে বিদায় জানিয়ে অনিলিখা হাঁটতে শুরু করল।

কেন উত্তর দিক তা অবশ্য বুঝতে পারল না অনিলিখা। একটা পার্কের পাশ দিয়ে ফাঁকা রাস্তা। একধারে পরপর ভিক্টোরিয়ান হাউস। রাস্তা ফাঁকা।

অনিলিখার কাছে আবার মাইক-এর কাছ থেকে মেসেজ এসেছে। একটু সাবধানে হেঁটো। বড় রাস্তায় এসো না। সহজ টার্গেট। অলিগলির মধ্যে দিয়ে হাঁটতে থেকো। একটা পোস্টকোড পাঠিয়েছি। ওই পোস্টকোড অনুযায়ী এগোও।

অনিলিখা মেসেজ পাঠাল—সবুজ আপেল কোথায়?

উত্তর এল—আমরা ওকে ট্রেস করতে পারছি না। তবে তোমাকে ফলো করবে বলে আমাদের ধারণা।

অনিলিখা হাঁটতে শুরু করল। এদিকটা চেনা নেই। এটুকু বুঝতে পেরেছে এটা সম্ভ্রান্ত এলাকা নয়। আশেপাশের বাড়ি দেখে বোঝা যায়। দেওয়ালে নানান ধরনের ছবি আঁকা। রাস্তা নোংরা। একটার পর একটা গা ঘেষাঘেষি করে বাড়ি।

ফাঁকা রাস্তা। রাস্তার ধারে কম্বল মুড়ে এক ভিখারি শুয়ে আছে। পঞ্চভুজ ল্যাম্প শেডের হলুদ আলো রাস্তায় এসে পড়েছে। বেশ কিছু সরু সরু রাস্তা বাড়িগুলোর পাশ থেকে এসে সেই রাস্তায় মিশেছে। হঠাৎ অনিলিখা একটা

আওয়াজ পেল। লক্ষ করল পাশের সরু একটা রাস্তা দিয়ে একটা লোক দ্রুত এগিয়ে আসছে ওর দিকে। হাতে বন্দুক জাতীয় কিছু একটা আছে। দ্রুত একটা ল্যাম্পপোস্টের আড়ালে যাওয়ার চেষ্টা করল অনিলিখা। কিন্তু তার আগেই দু-দুটো গুলির আওয়াজ ভেসে এল।

যে লোকটা ছুটে আসছিল, তাকে লক্ষ্য করে কেউ গুলি ছুড়েছে। লোকটা বড় রাস্তায় বসে পড়েছে। যে ভিখারিটা খানিক আগে কম্বল গায়ে দিয়ে শুয়ে ছিল। সে আর শুয়ে নেই। সেই গুলি করেছে। MI 6-এর কেউ হবে।

২৬। সব রহস্য যখন শেষ। কয়েকদিন বাদে

জেনেভা কনভেনশন সেন্টার থেকে মাইক আর অনিলিখা বেরিয়ে এল। কিছুক্ষণ আগেই বিভিন্ন রাষ্ট্র প্রধানের মিটিং হয়েছে। পরিস্থিতি এখন অনেক শান্ত। খুব সময় মতো একটা খুব বড় বিপর্যয় থামানো গেছে। অনিলিখার অনুমান একদম ঠিক। ওরা একটা লং রেঞ্জ ব্যালিস্টিক মিসাইল লঞ্চ করতে চলেছিল। খুব সম্ভবত জার্মানির মিউনিখকে ও প্যারিসকে টার্গেট করত। তার যে কী ভয়ানক ফলাফল হতে পারত, তা ভাবাও যায় না।

সেটা যেকোনও সময় হতে পারত কারণ ওই কম্পিউটার যেকোনও সময় ওই ম্যালওয়ার দ্বারা আক্রান্ত হতে পারত। আর সেটা হলেই সেই কম্পিউটারের মাধ্যমে ওর সঙ্গে যুক্ত পিএলসি-এর কোড পরিবর্তিত হয়ে যেত। সেক্ষেত্রে পিএলসি একের পর এক নির্দেশ স্বয়ংক্রিয়ভাবে দিয়ে লং রেঞ্জ ব্যালিস্টিক মিসাইল লঞ্চ করত। ম্যানুয়াল সব নির্দেশের দরকার পড়ত না।

তবে এর পিছনে কার হাত ছিল তা বোঝা যায়নি। আঙুল উঠেছে সৌদির দিকে। কিন্তু সরাসরি কোনও প্রমাণ নেই। তবে সেদিন স্কটল্যান্ডের যে বিরোধী দলনেতাকে ধরা হয়েছে, তার থেকে অনেক কিছু জানা গিয়েছে। এমনকী তাকে জেরা করেই ওই কম্পিউটার সিস্টেমকেও দ্রুত সনাক্ত করা গিয়েছে। তবে সে তদন্ত এখনও শেষ হয়নি। এতসব ক্ষমতাশালী মানুষ আছে এর পিছনে যে সবকিছু কোনওদিন জানাও যাবে না।

এখনও সাফিনকে ছাড়া হয়নি। সময় লাগবে। আমেরিকার লিগাল সিস্টেম এমন যে এ ধরনের অপরাধীকে কোনওভাবে সাহায্য করে না। তবু অনিলিখা যথাসর্বস্ব চেষ্টা চালাচ্ছে। এ বিষয়ে একটা প্রেস কনফারেন্স করে সাফিনের পক্ষে খানিকটা জনমতও তৈরি করেছে।

প্রমাণ করা গেছে যে সাফিনের স্মৃতি পরিবর্তন করে দেওয়া হয়েছিল। সে ড্রাগের খোঁজও পাওয়া গেছে। এর পিছনে ছিল মূলত আব্দুল মজিদ ও ওর

সংস্থা। ওরা একটা বিশেষ মেমারি ইমপ্ল্যান্ট টেকনিক বার করেছিল, যা দিয়ে কারুর স্মৃতি ইচ্ছেমতো পরিবর্তন করে দেওয়া যায়। নতুন ভুল তথ্য স্মৃতি হিসেবে প্রোথিত করা যায়।

এ বিষয়ে ওরা প্রফেসার কেলভিনের সঙ্গে কাজ করেছে। তারপরে এর অপপ্রয়োগ করা শুরু করে। কোন কোন ক্ষেত্রে এরকম টেকনিক ব্যবহার করেছে, তা এখন তদন্তসাপেক্ষ।

আমাদের স্মৃতি একটা বই-এর মতো নয় যে লাইব্রেরির তাক থেকে বার করে আবার রেখে দিলে বই একইরকম থাকে।

আমাদের স্মৃতি হল একটা কম্পিউটারের ফাইলের মতো। যা প্রত্যেকবার বার করার সময় তাকে পরিবর্তিত করে দেওয়া যায়। এটাই আবিষ্কার করেছিলেন প্রফেসার কেলভিন যার সব স্বত্ব কিনে নেয় এই 'সেল ইওর ড্রিম' কেম্পানি। ওরা হয়ত প্রথমে এটা কোনও ক্যাম্পেনের ক্ষেত্রে কিছু ক্ষমতাশালী লোককে প্রভাবিত করার জন্য এটার কথা ভেবেছিল। সেক্ষেত্রে ক্যাম্পেন অন্য মাত্রা পেতে পারে যদি ক্যাম্পেনের পক্ষে এভাবে কিছু মিথ্যে কথাকে সত্যি করে তোলা যায়। ওরাই সে ড্রাগ প্রয়োগ করে সাফিনের উপরে যাতে সাফিনের নিজের মনে হয় যেন সেই বোমা তৈরির যাবতীয় প্রস্তুতি একা করেছে।

ছেলেটা ঠিক বলেছিল। সেই সন্ধেতে আরও দুজন ছিল সাফিনের সঙ্গে। একজন হল ওই সন্ত্রাসবাদী। তাকে ইতিমধ্যে সনাক্ত করা গেছে আল কায়দার জঙ্গি হিসেবে।

অন্যজন ছিল খুব সম্ভবত সেই ব্যক্তি যে ওই ড্রাগ সাফিনের উপরে প্রয়োগ করেছিল। সেটা কে তা অবশ্য এখনও জানা যায়নি। তবে এটা নিশ্চিত যে সে এই ড্রাগ আগেও সাফিনের উপরে প্রয়োগ করেছে।

তা যাই হোক। সব ভালো, যার শেষ ভালো। আস্তে আস্তে সাফিন অনেক সুস্থ হয়ে উঠছে। আস্তে আস্তে ও ওই ইমপ্ল্যান্ট করা স্মৃতির থেকে বেরিয়ে আসছে।

২৭। মার্কিন দূতাবাসে অনিলিখা

আজ সাফিনের মা ও অনিলিখাকে ভারতে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত নিমন্ত্রণ করেছেন। আজ এক বিশেষ দিন। এতদিন বাদে সরাসরি সাফিনের সঙ্গে কথা বলা যাবে।

প্রথমেই ওই রাষ্ট্রদূত দূতাবাসের পক্ষ থেকে এ ভুলের জন্য ক্ষমা চেয়ে নিলেন। কলকাতায় সন্ধ্যা ছ'টা। কলোরাডোয় সকাল সাড়ে ছ'টা।

শুধু তিনি নন, সঙ্গে এখানকার দূতাবাসের আরও অনেক কর্মী আছে।

কিন্তু ফোন করার সময় অন্য দিক থেকে আর কোনও কথা শোনা যাচ্ছে না। এদিক থেকে তিনি বলে যাচ্ছেন—সাফিন, সাফিন।

অন্যদিকে কোনও সাড়া নেই। সাফিন কাঁদছে।

কিছুক্ষণ বাদে নিজেকে সামলে নিয়ে সাফিন বলে উঠল, মা আমি ভালো আছি। তুমি ভালো আছ তো মা?

কিছুক্ষণ বাদে সাফিনের মা এদিক থেকে কথা বলে উঠল, এই যে তোর গলা শুনলাম। এতদিন বাদে। সব অসুখ সেরে গেল। এখন খুব ভালো আছি।

সাফিনের মা আর কথা বলতে পারলেন না। কান্নায় গলা বুজে এসেছে। সবাই আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল।

২৮। অঘটনঘটনপটিয়সী অনিলিখা। শনিবারের আসর

আজ শুধু অনিলিখাদি নয়, সঙ্গে অনিলিখাদি একজনকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। বেশ মজার মানুষ। আমেরিকাতে থাকেন। অনর্থকাকু। কয়েকদিনের জন্য কলকাতায় এসেছেন।

অনিলিখাদির মুখে পুরো ঘটনা শোনার পর অনর্থকাকু বলে উঠলেন, সলিসিটার হিসেবে আমি কিন্তু কিছুই কাজ করতে পারিনি। এ রহস্যের সমাধান শুধু তোমার জন্যই সম্ভব হল।

না, না, আপনার একটা বড় অবদান আছে।

কীভাবে?

হেসে বলে উঠল অনিলিখাদি, আপনি অপমানিত না হলে বলি, আপনার মতো একজন সলিসিটারকে যে বেছে বেছে নির্বাচন করে, আমার কাছে সাজেস্ট করে, তাকে খানিকটা সন্দেহ করতেই হয়। সেজন্য আপনার সঙ্গে প্রথম আলাপের পর থেকেই আমার সন্দেহ হয় আব্দুল মজিদের উপরে। হঠাৎ করে ও আগ বাড়িয়ে, এত আগ্রহ নিয়ে আপনার ফোন-নাম্বার আমাকে দিল কেন? এরপর থেকেই আমি আব্দুলকে সন্দেহ করতে শুরু করি।

আমরা সবাই হাসতে শুরু করলাম। অনর্থকাকুও।

অনিলিখা বলল, পরে জেনেছিলাম আপনার সাহায্যের ও সততার জন্য ও বেচারা ওই জমির কেসে হেরেছিল।

অনিলিখা ফের বলে ওঠে, ব্যস্ততার মধ্যে আগে আপনাকে বলা হয়নি। আপনাকে MI 6 পর্যন্ত চেনে।

সে কি? কে বলল? আমি তো তোমার মতো এত বিখ্যাত হইনি এখনও।

ওই ঘটনা চলাকালীন মাইকের সঙ্গে তো আপনার একদিন দেখা হয়েছিল। তাই না? আমি দেখি। আপনার সঙ্গে ওই দিন কথা বলার পরে মাইক ঘরের কোণে গিয়ে খুব হাসছে। আমি কোনও এজেন্টকে ওরকম ভাবে কাজের মধ্যে হাসতে দেখিনি। আমি জিগ্যেস করতে অনেক কষ্টে হাসি থামিয়ে বলল, যে আপনাকে ও আগে থেকেই খুব ভালো করে চেনে। ইনফ্যান্ট ওদের অনেক ক্ষতি হয়েছিল অহেতুক চারদিন ধরে আপনাকে চব্বিশ ঘণ্টা ফলো করতে গিয়ে।

কেন? কী করেছিলাম?

—আপনি বোধহয় তখন লন্ডনে বেড়াতে এসেছিলেন। ওদের লন্ডনের MI 6 অফিসের সামনে কিছু দূরে একটা লাল লেটার বক্স আছে। তখন ওরা একজন রাশিয়ান এক্স-স্পাই ও তার মেয়ের উপরে নার্ভ গ্যাস আক্রমণের ব্যাপারে তদন্ত করছিল। খুব হাই প্রোফাইল কেস। ওদের সোর্সদেরও বলা ছিল যে কেউ কিছু ও ব্যাপারে জানতে পারলে যেন ওই লেটার বক্সে চিঠির মাধ্যমে জানায়। এতে ওই ব্যক্তির পরিচয় গোপন থাকবে। শুধু কোনও ঠিকানা থাকবে না সে ক্ষেত্রে। হঠাৎ ওরা সিসিটিভি ফুটেজ থেকে দেখে যে ওখানে এক কোনও অচেনা ব্যক্তি একটা কাগজে সাংকেতিক কিছু লিখে চুইংগাম দিয়ে কাগজটা আটকে ফেলে গেছে।

কী ব্যাপার। শেষে বোঝা যায় যে সে ব্যক্তি ছিলেন আপনি। আপনি অন্যমনস্ক হয়ে পোস্টবক্সকে ডাস্টবিন ভেবেছিলেন। একটা বাংলা অক্ষরে লেখা আপনার কবিতা আপনার ব্যাগে ছিল। আপনি সে কাগজের কিছুটা অংশ ছিঁড়ে চুইংগাম ফেলার জন্য ওই কাগজটা ব্যবহার করেছিলেন ও ওখানে ফেলেছিলেন। আপনার ওই একটা কবিতাই একমাত্র ৬৪ টা ভাষা অনূদিত হয়েছে। ওরা সংকেত ভেবে সবরকম ভাবে ওটাকে বিশ্লেষণ করে শেষে কিছু খুঁজে পায়নি। এরকম ভুল যে কেউ করতে পারে সে ধারণা ওদের ছিল না। আপনাকে চারদিন ২৪ ঘণ্টা ফলো করে আপনার করা আরও বেশ কয়েকটা দুষ্কর্ম দেখে ওরা নিশ্চিত হয় যে আপনি ভুল করেই করেছেন। এবার বুঝলেন আপনি কেন এত বিখ্যাত?

অনর্থকাকু বলেন, সাংঘাতিক ব্যাপার। হ্যাঁ, এখন মনে হচ্ছে তুমি যা বলছ তা হয়ে থাকতেই পারে। তা কোন কবিতাটা জিজ্ঞাসা করেছিলে?

না, তবে মাইককে দেখা হলে জিজ্ঞাসা করবেন। নির্ঘাত মুখস্থ বলে দেবে।

অনর্থকাকু ফের বলে উঠলেন, আমি রহস্য মেলাতে পারি না বটে, তবে ছন্দ কিন্তু শেষে মেলাতে পারি। তোমাকে একটা কবিতা শোনাই।

কী আর করব? শোনান। কিছুতেই ফি-তো আর আপনি নিলেন না। শুনতে তো হবেই।

তিনি বলে উঠলেন—এটা তোমাকে নিয়েই লেখা।

ঝলমলে চেহারায়
বুদ্ধির ধার
উজ্জ্বল দুটি চোখে
ফুটে ওঠে তার।
জানা অজানার টানে
রহস্য সমাধানে
অনন্য অনিলিখা,
জুড়ি মেলা ভার।

আমরা সবাই বলে উঠলাম, দারুণ। দারুণ।

অনিলিখাদি হেসে বলল, না, সত্যি এ কবিতাটা খুব ভালো হয়েছে। আপনাকে যত খারাপ কবি ভেবেছিলাম, তার থেকে আপনি অনেক ভালো।

একটু থেমে অনিলিখা ফের বলল, এখনও কিন্তু আমার কাজ শেষ হয়নি। যতদিন না সাফিন জেল থেকে বেরোচ্ছে, ওর উপরে আনা সব রকম অপরাধ থেকে নিষ্কৃতি পাচ্ছে—আমার কাজ শেষ হবে না।

সমস্যা হল আমেরিকার লিগাল সিস্টেমে এমন কোনও নিয়ম নেই যেখানে অপরাধী অপরাধ স্বীকার করার পরেও তাকে নিরপরাধ বলা চলে। সেখানেই সমস্যা। তা ছাড়া সন্ত্রাসবাদের জন্য আইন কানুন এতটাই শক্ত করে রাখা আছে যে, সাফিন যে কবে ছাড়া পাবে বলা খুব শক্ত। আমাকে আর অনর্থবাবুকে এখনও সে লড়াইটা দিনরাত করে যেতে হবে।

তোমার মতো অঘটনঘটনপটিয়সী-র পক্ষে সব কিছুই সম্ভব। অবশ্যই সেটাও সম্ভব হবে। আমি তো তোমার সঙ্গে থাকবই।

অনর্থকাকুর কথা শুনে প্রতীক আরেকটু হলে জল খেতে খেতে বিষম খেয়ে একটা অঘটন ঘটিয়ে ছাড়ছিল।

২৯। প্রেস কনফারেন্সে সাফিন—চিত্ত যেখানে ভয়শূন্য

দশ মাস বাদে। ডেনভারে প্রেস কনফারেন্স

আজ সাফিন ছাড়া পেয়েছে। সে উপলক্ষে বিশেষ প্রেস কনফারেন্স। উপস্থিত আছে ভারতীয় দূতাবাসের ও আমেরিকার বেশ কিছু পদস্থ অফিসিয়াল। দেশবিদেশের অজস্র মিডিয়া চ্যানেল।

এ বিষয়ে কলোরাডোর গভর্নর, এফ বি আই-এর যুগ্ম আধিকারিক-এর মতো কিছু আধিকারিক অন্যান্য কিছু কথা বলার পরে সাফিনকে বলতে বলা হল। সে বক্তব্যের কিছু অংশ নীচে তুলে ধরছি।

সুপ্রভাত। আমার কাছে আজকের এ সকাল সত্যি অন্যরকম। জেলের ওই অন্ধকার থেকে বেরিয়ে যেন হঠাৎ করে অনেক আলো।

আমার বাবা-মা আমাকে সবসময় এই আলোর জগতেরই সন্ধান চিনিয়েছিল। বলেছিল আমি যেন সবার ভালো কাজে, দরকারে আসি। তখনও বুঝিনি যে আমি নিজে এই অন্ধকারে কোনওদিন হারিয়ে যাব।

এ পৃথিবীকে আমরা টুকরো টুকরো করে ফেলেছি। কখনও দেশ, কখনও ধর্মের, কখনও জাতির ছোট ছোট আঙিনায়। সেখানে অনেকে আছে, যারা সবসময় যুদ্ধ চায়। মানুষে-মানুষে হিংসা চায়। আমি জানি এই ঘরেও যুদ্ধবাজ লোকই বেশি আছে, যারা শুধু আগুন ছড়িয়ে বেড়ায়।

একদিন আমিও যেন হঠাৎ করে তাদের মতোই হয়ে গেলাম। আমার চেনা পৃথিবী উধাও হয়ে গেল। চারদিকে শুধু হিংসা, শুধু রক্ত। আমার মনে হল আমি যেন আমার কাছেই হারিয়ে গিয়েছি। তা না হলে এত বড় অপরাধ কী করে করলাম!

পরে বুঝেছি সবাইকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করা উচিত নয়। আমাকে এক বন্ধু বলেছিল, তার বাড়িতে রাখার পর্যাপ্ত জায়গা না থাকায় সে আমার ঠিকানায় কিছু জিনিস অর্ডার করবে। পরে সংগ্রহ করে নেবে। কিছুই জানতাম না যে সে জিনিসগুলো কী। এটাও ভাবিনি যে কেনই বা সে আমার বাড়িতে এসে আমার কম্পিউটার ব্যবহার করে সেগুলো অর্ডার দেয়।

আসলে কিছু কিছু মানুষ খুব সহজে সবাইকে বিশ্বাস করে। আমিও সে দলে পড়ি। আসলে এটাই ছিল আমার ছোটবেলা থেকে শিক্ষা।

বাবা বলতেন সামনের লোকটাকে বিচার না করে আগে ভালো ভেবে নাও। তা না হলে আমরা যত বিচার করব, ততো নিজেদের মধ্যে বিভেদ বাড়াব। একবার মনের মধ্যে দেওয়াল উঠে গেলে, তা আর ভাঙা যায় না।

কিন্তু এ শিক্ষার, এ ভদ্রতার সুযোগ যে কেউ নেবে, সেটা কখনও ভাবিনি। একদিন তাই হঠাৎ করে বিনা অপরাধে আমার চেনা পৃথিবীটা হারিয়ে গেল। সেদিন দেখলাম সারা পৃথিবী আমাকে ঘৃণা করে। সবাই আমাকে অবিশ্বাস করে। আমার নাম, আমার ধর্ম যেন আমার বাকি সব পরিচয় আড়াল করে দিয়েছে।

আমার জেলের ছোট ঘরটাতে আমার এক বন্ধু ছিল। সে হল আমার প্রিয় কবির একটা বই। আমি যখন রোজ অপেক্ষা করতাম আমার মৃত্যুর, সে আমার সামনে এসে বলত—

বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা—
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।
দুঃখতাপে ব্যথিত চিতে নাই-বা দিলে সান্ত্বনা,
দুঃখে যেন করিতে পারি জয়।
সহায় মোর না যদি জুটে নিজের বল না যেন টুটে,
সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি, লভিলে শুধু বঞ্চনা
নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয়।
আমারে তুমি করিবে ত্রাণ এ নহে মোর প্রার্থনা—
তরিতে পারি শকতি যেন রয়।

ওই কবিকে আমার প্রণাম। তা না হলে আমি হয়তো আমার পরিচয় অনেক আগেই হারাতাম।

মানুষে-মানুষে যুদ্ধ শেষ করার একটাই উপায় ভালোবাসা। সেই অস্ত্রই এখনও কেউ প্রয়োগ করতে শেখেনি। আমরা শিখেছি ঘৃণা করতে যা ক্যান্সারের মতো সারা শরীরে খুব তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ে। আমাদের চশমাতে ধর্মের রঙ, দেশের রঙ, জাতির রঙ লেগে থাকে। তাই আসল রঙটা আমরা চিনতে ভুলে যাচ্ছি।

মানুষ যখন খুব একা হয় যায়, তখন তার মধ্যে আসল উপলব্ধি হয়। আমি অন্ধকার সেলের মধ্যে যখন নিজের কাছে নিজে অচেনা হয়ে গিয়েছিলাম, কেউ কি জানত আমার জন্য আমার অসহায় মা আর এক দেবী কলকাতার রাস্তায় দাঁড়িয়ে পৃথিবীর সব থেকে বড়শক্তির ঘৃণার মেশিনকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে।

সেদিন যখন কেউ আমাকে বিশ্বাস করেনি, তখন আমাকে শুধু দুজন বিশ্বাস করেছিল। আমার মা আর এক দেবী। তাকে আমি দেখি নি। তার নাম অনিলিখা। একজন মা তার ছেলেকে সবসময় রক্ষা করবে, এটা হয়তো স্বাভাবিক। কিন্তু একজন মহিলা অন্য একজন সম্পূর্ণ অসহায় অচেনা মানুষের জন্য নিজেকে উজাড় করে দিয়ে তাকে রক্ষা করার চেষ্টা করবে, এটা আমি নিজেও ভাবতে পারি না। আমি আজ তার জন্যই মুক্ত। জানি সে এই ঘরে নেই। সে যেখানেই থাকুক তাকে ধন্যবাদ জানাই আমার এই নতুন জীবনের জন্য।

আপনারা সবাই ভালো থাকবেন। শেষে আমার প্রিয় কবির একটা কবিতা দিয়ে শেষ করি।

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণতলে দিবসশর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি।

আমি এখনও আশা রাখি আমি এই জীবনেই সে পৃথিবী দেখে যাব যেখানে ক্ষুদ্র স্বার্থের সন্ধানে বিভেদের প্রাচীর আমাদের পৃথিবীকে ছোট ছোট টুকরোয় ভেঙে ফেলবে না।

কিছুক্ষণ বাদে এ প্রেস কনফারেন্স দেখে পৃথিবীর এক অত্যন্ত শক্তিশালী মানুষ সাফিনের বলা কবিতার অনুবাদ পড়ে টুইট করেছিলেন—হোয়াট অ্যা ক্রেজি টেররিস্ট। হি অ্যান্ড হিস ফেভারিট পোয়েট ডু নট ওয়ান্ট টু বি সেভড ফ্রম ডেঞ্জার। দে লাইক টু বি টরচারড ইভেন মোর। হি মাস্ট হ্যাভ লাইকড দ্য প্রিজনস হিয়ার।



অনিলিখা ও সেই লোকটা

Arajakata Exclusive

সত্যি এখন সব বদলে গেছে। শনিবারের আসরে আমরা প্রায় সবাই এসেছি। কিন্তু কারো মুখে কোনও কথা নেই। সবার চোখ হাতে ধরা ফোনে। গত পাঁচ মিনিট আমরা কেউ কোনও কথা বলিনি।

বাইরে এরই মধ্যে একটু ঝিরঝির করে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। প্রথম বর্ষার বৃষ্টি। ঠিক সময় অনিলিখাদির প্রবেশ। ছাতা আনেনি। ভালোই ভিজে গেছে। ভিজে চটি খুলতে খুলতে বলল, বৃষ্টিতে না ভিজলে, বর্ষাকে ঠিকভাবে স্বাগত জানানো হয় না।

অনিলিখাদি পাড়ার শ্যামলদার দোকান থেকে চপ-কাটলেট নিয়ে এসেছে। মুহূর্তে ঘরের পরিবেশ বদলে গেল। কিচেন থেকে প্লেট এনে আমরা সবাই খাবার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠলাম।

এর মাঝেই অনিলিখাদি বলল, আমি ঢোকার আগেই বাইরে থেকে তোদের লক্ষ্য করছিলাম। যেভাবে তোরা বিভোর হয়ে ফোনের স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে বসেছিলি, তাতে মনে হচ্ছিল আগামী দিনে তোরা কথা বলতেই ভুলে যাবি। আর একটা দেশ ধ্বংস করতে পরমাণু বোমার দরকার হবে না, পাওয়ার গ্রিড আর সব মোবাইল নেটওয়ার্ক পাঁচ দিনের জন্য বন্ধ করে দিলেই হবে।

আমরা চুপ।

একটু থেমে অনিলিখাদি ফের বলে উঠল, আমাকে আবার ইংল্যান্ডে আর স্পেনে অফিসের কাজে যেতে হবে। অন্য কিছু দেশেও যেতে হতে পারে।

—বাহ্! গরম থেকে একটু রেহাই পাবে।—সহেলী বলল।

—তা ঠিক। তবে এবারে অফিসের কাজের প্রেসার ভালোই থাকবে। অন্য একটা কাজ সারতে হবে।

—কী কাজ অনিলিখাদি?

—একটা চিঠি পৌঁছতে হবে একজনের কাছে। একটা বিশেষ চিঠি।

—চিঠি? এখনকার দিনে চিঠি কেউ লেখে?

—এই চিঠিটা যার উদ্দেশে লেখা তাকে পৌঁছে দিতে হবে।—বলে অনিলিখাদি একটা খাম খুব যত্ন করে ব্যাগ থেকে বার করল। তারপর তার থেকে একটা চিঠি বার করে বলল, তোদের একটু পড়ে শোনাই, তাহলে বুঝতে পারবি এ চিঠিটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

প্রিয়তমা

আমার চিঠি লেখার অভ্যেস একদম নেই। কিন্তু তোমার কাছে আমার শব্দগুলো পৌঁছনোর আর কোনও উপায় এখন আমার কাছে জানা নেই। আমি তোমাকে কতটা মিস করছি সেটা জানানোরও আর কোনও উপায় নেই। তাই এই চিঠি।

প্রায় দু-মাস কাদার মধ্যে আটকে থাকার পরে দুদিন হল একটা ঘর পেয়েছি। ১০৪ নাম্বার ডিভিশনে আছি। এখানে একটা ছোট কিচেনে আমার সঙ্গে আরও চারজন আছে। তবু মনে হচ্ছে কত জায়গা। তোমার কথা খুব মনে হচ্ছে। তুমি যদি এখানে থাকতে, সারাদিনই কথা বলতাম। কত কথা যে বলার আছে।

এখন আমি যেখানে আছি তার কিছুটা দূরেই মজেল নদী। নদীর ধার দিয়ে মাইলের পর মাইল জুড়ে ফক্স হোল। অর্থাৎ কাদা-মাটির মধ্যে গর্ত করে দাঁড়িয়ে থাকার জন্য ডিফেন্সিভ পজিশন। আর আছে পরিখা।

যুদ্ধ এখানে আপাতত শেষ। কিন্তু চারদিকে ধ্বংসের চিহ্ন। নদীর উপর দিয়ে যে ব্রিজ ছিল তাও জার্মান আর্মি পিছিয়ে যাওয়ার আগে ধ্বংস করে দিয়ে গেছে যাতে আমরা সহজে নদী পার করে অন্যদিকে না যেতে পারি। এটা শত্রুপক্ষের সাপ্লাই চেন ধ্বংস করার একটা উপায়। আমাদের যে অংশটা আগে এগিয়ে গেছে তাদের কাছে রসদ পাঠানো সোজা হবে না। আমাদের সামনে একটা খুব ইন্টারেস্টিং প্ল্যান আছে। কিন্তু সেটা লিখলে এ চিঠি আর তোমার কাছে পৌঁছবে না।

দেখতে দেখতে দেড় বছর হয়ে গেল। এখনও মনে আছে নরম্যান্ডি বিচে ল্যান্ড করার কথা। জাহাজ থেকে নেমে পিঠে ভারী ব্যাগ আর হাতে বন্দুক নিয়ে জল আর বালির মধ্যে দিয়ে ছুটে যাওয়ার কথা। গুলি ছুটে আসছিল আমাদের লক্ষ্য করে। কে গুলি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল, ঘাড় ঘুরিয়ে তা দেখারও অবকাশ ছিল না। শুধু মনে হচ্ছিল ডেভ আর টিনাকে দেখতে ফিরে যেতে পারব তো। সেদিন আকাশ ছিল মেঘলা। কুয়াশায় দূরের কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। বুঝতে পারছিলাম না কার দিকে ছুটে চলেছি।

আমাদের দিকে উড়ে আসছিল ঝাঁকে ঝাঁকে জার্মান বিমান। আর তাদের লক্ষ্য করে গর্জে উঠছিল আমাদের অ্যান্টি এয়ারক্রাফ্ট কামানগুলো। তার মধ্যে দিয়ে বিচের উপরে আমরা ছুটছি। সে যে কী অদ্ভুত দৃশ্য! মনে হচ্ছিল ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া আকাশ যেন তারাবাজি দেখছে।

প্রত্যেকটা ধ্বংস হয়ে যাওয়া শত্রুবিমান দেখে যে কী আনন্দ

হচ্ছিল কী বলব! কিন্তু পরে ভাবছিলাম ওই প্রত্যেকটা ধ্বংস হয়ে যাওয়া বিমানের মধ্যে যে আছে তার জন্যও হয়ত তোমাদের মতো কেউ অপেক্ষা করে বসে আছে। সে আর ফিরবে না।

সেদিন আমার মিশন সফল হয়েছিল। তারপরে ফ্রান্সের ছোট ছোট রাস্তা, কখনও শস্যখেতের মধ্যে দিয়ে একটু একটু করে এগিয়েছি। সবাই যখন জার্মান সেনার কথা ভাবত, তখনও ওই অবস্থাতেও তোমার কথাই মনে হত। যদি না ফিরি? এখন মনে হয় সে সময় পেরিয়ে এসেছি।

আমার মনে হয় আর কিছুদিনের মধ্যেই যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে। কতদিন যে তোমাদের দেখব বলে অপেক্ষা করে আছি। ডেভ নিশ্চয়ই এতদিনে প্রচুর কথা বলতে শিখে গেছে। টিনা আর ওর সঙ্গে ঝগড়া করে না তো?

অনিলিখাদি থামল। বলল, পুরোটা পড়ব না। এটা যার জন্যে লেখা তারই পুরোটা পড়ার অধিকার আছে। তোদের জন্য খানিকটা পড়লাম।

এ চিঠিটা কোথায় পেলে? এ তো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় লেখা চিঠি বলে মনে হচ্ছে।—প্রতীক বলল।

—হ্যাঁ, ঠিক তাই। তারিখ দেওয়া নেই। ১৯৪৫-এর মাঝামাঝির চিঠি বলে মনে হয়। যে চিঠি লিখেছিল সে নিশ্চয়ই ব্রিটিশ আর্মিতে ওই সময় ছিল আর অ্যালায়েন্স পাওয়ারের হয়ে জার্মানিতে যুদ্ধ করতে গিয়েছিল।

একটা বইয়ের ভেতরে পেলাম। গতকাল কলেজ স্ট্রিটে একটা পুরোনো বই-এর দোকান থেকে 'দ্য পেন অ্যান্ড দ্য সোর্ড' বলে একটা বই কিনেছিলাম। অনেক পুরোনো বই। তার মধ্যেই এই চিঠিটা খামসুদ্ধু পেলাম। খামের উপরে স্ট্যাম্প দেখেই মনে হল যে চিঠিটা বইয়ের থেকে অনেক বেশি পুরোনো। নেহাত কৌতূহলবশত খুলে ফেললাম। খুলে দেখি এই কাণ্ড। দক্ষিণ ইংল্যান্ডের সারের একটা অ্যাড্রেস লেখা আছে খামের উপরে। কয়েকদিন পরে যখন যাব, তখন এই চিঠিটা নিয়ে যাব।

—যিনি লিখেছিলেন, তিনি কি মারা গিয়েছেন? বলে উঠলাম।

—সেটা হওয়ারই সম্ভাবনা বেশি। না মারা গেলে অবশ্য অনেক বেশি খুশি হব।

—কিন্তু যাকে চিঠি লেখা হয়েছে, তিনি?

—নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। ইংল্যান্ডে অনেকে ১০০-র বেশি বেঁচে থাকে। না থাকলেই বা কী। তার পরিবারের কেউ না কেউ তো থাকবে। তার হাতে এ চিঠি তুলে দিতে পারলেও খুব ভালো লাগবে।

—কিন্তু এখানে এল কী করে?

—সেটা আমাকেও ভাবাচ্ছে। মনে রাখতে হবে অনেক ভারতীয় সৈন্যও কিন্তু ওদের সঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে লড়েছে অ্যালায়েন্স পাওয়ারের হয়ে। তবে সব প্রশ্নের তো উত্তর পাওয়া যায় না। সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হয়, যার উত্তর পাওয়া গুরুত্বপূর্ণ। এরকম একটা চিঠির জন্য আমি নিজে তো সারাজীবন অপেক্ষা করে বসে থাকতে পারি।

আমরা সবাই একবার করে চিঠিটা হাতে নিয়ে দেখলাম। ছোট ছোট অক্ষরে লেখা। খুব সুন্দর হাতের লেখা। কাগজটা লালচে হয়ে গেছে।

—ওই অ্যাড্রেসটা গুগলম্যাপে পেয়েছ?

—কাছাকাছি জায়গা খুঁজে পেয়েছি। ঠিক সেই জায়গার ও রাস্তার নাম বদলে গেছে। ওখানে গিয়ে খোঁজ পাওয়া যাবে আশা রাখি।

একটু থেমে অনিলিখা বলল, যদি খুঁজে পাই তোদের সবার জন্য সুইস চকলেট আনব।

আমরা সবাই হইহই করে উঠলাম।

২

আমরা সবাই জানি বাবা আর ফিরে আসবে না। শুধু মা সে কথা শুনতে চায় না। এখনও বিশ্বাস করে বাবা ফিরে আসবে। চারবছর হল যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। যারা ফেরবার, সবাই ফিরে এসেছে। বাবার এখনও কোনও খোঁজ নেই। দু-বছর আগে একটা চিঠি এসেছিল। মা চিঠিটা খাম থেকে খুলে অনেকক্ষণ ধরে চুপ করে বসেছিল। বারবার জিগ্যেস করেও উত্তর পাইনি।

দিদি বলেছিল, তাতে বাবার সম্বন্ধে কিছু খবর ছিল। দিদি পড়তে পারে। মা কিন্তু চিঠিটা কোথাও সরিয়ে রেখেছে। ও চিঠিতে কী ছিল, তা কখনও বলেনি। যখন পড়তে শিখব, তখন ওই চিঠিটা ঠিক খুঁজে নিয়ে পড়ব।

আমাদের বাড়িটা একটু নির্জন জায়গায়। কাছে একটা চার্চ আছে। লাগোয়া একটা কবরখানা। মা অনেকসময় কবরখানায় গিয়ে গাছের তলায় বসে থাকে। মনে হয় আমাদের সামনে কাঁদতে চায় না। ওখানে গিয়ে কাঁদে। আমি দূর থেকে দেখি। জানি না আমারও কেন তখন চোখে জল আসে।

আমি সবে প্রাইমারি স্কুলে যেতে শুরু করেছি। আমার বাড়ি থেকে স্কুল একঘণ্টার হাঁটা পথ। মাঝে একটা সরু নদীও পার হতে হয়। হাঁটু জল। আমার দিদিও একই স্কুলে যেত। এখন আর যায় না। মার সঙ্গে এখন বাড়িতেই থাকে।

এখানে তোমাদের জন্য বলে রাখি, আমার মা আর দিদি একদম অন্য

ধরনের। আগে এরকম ছিল না। গত দু'বছর কীরকম যেন হয়ে গিয়েছে। মা একদম অন্য রকম হয়ে গেছে। সারাদিন ধরে মাটির পুতুল বানায় আর ঘরে সাজিয়ে রাখে। সেগুলো ঠিক যেন পুতুলও নয়। মা বলে, ওদের প্রত্যেকের মধ্যে প্রাণ আছে। ওদের সঙ্গে সারাদিন কথা বলে। বিড়বিড় করে।

তার মধ্যে আমার দিকে হঠাৎ করে তাকিয়ে কোনও কোনও দিন বলে ওঠে, ওরা কী বলছে জানিস। বলছে তোদের বাবা ভালো আছে। শিগগিরি ফিরে আসবে।

আমি মন দিয়ে কথা শোনার চেষ্টা করি। মা যখন থাকে না, তখন ওদেরকে ধাক্কা দিয়েও দেখি। পুতুলগুলো কিন্তু কোনও কথা বলে না। নড়েও না।

মাকে জিগ্যেস করেছিলাম। মা বলেছে, বড় হলে ওরা আমার সঙ্গে কথা বলবে। যেমন দিদির সঙ্গে নাকি কথা বলে। কী জানি।

আমাদের অবস্থা ভালো নয়। মা সপ্তাহে কয়েক ঘণ্টার জন্য কাজ করে। যা পায়, তাতে কোনওরকমে আমাদের চলে। সেদিন স্কুল থেকে ফেরার পথে দেখলাম, মা একটা আবর্জনার স্তূপে কী যেন খুঁজছে। তারপর দেখলাম দুটো খাবারের প্যাকেট থেকে আধখাওয়া কিছু খাবার বার করে গুছিয়ে ব্যাগে রাখছে।

খুব কান্না পেল। আমি যখন বড় হব তখন এভাবে আমাদের রাস্তায় পড়ে থাকা প্যাকেটের থেকে খাবার খুঁজতে হবে না।

একদিন মাকে জিগ্যেস করলাম—মা, তুমি কি ম্যাজিক জানো?

—কেন বল তো?

—ওই যে তুমি পুতুলগুলোর কথা বোঝো।

—হ্যাঁ, তা তো জানি। ওরাও আমার কথা বোঝে।

আমার বন্ধুরা বলে আমার মা নাকি পাগল।

তবে এটা ঠিক আমার মা'র অন্যরকম কিছু ক্ষমতা আছে। মা বলে, লন্ডন শহরের তলায় একটা জায়গা আছে। সেখানে নাকি মাঝে মধ্যে যায়। আমাকে বলেছে একদিন আমাকেও নিয়ে যাবে। ওখানে যারা থাকে, তাদের নাকি অনেক ক্ষমতা। তারা বাবাকেও খুঁজে বার করতে পারবে।

সেদিন টম আমাকে একটা খেলনা বন্দুক ধার দিয়েছিল। আমি বাড়ি নিয়ে এসেছিলাম। দিদির সঙ্গে খেলছিলাম। হঠাৎ মার যে কী হল। আমাকে খুব মারল। তারপরে খেলনা বন্দুকটা ভেঙে দিয়ে বলল,—এসবের জন্যই তোর বাবাকে আর পাওয়া যাচ্ছে না।

বলে আমার হাত ধরে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে এল। বাইরে সেদিন পূর্ণিমার চাঁদ ছিল। চারদিক চাঁদের আলোয় ভাসছিল। আমাকে তারায় ভরা আকাশ দেখিয়ে বলল,—আমরা এসব হাতে নিয়ে শুধু যুদ্ধ শুরু করি। ওদের থেকে

শিখতে পারি না। ওদের দিকে তাকাবি আর ভাববি, আমরা কত ছোট। কত ছোট ছোট কারণে যুদ্ধ করি।

বলে কাঁদতে শুরু করল।

খানিকবাদে মা খেলনা বন্দুকটা ঠিক করার চেষ্টা করল। কিন্তু পারেনি। টম আমার সঙ্গে আর কথা বলে না।

আমি এখন রোজ অনেক রাত অব্দি আকাশের দিকে তাকিয়ে বসে থাকি যাতে আমার মধ্যে কোনওদিন যুদ্ধ করার ইচ্ছে না হয়।

৩

আমি কী করব বুঝতে পারছি না। আজ স্কুল থেকে ফিরে দেখি মা নেই। দিদিও নেই। দেখলাম আমার জন্য আমার খুব পছন্দের কিছু খাবার রাখা আছে। খিদে পেয়েছিল। খেয়ে নিলাম।

ভেবেছিলাম ওরা খানিকক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসবে। কিন্তু তারপরে বেশ কয়েক ঘণ্টা কেটে গেল। ওরা এখনও ফিরে আসেনি।

বাইরে অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। কোথায় খুঁজতে যাব? এখানে কাছাকাছি তো কেউ থাকে না। কেউ আমাদের সঙ্গে মেশেও না।

তবু বাইরে বেরিয়ে এলাম। বাইরে এখন ঠান্ডা পড়েছে। মা'র হাতে বোনা উলের সোয়েটারটা পরে খুঁজতে বেরলাম। হু-হু করে ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে। তাহলে কি মা'রা মাটির তলার ওই শহরটাতে গিয়েছে!

কিন্তু সে তো অনেক দূর? আমি একা কী করে যাব?

মা'র সঙ্গে এর মধ্যে একদিন গিয়েছিলাম। সে খুব ভয়ের জায়গা। সুড়ঙ্গের পর সুড়ঙ্গ। যেন গোলকধাঁধা। ঘুটঘুটে অন্ধকার। অনেকটা যাওয়ার পর একটা লেক পড়ল। মাটির নীচে এরকম আগে দেখিনি। তার দিকে তাকিয়ে মা বলল, ওখানে জলের মধ্যে মেয়েটা থাকে। যখন আমি থাকব না, এখানে আসবি। ভয় পাবি না।

জিগ্যেস করেছিলাম—ও কে মা?

—সে কথা এখন বলছি না। বললে ভয় পাবি। তবে যাদের সাহস আছে, যারা ভালো, তাদের ও কিছু ক্ষতি করে না।

—ও কি ভূত?

মা তার উত্তর দিল না। আমি মার হাতটা শক্ত করে জড়িয়ে ধরেছিলাম।

মনে হল, মা ওখানে যায়নি তো? কিন্তু আমি তো ওখানে একা একা যেতে পারব না।

ঠান্ডা হাওয়ায় কাঁপছিলাম। রাতের তারাভরা আকাশ নীচে আমার উপর নেমে আসছিল। যেন আমাকে ছুঁয়ে সান্ত্বনা দিচ্ছিল, আশ্বাস দিচ্ছিল যে আমরা সবাই তোমার সঙ্গে আছি। ভয়ে ভয়ে আবার ঘরের দিকে এগিয়ে গেলাম।

ঘরে ঢুকেই কান্না পেল। মা নেই। দিদি নেই। বাবা নেই। কেউ নেই আমার। শুধু ঘরময় সেই পুতুলগুলো। ওরাই কি এখন থেকে আমার একমাত্র সঙ্গী?

ওদের দিকে এগিয়ে গেলাম। মনে হল একটা পুতুল ঠোঁট নাড়ছে। যেন কিছু কথা বলতে চায়।

৪

জুলাই মাস। মাদ্রিদে এখন দিনের বেলা বেশ গরম থাকে। তবে আজ এখানে বেশ হাওয়া দিচ্ছে। গরমটা অতটা বোঝা যাচ্ছে না।

বিজ্ঞানী ইগন্যাকোকে ন্যাকো বলেই চেনে সবাই। শুধু স্পেন কেন সারা বিশ্বের কম্পিউটার জগতের সঙ্গে যুক্ত বিশেষজ্ঞরাই ন্যাকোকে চেনে। তার কারণ আরও উন্নত দেশের বিজ্ঞানীরাও যা করতে পারেননি, সেই কোয়ান্টাম কম্পিউটার তৈরি করেছেন উনিই প্রথম।

কাজটা সহজ ছিল না। একটা সাধারন কম্পিউটার ০ আর ১-এর বাইরে ভাবতে পারে না। কোয়ান্টাম কম্পিউটার সেখানে কিউবিটের উপরে নির্ভর করে কাজ করে যার মান ০ থেকে ১-এর মধ্যে যা কিছু হতে পারে। এই কম্পিউটার অ্যাটমের লেভেলে গিয়ে কাজ করে। একটা অ্যাটম ঘূর্ণমান অবস্থায় একটা মুহূর্তে একই সঙ্গে ২৫ শতাংশ উপরের দিকে আর ৭৫ শতাংশ নীচের দিকে থাকতে পারে। এভাবে ঘূর্ণমান অ্যাটমের অভিমুখের ওপরে নির্ভর করে সাধারণ কম্পিউটারের থেকে এ ধরনের কম্পিউটার অনেক বেশি তথ্য রাখতে পারে। তাই কোয়ান্টাম কম্পিউটার স্পিড আর পারফরমেন্সে যুগান্তকারী পরিবর্তন আনবে।

অনেকেরই ধারণা এরকম একটা আবিষ্কারের জন্য ন্যাকো নোবেল পুরস্কার পেতে চলেছেন। একটা বিখ্যাত কম্পিউটার কোম্পানি ওঁর আবিষ্কারের ওপরে নির্ভর করে একটা অত্যাধুনিক ল্যাব বানাচ্ছে। ন্যাকোর জন্ম স্পেনে হলেও কর্মজীবনের একটা বড় অংশ কেটেছে সুইজারল্যান্ডে। জুরিখে। তবে আবার এক বছর হল ন্যাকো স্পেনে ফিরে এসেছেন।

গাড়ি থাকলেও মেট্রোতেই যাতায়াত পছন্দ ন্যাকোর। গ্র্যান ভিয়া স্টেশনে নেমে বাইরে বেরিয়ে এল ন্যাকো। এটাই প্রায় মাদ্রিদের কেন্দ্র। মাদ্রিদের জমজমাট শপিং স্ট্রিট। এখন এখানে এ সময়ে উৎসবের মেজাজ। রাস্তা যেন লোকের ভিড়ে

হারিয়ে গেছে। এখানেই কিছু দূরে আছে স্পেনের রয়্যাল প্যালেস স্পেনের বর্তমান রাজা অবশ্য থাকেন শহরের বাইরে জারজুয়েলা প্যালেসে।

কাছেই দ্য কাফে মাদ্রিদে এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করার ও ডিনার খাওয়ার কথা। হঠাৎ একজন মাঝারি হাইটের ইংলিশ টুরিস্ট একটা কাগজ দেখিয়ে একটা অ্যাড্রেস জিজ্ঞাসা করল।

এখন সবাই গুগল ম্যাপে ঠিকানা খুঁজে নেয়। তবু ন্যাকো যতটা সম্ভব ডিরেকশান দেওয়ার চেষ্টা করলেন। জায়গাটা পাঁচ মিনিটের থেকে বেশি দূরে নয়।

লোকটা ডিরেকশন নিয়ে ধন্যবাদ জানিয়ে এগিয়ে গেল।

রাস্তা উপরের দিকে উঠে গেছে। এগোতে গিয়ে ন্যাকোর মনে হল শরীরটা কীরকম লাগছে। অবাক হয়ে লক্ষ করল ডানহাতে কী একটা সাদা পাউডার লেগে আছে। কখন লাগল? এটা কী? নাকের কাছে এনে গন্ধ শুঁকে বোঝার চেষ্টা করল। মাথাটা কেমন যেন ঘুরে গেল। একটু দূরে একটা বেঞ্চ আছে। তার উপরেই টলতে টলতে গিয়ে বসে পড়ল ন্যাকো। খানিকক্ষণের মধ্যে মনে হল নিজের বুদ্ধির উপরে নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছে। সাহায্যের জন্য চিৎকার করে উঠতে চাইল। কিন্তু কথা বেরোল না। চোখের সামনে আস্তে আস্তে অন্ধকার নেমে এল মুহূর্তের মধ্যে।

দূর থেকে ওই লোকটা এতক্ষণ ন্যাকোকে লক্ষ করছিল। কাছে এসে একটা সাদা কাগজ পাশে ফেলে দিয়ে গেল। তাতে ঠজ্জড লেখা।

৫

সুইডেনের স্টকহোম। আরল্যান্ডা এয়ারপোর্ট থেকে গাড়িতে করেই যেতে পারত হ্যান্স। কিন্তু তা না করে হ্যান্স আরল্যান্ডা এক্সপ্রেসের টিকিট কেটে উঠে বসল। অনেক তাড়াতাড়ি যাওয়া যাবে। আসলে এ শহরের সব রাস্তাঘাটই হ্যান্সের চেনা। এখন আমেরিকায় থাকলেও একটা বড় সময় এখানে কাটিয়েছে হ্যান্স। এখানকার রয়্যাল ইনস্টিউট অফ টেকনোলজিতে পড়াশোনা হ্যান্সের। এখানে থাকাকালীনই ও প্রথম ভেবেছিল একটা বিশেষ সোশ্যাল নেটওয়ার্কের কথা। তখনও ভাবেনি যে ওর এই সোশ্যাল নেটওয়ার্ক তিন বছরে এত জনপ্রিয় হয়ে উঠবে।

এখানে ও গেমিফিকেশনকে ব্যবহার করেছে। অর্থাৎ যে যত সময় ওর নেটওয়ার্কে থাকবে, যত বেশি বিষয়ে বা আলোচনায় অংশগ্রহণ করবে, যে যত বেশি জনকে বা যত বেশি সংস্থাকে বিচার করে নাম্বার দেবে, সে তত বেশি পুরস্কৃত হবে। পুরস্কার মানে টাকা পয়সা কিছু না। সোশ্যাল নেটওয়ার্কে সেই

লোকটির স্ট্যাটাস বাড়বে। যার ভিত্তিতে ভিসা, হোটেল, বন্ধু পাওয়া আরও সহজ হবে।

ব্যাপারটা যে এত জনপ্রিয় হয়ে উঠবে তা নিজেই ভেবে উঠতে পারেনি। এখন অনেকে দিনের পর দিন রাতেও না ঘুমিয়ে ওর নেটওয়ার্কে কাটায়। এই তো সেদিন একটা ষোল বছরের ছেলে হার্ট অ্যাটাকে মারা গেল। তার নাকি এমন নেশা হয়ে গিয়েছিল যে আঠেরো দিন একটানা নেটওয়ার্কে ছিল। অনেকে আশেপাশের মানুষের কথাও খেয়াল রাখে না। তারা শুধু থাকে তাদের এই ভারচুয়াল জগতের বন্ধুদের সঙ্গে। অনেকে ভুলেও যায় বাইরের বাস্তব জগতের অস্তিত্বের কথা। সবকিছুর থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে এই নেটওয়ার্কিং স্ট্যাটাসের মোহ।

এই তো ক'দিন আগের কথা। এক বছর তিরিশেকের লোক নাকি খেলতে খেলতে এটাও খেয়াল করেনি যে তার বাবা দুদিন আগে মারা গেছে। ওরা দুজনেই থাকত সে বাড়িতে। বাবার মৃতদেহ দুদিন ধরে বাড়িতেই দোতলার ঘরে পড়েছিল। ভাগ্যিস সে ঘরের জানলা খোলা ছিল। এমন গন্ধ বেরোতে শুরু করে যে পাশের বাড়ি থেকে প্রতিবেশী চলে এসে মৃতদেহ আবিষ্কার করে। এসে দেখে ছেলে তখনও খেলে যাচ্ছে।

আজ তাই হ্যান্সের নাম পৃথিবীর সবথেকে বড়লোকেদের তালিকায়। নিজস্ব কুড়িটারও বেশি প্রাইভেট জেট আছে। সারাক্ষণ মিডিয়ার সামনে থেকে থেকে ও যেন একটু হাঁফিয়ে উঠেছে ইদানীং।

তাই মাঝেমধ্যে হ্যান্সের ভালো লাগে একদম সাধারণের মতো করে কিছু সময় কাটাতে। যখন আশেপাশের কেউ ওকে বিলিওনেয়ার হ্যান্স বলে চিনবে না। ও যখন ফিরে যেতে পারবে ওর কলেজের দিনগুলোতে। ওকে অন্তত কিছুটা সময় মুহূর্তের হিসেবে কাটাতে হবে না।

তাই মাঝে মধ্যে ও যখন পৃথিবীর নানান প্রান্তে যায়, তখন হাতে গোনা বিশেষ কিছু লোক ছাড়া আর কেউ সে যাওয়ার কথা টের পায় না।

এখন রাত ন'টা। ট্রেনের ফার্স্ট ক্লাসে ও বাদে আর একজনই আছে। বাইরে এখনও দিনের উজ্জ্বল আলো আছে। এখানে এখন রাত বারোটা অব্দি আলো থাকে। আবার চারটেতে ভোর হয়ে যায়।

স্টকহোমে এবারে অবশ্য কয়েকটা কারণে আসা। তার মধ্যে একটা বিশেষ কারণ অ্যালফা এক্সের মিটিং। অ্যালফা এক্সের কথা সারা বিশ্বে খুব কম লোকই জানে। অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে একটা নির্দিষ্ট সিলেক্ট গ্রুপে এ বিষয়ে আলোচনা হয়। কী এই অ্যালফা এক্স?

এরা হল এক বিশেষ মানবগোষ্ঠী। বিশ্বের কয়েকজন বিলিওনেয়ার মিলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, একটা বিশেষ মানবগোষ্ঠীর দরকার যারা অন্য সবার থেকে

আলাদা হবে। যারা বুদ্ধিতে-মেধায় অন্য সবার থেকে অনেক এগিয়ে থাকবে। সেটা তৈরি করতে যা খরচ হবে তা সে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং হোক, বা কোনও চিপ ইমপ্লানট হোক, তার খরচ বহন করবে এই গ্রুপ। পরিবর্তে এই মানবগোষ্ঠী নতুন যা আবিষ্কার করবে তার থেকে পাওয়া মেধাসম্পদে শুধু অধিকার থাকবে এই গ্রুপের। অ্যালফা এক্সের। এবিষয়ে কিছু দরকারি মিটিং হবে এবারে এখানে।

ট্রেনে চেপে স্টকহোম শহরের কেন্দ্রে পৌঁছতে মিনিটকুড়ি সময় লাগে। ট্রেন থেকে নেমে স্টেশন থেকে বেরিয়ে আসে হ্যান্স। ফাঁকা রাস্তা। নিশ্চিন্তে রাস্তা দিয়ে হেঁটে এগিয়ে যায় পাশের ম্যারিয়ট হোটেলের দিকে।

একটা লোক ওর পিছন পিছন আসছে। ট্রেনের ওই লোকটা কি?

সর্বনাশ, ওকে দেখে চিনতে পেরে গেছে। যেভাবে সারাক্ষণ দেশে-বিদেশে খবরে ওকে দেখায়, তাতে চিনে ফেলাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

—আচ্ছা, সিটি হল টাওয়ারটা কোথায়?

এখানকার সবাই সিটি হল টাওয়ার চেনে। নির্ঘাত টুরিস্ট হবে। সাদার্ন-ইংল্যান্ডের লোকের অ্যাকসেন্ট। মাঝবয়সি লোক। বেশ সম্ভ্রান্ত দেখতে।

—এখান থেকে পাঁচ মিনিট হাঁটা পথ। বলে লোকটাকে ডিরেকশন দেয়।

লোকটা ধন্যবাদ জানিয়ে হ্যান্ডশেকের জন্য হাত বাড়িয়ে দেয়। একটু দ্বিধা নিয়ে হ্যান্ডশেক করে হ্যান্স। তারপর হ্যান্স এগিয়ে যায় ম্যারিয়ট হোটেলের দিকে। কিন্তু হঠাৎ যেন অসহ্য মাথা যন্ত্রণা শুরু হয়। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। পায়ের তলার মাটি যেন কেঁপে ওঠে। কোনওরকমে রাস্তাতেই বসে পড়ে। উঠতে গিয়ে দেখে উঠতে পারছে না। কথা বলার ক্ষমতাও হারিয়েছে। তার পরেই চোখে ঘন অন্ধকার নেমে আসে।

একটা লোক দূরে অপেক্ষা করছিল। মাটিতে শুয়ে পড়া হ্যান্সের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় একটা সাদা চিরকুট ফেলে যায়। তাতে লেখা ঠক্সড।

৬

অফিসের কাজের পরে লন্ডনের কেন্সিংটন গার্ডেনের মধ্যে দিয়ে হাঁটছিল অনিলিখা। এখানেই কেন্সিংটন প্যালেস। ইংল্যান্ডের যুবরাজ এখানেই থাকেন। একসময় প্রিন্স চার্লস ও প্রিন্সেস ডায়ানা থাকত এখানে। কিছুদিন আগে প্রিন্স হ্যারির বিয়ের সময়ও সব মিডিয়ার নজর ছিল এখানে।

অনিলিখার কাছে কেন্সিংটন গার্ডেনের আকর্ষণ অবশ্য তার জন্য নয়। এই বাগানের মূল আকর্ষণ বাগানের মধ্যের বড় লেক। দেশ-বিদেশের নানান ধরনের হাঁস আছে এখানে।

অফিসের একটা দরকারি মিটিং সবে শেষ হয়েছে। তার পরেই অফিস থেকে বেরিয়ে এসেছে। মিটিং-এর কথা ভাবতে ভাবতে একটু অন্যমনস্ক হয়ে হাঁটছিল অনিলিখা।

হঠাৎ মাঝারি হাইটের সোনালি চুলের সুদর্শন এক সাহেব এসে জিগ্যেস করল, ম্যাডাম, ক'টা বাজে?

অনিলিখা ফোন দেখে উত্তর দেওয়ার আগেই উত্তর এল, জাইকা—৬টা। —বলেই লোকটা ধন্যবাদ জানিয়ে চলে গেল।

লোকটাকে এক ঝলক দেখলেও লোকটার তীক্ষ্ণদৃষ্টি মনে রাখার মতো।

জাইকা কোথায় তা ভালোই জানে অনিলিখা। এখান থেকে পাঁচ মিনিটের পথ।

কিন্তু লোকটা কে? যাবে কি?

এখন চারটে। নিশ্চয়ই লোকটা এটাও জানে যে, অনিলিখার অফিস কাছেই। তা না হলে এতক্ষণ এখানে থাকবে ধরে নিত না। কী-ই বা হবে? কৌতূহল নিরসনের জন্যই অন্তত যাওয়া দরকার।

ঠিক ছ'টার সময় ওই রেস্টুরেন্টের সামনে যেতেই অনিলিখা খেয়াল করল লোকটা কিছু দূরে দাঁড়িয়ে আছে। ওকে দেখে হাঁটতে শুরু করল।

অনিলিখা লোকটার পিছু পিছু হাঁটতে শুরু করল। লোকটা মিনিট পাঁচেক পরে পুরোনো দিনের একটা ভিক্টোরিয়ান বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে একটু থেমে একবার মুখ ঘুরে তাকিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল।

অনিলিখাও ভেতরে ঢুকে এল। ঢোকার পরেই একটা লম্বা বারো ফুট চওড়া লবি। পাশ দিয়ে পর পর ঘর।

তার একটাতে লোকটা অনিলিখার মুখোমুখি এসে বসল।

একটা কার্ড এগিয়ে দিল অনিলিখার দিকে—আমার নাম মাইক। আমি MI 6-এ কাজ করি। একটা বিশেষ কারণে আপনার সাহায্য চাই। বিজ্ঞানী মহলে আপনি দেশ-বিদেশের অনেককেই চেনেন। গত আট সপ্তাহে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ও ইংল্যান্ডে চারজন নামকরা বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ মারা গেছেন। আপাতদৃষ্টিতে হার্ট অ্যাটাক মনে হলেও, আমরা পরে জানতে পেরেছি যে এদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রে এক বিশেষ নার্ভ এজেন্ট ব্যবহার করা হয়েছিল। যে নার্ভ এজেন্ট ব্যবহার করা হয়েছে, তার সঙ্গে আমরা এখনও অব্দি পরিচিত নই। তবে অত্যন্ত শক্তিশালী কোনও নার্ভ এজেন্ট যাতে পাঁচ মিনিটের মধ্যে মৃত্যু হচ্ছে। এদের মধ্যে আছেন স্পেনের কম্পিউটার বিজ্ঞানী ইগন্যাকো লোপেজ, সুইডিশ প্রযুক্তিবিদ ও ব্যবসায়ী 'লস্ট ইন টাইম' সোশ্যাল নেটওয়ার্কের অধিকর্তা হ্যান্স মারগোলিস, বিখ্যাত জার্মান প্রযুক্তিবিদ ম্যারিও হ্যাবারমান, বিখ্যাত সুইস সায়েন্টিস্ট ও ব্যবসায়ী মাইকেল থাম।

পরপর নামগুলো বলে গেল লোকটা।

—এদের সঙ্গে আপনার আলাপ ছিল?

—আমি এদের নাম ও কাজের সঙ্গে পরিচিত। এদের মধ্যে কয়েকজনের সঙ্গে আমার বিভিন্ন কনফারেন্সে দেখা হয়েছে, তবে তার বেশি তেমন কোনও পরিচয় ছিল না। আমিও এদের অকাল মৃত্যুর খবর পেয়ে খুব অবাক হচ্ছিলাম। ভাবছিলাম এ কি হচ্ছে? এ কি অতিরিক্ত টেনশন-কাজের চাপের জন্য। খবরটা হার্ট অ্যাটাক হিসেবেই দেখানো হয়েছে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে।

—হ্যাঁ, আমরাই চাইনি কোনও প্যানিক তৈরি হোক এর জন্য। বুঝতেই পারছেন, এরা শুধু নামী সায়েন্টিস্টই নন, প্রত্যেকেই মাল্টিবিলিওনেয়ার। প্রচণ্ড বড়লোক। তা এদেরই যদি আমরা নিরাপত্তা না দিতে পারি, তাহলে সাধারণ মানুষ কী ভাববে। তা ছাড়া এখানে এমন একটা নার্ভ এজেন্ট মারণাস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে যার কথা আমরা এখনও কেউ জানি না।

—তা আপনাদের কি মনে হয় কোনও টেররিস্ট সংস্থা এর পিছনে আছে?

—হ্যাঁ, প্রাথমিকভাবে তাই সন্দেহ করা হচ্ছে। এর পিছনে রাশিয়ার মতো কোনও দেশের সরকারও থাকতে পারে। খুব সংগঠিত না হলে এরকমভাবে মারা যেত না। কোনও সাক্ষীও পাওয়া যায়নি। যেই করে থাকুক না কেন, খুব প্রস্তুতির সঙ্গে নেমেছিল। আর প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আক্রান্তের পাশে আবার একটা কাগজ ফেলে গেছে। প্রথম খুনের পরে লেখা ছিল ঠজ্জড. দ্বিতীয় খুনের পরে ঠজ্জ্রড, তৃতীয় খুনের পরে ঠড্ডড, চতুর্থ খুনের পরে ঠঞ্জড—এই দেখুন বলে মাইক ফোনে পরপর কাগজ থেকে তোলা ছবি দেখাল।

—অনিলিখা ছবিগুলো খেয়াল করে দেখল। চারটে কাগজ। ডটপেনে লেখা। ঠজ্জড ঠজ্জ্রড ঠড্ডড ঠঞ্জড

—কোনও সংগঠনের নামের শুরুর আদ্যক্ষর?

—নাহ্, ওরকম নামের কোন সংগঠন নেই। অন্য কিছু।

অনিলিখা আবার ফোনের ছবিটা নিয়ে একটু ভালো করে দেখল। ফের বলল, 'আরেকটা জিনিস হতে পারে। তাড়াতাড়ি করে

লেখার জন্য এরকম লাগছে। চতুর্থ কাগজটায় যেটা আছে সেটা কিন্তু ঠঞ্জড নয়। মনে হচ্ছে একটা স্কোয়ার।'

—তাই নাকি?

একটু ভালো করে দেখে অনিলিখা ফের বলল, এবারে মনে হচ্ছে বুঝতে পারছি।

—কি? কী হতে পারে?—মাইক উৎসাহিত হয়ে বলল।

—ট্যালিমার্ক। সিম্পলি ১ ২ ৩ ৪ লিখেছে ট্যালি মার্কে।

—কিন্তু ট্যালিমার্ক তো অন্যরকম হয়।

—না, সাউথ আমেরিকায় এরকমভাবে আগে ট্যালিমার্ক দেওয়া হতো। আপনি ভেরিফাই করে নেবেন। কিন্তু আমি মোটামুটি নিশ্চিত।

—তাই? এক্সেলেন্ট ইনফরমেশন।

—এতে দুটো জিনিস বোঝা যায়। এক, এই সব ঘটনার পিছনে যে একজন বা একই সংস্থা আছে তা সে আপনাদের জানাতে চায়। একইসঙ্গে সে আপনাদের চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে। আরও করবে, এরকম হুঁশিয়ারি দিচ্ছে। দুই, তার অঙ্কে যথেষ্ট আগ্রহ আছে। খুব সম্ভবত লোকটি দক্ষিণ আমেরিকার। তা না হলেও ওই ট্যালি মার্কের সঙ্গে পরিচিত হওয়া প্রায় অসম্ভব।

—তা আপনার চেনা তেমন কেউ আছে, যাকে আপনার সন্দেহ হয়?

—না সেরকম কারুর কথা মাথায় আসছে না। আপনি এখানকার বিজ্ঞানীদের ও প্রযুক্তিবিদদেরও জিগ্যেস করুন।

—হ্যাঁ, তা আমরা অবশ্যই করব। একইসঙ্গে আপনাকেও সাবধান করে দিই। যারা মারা গেছেন তাদের সঙ্গে আপনার প্রোফাইলও খানিকটা মিলে যায়। বুঝতেই পারছেন আমাদের দিক দিয়ে সতর্ক করে দেওয়াটা উচিত। আমরা এখানকার কিছু সায়েন্টিস্ট যারা টার্গেট হতে পারে, তাদের সতর্ক করে দিয়েছি। খবরটা আমরা মিডিয়ার থেকে দূরে রেখেছি যাতে কোনওরকম প্যানিক না হয়। একইসঙ্গে ইন্টারপোলের ও ইউরোপের বিভিন্ন ইনটেলিজেন্স এজেন্সির সঙ্গে কাজ করছি আমরা।

আরও খানিকক্ষণ কথা বলার পরে অনিলিখা ওই বাড়িটা থেকে বেরিয়ে এল। সাড়ে সাতটা বাজে। সারাদিন গরম থাকলেও এখন ঠান্ডা মিষ্টি হাওয়া দিচ্ছে। রাস্তায় দেশ-বিদেশ থেকে বেড়াতে আসা টুরিস্টের ভিড়। শেষ বিকেলের আলোয় লন্ডন আরও রূপসী হয়ে উঠেছে।

৭

আগে এ জায়গাটা লন্ডনের থেকে বেশ খানিকটা দূরে ছিল। কিন্তু শহর হাত-পা ছড়াতে ছড়াতে একে প্রায় কাছে টেনে নিয়েছে।

চিঠির অ্যাড্রেসটা নিয়ে বেশ রিসার্চ করে এসেছিল অনিলিখা। তাই গুগল ম্যাপে ঠিকানাটা পাওয়া না গেলেও বাড়িটা খুঁজে পেতে বিশেষ অসুবিধে হল না। বাড়িটায় এখন কেউ থাকে না। একতলা ছোট বাড়ি। বাইরের বাগান বড় ঘাসে-আগাছায় ছেয়ে গেছে। বাড়ির পাশে একটা বড় বার্চ গাছ। বাড়িটাতে যে কেউ অনেকদিন থাকে না তা নিশ্চিত। কিছু দূরে একটা চার্চ আর কবরখানা।

কাকে জিগোস করা যায় ভাবতে ভাবতে একটু দূরে একটা স্কুল চোখে পড়ল।

স্কুলের রিসেপশন থেকে একজন লোকের ঠিকানা পাওয়া গেল যিনি নাকি এখানে বহুবছর ধরে আছেন। একসময় লোকাল কাউন্সিলারও ছিলেন। উনি জানতেও পারেন।

সে ঠিকানার মালিককেও খুঁজে পেতে অসুবিধে হল না। স্টিভ মেজ। অনেক বয়স হয়েছে। দেখে মনে হয় আশির কাছে বয়স হবে।

ওই ঠিকানায় ১৯৪০ নাগাদ কে থাকত জিগ্যেস করতে একটু আগ্রহী কড়া চোখে তাকিয়ে নিলেন অনিলিখার দিকে।

—আপনি কোনও সাংবাদিক নন তো?

—না, না। আমার আসলে ওই পরিবারের যে-কোনও জীবিত সদস্যের সঙ্গে দেখা করার খুব দরকার ছিল। একটা বিশেষ জিনিস দেওয়ার ছিল।

—এ গ্রামের, হ্যাঁ, তখন এটা গ্রামই ছিল। আগে তো এত লোক এখানে থাকত না। তখন লন্ডনের সঙ্গে এখানকার এত ভালো যোগাযোগও ছিল না। সে আমার ছোটবেলার কথা। গ্রামের ওই দিকটা ছিল একদম ফাঁকা ফাঁকা। আমার বাড়ি থেকে বারণ ছিল ওই দিকটায় যেতে। শুনেছিলাম ওখানে এক পাগলী মহিলা থাকত। তার সঙ্গে থাকত তার এক ছেলে আর এক মেয়ে। মহিলার স্বামী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মারা যান। তারপর একদিন নাকি রাতারাতি ওই মহিলা আর ওঁর মেয়ে উধাও হয়ে যায়।

ওই মহিলা নানান ধরনের ব্ল্যাক ম্যাজিক জানত। আমি অবশ্য তাকে দেখিনি কখনও। ওর ছেলে, কি যেন নাম ছিল তার, বিল, নাহ্ নামটা ঠিক মনে পড়ছে না, সেও ভারি অদ্ভুত ছিল। আমার থেকে দু-বছরের বড় ছিল। কারুর সঙ্গে মিশত না। আমরা সবাই হাসাহাসি করতাম ওকে নিয়ে। ওর মা আর বোনের উধাও হওয়ার এই ঘটনাটা ঘটার পরে ওকে নিয়ে ওর এক কাকা এখান থেকে চলে যায়। বাড়িটা বিক্রি করে দেয়।

তারপরে এক ইতালিয়ান পরিবার ছিল কয়েকবছর। কিন্তু ওখানে আসার পরেই ওদের পরিবারেও পরপর অঘটন ঘটতে থাকে। ওঁর স্ত্রী প্রথমে মারা যায়। তার পর ওঁর ছেলেও একবার ভয় পেয়ে খুব অসুস্থ হয়ে পড়ে। তিন বছর বাদে বাড়ি বিক্রি করে চলে যান। তারপর ওই বাড়ি তিনবার হাতবদল হয়। কিন্তু যারাই এসেছে, তারা বেশিদিন ওই বাড়িতে টিকতে পারেনি। এতটাই বদনাম হয়ে গেছে, যে গত কুড়ি বছর আর কেউ থাকে না ওখানে।

—তা ওই ছেলেটা কোথায় এমন জানা আছে?

—এত বছর আগের ঘটনা, কেউই জানবে না।

—তাহলে কোনও ভাবে ওর ঠিকানা জোগাড় করা সম্ভব নয়। আসলে আমার একটা খুব দরকারি চিঠি দেওয়ার ছিল।

একটুক্ষণ চুপ করে ভাবল জন। তারপরে বলল, একটা উপায় আছে। শুনেছিলাম ছেলেটা রেডিং গ্রামার স্কুলে ভর্তি হয়েছে। ওদের কাছে খোঁজ করা যেতে পারে। ওখানে প্রত্যেক স্টুডেন্টের রেকর্ড থাকে। তবে ষাট বছর আগের কথা। রেডিং গ্রামার স্কুল আপনি গুগলে সার্চ করলেই পেয়ে যাবেন।

আর বেশি সময় ছিল না ওখানে অনিলিখা। ওখান থেকে বেরিয়ে আরও দু-তিনজনকে জিগ্যেস করেছিল কিন্তু কেউই বলতে পারেনি।

৮

আমাকে সবাই পাগল ভাবে। ভাবে আমিও আমার মার মতো, বোনের মতো। হয়ত তাই।

আমি একা থাকতে ভালোবাসি। আসলে বাতাসে যে সুর ভেসে বেড়ায়, সে সুর শোনার মধ্যে একটা নেশা আছে। আর কোনও কথা শুনতে ভালো লাগে না। আমি তাই সময় পেলেই বাইরে চলে এসে সে সুর শুনি। নীল আকাশের তলায় বসে থাকি। কখনও ঘাসের উপরে শুয়ে পড়ে আকাশ দেখি। গায়ের উপরে প্রজাপতি এসে বসে। পোকারা গায়ের উপর দিয়ে হেঁটে যায়। পাশে হলুদ ঘাসফুল দোলা দেয়। হাওয়া দিলে মাথার উপরের গাছগুলো আমার গায়ে পাতার চাদর বিছিয়ে দেয়। সরু সরু ডাল আর পাতায় ভরা মাথা ঝাকিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলে। ওদের নিয়ে বেশ থাকি।

ক্লাস আমার ভালো লাগে না। আমি যে সব সাবজেক্টে খারাপ রেজাল্ট করি, তা কিন্তু নয়। অনেকে বলে আমি নাকি অংকে জিনিয়াস। কেন বলে জানি না।

আসলে সংখ্যাগুলো যেন আমার সঙ্গে কথা বলে। আমাকে যখন কোনও অংক করতে দেওয়া হয়, সংখ্যা দিয়ে কোনও কিছু করতে দেওয়া হয়, তখন ওদের দিকে তাকালেই মনে হয় ওদেরও যেন আমার মতোই হাত-পা আছে। আমার মতোই একটা নাম আছে—চরিত্র আছে। মনে হয় ওদের আমি অনেক আগে থেকেই চিনি।

তাই সবাই যখন দুটো সংখ্যাকে গুণ করে, ভাগ করে পাতা ভরায়, আমি তখন ওদের মধ্যে মিল দেখি, প্যাটার্ন খুঁজে বার করি। কী করে জানি

না. উত্তরটা আমার চোখের সামনে চলে আসে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে।

যখন টিচার জিগ্যেস করে কী করে ওই রেজাল্টটা পেয়েছি, তখন বলতে পারি না। ওরা আগে ভাবত আমি লুকিয়ে লুকিয়ে ক্যালকুলেটর ব্যবহার করি। কিন্তু এখন বুঝতে পারে যে আমি তা করি না।

দুটো লোক একসঙ্গে এলে কী করব বুঝতে পারি না। কিন্তু কয়েকটা সংখ্যা একসঙ্গে দিলে কী কী হতে পারে, তা আমি সেই মুহূর্তে বুঝে যাই। ওরা অবাক হয়, ভাবে আমার বুঝি অন্যরকম কোনও ক্ষমতা আছে। ওরা বুঝতে পারে না যে, সংখ্যাগুলোর একটা ভাষা আছে। তারা যেন আমার সঙ্গে ঠিক সেই ভাষায় কথা বলে।

মা ঠিকই বলত। পুতুলগুলোও নিশ্চয়ই কথা বলে। আমি শুধু বুঝি না। যখনই সময় পাই, ওদের সামনে গিয়ে বসি। বোঝার চেষ্টা করি। ওরাই হয়তো আমাকে কোনওদিন বলে দেবে আমার মা আর দিদি কোথায় আছে।

আমি শহরের তলার ওই জায়গাটা খোঁজারও অনেক চেষ্টা করেছি। কোথা দিয়ে নীচে ঢুকতে হয়, কিছুতেই মনে পড়ে না। একদিন খুঁজতে খুঁজতে অনেক দূরে চলে গিয়েছিলাম। রাস্তা চিনে আর ফিরে আসতে পারছিলাম না। একজন পুলিশ একা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে দেখে আমাকে ধরল। অনেক প্রশ্ন করল। তারপর আমাকে ধমক ধামক দিয়ে আমার হোস্টেলে পৌঁছে দিল।

তোমাদের বলা হয়নি। আমি এখন একটা অন্য জায়গায় থাকি। একটা-হোস্টেলে।

আমার এক কাকা আছে। আমাদের ওই বাড়িটা বিক্রি করে আমাকে এখন এই হোস্টেলে রেখে গেছে। কাকাই আমার গার্জেন। তবে বেশি দেখা হয় না। দু-মাসে এক বার এখানে আসে।

সেদিন স্কুল থেকে সবার সঙ্গে একটা সমুদ্রতীরে গিয়েছিলাম। বালির বীচ। সেখানে স্কুল থেকে নানান ধরনের খেলাধুলোর আয়োজন করেছিল। আমি এক ফাঁকে পালিয়ে দূরে সরে এসেছিলাম। সমুদ্রের জলের মধ্যে গিয়ে বসেছিলাম। ঢেউ-এর মধ্যে সূর্যের আলোয় মণিমুক্তো ভেসে বেড়াচ্ছিল। চকচক করছিল। কখন জানি আস্তে আস্তে আমার দিকে এগিয়ে এসেছিল।

আমার সঙ্গে কেউ এরকম ভাবে মেশেনি। যত ওদের কাছে যাওয়া যায়, তত ভালো ওদের কথা বোঝা যায়। আমিও তাই এগিয়ে যাচ্ছিলাম। ওরা আমাকে নিয়ে লোফালুফি করে খেলছিল।

কতক্ষণ এরকম জলের মধ্যে ছিলাম জানি না। আমি নাকি প্রায় ডুবে গিয়েছিলাম। আমাকে ওরা জল থেকে উদ্ধার করে। আমাকে সেদিন খুব বকুনি খেতে হয়েছিল। বারবার বলছিল, আমি যেন আর কখনও জলের কাছে না যাই।

ভাগ্য ভালো ছিল তাই বেঁচে গেছি।

যখন বাসে উঠলাম, ওরা তখনও দূর থেকে ডাকছিল। স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলাম। আবার কোনওদিন আমি ওদের কাছে যাব।

৯

ইংল্যান্ডের কিংস কলেজের জেনোমিকস সেন্টারে কাজ করেন প্রফেসার ব্রায়ান লেনক্স। একটা সময় অ্যালজাইমার নিয়ে গবেষণা করছিলেন। কী কারণে অ্যালজাইমার হয়, কেন অ্যালজাইমার পেশেন্টদের সংখ্যা ইদানীং এত বেড়েছে, সেসব নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে জেনোম সিকোয়েন্স নিয়ে ইন্টারেস্টেড হয়ে যান। কোন জিন এর জন্য দায়ী সেটা যদি জানা যায় তাহলে অ্যালজাইমারের মতো অসুখের চিকিৎসা সম্ভব হবে। কিন্তু সে গবেষণা করতে গিয়ে উনি অন্য একটা বিষয়ে আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

বিজ্ঞানীরা জানেন, একটা লোকের বুদ্ধিমত্তা বা আই কিউ-এর রহস্যের অনেকটাই জিনগত। অর্থাৎ একটা ছেলে বা মেয়ে কতটা বুদ্ধিমান হবে, তা অনেকটাই নির্ভর করে তার বাবা ও মা কতটা বুদ্ধিমান তার উপরে। কিন্তু কী সেই জিন যা মানুষকে বুদ্ধিমান করে তোলে?

দেখেন প্রায় পাঁচশোর বেশি জিন এর পিছনে দায়ী। কিন্তু বিশেষ একটা জিন IGF2R-এর একটা বড় ভূমিকা থাকে। অর্থাৎ জিন এডিটিং টেকনোলজির সাহায্যে এই জিনে পরিবর্তন এনে কাউকে বেশি বুদ্ধিমান করে তোলা সম্ভব। এ বিষয় নিয়েই ওঁর গবেষণা। এ বিষয়ে সাম্প্রতিককালে বেশ কিছু সাফল্য পেয়েছেন।

একটা প্রাইভেট ল্যাবের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এ বিষয়ে গবেষণা করছেন। মূল উদ্দেশ্য ভ্রূণ স্তরে জিনে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনা যাতে বুদ্ধিমান শিশু তৈরি করা যায়। বলা যায় প্রায় প্রত্যেক পিতামাতাই চান যে তাদের সন্তান বুদ্ধিমান হোক। কিন্তু সবাইকে তো সে সুযোগ দেওয়া সম্ভব নয়। তাই সামান্য কয়েকজনকে আকাশছোঁয়া মূল্যের বিনিময়ে এ সুযোগ দেওয়া হচ্ছে।

শনিবার সন্ধেবেলা। খানিকক্ষণ হল পাব থেকে ফিরেছেন। এই একটা দিন পুরোনো কিছু বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হয়, আড্ডা হয়। এরকম ঝকঝকে আকাশ আর রোদের দেখা লন্ডনে আর ক'দিন মেলে। তাই আড্ডাটা আজ একটু বেশি হয়েছে।

হঠাৎ কলিংবেলের আওয়াজ পেলেন। টালমাটাল অবস্থায় বেরিয়ে এলেন। কিন্তু বাইরে কেউ নেই।

খেয়াল করলেন পার্সেলে কিছু একটা এসেছে। ঘরের বাইরে রাখা আছে। এরকম কোনও পারসেল তো আসার কথা ছিল না।

কার কাছ থেকে আসতে পারে?

উপরে প্রেরকের নাম, ঠিকানা লেখা আছে। ডেভিড কো। নামটা তো চেনা লাগছে না। ইয়র্কশায়ার থেকে চিঠিটা এসেছে। ছোটবেলায় বেশ খানিকটা সময় ইয়র্কশায়ারে কাটিয়েছেন। হ্যাঁ, মনে পড়েছে, ডেভিড বলে এক বন্ধু ছিল বটে। কিন্তু তার পদবী তো অন্য কিছু ছিল। যাই হোক এ নিয়ে এত ভাবার কিছু নেই।

উৎসাহের চোটে বেশি কিছু না ভেবে পার্সেল খুলতে গেলেন প্রফেসার ব্রায়ান।

আর তখনই বিস্ফোরণ হল। সে আওয়াজ বেশ কিছুদূর থেকে শোনা গিয়েছিল।

১০

এবারে পার্সেল বম্ব।

মাইক আবার অনিলিখাকে ডেকেছে। এবারে বাকিংহ্যাম প্যালেসের কাছে একটা বাড়িতে। প্যালেস স্ট্রিটে। শহরের সবথেকে অভিজাত এলাকায়। পাশেই সেন্ট জেমস পার্ক। বাইরে থেকে দেখে অত্যন্ত উচ্চবিত্তদের জন্য কোনও ফ্ল্যাট বলে মনে হবে। কিন্তু এরকম বেশ কিছু ফ্ল্যাট বা বাড়ি MI 6 ভাড়া নেয়। সেরকমই একটা ফ্ল্যাটে মাইক আবার অনিলিখার মুখোমুখি।

—আজকের কাগজে খবরটা পড়েছেন নিশ্চয়? এটা যে টেররিস্ট অ্যাক্টিভিটি এ নিয়ে আর কোনও সন্দেহ নেই। আমরা নার্ভ এজেন্ট নিয়ে রিসার্চ করছিলাম,ভাবছিলাম পরেরটাও সেরকমই হবে, আর এক্ষেত্রে দেখা গেল নার্ভ এজেন্ট ব্যবহার না করে, ব্যবহার করেছে হাতে তৈরি শক্তিশালী পার্সেল বোমা। একটু থেমে মাইক ফের বলল, তবে একই লোক তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। আপনার অনুমানই ঠিক। এবারে একটা স্কোয়ারের মধ্যে কাটা দাগ। অর্থাৎ পাঁচ নম্বর। ঠিক একই ভাবে একটা কাগজ ফেলে গেছে। এছাড়াও একটা জিনিস পাওয়া গেছে কাছের একটা দেওয়ালে।

একটা তারিখ আর সংখ্যা। আমাদের ক্যামেরায় তোলা ছবিটা দেখাচ্ছি।

বলে ছবিটা বড় করে দেখাল।

২৫ শ্র ৬ শ্র ১৮

৩০২৭০০

—এর অর্থ কী? তারিখের দিন, মাস, বছর গুণ করে কী লাভ। অনিলিখা অবাক হয়ে বলল।

—সেটাই তো?

—তা এটা যে ওই খুনের সঙ্গে রিলেটেড কী করে বুঝছেন?

—এর কারণ আগের খুনটাতেও অর্থাৎ মাইকেল থাম-এর খুনেও ঠিক এরকমভাবে একটা তারিখ লেখা ছিল। সেদিনের তারিখ আর গুণ। তার আগে বাকি খুনগুলোতে এরকম ছিল না।

—আগের খুনটা কোন দিনে হয়েছিল যেন?

—২০-জুন। লেখা ছিল

২০ শ্র ৬ শ্র ২০১৮

২৪২১৬০

—তা আপনি তো আগে এর কথা বলেননি?

—আগের বার ভেবেছিলাম ওটা অন্য কেউ লিখেছে। ঘটনার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই। তাই গুরুত্ব দিইনি।

—এর আগের খুনটা কি ১৫ই জুন হয়েছিল?

—হ্যাঁ। ঠিক তাই। তবে তার আগের দুটো খুন সে হিসেবে হয়নি। প্রথম খুন হয়েছে এর বাইশ দিন আগে। আপনি যা ভাবছেন, আমরাও তাই ভেবেছি। লোকটা প্রত্যেকবার খুন করবে সেই দিনে, যার ক্ষেত্রে দিন, মাস আর বছর গুণ করলে একটা শূন্য থাকে শেষে। তাই তো? অর্থাৎ পরের খুন করবে ৩০ জুন।

—হ্যাঁ, সেটা ঠিক। একটা প্যাটার্ন পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু তাতে পুরো হিসেব মিলছে না। এর জন্য গুণ করে দেখানোর কোনও প্রয়োজন নেই। আগস্ট অব্দি প্রতি পাঁচ দিন বাদে বাদে খুন করলেই হবে। একমাত্র ৩০শে জুলাই এর পরে ৫ আগস্ট—ছ'দিন বাদে এমন একটা তারিখ আসবে যার তিনটে সংখ্যা গুণের পরে গুণফলের শেষ অংক শূন্য হবে।

—আমরাও তাই কনফিউসড। মনে হচ্ছে লোকটা পাগলাটে হতে পারে। অথবা আমাদের ইনভেস্টিগেশনকে ভুল দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। হয়তো ৩০-এর বদলে ২৯-এ পরের খুনটা করতে পারে।

—একটা কথা ঠিক। লোকটা অংক নিয়ে খুব আগ্রহী বলতে হবে। বলে অনিলিখা একটু থামল।

—আগের ছবিটা আছে কি?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ দেখাচ্ছি।

অনিলিখা খুব খুঁটিয়ে ছবিটা দেখল। তাড়াহুড়ো করে পেন্সিলে লেখা বেশ বোঝা যাচ্ছে।

২০ শ্র ৬ শ্র ২০১৮

২৪২১৬০

পরিষ্কার একই রকম হাতের লেখা।

একটু থেমে অনিলিখা বলল, অপরাধীর একটা প্রোফাইল পাওয়া যাচ্ছে এর থেকে।

—ঠিক তাই। এক—সাউথ আমেরিকান, দুই—অঙ্কে আগ্রহী।

—শুধু অঙ্কে নয়, ভেদিক ম্যাথসে।

—মানে? সেটা আবার কীরকম?

—দাঁড়ান, বলার আগে আপনাকে একটা প্রশ্ন জিগ্যেস করি। বলুন তো ৩০ জুন, ২০১৮ তারিখের গুণফল কত হবে?

মাইক একটু অবাক হয়ে ফোনটা বার করতে গেল।

—না ফোনে গুণ করলে চলবে না। কাগজে লিখে করুন।

আরও অবাক হয়ে মাইক টেবিলের উপরে পড়ে থাকা প্যাডের উপরে লিখল।

৩০ শ্র ৬ গু ১৮০

২০১৮ শ্র ১৮০

—ব্যস, আর করতে হবে না। একটা জিনিস বুঝতে পারলেন যে আপনি একবারে একলাইনে তিনটে সংখ্যাকে গুণ করতে পারতেন না, যেটা এক্ষেত্রে খুনি করেছে। এটা ভেদিক ম্যাথসে সম্ভব হয়।

—দারুণ পয়েন্ট। আমরা এটা ভাবিনি। খুনির কাছে এ ধরনের ক্ষেত্রে ফোন থাকে না। জিপিএস ট্র্যাকিং যাতে কোনওভাবে সম্ভব না হয়, তার জন্য লোকটা নিশ্চয়ই ফোন সঙ্গে রাখেনি। লোকেশন সার্ভিস অফ থাকলেও আমরা ঠিক খোঁজ পেয়ে যেতাম ওই এলাকায় ওই সময় কার কাছে কী ফোন ছিল। ফোন থাকলেও সুইচড অফ ছিল। আর ক্যালকুলেটর নিয়ে ও নিশ্চয়ই ঘুরছিল না। সে ক্ষেত্রে নিজেই ভেবে গুণ করেছে।

অনিলিখা বলল, ঠিক তাই। ভেদিক ম্যাথস-এর বিষয়টা একটু পড়ে নেবেন। যারা ভেদিক ম্যাথস জানে, তারা এভাবেই এক লাইনের মধ্যে উত্তর লিখে ফেলতে পারে আর এটা খুব তাড়াতাড়ি করাও সম্ভব। তাছাড়া, ঠিক যেভাবে ভেদিক ম্যাথসে উত্তর বার করা হয়, এখানেও ঠিক সে ভাবেই উত্তর লেখা হয়েছে। অর্থাৎ খুনি ভেদিক ম্যাথস জানে, তার সম্ভাবনা প্রবল।

—ঠিক। দারুণ একটা পয়েন্ট পাওয়া গেল। আমরা আরও বেশ কয়েকটা

বিষয়ের কথা ভেবে খুনির প্রোফাইল খাড়া করেছি। খুব সাবধানী লোক। কোনও ডিএনএ ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়া যায়নি। আশেপাশের সিসি টিভিতেও সন্দেহজনক কোনও ছবি ধরা পড়েনি। তবে লোকটা যে উচ্চতায় দেওয়ালের উপরে লিখেছে, প্রায় কারুর নজরে পড়েনি, তাতে মাঝারি হাইটের ও মাঝ বয়সি হওয়ার সম্ভাবনা। এরকম আরও বেশ কিছু পয়েন্ট পাওয়া গেছে। আচ্ছা, বিষয়টা কী বললেন? ভেদিক ম্যাথস। তাই তো?

—হ্যাঁ, ওই বিষয়ে বই খোঁজ করলেই পেয়ে যাবেন। আজ আমাকে এবারে বেরোতেই হবে।—অনিলিখা উঠে দাঁড়াল। মাঝে এক ঘণ্টা সময় ছিল। এখন আবার অফিসে ফিরতে হবে।

—আপনার সাহায্যের জন্য অনেক ধন্যবাদ।—মাইক উঠে দাঁড়িয়ে দরজা অব্দি অনিলিখাকে এগিয়ে দিল। এই বাঙালি মহিলাটি প্রবলেম সলভিং-এর দিক দিয়ে যে অনেক এজেন্টের থেকে এগিয়ে আছে, এতে কোনও সন্দেহ নেই।

১১

আমি এখন গ্রেড এইটে পড়ি। সবাই এখনও আমাকে একটু এড়িয়ে চলে। কেন জানি না। আমি তো কারুর কোনও ক্ষতি করিনি। ওটা ঠিক যে আমার কারুর সঙ্গে মিশতে ভালো লাগে না। খেলতে ভালো লাগে না।

তার থেকে আকাশের দিকে তাকিয়ে বসে-শুয়ে থাকতে আমার অনেক বেশি ভালো লাগে। মাঠের মধ্যে দিয়ে খালি পায়ে দৌড়তে ভালো লাগে। নদীর জলে পা ভিজিয়ে বসে থাকতে ভালো লাগে।

মাঝেমধ্যেই রাতে আমার ঘুম ভেঙে যায়। কেন জানি না। সেদিনও রাতে ঘুম ভেঙে গেল। কেউ কি আমাকে ডাকতে এসেছে। মা কি কাউকে পাঠিয়েছে আমাকে কাছে ডেকে নিতে? মনে হল দরজার সামনে কে দাঁড়িয়ে আছে।

কী মনে হল জানি না। বেশ শীত পড়েছিল। তার মধ্যে কোনওরকমে গায়ে একটা সোয়েটার পরে বেরিয়ে এলাম। কেউ নেই। তবু মন বলল, এগিয়ে যাই। বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এলাম। বাইরে ঘন কুয়াশা। ঠান্ডায় কাঁপছি। তবু তার মধ্যে কে যেন আমাকে ডানদিকে এগিয়ে যেতে বলল। আমি এগিয়ে গেলাম। তার পরে খানিকবাদে আবার যেন বাঁদিকের গলি দিয়ে এগিয়ে যেতে বলল। মনে হল কোন পথ দিয়ে নীচের শহরটাতে যেতে হয় তা যেন কে বলে দিচ্ছে।

রাস্তায় তখন প্রায় কোনও লোক ছিল না। থাকবেই বা কী করে! এই হাড়কাঁপানো শীতে কে বাইরে যায়।

এর মধ্যে আবার ঝিরঝির করে বৃষ্টি শুরু হল। কতক্ষণ হাঁটছিলাম ঠিক জানি না। তা ঘণ্টা দেড়েক তো বটেই। সোয়েটার-জামা-প্যান্ট ভিজে সপসপ করছে।

একটা জায়গায় মেট্রোর কাজ হচ্ছিল। তার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে গেলাম। একটা জায়গায় লাল ফিতে দিয়ে পথ বন্ধ করা আছে। লেখা আছে কাজ হচ্ছে বলে। কেন জানি না মনে হল এই পথে আগে যেন কোনওদিন এসেছি। এগিয়ে গেলাম।

খানিকবাদে একটা সিঁড়ি পড়ল। খুব সরু সিঁড়ি। তার উপরে জল পড়ে পড়ে বেশ পিচ্ছিল হয়ে গেছে। বেশ খানিকটা নীচে নেমে গেছে। নীচে একটা প্ল্যাটফর্ম। পরিত্যক্ত। মনে আছে এখানেই এসেছিলাম। প্ল্যাটফর্মে আলো জ্বলছে। এই লাইন দিয়ে কোনও ট্রেন যায় না। এটা লন্ডনের বন্ধ হয়ে যাওয়া একটা মেট্রোর স্টেশন। মনে পড়ল এই লাইন ধরেই মা'র সঙ্গে হেঁটে গিয়েছিলাম অনেকটা পথ। তারপর সেই সুড়ঙ্গটা পড়ে। কিন্তু সামনের লাইন এতটাই অন্ধকার আমার পক্ষে আর যাওয়া সম্ভব নয়। বাধ্য হয়ে ফিরে এলাম। পরে আরেকদিন টর্চ নিয়ে এসে যাব।

আমাকে কে এখানে নিয়ে এল? সামনে তো কাউকে দেখিনি?

মা বলত সব প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে উত্তর পাওয়া যায় না।

আপাতত জায়গাটা মনে রেখে দিয়েছি। আর ভুলে যাব না।

১২

চিঠিটা যার উদ্দেশে লেখা তার হাতে কি কোনওদিন পৌঁছবে?

চিঠিটা নিয়ে অনিলিখা আবার পড়তে শুরু করল। কতবার পড়েছে। হয়ত এ চিঠি পড়ার কোনও অধিকার ওর ছিল না। কিন্তু এ চিঠি না পড়লে এ চিঠি পৌঁছে দেওয়ার গুরুত্ব অনিলিখা নিজে বুঝতে পারত না। তাগিদও থাকত না।

হয়তো তিনি এখনও বেঁচে আছেন। হয়ত এখনও তাঁর পরিবার এ চিঠির অপেক্ষায় আছে। মৃত্যুর কাছে দাঁড়িয়ে যখন কেউ তার পরিবারকে উদ্দেশ্য করে চিঠি লেখে, তখন চিঠি হয়তো এরকমই হয়। শব্দ জীবন আর মৃত্যুর দূরত্ব মুছে দেয়। যে চিঠি লেখে সে জানে সে চিঠিই হয়তো শেষ চিঠি। প্রেরক হয়তো

জানত এ চিঠি পৌঁছবে না, কিন্তু কোনওদিন হারিয়ে যাবে না।

বড় চিঠি। একদিকে ইতিহাসের মূল্যবান দলিলও বটে। আবার চিঠির কিছু অংশে চোখ বোলাল অনিলিখা।

তোমাকে একটা কথা আগে জানাইনি। সে ঘটনাকে আমি কোনওদিন পিছনে ফেলে আসতে পারিনি। অনেক দিন পর অব্দি দুঃস্বপ্ন দেখে মাঝরাতে উঠে বসে থাকতাম। একটা অদ্ভুত অপরাধবোধে ভুগছিলাম। জানি না যেখানে শত্রুকে যে-কোনও শর্তে শেষ করে দেওয়াই যে-কোনও সেনার লক্ষ্য, সেখানে এই অপরাধবোধ কেন হয়েছিল।

আমাকে কিছু দিন ব্রিটিশ এজেন্ট হিসেবে কাজ করতে হয়েছিল 'স্পেশ্যাল অপারেশনস এক্সিকিউটিভ' বা 'এসওই'-তে।

সেটা তখন ১৯৪৩ সালের মাঝামাঝি। আমি তখন ফ্রান্সের জার্মান অধিকৃত 'অ্যাঙ্গারস' এরিয়াতে ছিলাম। তখন ফুলের সময়। আমি মাঠের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় তোমার জন্য ভালো ফুল দেখলে কুড়িয়ে রাখতাম। কেন জানি না, ক'দিন বাদে শুকিয়ে গেলে মন খারাপ হয়ে যেত। বুঝতে পারতাম সময়টা ফুলের মতোই হারিয়ে ফেললাম।

ওসব জায়গায় তেমন কোনও ফ্রেঞ্চ প্রতিরোধ ছিল না। তবু জার্মান সেনাদের আরও আগ্রাসনের গতি কমাতে, সাধ্যমতো বাধা দিতে আমার মতো ব্রিটিশ ইনটেলিজেন্সের ও আর্মির কিছু লোক ফ্রেঞ্চ প্রতিরোধ বাহিনীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করত। একে বলা হত 'রেসিস্টান্স মুভমেন্ট'।

আগে এটা চিঠিতে লেখার উপায় ছিল না। এখন তা লেখা যায়। তা তখনই এ ঘটনাটা ঘটেছিল। আমি একটা ফ্যাক্টরিতে কাজ করতাম। ওটাই ছিল আমার পরিচয়। একদিন ক্যাফেতে একটা লোকের সঙ্গে আলাপ হল। সে প্রতিরোধ বাহিনীকে নানান দরকারি তথ্য দেয়। তার কাছেই শুনলাম লেম্যান্স স্টেশনের কাছে একটা 'মুভমেন্ট কন্ট্রোল' অফিস আছে। সেখানে একটা স্টিল ড্রয়ারে খুব দরকারি ফাইল থাকে। তাতে আগামী কয়েকমাসে এপ্রান্তে কী ট্রেন আসবে, কোন ট্রেনে কী অস্ত্র থাকবে, কী ধরনের খাবার থাকবে, কোন ট্রেনে কত সেনা থাকবে তার সব তথ্য থাকে। জার্মান দক্ষতার সঙ্গে সে তথ্যের উপর নির্ভর করে অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে সেনা চলাচল থেকে সব কিছুর মুভমেন্ট নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

লোকটা ওখানে কাজ করে। কিন্তু ফ্রেঞ্চ হওয়ার জন্য ওর স্পেশাল চেকিং হয়। ওর পক্ষে কাজটা করা সম্ভব নয়। আমার সাহায্য চায়।

এ তথ্য আমাদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। এর উপরে নির্ভর করে আমরা সেনা চলাচল ব্যাহত করতে পারি। খাবার ও ওদের অস্ত্র সাপ্লাই বন্ধ করে দিতে

পারি। ব্রিটেনের রয়্যাল এয়ারফোর্স এ তথ্যের উপরে নির্ভর করে আক্রমণ করতে পারে। কিন্তু একইসঙ্গে সে তথ্য যে আমরা জেনে গেছি তা সামান্যতম টের পেলেই ওরা প্ল্যান অন্যরকম করে দেবে।

ওই লোকটার কাছেই শুনলাম সেখানে রাতে একজন নাইট গার্ড থাকে। তার আবার খুব ব্র্যান্ডির নেশা। লোকটা এও বলল যে, ও একতলার একটা জানলার লক ভেতর থেকে খুলে রাখবে আর জানলার শাটার খুলে রাখবে যাতে বাইরে থেকে খুলে ফেলা যায়। আমি সেই জানলা দিয়ে ঢুকতে পারি। কোথায় ফাইল আছে ভালো করে বুঝিয়ে দিল।

লোকটা কেন নিজে করতে পারবে না জিগ্যেস করতে বলল, ফ্রেঞ্চলোকদের বিশেষ করে সার্চ করা হয়। বেরোনোর সময়। কিন্তু ঢোকার সময় করা হয় না। ঠিক হল রাতে লোকটা গার্ডকে কোথাও খানিকক্ষণের জন্যে সরিয়ে নিয়ে যাবে। আমি সেসময় জানলা দিয়ে ঢুকে ফাইল নিয়ে যাব।

যে যে দরজা পেরিয়ে আমাকে ওই লকারের কাছে যেতে হবে সে দরজাগুলোর লকের মোমের ছাঁচ আমাকে ও আগে দিয়ে দেবে, যাতে আমি তাদের চাবি তৈরি করে নিতে পারি। তাহলে লক খুলে ভেতরের দরজাগুলো খুলতেও অসুবিধে হবে না।

আমি ওই ফাইলের সব কাগজের ছবি তুলে আবার সে রাতেই লোকটাকে ফেরত দিয়ে যাব যাতে কেউ বোঝার আগেই আবার ওই লোকটা সকালে ঠিক ওই জায়গায় ফেরত দিয়ে যেতে পারে।

কয়েকদিন পরে সব ব্যবস্থা হল। রাত এগারোটা নাগাদ একটা ভ্যানে করে ওখানে পৌঁছলাম। অন্ধকারে একটা জায়গায় লুকিয়ে থেকে দরজার দিকে লক্ষ্য রাখলাম। খানিকবাদে আমার চেনা সেই কন্টাক্ট ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে সিকিউরিটি গার্ডের সঙ্গে আড্ডা দিতে শুরু করল। লক্ষ্য করলাম, ওরা দুজনে বাইরের দরজা বন্ধ করে গল্প করতে করতে পাশের একটা দোকানের দিকে এগিয়ে গেল।

আমিও সেই ফাঁকে আস্তে আস্তে বাড়িটার দিকে এগিয়ে গেলাম। বুকের ধুকপুকুনি হঠাৎ করে বেড়ে গেল। এটা কোনও ট্র্যাপ নয় তো! লোকটাকে আমি তেমন চিনি না। এরকম প্রায়শই হয়। ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই হয়তো ধরা পড়ে যাব। তারপর মৃত্যু বা তার থেকেও খারাপ কিছু।

তবু এগিয়ে গেলাম। দেখলাম জানলার শাটার সহজেই খুলে গেল। জানলার লকও লোকটার কথামতো খোলা ছিল। তা দিয়ে কোনও আওয়াজ না করে ঢুকে গেলাম। ঘরের ভিতরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। কোনও আওয়াজ নেই। একহাতে ০.৪৫ ক্যালিবারের রিভলভারটা, অন্যহাতে পেন্সিল টর্চটা নিয়ে এগিয়ে গেলাম। চাবি

থাকায় একটা ঘর থেকে আরেকটা ঘরে ঢুকতে কোনও অসুবিধে হল না। যে ঘরে ওই ফাইলটা থাকার কথা সে ঘরের লকও আমার তৈরি চাবি দিয়ে খুলতে অসুবিধে হল না।

আস্তে আস্তে দরজার হ্যান্ডেলটা ঘুরিয়ে অন্ধকার ঘরটাতে ঢুকে পেন্সিল টর্চের আলো আমার পায়ের কাছে ফেললাম। তারপরে আস্তে আস্তে ওই ফাইল ড্রয়ারের দিকে এগিয়ে গেলাম।

হঠাৎ ঘরের আলো জ্বলে উঠল।

পাশ থেকে একটা মেয়ের তীব্র কণ্ঠ পেলাম—এক পা এগোবে না। গুলি করব।

ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলাম এক বছর কুড়ির মেয়ে। সাদা ব্লাউজ, নীল স্কার্ট। মেয়েটার হাতে রিভলভার আর সে রিভলভার আমার দিকে তাক করা। কিন্তু রিভলভারের নল অনভ্যস্ত হাতে কাঁপছে। কী হল জানি না। মুহূর্তের মধ্যে আমার রিভলভারটা দিয়ে মেয়েটাকে গুলি করলাম। মেয়েটাও গুলি করল। কিন্তু ওর গুলিটা আমার গায়ে না লেগে সিলিং এ লাগল। আমার গুলি কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি। সোজা মেয়েটার বাঁদিকের বুকে গিয়ে লেগেছে আর মেয়েটা ছিটকে গিয়ে ঘরের অন্যকোণে পড়েছে। সাদা ব্লাউজের উপর দিয়ে রক্তের ধারা বেরোচ্ছে। তাড়াতাড়ি ফাইলটা বার করে বেরিয়ে আসছিলাম। হঠাৎ কী মনে হতে মেয়েটার পাশে বসে পড়লাম। মেয়েটা বেঁচে আছে নাকি মারা গেছে? চমকে উঠলাম মেয়েটার মুখ দেখে। আগে খেয়াল করে দেখার সময় পাইনি। কী নিষ্পাপ, কী সুন্দর সে মুখ। ঠিক তোমার মতো।

ওর মাথা আমার কোলের উপরে রেখে বাঁচানোর চেষ্টা করলাম। বুকের মধ্যে দিয়ে গুলি চলে গেছে।

হঠাৎ আমার ভীষণ কান্না পেল। যুদ্ধের কথা ভুলে গেলাম। মনে হল আমার খুব প্রিয়জন কাউকে যেন মেরে ফেলেছি। তখনও পাচ্ছিলাম বারুদের আর মেয়েটার জামার থেকে আসা পারফিউমের একটা মিশ্র গন্ধ। এ যেন হারিয়ে যাওয়া জীবনের স্বপ্নের অনুভূতি। মাথায় এল না যে ওখানে আর কিছুক্ষণ থাকলে আমার বিপদ হতে পারে। বন্দুকের আওয়াজ নিশ্চয়ই বাইরে গেছে। যে-কোনও সময় লোক চলে আসতে পারে।

তা অবশ্য হয়নি। কেউ আসে নি। আমি আরও কুড়ি মিনিট মেয়েটাকে বাঁচানোর ব্যর্থ চেষ্টা করার পরে শেষে ফাইল নিয়ে বেরিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু কেন্ন যেন মনে হচ্ছিল তোমার মতো কাউকে খুন করে ফেলেছি।

বাকি প্ল্যান ঠিক ছিল। ভ্যান আমার জন্য দাঁড়িয়ে ছিল। তাতে করে পালিয়ে আসি। পরে ফাইলের কাগজের ছবি তুলে আমার ওই কন্টাক্টের হাতে

ফেরত দিই। আমার কোনও ফিঙ্গারপ্রিন্ট জার্মান পুলিস খুঁজে পায়নি। ওটাকে একটা সাধারণ ডাকাতির ঘটনা বলে ভেবেছিল।

ইতিহাসে ওই মেয়েটাও থাকবে না, আমিও থাকব না, ওটা হয়ত তেমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাও ছিল না। কিন্তু আমি ওই দিনটার কথা আজও ভুলিনি। পরে জেনেছিলাম মেয়েটার নাম ছিল ম্যাথে। জার্মান পুলিশ গেস্টাপোর মতো ফ্রেঞ্চ সাধারণ পোশাকের পুলিশ মিলিস-এ Milice-এ ওই মেয়েটা সবে যোগ দিয়েছিল। হয়তো তাই আমাকে গুলি করতে গিয়ে ওর হাত কেঁপেছিল। মৃত্যুর খেলায় ও তখনও মাতেনি। আমাকে সামান্য হলেও মানুষ ভেবে বিশ্বাস করেছিল। আমার হাত কাঁপেনি। শুনেছিলাম ওর বন্ধু আমার ওই কন্টাক্টের থেকে প্ল্যানটার কথা শুনেছিল। কিন্তু সে জানত না যে তার বান্ধবী এই 'মিলিস'-এ সবে যোগ দিয়েছে। সে দিক দিয়ে আমার খুন করাটা ভুল হয়নি।

কিন্তু তবু ওই দিনটার কথা ভুলতে পারিনি। এখনও অনেক সময় ওই বারুদের আর পারফিউমের গন্ধ পাই। বুঝতে পারি প্রিয়জনেরা কত সহজে এই যুদ্ধে হারিয়ে যায়। প্রযুক্তির কাছে মনুষ্যত্ব, মানুষের উপর বিশ্বাস কত সহজে হারিয়ে যায়।

জার্মানরাও ওই হত্যার কথা ভুলে গিয়েছিল কিছুদিন পরে। আমি পারিনি। কারণ ওর চোখে এক মুহূর্তের জন্য হলেও তোমাকে দেখেছিলাম।'

১৩

প্রফেসার অ্যান্ডি কয়েকদিনের জন্য লন্ডনে এসেছেন। মাঝেমধ্যেই আসেন। ইংল্যান্ডে জন্ম হলেও এখন আমেরিকায় থাকেন। লন্ডনের সেন্ট জেমস হোটেলে সায়েন্স কনফারেন্সে এবার ওঁর বক্তব্য—'গ্লোবাল ওয়ার্মিং—অ্যানাদার গ্রেট লাই'। সেন্ট জেমস বাকিংহ্যাম প্যালেসের কাছেই নামকরা হোটেল।

অর্থাৎ ওঁর বক্তব্য হবে যে, গ্লোবাল ওয়ার্মিং হচ্ছে না। পুরোটাই বানানো গল্প। ক্লাইমেট বা জলবায়ু পরিবর্তনের পিছনে আমাদের কৃতকর্ম যে কোনওভাবে দায়ী নয়, সেটাই উনি প্রমাণ করবেন। উনি যা বলবেন তা যে আদৌ সত্যি নয় অর্থাৎ গ্লোবাল ওয়ার্মিং যে হচ্ছে সেটা উনি নিজে ভালোই জানেন। কিন্তু তবু বিশেষ কারণে এই বক্তব্য।

অন্য বিজ্ঞানীদের থেকে উনি অনেক বেশি বড়লোক, অনেক বেশি স্বীকৃতিও পেয়েছেন। অনেক পুরস্কার পেয়েছেন। তার একটা বড় কারণ উনি আমেরিকার ম্যানুফ্যাকচারিং লবির হয়ে বহুবছর ধরেই কাজ করেন।

গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর জন্য দায়ী কার্বন এমিসন, বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইডের মতো গ্যাসের মাত্রা বেড়ে যাওয়া। সেটার নিষ্ক্রমণের পরিমাণ কমানোর জন্য ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রির উপরে যথেষ্ট চাপ থাকে। কিন্তু তা কমানোর জন্য যা টেকনোলজি লাগে, যা টাকা খরচ হয়, তার থেকে অনেক কম খরচে সাধারণের মনে বিভ্রান্তি ছড়ানো যায় এ ধরনের বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে। সে জন্যই অ্যান্ডির মতো বিজ্ঞানীদের কিনে রেখে দেয় এই ইন্ডাস্ট্রি।

ওঁর মতো প্রথম সারির বিজ্ঞানী যখন কিছু বলেন, তখন সবাই সেটা শোনে। এমনিতেও অনেকের এ বিষয়ে প্রশ্ন আছে। তাদেরকে আরও বিভ্রান্ত করে দিতে পারলেই হল। কেউ আর এ নিয়ে শোরগোল করবে না। ম্যানুফাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি বিভিন্ন বিধিনিষেধের বাইরে থেকে যা ইচ্ছে করে যেতে পারবে।

ওঁর বক্তব্য কার্বন এমিসন নয়, এর পিছনে দায়ী আছে 'মিলানকোভিচ সাইকেল'। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর কক্ষপথের আকারের সামান্য পরিবর্তন হয়, অক্ষের সামান্য পরিবর্তন হয়। তার জন্যই এই ক্লাইমেট চেঞ্জ। এর সঙ্গে আরও কয়েকটা তথ্যের সন্নিবেশে কীভাবে গল্প বানাবেন সেটাই ভাবছিলেন উনি। হঠাৎ এর মধ্যে সেলফোনটা বেজে উঠল।

ফোনটা তুলে নিলেন। ছোটবেলার বন্ধুর ফোন। এ হোটেলেই উঠেছে। অনেকদিন আগে একসঙ্গে এক স্কুলে পড়েছেন।

কাজের মধ্যে একটু বিরক্ত হলেও না আসতে বললে অভদ্রতা হত। এত দিন বাদে দেখার সুযোগ। ওঁর রুমে ডেকে নিলেন।

খানিকবাদে দরজায় একটা কলিং বেল বেজে উঠল।

মাঝারি চেহারার আগন্তুককে দেখে খানিকটা অবাক হলেন।

এখনও দেখে অনেক কম বয়স লাগে। খুব ভালো স্টুডেন্ট ছিল। সে তুলনায় তেমন কিছুই করতে পারেনি। অনেক বেশি ওর কাছ থেকে প্রত্যাশিত ছিল।

বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রায় মিনিট পনেরো কথা বলার পরে বন্ধু উঠে দাঁড়াল।

—আজ আর বসব না, জানি তোরও অনেক ব্যস্ততা আছে। তোর জন্য একটা উপহার এনেছি, বলে একটা ছোট বাক্স এগিয়ে দিল।

—আবার আমার জন্য উপহার কেন?—বলে ছোট বাক্সটা হাতে নিল অ্যান্ডি।—এনিওয়ে থ্যাঙ্কস।

বন্ধু বেরিয়ে যেতে কৌতূহলবশত অ্যান্ডি ছোট কালো বাক্সটা খুলে ফেলল। ভেতরে একটা ভারি সুন্দর টাই পিন। কিন্তু হাতে নিতে গিয়েই কী যেন একটা হাতে বিঁধল। যেখানে লাগল, সে আঙুলটা ভালো করে দেখল। কিন্তু তেমন

কিছুই চোখে পড়ল না। সামান্য লাল হয়ে গেছে।

হঠাৎ মাথাটা যেন ঘুরে গেল। টালমাটাল অবস্থায় খাটের উপরে বসে পড়লেন প্রফেসার। কোনওরকম ফোন করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু কী নাম্বারে ফোন করবেন ঠিক করতে পারলেন না। ব্রেন যেন কোনও কাজ করছে না। খানিকক্ষণ নিথর হয়ে বসে রইলেন।

আস্তে আস্তে চোখের সামনে অন্ধকার নেমে এল।

১৪

অ্যালান কো-র ফারম হাউসটা পোর্টসমাউথে। অনেকটা জায়গা নিয়ে বড় ফার্ম হাউস। সপ্তাহের দিনগুলো অ্যালান কো সাউথ লন্ডনের একটা দামি ফ্ল্যাটে থাকেন আর শুক্রবার এখানে চলে আসেন।

বাড়ির থেকে খানিক দূরে বীচ। সময় পেলেই বীচে চলে আসেন। এখান থেকে ফ্রান্স দূর নয়। অনেক যুদ্ধের তাই সাক্ষী থেকেছে এই পোর্টসমাউথ। এখানে দু-হাজার বছর আগে রোমান ক্যাসেল তৈরি হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ওখানেই অনেক যুদ্ধবন্দীদের রাখা হয়েছিল।

অ্যালান এক নামকরা ফুড অ্যান্ড ড্রাগ কোম্পানিতে চিফ রিসার্চ সায়েন্টিস্ট হিসেবে কাজ করেন। ওঁর বিষয় জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং। তবে ওঁর এই জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর রাজত্ব মাইক্রোবের উপরে। আমাদের শরীরে অজস্র ব্যাকটেরিয়া থাকে যারা আমাদের সঙ্গে সুখে শান্তিতে সহবাস করে। আমরাও সুস্থ থাকি। এদের মধ্যে কিছু ব্যাক্টেরিয়া আছে যাদের ডিএনএ-তে সামান্য পরিবর্তন আনলে তা আমাদের আরও অনেক উপকারে আসতে পারে।

যেমন দাঁতের ক্ষয়ের সমস্যা। ডক্টর অ্যালান দেখান কীভাবে 'স্ট্রেপটোকক্কাস মিউট্যান্স' ব্যাক্টেরিয়ার ডিএনএ-তে সামান্য পরিবর্তন আনলে আর আমাদের দাঁতে ওদের বসতি গড়ার সুযোগ করে দিলে, ওরা কীভাবে আমাদের দাঁতের ক্ষয় রোধ করতে পারে।

ওঁর গবেষণার উপরে নির্ভর করে একটা বিশেষ টুথপেস্ট তৈরি হয়েছে। এখন ওঁর গবেষণা চলছে আরেকটা বিশেষ ব্যাকটেরিয়া নিয়ে যার উপরে নির্ভর করে আমাদের দৃষ্টিশক্তি বাড়ান যেতে পারে।

এ ভাবেই জেনেটিকালি মডিফায়েড শস্যের মতো এসব মাইক্রোবের

সাহায্যে আগামী দিনে তৈরি হবে জেনেটিক্যালি পরিবর্তিত মানুষ যারা সাধারণ মানুষের থেকে অনেক এগিয়ে থাকবে।

বাড়ির কাজের লোকটাকে বিয়ার আনতে বলেছিলেন। লোকটা টেবিলের উপরে বিয়ার রেখে একটু দূরে গিয়ে দাঁড়াল। এখানে এখন ভালো গরম পড়েছে। কিন্তু অ্যালান চড়া রোদ ভীষণ পছন্দ করেন। ইংল্যান্ডে বছরে এরকম দিন হাতে গোনা যায়।

চোখ বুজে বিয়ারে চুমুক দেওয়ার সময় মনে হল শরীরটা যেন অন্যরকম লাগছে। চোখ খুলে তাকিয়ে দেখলেন, যে লোকটা বিয়ার এগিয়ে দিয়েছে সে লোকটা ওর কাজের লোক নয়। এ লোকটাকে উনি আগে কোনওদিন দেখেননি।

—কে? কে তুমি?

বলতে বলতে শরীর কীরকম যেন করে উঠল ওঁর। কথা জড়িয়ে এল খুব দ্রুত।

ঘোলাটে চোখে দেখলেন সামনের লোকটার মুখের মধ্যে কোনও অভিব্যক্তি নেই। আরও কিছু বলার আগেই আরও গভীর ঘুমে, আরও গভীর অন্ধকারে হারিয়ে গেলেন।

লোকটা এগিয়ে এসে পকেট থেকে একটা কাগজ বার করে ওঁর টেবিলের উপরে রেখে দিল। তাতে ট্যালি মার্কে সপ্তম সংখ্যাটা লেখা আছে। সপ্তম শিকার।

১৫

MI 6 দপ্তর থেকে বেরিয়ে প্রথমেই মাইকের মনে হল অনিলিখার সঙ্গে একবার কথা বলা দরকার। মেয়েটা যে অসম্ভব বুদ্ধিমান এ নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

ইন্টারপোলও একই তথ্য কনফার্ম করেছে। লোকটা ইংরেজ। ইংল্যান্ডে থাকে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই! তবে কোনও বড় সংস্থার হয়ে কাজ করার প্রবল সম্ভাবনা। কয়েকদিন আগে সেন্ট জেমস হোটেলের খুনের থেকে পরিষ্কার, লোকটা আধুনিক প্রযুক্তি খুব ভালো বোঝে। খুব বুদ্ধিমান। কোনও সিসি টিভি ক্যামেরাতে ধরা পড়েনি।

বিশেষ করে ব্রুনোর ব্যাপারটা অনিলিখাকে জানানো দরকার। ব্রুনোর সঙ্গে অপরাধীর অনেক কিছুই মিলে যাচ্ছে।

সাতটা নাগাদ ডিনারে লন্ডনের টাওয়ার ব্রিজের কাছাকাছি একটা জাপানিজ

সুসি রেস্টুরেন্ট-এ দেখা করল মাইক।

সামান্য সৌজন্যমূলক কিছু কথা বলার পরে সরাসরি কাজের কথায় চলে এল মাইক।

—আমরা একজনকে সন্দেহ করছি। বলে ফোনটা অনিলিখার দিকে এগিয়ে দিল। একটা ছবি দেখিয়ে বলল, এই লোকটাকে। এর নাম ব্রুনো। আমাদের অপরাধীর প্রোফাইলের সঙ্গে প্রায় পুরো মিলে গেছে। একটা নামী ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্সি ফার্মে কাজ করে। পেরু থেকে এখানে বারো বছর বয়সে আসে। একা থাকে। খুব ইনটেলিজেন্ট। আমাদের ইনফরমেশন অনুযায়ী ভেদিক ম্যাথস জানে। এখানে একটা স্কুলে ভেদিক ম্যাথস পড়ায়। নিজের শখে। একই সঙ্গে খুব ভালো মেকানিক এরকম খবর পেয়েছি।

এক বছর একটা কেমিক্যাল কোম্পানিতেও কাজ করেছিল। তাই নার্ভ এজেন্ট বা পার্সেল বোমা তৈরি করা ওর পক্ষে সম্ভব। তা ছাড়া যখন ও এখানে এসেছিল, তখন ওর বাবা একটা গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায়। রেসিস্ট ক্রাইম বলে সন্দেহ করা হয়েছিল। পরে যাকে সন্দেহ করা হচ্ছিল, তাকে উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে ছেড়ে দেওয়া হয়। তাই আমাদের সরকারের উপর ওর আক্রোশ থাকা স্বাভাবিক।

—তা এবারে আমাকে কী করতে হবে?

—ওর সঙ্গে দেখা করে আমাকে কিছু তথ্য জোগাড় করে দিতে হবে। আমি দেখা করতে গেলে সন্দেহ হবে। তোমাকে অবশ্যই আমরা বলে দেব কীভাবে ওর সঙ্গে দেখা করা যেতে পারে। ওর সঙ্গে কীভাবে কোথায় দেখা করা সম্ভব সে সব আমরাই ব্যবস্থা করে দেব। কোনও চিন্তা কোরো না। তোমার কোনও লাইফ রিস্ক থাকবে না। আমরা সব রকম নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেব।

একটু থেমে বলল, লোকটা খুব কম লোকের সঙ্গে মেশে। আর্ট নিয়ে বিশেষ উৎসাহী। মাঝেমধ্যেই বিভিন্ন আর্ট একজিবিশনে যায়। আমাদের একজন এজেন্ট আছে যে ওর ওপর চব্বিশ ঘণ্টা নজর রাখছে। ঠিক সময় মতো তোমায় খবর দেব। তখন তোমাকে একটু কষ্ট করে চলে আসতে হবে, যেখানে আসতে বলব।

—আমার পক্ষে কিন্তু যে কোনও সময় এ ভাবে হঠাৎ কাজের মধ্যে বেরিয়ে আসা খুব শক্ত।

মাইক হেসে বলল, আফটার অল ইউ আর অনিলিখা।

আমরা আপনার সব অতীতের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে আগে থেকেই পরিচিত আছি। আগে বলিনি। শুধু শুধু আমরা আপনার সাহায্য নিইনি। যাদের রক্তে রহস্যের সমাধান খুঁজে বার করার নেশা থাকে, তারা ঠিক সে সময় বার করে

নিতে পারে। অল দ্য বেস্ট।

ওঠার আগে একটা ছোট ঘড়ি অনিলিখার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল। এটাতে মেসেজ আসবে।

১৬

মা যে ভুল বলত না, তা আমি বুঝেছি। এই পৃথিবীর চেনা-জানা জগতের বাইরে একটা জগৎ আছে। সে জগৎকে বিজ্ঞান দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। বুদ্ধি দিয়ে বিশ্লেষণ করা যায় না। শুধু হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে হয়।

ওই যে লিখেছিলাম লন্ডনের নীচের শহরের কথা। সেটা সত্যি আছে। লন্ডন শহরের নীচে। কিন্তু সেখানে সবার যাওয়ার অধিকার নেই। যারা এ শহরের কথা জানে, তারাও ভয়ে যায় না। যতবার গেছে, কেউ না কেউ মারা গেছে। কেউ ফিরেছে, কিন্তু আহত হয়ে। কী হয়েছিল তা মনে করতে পারে না।

এ শহরের তলায় এক হারিয়ে যাওয়া নদীও আছে। কারকওয়েল। আমি সেখানেও গেছি।

লন্ডনে ১৩৪৮ সালে ব্ল্যাকডেথ হয়েছিল। লন্ডনের প্রায় ৪০ শতাংশ মানুষ মারা গিয়েছিল এক-দেড় বছরের মধ্যে। প্লেগে। যারা মারা গিয়েছিল, তাদের কঙ্কাল আজও রাখা আছে। মাটির তলায়। আমি সে কঙ্কাল আর হাড়ের স্তূপও দেখেছি। ভয় পাইনি।

আমি জানি ওই মাটির তলায় আমার মাও আছে। তাই ওই সুড়ঙ্গের পর সুড়ঙ্গ ঘুরে যখন ওই ভয়ের জায়গাটা আসে, আমি সেখানে বসে থাকতে ভয় পাই না। জানি মা আছে এখানে, আমাকে দেখছে। অন্ধকারের ওপার থেকে। চেনা জগতের ওপার থেকে। ওটাই তাই আমার সব থেকে প্রিয় জায়গা।

১৭

সন্ধে আটটা। অফিস থেকে বেরোবে বেরোবে করছিল অনিলিখা। হঠাৎ বিপ বিপ করে উঠল হাতঘড়িটা।

ঘড়িতে মেসেজ এসেছে। টেট মডার্ন আর্ট গ্যালারি। একটা আর্ট একজিবিশন হচ্ছে। এক্ষুনি চলে আসুন। আমরা আপনার অফিস বিল্ডিং-এর নীচে আছি।

অনিলিখা অফিসের ব্যাগ অফিসে রেখে তাড়াতাড়ি করে বেরিয়ে আসে। ব্রুনো নির্ঘাত ওখানেই আছে।

খানিকবাদে টেট মডার্ন আর্ট গ্যালারি থেকে কিছুটা দূরে একটা পাথর বসানো সরু রাস্তায় কালো গাড়িটা এসে থামল। এখানে খুব কম গাড়িই এসে দাঁড়াতে পারে। কিন্তু এ গাড়ির সে পারমিশন আছে।

গাড়ি থেকে নামার আগে মাইক অনিলিখাকে বলে দিল, এটা আপনার ঢোকার টিকিট। এটা মূলত সিনকোয়েচেন্তো (Cinquecento) পিরিয়ডের আর্টিস্টদের ওপরে একজিবিশন। তার মধ্যেও মূলত 'লিওনার্দো দ্য ভিনচি'-র ছবির ওপরে একজিবিশন। কিছু ছবি ইউরোপ থেকে এই একজিবিশনের কারণে কয়েকদিনের জন্য নিয়ে আসা হয়েছে। আপনাকে ওই সময়ের লিওনার্দোর আঁকার উপরে একটু বলে দিই। তাহলে আপনার লোকটার সঙ্গে আলাপ জমাতে সুবিধে হবে।

মুচকি হেসে বলল অনিলিখা—না। বলতে হবে না। আমার এ বিষয়ে সামান্য পড়াশোনা আছে। ওই সময়টা অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীর শুরুর দিকটা তো ইটালির চিত্রশিল্পের স্বর্ণযুগ। লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি, মাইকেল এঞ্জেলো, রাফায়েল, টিটিয়ান, হ্যান্স হলবাইন—কার কার নাম বলব। চিন্তা করতে হবে না। ঠিক কথা বলার বিষয় খুঁজে নেব।

—বাহ্, আমরা ওটাই একটু ভয় পাচ্ছিলাম। আরেকটা কথা। ভেতরে কোনও অসুবিধে নেই। কিন্তু বাইরে একটু সাবধান থাকবেন। এ ধরনের লোক খুব ডেঞ্জারাস হতে পারে। আমরা যদিও নজর রাখব।

—ঠিক আছে। অনিলিখা গাড়ি থেকে নেমে টেট মডার্ন আর্ট গ্যালারির দিকে এগিয়ে গেল। একবার ফোনে ব্রুনোর ছবিটা দেখে নিল যাতে চিনতে অসুবিধে না হয়।

বেশ শার্প দেখতে। চোখ মুখ কাটা কাটা। চওড়া ভুরু। চওড়া কপাল। সোনালী চুল। ইনফরমেশন অনুযায়ী পাঁচ আট-এর মতো হাইট।

কাছে যেতেই বুঝল একজিবিশন পুরোপুরি সোল্ড আউট। এখন আর টিকিট কাটা যাচ্ছে না। বিশাল জায়গা জুড়ে একজিবিশন।

একটু খুঁজতেই ব্রুনোকে পাওয়া গেল। লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি-র সেকশনে আছে। ওই সেকশনেই সবথেকে বেশি ভিড়। অবশ্য সেটাই হওয়া স্বাভাবিক। ওরকম স্তরের একজন জিনিয়াস হাজার বছরে একজন হয়। কী না ছিল লোকটা। সেরা আর্টিস্ট, সেরা আর্কিটেক্ট,নামকরা কবি ও মিউজিশিয়ান, সেরা বিজ্ঞানী।

আর সবক'টা জায়গাতেই সেরা। কী করেনি লোকটা। মানবশরীর-এর রহস্য বোঝার জন্য তিরিশের বেশি মৃতদেহ কেটে মানব শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নিখুঁত ছবি ওঁরই প্রথম আঁকা। কীভাবে মার গর্ভে শিশু বড় হয় তারও প্রথম সঠিক ব্যাখ্যা উনি করেন। কীটপতঙ্গ ও পাখির ওড়া দেখে উনিই প্রথম ফ্লাইং মেসিন এর নিখুঁত ধারণা করেন। প্রকৃতির সব রহস্যই প্রায় খুঁজে বার করার চেষ্টা করে গেছেন। কীভাবে পাথর তৈরি হয়, আকাশে মেঘ কীভাবে হয় থেকে শুরু করে

এমনকী সূর্য যে স্থির,পৃথিবী যে তাকে ঘিরে ঘুরছে, তাও উনি বলে গেছেন।

উনি বাঁ হাতে লিখতেন। যাতে ওঁর বিভিন্ন আবিষ্কার ওঁকে বিপদে না ফেলে তার জন্য উনি কাগজের ডান দিক থেকে বাঁ দিকে লিখতেন। আয়নায় দেখলে তবে ওঁর লেখা পড়া যেত। এ ধরনের জিনিয়াসরা এরকম একটু পাগলাটে হন।

আসলে প্রকৃতিকে আবিষ্কার করে তাকে নিখুঁতভাবে প্রয়োগ করেছেন ওঁর শিল্পকর্মে।

তবে এটা লিওনার্দোকে নিয়ে ভাবার সময় নয়। এটা ব্রুনোকে নিয়ে ভাবার সময়। তাই ছবিগুলোর থেকে চোখ সরিয়ে ব্রুনোর দিকে তাকাল অনিলিখা।

একটা জায়গায় লিওনার্দোর সবথেকে নামকরা ছবি মোনালিসার অনুকরণে অন্য শিল্পীর আঁকা মোনালিসার ছবি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। মোনালিসার আসল ছবিটা ফ্রান্সের বিখ্যাত ল্যুভর মিউজিয়ামে আছে। এখনকার অনেক নামী শিল্পী মোনালিসার অনুকরণে এঁকেছেন। সেখানে ব্রুনোও দাঁড়িয়ে আছে। সেদিকে এগিয়ে গেল অনিলিখা।

ছবিগুলো দেখে হতাশায় মাথা নাড়ছে ব্রুনো। হতাশারই ব্যাপার। কোনওটাই আসল মোনালিসার কাছাকাছি হয়নি। না হওয়ারই কথা। ওই প্রতিভার ধারেকাছে যাওয়ার মতো প্রতিভাও খুব কমজনের মধ্যে থাকে। তাই ছবি যত চেষ্টা করেই কপি করা হোক না কেন, মোনালিসা মোনালিসাই। সময়ের সব দাগ মুছে দিয়ে এখনও একটাই ওরকম ছবি সম্ভব।

—আসলে এ ছবি আঁকতে গেলে সবার আগে প্রকৃতিকে বুঝতে হয়, গভীরভাবে অনুভব করতে হয়।

ইচ্ছে করে ব্রুনো যাতে শুনতে পায় সেরকম ভাবেই বলল অনিলিখা।

অবাক হয়ে অনিলিখার দিকে মুখ ঘুরিয়ে ব্রুনো বলল, একদম ঠিক কথা। এই একই কথা আমিও ভাবছিলাম।

অনিলিখা ফের বলে উঠল, আসলে মোনালিসার ছবির আসল রহস্য হল যতবার ওই ছবির দিকে তাকানো হয়, মনে হয় ছবিটা যেন একটু অন্যরকম। যে দেখছে তার মনের অনুভূতির রং যেন ধরা পড়ে মোনালিসার মুখে। সেই রহস্যটাই সবক'টা ছবিতে মিসিং।

—একদম তাই। তার কারণ কী জানো? লিওনার্দো ওয়াজ অ্যা গ্রেট অবসারভার। প্রকৃতির সেরা সব সৃষ্টিতে একটা অস্পষ্টতা থাকে, সেটা উনি ধরতে পেরেছিলেন।

অনিলিখা সায় দিয়ে বলে ওঠে—সেই অস্পষ্টতাই দর্শকের অনুভূতির প্রতিফলন ছবির মধ্যে তুলে ধরে। তাই কখনও মনে হয় মোনালিসার হাসিতে দুঃখের ছোঁয়া। কখনও মনে হয় কোন একটা রহস্য লুকিয়ে আছে হাসিতে। এই

এফেক্টটা ওঁর আবিষ্কার, যাকে বলা হয় কিনা 'স্ফুমাতো' ('sfumato')। অস্পষ্ট আউটলাইনে তুলির নরম ছোঁয়ায় ছবির কিছু অংশ যেন ইচ্ছে করেই সম্পূর্ণ করা হয় না। সেই বাকি অংশ আঁকে দর্শকের মন। একটা স্বপ্নের মতো। আর চোখের কোণে, ঠোঁটের কোণে লুকিয়ে থাকা সেই ছায়া, সেই অস্পষ্টতাকে অনুকরণ করা অসম্ভব। এ ছাড়া মোনালিসার ছবির বাঁ দিকের প্রান্তরেখা ডানদিকের থেকে বেশ খানিকটা নীচে, যার জন্য অরিজিনাল ছবিতে বাঁ দিকের মুখটা ডান দিকের মুখের তুলনায় অনেক বেশি লম্বা বলে মনে হয়। এটা ইচ্ছে করেই করেছিলেন লিওনার্দো আর তাই দর্শকের পজিশন অনুযায়ী ছবিটাও দেখতে অন্যরকম হয়ে যায়। সেই ম্যাজিকটাই এখানে সব কটা ছবিতে মিসিং।

—অসাধারণ বিশ্লেষণ। আপনার নাম?

—আমার নাম অনিলিখা, আপনি?

—আমার নাম ব্রুনো। আমি ছবিতে খুব আগ্রহী। তা আপনি নিশ্চয়ই খুব নামকরা কোনও শিল্পী হবেন। তা না হলে তো এরকম গভীর উপলব্ধি আসে না।

—না, না। অত্যন্ত আগ্রহী দর্শকের বেশি কিছু নই।

আরও অনেক কথা হল। অনিলিখাকে কথাটা বলতে হল না। ব্রুনোই মিনিট পাঁচেক বাদে বলল, এই ভিড়ের মধ্যে ভালো করে কথা বলা যাচ্ছে না। আপনি যদি কিছু না মনে করেন, তাহলে আমরা সামনের ক্যাফেতে গিয়ে কথা বলতে পারি। অবশ্যই যদি আপনার সময় থাকে।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল অনিলিখা—ঠিক আছে। আমার হাতে একঘণ্টা আছে। চলুন কোনও ক্যাফেতে যাওয়া যাক।

১৮

বাড়িতে পৌঁছনোর কিছুক্ষণ বাদেই মাইকের ফোন।

—কীরকম দেখলেন?

—ব্রুনো খুব শার্প। অনেক খবরাখবর রাখে। দৃষ্টিশক্তি খুব ভালো। আমি যে কালির পেন ব্যবহার করি তা আমার আঙুলে কালির অস্পষ্ট দাগ থেকে বুঝে গেছে। একইসঙ্গে আমি এদেশে না থাকলেও যে নিয়মিত আসি তাও বুঝতে পেরেছে। ব্রিটিশ সরকারের উপর যথেষ্ট রাগ আছে। লোকটা একটা সময় আদর্শগত দিক দিয়ে কমিউনিস্টদের সাপোর্ট করত। তারপরে বিভিন্ন কারণে ও এখানকার সরকারকে রীতিমতো ঘৃণা করে।

তাছাড়া, দুটো বড় ক্লু-ও মিলে গেছে। যেরকম বলেছিলেন, ভেদিক

ম্যাথসে লোকটার যথেষ্ট দক্ষতা আছে। ভেদিক ম্যাথসের ষোলোটা সূত্র পরপর বলে গেল। কীভাবে এর সাহায্যে আড়াই হাজার বছর আগে আমাদের দেশে মুনি-ঋষিরা কাজ করত, কীভাবে এ সূত্রগুলো ভাবা হয়েছিল, সে বিষয়েও গভীর জ্ঞান আছে। স্বামী কৃষ্ণতীর্থ যিনি বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে ভেদিক ম্যাথসকে আবার নতুন করে আবিষ্কার করেন, তার পুরো কাজের সঙ্গে উনি সম্পূর্ণ পরিচিত।

—এ তো সাংঘাতিক খবর। এর পরেও সন্দেহ করব না! এরকম হাতে গোনা ক'জন থাকতে পারে।

—অন্য ক্লুটাও মিলে গেছে। কথায় কথায় আমি জেনে নিয়েছি যে, দক্ষিণ আমেরিকার ওই স্টাইলের ট্যালি মার্কের সঙ্গে লোকটা যথেষ্ট পরিচিত।

—মাই গড। তাহলে তো মনে হচ্ছে এখনই অ্যারেস্ট করলে ভালো হয়।

—আমার মনে হয় ওকে আরেকটা এরকম ধরনের কাজ করার সুযোগ দিয়ে দেখতে হবে লোকটা কী করে।

—এর পরেও? আমরা কিন্তু ওকে অনেক সহজে সরিয়ে ফেলতে পারি। কেউ জানতেও পারবে না।

—না না। সেটা ঠিক হবে না। শুধু সন্দেহের বশে কিছু করা ঠিক হবে না। তার থেকে ওকে একটা এরকম সুযোগ দিয়ে দেখা দরকার কী করে।

—কিন্তু কাকে টার্গেট করছে তা আমরা জানব কী করে?

হেসে উঠল অনিলিখা—তার থেকে টার্গেটকেই যদি ওর হাতের সামনে নিয়ে যাওয়া হয়।

—ভালো আইডিয়া। কিন্তু কাকে মারার ব্যাপারে ও বেশি আগ্রহী হবে সেটা জানব কী করে? অবশ্য একটা টার্গেট প্রোফাইল তৈরি আছে আমাদের।

—বিজ্ঞান-প্রযুক্তির সঙ্গে যুক্ত আছে, ও সুস্থ-স্বাভাবিক পরিবেশের বিরুদ্ধে কিছু কাজ করছে—এরকম কিছু হাই প্রোফাইল লোকের সামনে ওকে আসার সুযোগ করে দিতে হবে। যারা খুন হয়েছে, তাদের মধ্যে আর কিছু মিল পাওয়া গেছে?

—একটা মিল আছে। এরা প্রত্যেকেই এমন কিছু কাজের সঙ্গে যুক্ত যাতে মানবিকতার দিক থেকে কিছু প্রশ্নচিহ্ন আছে।

—হ্যাঁ, আমারও সেরকম মনে হয়েছে। যেমন আপনি জানেন কিনা জানি না, ন্যাকো কোয়ান্টাম কম্পিউটার বার করলেও এখন যে প্রোজেক্টে ওই কম্পিউটার ব্যবহার করার কথা ভাবছিলেন, সেটা একেবারে ঠিক নয়। একটা নামী ইনসিওরেন্স কোম্পানির সঙ্গে উনি চুক্তি করেছিলেন যেখানে ডিএনএ প্রোফাইলের উপরে নির্ভর করে ইনসিওরেন্স প্রিমিয়াম ঠিক করা হবে। অর্থাৎ যদি দেখা যায় কারুর

মধ্যে অ্যালজাইমার হওয়ার জিনগত দিক দিয়ে প্রবণতা আছে, সেক্ষেত্রে তাকে হেলথ ইনসিওরেন্স অনেক বেশি দিতে হবে।

হয়তো তিনি পাবেনই না। সেই কাজে কোয়ান্টাম কম্পিউটার ব্যবহার করার জন্য চুক্তি করেছিলেন ন্যাকো।

—তা এতে খারাপ কী আছে?

—অবশ্যই এর আসল উদ্দেশ্য খুব খারাপ। এরকমও হতে পারে যে যদি কারুর খুব খারাপ কোনও অসুখ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, সে কোনওভাবে কোনওদিন স্বাস্থ্যবিমা পাবে না। তা, যা বলছিলাম।

সেদিক দিয়েও ভেবে আমাদের উপযুক্ত লোক খুঁজে বার করতে হবে যাকে খুন করতে ওঁর আগ্রহ থাকতে পারে। অবশ্যই ইতিমধ্যে ক্রুনোর উপর কড়া নজরদারি রাখতে হবে।

—হ্যাঁ, সে তো বটেই। আমরা ওর প্রত্যেকটা মুভমেন্টের উপর নজর রাখব। দরকার মতো আপনাকে আবার যেতে হবে।

—সে ঠিক আছে। কিন্তু আমি তো এখানে অন্য কাজে এসেছি। আমার পক্ষে যখন তখন সেটা করা সম্ভব হবে না।

—হ্যাঁ, তা জানি। আচ্ছা, একটা ভালো খবর দিই। আপনি যার খবর চেয়েছিলেন, আমরা তার খবর পেয়েছি। আমাদের ইন্টেলিজেন্স ঠিক তাকে খুঁজে বার করে ফেলেছে।

উত্তেজিত হয়ে উঠল অনিলিখা—ওই লিজা জেমসকে লেখা চিঠির কথা বলছেন? ওঁর বয়স তো বেঁচে থাকলে এখন আশির উপরে হবে।

—না না, ওঁর কোনও খোঁজ পাইনি। তিনি অনেক বছর আগেই মারা গেছেন। আপনি যেটা শুনেছেন সেটাই ঠিক। তবে আমরা তার ছেলেকে ট্র্যাক করতে পেরেছি। ওখান থেকে চলে এসে রেডিং-এর একটা নামি গ্রামার স্কুলে পড়ত। ছেলেটা নাকি পড়াশোনাতে খুব ভালো ছিল। খুব ভালো রেজাল্ট করে অক্সফোর্ডে ঢোকে। তারপরে দীর্ঘদিন ওখানে অঙ্ক পড়াত। বেশ কয়েকবছর হল রিটায়ার করেছে। আপনাকে ঠিকানাটা দিচ্ছি। মাইক ঠিকানাটা দিয়ে দেয়।

—অনেক ধন্যবাদ মাইক। খুব বড় উপকার করলে। ওই চিঠিটা না পৌঁছতে পারলে খুব আফশোস থেকে যেত। মনে হত এখানে আসাটাই অপূর্ণ থেকে যেত।

—এ তো আমাদের কাছে খুব সোজা কাজ। তবে তার থেকে অনেক শক্ত কাজে আপনি আমাদের সাহায্য করছেন। এটুকু উপকার করব না! গুড নাইট।

অনেক রাত হয়েছে। কাল আবার অফিস।

ব্রুনোর কথা মনে হচ্ছে। যে এত শিল্প ভালোবাসে, সে লোকটা এরকম খুনি হতে পারে? হয়তো পারে। ভালো ছবির মতো সব মানুষের চরিত্রের মধ্যেই একটা অস্পষ্টতা থাকে। সব কিছু আগে থেকে বোঝা যায় না।

১৯

১২, কুইন্স ক্লোস। এটন সোকন। ছোট গ্রাম। আউস নদীর ধারে। কেম্ব্রিজশায়ার ও বেডফোর্ডশায়ারের বর্ডারে। সামান্য কিছু লোকের বাস। তাদের বেশিরভাগই বৃদ্ধ বৃদ্ধা। আসলে এখান থেকে বড় শহরগুলোর যোগাযোগ ভালো নয়। কাছাকাছি সেরকম কোনও ইন্ডাস্ট্রিও গড়ে ওঠেনি। চারদিকে শুধু নিখাদ পরিবেশ। নদী, আর জঙ্গল। খোলা মাঠ আর নীল আকাশে হারিয়ে যাওয়া উপত্যকা।

গাড়ি নিয়েও ডেভের বাড়ি খুঁজতে অনেক সময় লেগে গেল অনিলিখার।

খুব উত্তেজনা হচ্ছিল অনিলিখার। শেষ পর্যন্ত দিতে পারবে তো সেই চিঠি! একটা চিঠির সূত্রেই কীরকম যেন আত্মীয়তা গড়ে উঠেছে এদের সঙ্গে। বাড়িতে কেউ থাকবে তো?

একতলা বাংলো প্যাটার্নের বাড়ি। লাল টালির ছাদ। সামনে বড় বাগান। তার মধ্যে দিয়ে সুড়কি ফেলা পথ। সেটা পেরিয়ে গিয়ে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে অনিলিখা একটু অবাক হল। কোনও কলিংবেল নেই। বাধ্য হল দরজায় ধাক্কা দিতে।

খানিকবাদে এক বছর চল্লিশের লোক দরজা খুলে দিল। দেখে বেশ ভদ্র মনে হয়।

—ডেভ বাড়িতে আছেন?

—হ্যাঁ। আপনার নাম?

—আমার নাম অনিলিখা। উনি আমাকে চিনবেন না। আসলে আমার কাছে ওঁর মোবাইলের নাম্বার ছিল না। তাই সরাসরি চলে আসতে হয়েছে।

—এমনিতেও তো ওঁর কোনও সেলফোন নেই। বাড়িতে কোনও ফোন নেই। আপনি ভেতরে চলে আসুন।

ভেতরে এসে বসল অনিলিখা। একটা সাধারণ ড্রয়িং রুম। তাতে একটা দিক জুড়ে বইয়ের আলমারি। অন্যদিকে একটা পিয়ানো। একটা বিশাল গ্র্যান্ড ফাদার ক্লক। দেওয়াল জুড়ে ফুল আর গাছের ছবি।

মিনিট পাঁচেক বাদে ডেভ এসে ঢুকলেন। দেখে বোঝাই যায় না ওঁর

এত বয়স হয়েছে। মনে হয় ষাটের কোঠায়। চোখে ভারী গোল ফ্রেমের চশমা। মাথা ভর্তি সোনালি চুল। অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত চেহারা। দেখেই প্রফেসার মানুষ মনে হয়। শ্রদ্ধাবোধ হয়।

অনিলিখা উঠে দাঁড়িয়ে হ্যান্ডশেক করে বলল, একটা দরকারে এসেছি। আপনাকে একটা অত্যন্ত দরকারি চিঠি দেওয়ার আছে।

—চিঠি? আমার নামে?—ভারী গলায় আস্তে আস্তে বললেন প্রফেসার।

—না, এটা আপনার মায়ের নামে। খুব সম্ভবত আপনার বাবার

লেখা। আমি খুব দুঃখিত যে লেখাটা আমি পড়েছি। আর পড়েছি বলেই এর মূল্য বুঝতে পেরেছি।

ভদ্রলোক যেন কথাটা শুনে চমকে উঠলেন। উত্তেজিত হয়ে কাঁপা হাতে চিঠিটা নিয়ে সামনের সোফায় বসে পড়লেন। চুপ করে পড়তে লাগলেন। মাঝে একবার যেন চশমা খুলে চোখ মুছলেন। একবার পুরো পড়ার পরে আবার দ্বিতীয় বার পড়লেন।

দ্বিতীয় বার পড়ার পর ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়ে অনিলিখার দিকে এগিয়ে এলেন। কিছুক্ষণ কিছু বলতে পারলেন না। অনেক কষ্টে আবেগ সামলে শেষে বললেন, তুমি যে কী উপকার করলে তা আমি বলে বোঝাতে পারব না। আমি প্রাণ দিয়েও তোমার এই ঋণ কোনওদিন শোধ করতে পারব না। এ চিঠি যে আমাদের কাছে কত মূল্যবান তা বোঝানোর কোনও ভাষা আমার কাছে নেই। এটুকু বলতে পারি আমার মা সারা জীবন কাটিয়েছেন এ চিঠির অপেক্ষায়। তারপরে হয়তো আমি। আমার জীবন অন্যরকম হতে পারত যদি এই চিঠিটা সময় মতো আমাদের কাছে এসে পৌঁছত। তা এটা কোথা থেকে পেলে?

অনিলিখা বলল কীভাবে বইয়ের মধ্যে চিঠিটা কলকাতায় পেয়েছে।

—কলকাতায়? কলকাতায় কী করে গেল? একটু থেমে ডেভ ফের বললেন, মনে হয় বুঝেছি। বাবার খুব বন্ধু একজন ছিলেন ভারতীয়। মায়ের মুখে শুনেছি। হয়তো তার সঙ্গে ওই চিঠি কোনওরকমে ভারতে চলে যায়। তা তুমি কোথায় থাকো? কলকাতায়?

—হ্যাঁ, আমি কলকাতায় থাকি। আমার নাম অনিলিখা। এখানে কিছুদিনের জন্য কাজে এসেছিলাম। চিঠিটা আমি অবশ্য আসার কয়েকদিন আগেই পেয়েছি।

—অনিলিখা? তোমার নাম শুনেছি মনে হচ্ছে।

অনিলিখা মুচকি হেসে উঠে বলতে যাচ্ছিল। ডেভ হেসে বললেন, দাঁড়াও, আমাকে ভাবতে দাও। বয়স হয়ে গেছে। মনে করতে একটু সময় লাগে। তারপরে উত্তেজিত হয়ে বললেন, আমি তোমার কিছু রিসার্চ পেপার ও বই পড়েছি। কিছুদিন আগেই 'ইন্টারনেট অফ থিংস'-এর উপরে তোমার একটা বই পড়েছিলাম। ঠিক তো?

অনিলিখা মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

—শুধু তাই নয়, তুমি তো বেশ কিছু রহস্য উদ্ধার করেছ। রিয়াল্স বিউটি উইথ দ্য ব্রেন।

ডেভ হেসে ফের বললেন, কলকাতায় এরকম সুন্দরী ও বড় মনের মানুষ থাকে জানলে আমি তো কবে কলকাতায় চলে যেতাম। তারপর প্রাণ খোলা হাসি হেসে উঠলেন।

একটু থেমে ফের বললেন, আমি অঙ্কের প্রফেসার ছিলাম অক্সফোর্ডে। আমার কাছে তোমার দেশ ভারত কিন্তু খুব প্রিয়।

—কেন? ভেদিক ম্যাথস এর জন্য? অনিলিখা বলল।

—না, না, তা নয়। ও বিষয়টা আমার তেমন জানা নেই। অন্য একটা বিষয়ের কথা বলি। সবথেকে বড় সংখ্যা, আর সব থেকে ছোট সংখ্যার ব্যবহার কিন্তু তোমার দেশেই শুরু হয়েছে। ললিতাভিস্তারা সূত্রের কথা জানা আছে?

—না, ঠিক মনে পড়ছে না।

—ওটা খুব সম্ভবত চতুর্থ শতাব্দীর শুরুতে লেখা। ওখানে বলা হয়েছে, বুদ্ধকে জিগ্যেস করা হয়েছিল একশ কোটির থেকে বড় কী সংখ্যা আছে। তোমরা তো কোটি বলো, তাই না?

—হ্যাঁ, দশ মিলিয়নে এক কোটি হয়।

—ঠিক, তা বুদ্ধ ওই প্রশ্নের উত্তরে বলেন এক শতকোটি-তে এক অযুত হয়। একশত অযুতে নিযুত হয়। একশত নিযুতে এক কঙ্করা হয়। একশত কঙ্করাতে এক ভিভারা হয়। বলতে বলতে উনি এক তল্লাকসনা অব্দি বলেন। তারপর একটু থেমে আবার বলতে শুরু করেন। উনি শেষ যে নাম্বারটা বলেন তাতে ১-এর পরে ৪২১ টা শূন্য ছিল। অতবড় সংখ্যা আজও আমরা ব্যবহার করি না। ভেবে দেখো, ওই সংখ্যার ব্যবহার কিন্তু প্রাচীন ভারতে ছিল। 'শূন্য'-এর মতো আরও অনেক বিষয়ে ভারতই পৃথিবীকে পথ দেখিয়েছে। নাহ্ আর বলব না। তুমি নির্ঘাত বিরক্ত হয়ে উঠছ।

—মোটেও না। আমার বরং খুব ভালো লাগছে। কিন্তু আপনার গ্র্যান্ড ফাদার ক্লকটা তো ভারি অদ্ভুত।

—ও দশটা ঘণ্টার কাঁটা আছে বলে বলছ।

—আপনি কি ঘড়িতে ডেসিম্যাল সিস্টেম ব্যবহার করেন।

—হ্যা, আসলে অঙ্কের প্রফেসাররা একটু আজব টাইপের হয় বলে ফের হেসে উঠলেন—ভেবে দেখো আমরা সব ব্যাপারে ডেসিম্যাল সিস্টেম ব্যবহার

করি। শুধু ঘড়ির ব্যাপারে অন্যরকম হবে কেন? কেন ষাট মিনিটে এক ঘণ্টা, ষাট সেকেন্ডে এক মিনিট হবে, কেনই বা ২৪ ঘণ্টায় এক দিন হবে। আমি তাই ডেসিম্যাল সিস্টেম ব্যবহার করি। আমার দিনে তাই দশ ঘণ্টা, প্রত্যেক ঘণ্টায় ১০০ মিনিট, প্রত্যেক মিনিটে ১০০ সেকেন্ড। ফলে আমার সেকেন্ড তোমাদের সেকেন্ডের থেকে সামান্য ছোট। তোমাদের দিনে ৮৬৪০০ সেকেন্ড, আমার দিনে এক লক্ষ সেকেন্ড। শুধু ওই ঘড়িটা নয়, আমার বাড়ির সব ঘড়িই ওই নিয়মে চলে।

—আপনার স্ত্রী?

—উনি অনেকদিন মারা গেছেন। আমি আর আমার কাজের লোক এখানে থাকি। কেনকে অবশ্য শুধু কাজের লোক বললে ভুল হবে। আমার সব কাজের অ্যাসিস্ট্যান্ট।

—তা আপনার সময় কাটে কী করে?

—ওই সারাদিন বাগান আর অঙ্ক নিয়ে থাকি। মাথার উপরে খোলা নীল আকাশ আর চারদিকে সবুজ থাকলে, আর কিছু লাগে না।

একটু থেমে ডেভ বললেন, তোমায় কিন্তু ডিনার খেয়ে যেতে হবে।

—না, না। অনেক কাজের মধ্যে এসেছি। আমাকে এক্ষুনি ফিরতে হবে। আমি পরে আরেকদিন আসব।

—ঠিক আছে। কথা দিচ্ছ যে আরেকদিন অন্তত আসবে। তোমার কাছে কিন্তু আমি চিরকালের জন্য উপকৃত হয়ে থাকলাম। মা যে কী খুশি হবেন, কী বলব!

—খুশি হবেন মানে? উনি তো আর জীবিত নেই।

—মানে ওই আর কী। আমি এখনও বিশ্বাস করি, মা এখানে কাছাকাছি কোথাও আছেন। তাই বলা আর কী।

যেতে যেতে অনিলিখা বলল, আপনার সঙ্গে কোনওরকম যোগাযোগ করতে হলে কীভাবে করব?

—এই তো বিপদে ফেললে। আমার আবার কোনও ফোন নেই!

অনিলিখা অবাক হয়ে বলে ওঠে—কোনও ফোন নেই?

—আমাকে আর কে ফোন করবে বলো? শুধু শুধু টাকা খরচ হয়। তাই রাখিনি। এখানে আমাদের ছোট গ্রাম। আমরা সবাই সবাইকে চিনি। যা দরকার বাড়িতে গিয়েই বলি। যোগাযোগ থাকে।

—তা আপনি কি লিঙ্কডিন বা ফেসবুক বা টুইটারে আছেন?

আবার সেই প্রাণখোলা হাসি হেসে বললেন ডেভ—আমি কি আর এ যুগের লোক যে এসব খুলে বসে থাকব! আমি এখনও সময় পেলেই বাইরে

বেরিয়ে যাই। ঘরে বসে থাকি না। সাইকেলে করে নদীর ধারে চলে যাই। সেখানে কোনও কোনও দিন মাছ ধরি। হাঁসেদের খাওয়াই। আমার বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে এখনও সপ্তাহে দুদিন ব্যাডমিন্টন খেলি। শনিবারে গ্রামের লাইব্রেরিতে বসে সেই সপ্তাহে পড়া গল্পের আলোচনা করি। এই হচ্ছে আমার জীবন। তবে আমাকে যোগাযোগ করার সবথেকে সহজ উপায় হল, এখানে চলে আসা। ঠিক পেয়ে যাবে।

—আপনি তাই এ বয়সেও এত ফিট।

—তা বলতে পারো। এখনও ম্যারাথন দৌড়োই। ভেজাল একদম পছন্দ করি না। ওই যে তোমাদের এখন হয়েছে না, মগজে চিপ বসিয়ে ঘুরছ, সেসব করার কোনওদিন দরকার হয়নি।

—মগজে চিপ? সেটা আবার কী?

—জানো না বুঝি। অবশ্য ব্যাপারটা খুব কম লোকই এখনও অব্দি জানে। এখানে একটা এলিটিস্ট সমাজ বা অন্য এক ধরনের মানুষ তৈরি করার চেষ্টা করা হচ্ছে। সে কাণ্ডের কর্মকর্তা হলেন বিখ্যাত গাড়ি প্রস্তুত সংস্থার প্রধান রিচার্ড বেহনিস। আমেরিকায় থাকেন। এখানে মাঝে মধ্যে আসেন। তা উনি আর ওঁর পোষা বিজ্ঞানীরা একটা চিপ তৈরি করেছেন যা মাথায় ইমপ্লানট করলে বুদ্ধি আস্তে আস্তে বেড়ে যাবে।

—হ্যাঁ, আমি এরকম সম্ভাবনার কথা শুনেছিলাম। কিন্তু সেটা যে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা হবে এরকম ভাবতে পারিনি।

—আমিও জানতাম না। আমার বন্ধুদের মধ্যে কয়েকজন নামকরা ফিজিসিস্ট আছেন, তাদের মুখেই শুনলাম। এরকম নাকি অলরেডি হাজার দশেক লোক আছে, যারা আমাদের মতোই, শুধু উপরে ওঠার সিঁড়ি তাড়াতাড়ি আয়ত্ত করার জন্য এই ইমপ্লয়ন্টের সাহায্য নিয়েছে। এই চিপের মাধ্যমে ব্রেনের কিছু অংশে নিয়ন্ত্রিত ইলেকট্রিক ইম্পালস পাঠানো হয় যাতে স্মৃতিশক্তি প্রায় দু-গুণ বেড়ে যায়, দ্রুত চিন্তা করার ক্ষমতা দশগুণ বেড়ে যায়।

—তা আপনার ভয়টা কোথায়?

—এ তো প্রযুক্তির অপপ্রয়োগ। ভাবো তো তোমাকে যদি এরকম একটা লোকের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে হয়। পারবে? কোথায় যাবে সাধারণ মানুষ?

—রিচার্ড ইংল্যান্ডে আসছেন পরের সপ্তাহে। সেটা জানেন তো?

—হ্যাঁ শুনেছি। ওঁর একটা বিশাল খামার বাড়ি আছে কেন্টের ক্যানটারবেরীতে। ২০ একরের ওপরে বিশাল বাড়ি।

ওখানেই থাকবে হয়তো এসে। আমি অবশ্য অত বড়লোকেদের খবর রাখি না, বিশেষ করে তাদের মধ্যে যদি আদর্শ না থাকে।

অনিলিখা আর বেশিক্ষণ ছিল না। এরকম প্রাণখোলা মানুষ খুব কম দেখা যায়।

যাক চিঠি অন্তত ঠিক লোকের কাছে পৌঁছেছে এত বছর বাদে।

২০

আবার ব্রুনোর সঙ্গে দেখা। এবারে লন্ডনের কোর্টফিল্ড রোডের একটা নামী ভারতীয় রেস্টুরেন্টে। বম্বে ব্রাসারি। ভেতরে পুরো ভারতীয় পরিবেশ। ভেতরে হালকা সেতারের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। দেওয়ালের ছবিতে ধরা হয়েছে ভারতের ইতিহাস।

অবশ্য এটা নিছক দেখা করার জন্য নয়। ঠিক হয়েছে রিচার্ড বেহনিস-এর লন্ডনে আসার খবরটা অনিলিখা মারফৎ ব্রুনোকে জানানো হবে। তারপরে ব্রুনোকে ট্র্যাক করা হবে। দেখা হবে ও কী করে। তাহলেই নিশ্চিত হওয়া যাবে।

ব্রুনো কম্পিউটার সায়েন্স ও ফিলোজফি নিয়ে পড়াশোনা করেছে অক্সফোর্ডে। খুব ভালো স্টুডেন্ট ছিল।

অনিলিখা সে প্রসঙ্গ দিয়েই গল্প শুরু করল।

—অনেকেই ভাবতে পারে না যে কম্পিউটার সায়েন্স ও ফিলোজফি একইসঙ্গে পড়া সম্ভব।

—ঠিক বলেছ। আমি ছিলাম ওই সাবজেক্টের প্রথম ব্যাচ। অনেকেই তখন ভাবতে পারত না যে এরকম একটা সাবজেক্ট কম্বিনেশন হতে পারে। কিন্তু আমার তো অভিভাবক ছিল না। তাই নিজের ইচ্ছেতেই সব কিছু ঠিক করতাম। পরে বুঝেছিলাম কেন এই দুটো সাবজেক্ট একসঙ্গে পড়ানো হয়। কম্পিউটার সায়েন্টিস্ট এর মধ্যে যদি দার্শনিকতা ও মানবতা না থাকে, তাহলে সে সমাজের সর্বনাশ করে দিতে পারে।

ব্রুনোকে উত্তেজিত করার জন্য অনিলিখা আবার বলল, শুনলাম এখন মানুষের ব্রেনের মধ্যেও চিপ বসানো হচ্ছে, আরও বুদ্ধিমান করার জন্য।

—ও তুমিও শুনেছ। ওই বদমায়েসটাকে হাতের কাছে পেলে যে কী করতাম না।

—রিচার্ড-এর কথা বলছ?

—হ্যাঁ, ঠিক তাই।

—শুনলাম পরের সোমবার এখানে দু-দিনের জন্য আসছে। কেন্টে ওঁর খামার বাড়িতে।

ব্রুনোর চোখটা রাগে জ্বলে উঠল। কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল।

খানিকবাদে ফের বলল, আমাদের আকাশ, বাতাস সব বড়লোকদের কাছে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। কিছু একটা করতে হবে অনিলিখা।

—আচ্ছা, বাই দ্য ওয়ে, তুমি কি প্রফেসার ডেভ জেমসকে চেনো? অক্সফোর্ডে পড়াতেন?

—আরেবাবা। চিনব না। ডেভ হলেন একজন জিনিয়াস। আমাদেরও পড়িয়েছেন। কী সুন্দর গল্প করে পড়াতেন। মনে হত যেন অংক পড়াচ্ছেন না, স্বপ্ন দেখাচ্ছেন। ওঁর কাছেই তো কম্পিউটারের বেসিক সব শেখা। ওঁর কাছেই বুঝি কীভাবে কম্পিউটার সায়েন্সের ভিত্তি দাঁড়িয়ে আছে অঙ্কের ওপরে। উনিই ছোট ছোট উদাহরণ দিয়ে বোঝাতেন আমাদের অঙ্কের জগতকে কীভাবে কম্পিউটার তার বাইনারি ভাষায় প্রকাশ করে গণনা করে। উনিই বলেন কীভাবে বেদে ভারতীয় মুনি-ঋষিরা প্রকৃতির থেকে শিখে তাকে অঙ্কের সূত্রাকারে প্রকাশ করেছিল। উনি হলেন এক কথায় অঙ্কের শিল্পী। কিন্তু উনি নিজেই পরে একটা সময় কম্পিউটার ও এখনকার প্রায় সব প্রযুক্তিকে দূরে সরিয়ে দেন। এখন ফোন পর্যন্ত ব্যবহার করেন না। উনি যেটা বুঝেছিলেন সেটা আমি এখন বুঝি। কীভাবে দুটো মানুষকে কাছে নিয়ে যাওয়ার জায়গায়, প্রযুক্তি কীভাবে একজন মানুষকে আরেকজন মানুষের থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। কীভাবে আমাদের অনুভূতির ভাষা হারিয়ে যাচ্ছে।

—তা তোমার সঙ্গে ওঁর যোগাযোগ আছে?

—হ্যাঁ, মাঝেমধ্যে আমি ওঁর বাড়ি যাই। ওঁর সঙ্গে যোগাযোগের আর কোনও উপায় নেই। ফোন, কম্পিউটার কিছুই নেই ওঁর কাছে। তা তুমি ওঁকে চিনলে কী করে?

অনিলিখা সংক্ষেপে চিঠির কথাটা উল্লেখ করল, অবশ্যই MI 6-এর থেকে পাওয়া সাহায্যের অংশটুকু বাদ দিয়ে। ব্রুনো পুরো ব্যাপারটা শুনে বলল, তোমার মতো মহিলা আমি সত্যি আগে দেখিনি। উনি এই চিঠিটা শুধু তোমার জন্যেই পেলেন। আমার দিক থেকেও, এর জন্য অনেক ধন্যবাদ।

ব্রুনোর সঙ্গে কথা বলার পরে অনিলিখা যখন বম্বে ব্রাসারি থেকে বেরল,তখন রাত দশটা। রাস্তায় ল্যাম্পের আলো সবে জ্বলে উঠেছে। পাবগুলোর সামনে লোকের জটলা। লন্ডনের গ্রীষ্মের সন্ধ্যার মাদকতা এখন যেন সবার মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে।

হাঁটতে হাঁটতে লক্ষ করছিল, লন্ডনের রাস্তায় প্রায় সবার হাতে মোবাইল,কানে হেডফোন। চারদিকে কী হচ্ছে তা কেউ যেন লক্ষ করছে না। বাইরের কোনও শব্দ কারুর কাছে যাচ্ছে না। আমরা সবাই যেন এক কৃত্রিম জগতের বাসিন্দা হয়ে গেছি।

এসবের মধ্যে অনিলিখার কেন জানি মনে হচ্ছিল কোথাও একটা গণ্ডগোল হচ্ছে। কী একটা খটকা ভাবতে ভাবতে ও এগিয়ে গেল আন্ডারগ্রাউন্ড স্টেশনের দিকে।

২১

ফোনটা ধরতেই উল্টোদিক থেকে মাইকের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

—অনিলিখা, আমাদের অনুমান নির্ভুল। ব্রুনো গাড়ি করে কেন্টের দিকেই যাচ্ছে। আমাদের একজন কন্টাক্ট ওকে ফলো করছে। আমরা ইচ্ছে করে রিচার্ড-এর বাড়ির ভেতরেও যাতে সহজে যেতে পারে, তার ব্যবস্থা করেছি।

—ব্রুনো কি একা আছে?

—হ্যাঁ। রিচার্ড-এর বাড়ির সিকিউরিটি আমরা কমিয়ে দিয়েছি যাতে ও ঢোকার সাহস ও সুযোগ পায়।

—রিচার্ড-এর সিকিউরিটি আগে থেকে কমিয়ে দেওয়া বোধ হয় ঠিক হচ্ছে না।

—সে ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাক। আসলে খুব কড়া পাহারা থাকলে ও তো বাড়ির ভিতরে ঢুকবে না। ঢোকার পর ঠিক সময় মতো আমাদের ধরতে হবে। সাক্ষ্য-প্রমাণ রাখতে হবে। তা তোমার মধ্যে একটা দ্বিধা আছে বলে মনে হচ্ছে। অন্য কিছু ভাবছ?

—না, ভাবছি যদি আসল অপরাধী অন্য কেউ হয়।

—তুমি তো জানো। লোকটার প্রোফাইল, চিন্তাভাবনা একদম মিলে যাচ্ছে অপরাধীর সঙ্গে। ভেদিক ম্যাথস, সাউথ আমেরিকান ট্যালি মার্কস, প্রকৃতির প্রতি অতিরিক্ত ভালোবাসা, শার্প মাইন্ড,মাঝারি হাইট, বয়স, নার্ভ এজেন্ট, বোমা তৈরির ক্ষমতা সব সব কিছু মিলে যাচ্ছে। চিন্তা কোরো না। আমরা নিশ্চিত না হয়ে ওর কিছু ক্ষতি করব না। তোমাকে সময় মতো জানাব।

—আসলে কী জানেন? আমার মনে হচ্ছে যেন খুব বেশি রকম মিলে যাচ্ছে। একটা ক্লু মেলা ভালো। এতগুলো ক্লু মিলে যাওয়া খানিকটা অস্বাভাবিক। আর খুব সহজে যেন সে প্রমাণগুলো আমাদের চোখের সামনে চলে আসছে। সেখানেই আমার সন্দেহ।

—না, তুমি একদম আমাদের মতোই হয়ে গেছ। পারফেক্ট। সবেতেই সন্দেহ—বলে হেসে উঠল মাইক। প্রথমবার মাইককে জোরে হাসতে শুনল অনিলিখা।

ফোন ছেড়ে খানিকক্ষণ চুপ করে ভাবল। কাল ব্রুনোর সঙ্গে যখন কথা হচ্ছিল কী যেন একটা কথায় খটকা লেগেছিল। পরে বাড়িতে এসে কাজে ব্যস্ত হয়ে যাওয়ায় ওটা নিয়ে আর ভাবার সময় পায়নি।

হঠাৎ কী একটা কথা মনে হতে ল্যাপটপ বার করে বেশ খানিকক্ষণ সার্চ করল অনিলিখা।

ঠিক যা ভেবেছিল। সন্দেহটা সত্যি। এবারে বুঝতে পারল কেন ব্রুনোর কথায় খটকা লেগেছিল। হ্যাঁ, ঠিক সেই কথাটা যেটা ব্রুনো বলেছিল ডেভ প্রসঙ্গে—'উনিই বলেন কীভাবে বেদে মুনিঋষিরা প্রকৃতির থেকে শিখে তাকে অঙ্কের সূত্রাকারে প্রকাশ করেছিল।'

অর্থাৎ ডেভ ভেদিক ম্যাথস জানতেন।

তাহলে কেন ডেভ নিজের মুখে 'ভেদিক ম্যাথস' জানার কথা অস্বীকার করেছিলেন অনিলিখার কাছে? একইসঙ্গে উনি জানতেন যে, ব্রুনো ভেদিক ম্যাথস জানে কারণ সেটা উনিই ব্রুনোকে শিখিয়েছেন।

তাহলে কি সবাই যাতে ব্রুনোকে সন্দেহ করে, সে জন্যই উনি জোর করে ওভাবে ভেদিক ম্যাথসের প্রমাণ রেখে এসেছিলেন খুনের জায়গাতে। উনি নিশ্চয়ই জানতেন যে ব্রুনোর এ বিষয়ে আগ্রহের কথা অনেকেই জানে আর বিষয়টা ইংল্যান্ডে খুব কম লোকই জানে। একই সঙ্গে ডেভ যে কোনওরকম প্রযুক্তি পছন্দ করেন না, তার প্রমাণ ওঁর বাড়িতে গিয়েই স্বচক্ষে দেখেছে অনিলিখা।

এর পরের প্রশ্নটাই হল ডেভ কি নার্ভ এজেন্ট বা বোমা তৈরির ক্ষমতা রাখে? সেক্ষেত্রে ডেভ এর উপরে সন্দেহটা আরও জোরদার হয়। আর তাই ইন্টারনেটে সার্চ করছিল অনিলিখা।

ইন্টারনেটে সার্চ করে অনিলিখা সেই মুহূর্তেই দেখেছে যে, ডেভ শুধু অঙ্কের প্রফেসার ছিলেন না, একইসঙ্গে নামকরা কেমিস্টও ছিলেন। সে বিষয়ে ওঁর বেশ কিছু রিসার্চ আছে। এমনকী প্রায় কুড়ি বছর আগে ট্যাবুন ও সারিন—এই দুই অত্যন্ত শক্তিশালী বিষাক্ত গ্যাসের কেমিক্যাল আর ফিজিক্যাল প্রপারটি নিয়েও অনেক কিছু লিখেছেন। টক্সিকোলজি নিয়ে ওঁর অনেক গবেষণা ছিল।

এই দুই অত্যন্ত বিষাক্ত গ্যাস নার্ভ এজেন্ট তৈরিতে ব্যবহার করা যেতে পারে। তাহলে উনিই কি এসব ঘটনার পিছনে? উনি কি কোনও অত্যন্ত শক্তিশালী নার্ভ এজেন্ট তৈরি করেছেন?

মাইককে ফোন করল অনিলিখা। কিন্তু ফোন ধরল না মাইক।

দশ মিনিট বাদে ফোন এল। উত্তেজিত কণ্ঠস্বর—রিচার্ড ইস অলরেডি ডেড। কেউ আবার অজানা কোনও নার্ভ এজেন্ট প্রয়োগ করেছে। আর সে লোকটা ব্রুনো নয়। ব্রুনো তখনও পৌঁছয়নি। অন্তত এ খুনটা ও করেনি। তবে এ ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে।

—আমার মনে হয় কে করেছে, কে এর পিছনে আছে তা আমি আন্দাজ করতে পেরেছি।

—কে?

—প্রফেসার ডেভ জেমস। উনি ইচ্ছে করেই আমাদের সামনে এমন কিছু বিষয় তুলে এনেছিলেন যাতে আমরা ব্রুনোকে সন্দেহ করি। নিজেই আড়ালে থেকে কাজ করেছেন।

অনিলিখা এই সন্দেহের পিছনের কারণগুলো বিশদে বলে।

—তুমি কি পাগল হয়েছ। ওঁর তো অনেক বয়স হয়েছে। আশির কাছে। অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় নামী প্রফেসার। এই বয়সে কেন করতে যাবেন এসব?

—সে কারণটা আমাকে বুঝতে হবে। উনি নিজে যে করেন তা হয়তো নয়,ওঁর বাড়িতে একটা লোক কাজ করে। আমার নিজের লোকটাকে দেখে একটু অবাক লেগেছিল। চেহারার মধ্যে যথেষ্ট শিক্ষার ছাপ। বিশেষ আলাপ হয়নি। হয়তো তার সাহায্য নেন প্রফেসার। আমার মনে হয় এ ব্যাপারে হঠাৎ করে কিছু করার দরকার নেই। আমি নিজে ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ করব। আমাদের একটু ধৈর্য ধরতে হবে। আচ্ছা, তোমাদের ওই ফাউন্টেন পেন একটা লাগবে।

—আমি এক্ষুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি। বুঝতে পেরেছি তুমি কী করবে।

—আমি কাল সকালেই যেতে চাই। তবে ওই পেনের বাইরে অন্য কোনও সাহায্য এখনই চাই না।

—ঠিক আছে, তাই হবে।

২২

আজ দরজায় ধাক্কা দেওয়ার পরে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করতে হল।

তারপর দরজা খুললেন স্বয়ং প্রফেসার।

দরজা খুলে এক গাল হেসে বললেন, তোমার কথাই ভাবছিলাম। কবে আবার দেখা পাওয়া যাবে!

অনিলিখাকে ড্রয়িংরুমের সোফায় বসতে বলে প্রফেসার বলে উঠলেন।—আজ কী খাবে বল? আমাদের এখানে একটা খুব ভালো ইতালিয়ান রেস্টুরেন্ট আছে। কীরকম সময় আছে হাতে?

—আজ সময় নিয়ে এসেছি। সন্ধে ছ'টা নাগাদ বেরোব। আমার ঘড়িতে সন্ধে ছ'টা, আপনার ঘড়িতে নয়—বলে মুচকি হাসল অনিলিখা।

প্রফেসার আনন্দে সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, সে তো দারুণ ব্যাপার। এমনিতেই গল্প বলার বেশি লোক পাওয়া যায় না। তোমার সঙ্গে গল্প করার সুযোগ তো আরও স্পেশাল।

—তা আপনার অ্যাসিস্টান্টকে দেখছি না।

—না, ও একটু দরকারি কাজে বেরিয়েছে।

—আমার দিক থেকে একটা ছোট উপহার ছিল।—বলে সঙ্গে আনা পেনটা এগিয়ে দিল অনিলিখা।

—বাহ্। এত খুব সুন্দর ফাউন্টেন পেন। এখন থেকে বাইরে গেলেই সঙ্গে রাখতে হবে। অনেক ধন্যবাদ।

—তা আমাকে আপনাদের গ্রাম দেখাবেন না? বাড়িতে না বসে থেকে চলুন বাইরে ঘুরে আসি। গ্রাম দেখতে দেখতে কথা বলা যাবে।

—খুব ভালো। আমার তো ঘরে থাকতেই ইচ্ছে করে না। আমার বেশ কয়েকটা সাইকেল আছে। স্ত্রীর সাইকেলটাও আছে। সাইকেল চালানো আসে তো?

অনিলিখা সম্মতি জানাতে ডেভ বললেন, আমি পাঁচ মিনিটে রেডি হয়ে আসছি। তোমাকে নদীর ধারে নিয়ে যাব। ওখানে গিয়ে কথা হবে।

খনিকবাদে ডেভ ও অনিলিখা সাইকেল নিয়ে গ্রামের পথে বেরিয়ে পড়ল। ছবির মতো সুন্দর গ্রাম। পাইন গাছে ছাওয়া সরু সরু রাস্তা। দেখেই বোঝা যায় এখানে বসতি গড়ে উঠেছিল কয়েকশো বছর আগে। শহরের মাঝে একটা ভারি সুন্দর পাব। একটা রেস্টুরেন্ট। একটা ১২০০ সালের চার্চ। রাস্তার দু'ধার দিয়ে ভারি সুন্দর দেখতে সব পুরোনো দিনের পাথরের কটেজ। ছোট একটা পোস্ট অফিস। তার পাশে একটা ছোট লাইব্রেরি।

লাইব্রেরি দেখিয়ে প্রফেসার বললেন, এটা আমাদের খুব প্রিয় জায়গা। আমরা অনেক বন্ধুরা এখানে প্রতি শনিবারে দেখা করি। সেই সপ্তাহে কে কী বই পড়লাম তা নিয়ে আলোচনা হয়। মজার কথা কি জান? সেখানেও আমরা এই নতুন প্রজন্মকে সঙ্গে পাই না।

গ্রামের মাঝখান দিয়ে সরু নদী বয়ে গেছে। তাতে কাচের মতো স্বচ্ছ জল।

সরু উঁচু-নীচু রাস্তা দিয়ে সাইকেল চালাতে চালাতে ডেভ বললেন, নদী আরেকটু আগে গিয়ে চওড়া হয়েছে। ওখানে যাচ্ছি আমরা।

বিভিন্ন চড়াই-উতরাই পথ পেরিয়ে ওরা নদীর ধারে পৌঁছল। ডেভ এই বয়সে এখনও এতটাই সুস্থ দেখে অবাক লাগে।

নদীর ধারে একটা জায়গায় সাইকেল রেখে হাঁটতে থাকল দুজনে।

আস্তে আস্তে ডেভ বললেন, আমার খুব রাগ হয় যখন দেখি আকাশটা একটু একটু করে হারিয়ে যাচ্ছে। কখনও উঁচু বাড়ির আড়ালে, কখনও অ্যান্টেনায়, কখনও বা প্লেনের আঁকিবুকিতে। এখন আরও খারাপ লাগে যখন দেখি আমরা কথা বলতেও ভুলে যাচ্ছি। সেদিন একটা রেস্টুরেন্টে গিয়ে দেখি সবার হাতে ফোন। কেউ কারুর সঙ্গে কথা বলছে না।

অনিলিখা বলল, সত্যি আমারও মনে হয় আমরা যেন সভ্যতার উল্টো পথে হাঁটছি। একটা সময় আমরা কথা বলতে শিখেছিলাম, সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য ছোট ছোট গোষ্ঠীতে বসবাস করতে শুরু করেছিলাম। অন্য জীবের থেকে অনেক ভালোভাবে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ করতে পেরেছি, তাই সভ্য হয়ে উঠতে পেরেছি। আমরা কি সেই কথা বলতেই ভুলে যাচ্ছি না! সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছি না?

—ঠিক বলেছ। আমরা অজান্তে প্রযুক্তির দাসত্ব স্বীকার করছি!

একটা সময় সবাই ভয় পেত রোবটরা আমাদের পিছনে ফেলে দেবে কিনা এই ভেবে। এখন আর সে ভয় নেই। আমরাই তার আগে অনেক বেশি রোবটদের মতো হয়ে যাব। নিজেদের মধ্যে কথা বলতে ভুলে যাব। নিজেদের আত্মীয় পরিজনদের কথা ভুলে যাব। আমাদের সংবেদনশীলতা, সহানুভূতি আস্তে আস্তে সব হারিয়ে যাবে।

—আপনার ছেলে কোথায় থাকে প্রফেসার?

খানিকক্ষণ চুপ করে থাকলেন ডেভ। তারপর বললেন, জন, আমার একমাত্র ছেলে, মারা গেছে। এখানে এলেই ওর কথা খুব মনে পড়ে। সেই ওর ছোটবেলার দিনগুলোর কথা। যখন একসঙ্গে বসে আমরা মাছ ধরতাম। ফুটবল খেলতাম। একসঙ্গে পাহাড়ে যেতাম। জঙ্গলের মধ্যে তাঁবু খাটিয়ে থাকতাম।

কিন্তু তারপরে আস্তে আস্তে ও একদিন বড় হল। সম্পর্কের সুতো কোথায় যেন আলগা হয়ে গেল। ওকে কাজের জন্য আমেরিকায় চলে যেতে হল। ফোন আসত মাঝে মধ্যে। মাসে একটা। আস্তে আস্তে সেটাও বন্ধ হয়ে গেল। শুনলাম ও নাকি দিনরাত কম্পিউটার নিয়ে কাজে ব্যস্ত থাকে। কী সব নতুন নতুন সফটওয়ার লেখে, বড় একটা কোম্পানিতে কাজ করে। তখন আশির-নববইয়ের

দশক। কম্পিউটারের শৈশব। অনেক কাজের সুযোগ। ও ওই জগতে আস্তে আস্তে যেন হারিয়ে গেল।

বছরে একবার করে দেখা হত। পরে তাও হত না। ফোন করতাম, পেতাম না। সব সময় ব্যস্ত। কম্পিউটার যেন ওকে কেড়ে নিল আমার কাছ থেকে। অথচ ওর কম্পিউটারে হাতেখড়ি আমার কাছেই।

পরে একদিন খবর পেয়েছিলাম ওর চাকরি চলে গেছে। ফোন করেছিলাম কয়েকবার ওর কোনও সাহায্যের দরকার আছে কিনা। ওকে ফোনে পাইনি।

পরে শুনলাম ওর সঙ্গে ওর বউ-এর ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে।

একদিন হঠাৎ ও ফোন করল। ওর ছেলে হ্যারিকে দেখার কেউ নেই। আমরা দেখতে পারব কিনা। বলা বাহুল্য, এতে আর অসুবিধের কী থাকতে পারে! আমরা খুব খুশি।

তখন ওকে বহুবছর বাদে আমরা একবারই দেখেছিলাম। বেশ মোটা হয়ে গেছে। কম্পিউটারে গেমস খেলে সারাক্ষণ। আমাদের এখানে যতদিন ছিল, বেশির ভাগ সময় কম্পিউটার নিয়েই বসে থাকত। সাংঘাতিক ডিপ্রেশানে, একাকীত্বে ভুগছিল। স্বাভাবিক। যে সারাজীবনে নিজের বাইরে কারুর কথা ভাবেনি, সে একটা সময় নিজেকেও সঙ্গে পায় না।

আমার এখানে হ্যারিকে রেখে ফেরত যাওয়ার একমাস পরে খবর পেলাম ও সুইসাইড করেছে। অবশ্য আমার কাছে ওর মৃত্যু আগেই হয়েছিল।—বলে খানিকক্ষণ চুপ করে থাকলেন ডেভ। কপালে হাত দিয়ে মাথা নীচু করে বসে থাকলেন কিছুক্ষণ।

—আপনার নাতি হ্যারি এখন কোথায় আছে?

—হ্যারি এখন ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। তবে আমাদের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ নেই। ও আমাদের কাছেই বড় হয়েছে। কিন্তু এখনকার যেরকম হয়। এ সমাজটা খুব বিচিত্র। সবাই শুধু নিজেকেই আয়নায় দেখে।

হ্যারির জিনেও বোধহয় সেই প্রযুক্তির নেশা ছিল। আমাদের সব রকম চেষ্টা সত্ত্বেও হ্যারিও ওর বাবার মতো আস্তে আস্তে কম্পিউটার অ্যাডিক্ট হয়ে উঠল। হয় কম্পিউটার, না হয় ফোন। এর বাইরে ওর কোনও জগৎ ছিল না। সারাক্ষণ আমাদের বাড়িতে একটা ঘরে বন্দি থাকত। বাইরে যেতে চাইত না। সামনে যারা আছে তাদের সঙ্গে

কথা না বলে সোশ্যাল নেটওয়ার্কের হাজার মাইল দূরের লোককে আপনার বলে ভাবত।

একবার আমার জন্ডিস হল। একমাস বাড়িতে পড়ে ছিলাম। অবাক ব্যাপার তখনও আমার জন্য ওর কোনও সময় হত না। সারাদিন পড়ে থাকত নানান ধরনের ইলেক্ট্রনিক গ্যাজেট নিয়ে। ওর ঠাকুমা যেদিন হাসপাতালে ভর্তি হল,

সেদিনও হাসপাতালে গিয়ে দেখেছিলাম যে ও ফোন নিয়ে বসে আছে। মনে হচ্ছিল ওর সব অনুভূতি ও হারিয়ে ফেলেছে। এমন একটা জগৎ-এর মধ্যে হারিয়ে গেছে যেখানে মানুষ-প্রকৃতি-ভাব-ভালোবাসা-সম্পর্কের কোনও অস্তিত্ব নেই।

হাইস্কুল শেষ হতে ও ইউনিভার্সিটিতে গেল। তারপর থেকে আমদের সঙ্গে যোগাযোগ প্রায় রাখে না। হয়তো ওই কৃত্রিম জগতের বাইরে কারুর সঙ্গেই ও যোগাযোগ রাখে না।

কিছুদিন আগে শুনেছি, ও এখন ক্লাসও নিয়মিত করে না। নিজের জগতে হারিয়ে থাকে। সেখানে শুধু ও আর ওর কম্পিউটার বা ফোন।

—আমি দুঃখিত। হয়তো আমিও এ জগৎকেই বিনা প্রতিবাদে মেনে নিচ্ছি। আমিও এর জন্য দায়ী।—অনিলিখা আস্তে আস্তে বলল।

ডেভ উত্তেজিত হয়ে বললেন, এ কোন জগৎ যেখানে আমরা প্রযুক্তির দাসত্ব এত সহজে স্বীকার করে নিচ্ছি। হ্যামলিনের বাঁশিওয়ালার মতো এ কোন বাঁশির সুর যাতে আমরা ভুলে যাচ্ছি আমাদের চারদিকের পৃথিবী আর চারপাশের মানুষগুলোকে। ভুলে যাচ্ছি আপনজনকে, ভুলে যাচ্ছি পাশের বাড়ির সেই অসহায় বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে যে আমাদের কাছে আর কিছু নয়—শুধু সামান্য সময় পাওয়ার অপেক্ষায় আছে।

চশমা খুলে চোখ মুছলেন ডেভ। ফের বলেলেন—আমি জন বা হ্যারিকে হঠাৎ করে হারাইনি। হারিয়েছিলাম একটু একটু করে। ওদের আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিল প্রযুক্তি। আচ্ছা, আমরা কেন বুঝতে পারছি না যে আমরা আমাদের সর্বনাশ ডেকে আনছি। এ কী সমাজ যেখানে আমরা শুধু নিজের ছোট স্বার্থের কথা ভেবে পরিবেশ ধ্বংস করতেও দ্বিধা করি না। এটাও ভাবি না যে, যেভাবে আমরা ফসিল ফুয়েল ব্যবহার করছি তাতে পৃথিবীর জলবায়ু বদলে যেতে বাধ্য? লক্ষ লক্ষ লোক তার জন্য এক দেশ থেকে আরেক দেশে পানীয় জলের খোঁজে যেতে বাধ্য হবে। আমি জানি না। আমি কী করতে পারব। কিন্তু কিছু একটা করতেই হবে অনিলিখা।

অনিলিখা বলল, আমরা বলে যাচ্ছি গ্লোবাল ওয়ার্মিং হচ্ছে না, কিন্তু দেখুন এবারে ইউরোপের নানান জায়গায় খরা হচ্ছে। সব ঘাস শুকিয়ে গেছে। এমনকী গরুকে খাওয়ানোর জন্য ঘাস পাওয়া যাচ্ছে না। পর্তুগালে ৪৮ ডিগ্রি যা গত তিরিশ বছর হয়নি।

ডেভ উত্তেজিত হয়ে বললেন—এর মধ্যেও আমরা আমাদের ভুল বোঝাচ্ছি। আমেরিকায় অনেকে সারাদিনের জন্য বাড়ির বাইরে চলে যায় এসি চালিয়ে রেখে। আমাদের কোনও সচেতনতাই নেই। এ পৃথিবীকে আমরা পাল্টে দিচ্ছি।

আমরা গত একশো বছরে পরিবেশের যা ক্ষতি করেছি, তা ভাবলেই খারাপ লাগে। আগে এখানে কত পাখি আসত, কত রঙের প্রজাপতি উড়ত।

—হ্যাঁ, তাই অ্যান্ডির মতো অসৎ বিজ্ঞানী যখন মারা যায়, আমার আনন্দ হয়।—অনিলিখা বলল।

অনিলিখার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে ডেভ ফের বললেন— কয়েক বছর বাদে শুধু জলের জন্য দেশে দেশে যুদ্ধ লাগবে। লক্ষ লক্ষ লোক পানীয় জলের সন্ধানে এক দেশ থেকে আরেক দেশে যাবে। চারদিকে প্রাকৃতিক বিপর্যয় এত বেড়ে গেছে। এত জায়গায় ফরেস্টফায়ার লাগছে। এত বেশি সংখ্যায় ঝড় হচ্ছে, তবু আমরা বলছি গ্লোবাল ওয়ার্মিং হচ্ছে না।

একটু থেমে ডেভ ফের বললেন—আমাদের সমস্যা অসৎ বিজ্ঞানীদের নিয়ে। তোমার মতো, বা মিস্টার পাই এর মতো অনেক বিজ্ঞানী আছেন, অনেক প্রযুক্তিবিদ আছেন যারা বিজ্ঞান-প্রযুক্তিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে মানবজাতির সামগ্রিক মঙ্গলের কথা ভেবে। নিজের স্বার্থে কিছু করছে না। কিন্তু সে সংখ্যাটা কমে আসছে। বাড়ছে অসৎ বিজ্ঞানীদের সংখ্যা। নিউটন হয়তো ঠিকই বলেছিলেন ২০৬০ সাল নাগাদ পৃথিবী ধবংস হয়ে যাবে। আগেই হতে পারে। তবে তার অনেক আগেই আমরা হয়ত আর মানুষ থাকব না। যন্ত্র হয়ে যাব। আমাদের সঙ্গে তখন যন্ত্রদের একটাই তফাত হবে। যন্ত্ররা নিজেদের কথা ভাববে না। আমরা শুধু নিজেদের কথাই ভাবব।

একটু থেমে ফের বললেন প্রফেসার—সমাজটাও অনেক পাল্টে গেছে। আমাদের গ্রামে অনেক বুড়ো বুড়ি আছে, যাদের ছেলে বা মেয়ে হয়ত সামান্য দূরে কোথাও আছে। কিন্তু কখনও দেখা করতেও আসে না। তুমিই বলো এ প্রযুক্তির কোনও দাম আছে যেখানে একজন মানুষ তার সবথেকে কাছের মানুষের কাছে হারিয়ে যায়।

—সত্যি তাই। আমাদের সময় আমরা বাইরে গিয়ে খেলাধুলো করতাম, বাড়ির সবার সঙ্গে গিয়ে গল্প করতাম, সবার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতাম। এখনকার ছেলেমেয়েরা সেখানে ফেসবুকে পড়ে থাকে। যাদের বন্ধু বলে মনে করে তারা কেউ বন্ধুও নয়।

—এখন তো আরও শক্তিশালী কিছু সোশ্যাল নেটওয়ার্ক আসছে যারা আমাদেরকে ওই কৃত্রিম জগতে বন্দি করার প্ল্যান করছে। চোখের সামনে কী হচ্ছে, কে আছে, তাকে বিশ্বাস না করে আমরা যাকে চিনি না, তার উপরে ভরসা করছি। সবেতে শুধু আমি, আমি, আর আমি। তার বাইরে কোনও কিছুর কথা আমরা ভাবতে ভুলে যাচ্ছি।

—হ্যাঁ, তা ঠিক। আমাদের গভীর অনুভূতিগুলো হারিয়ে যাচ্ছে। সেদিনই একটা জার্নালে দেখছিলাম পরস্পরকে বোঝার ক্ষমতা, অন্যদের প্রতি সহানুভূতি কলেজ স্টুডেন্টদের মধ্যে ৪০ শতাংশ কমে গেছে গত পাঁচ বছরে।

—হ্যাঁ, অন্যের কথা ভাবার জন্য প্রযুক্তি লাগে না, ভাষা লাগে না। সবার আগে মন লাগে। সেটাই যেন হারিয়ে ফেলেছি। কিছু মানুষ এর মধ্যে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এই সোশ্যাল নেটওয়ার্ককে গেমিফিকেশনের মাধ্যমে আরও শক্তিশালী করে তুলতে চাইছে।

—কেউ কেউ তো আবার নিজেদের স্বার্থে উন্নত মানব গোষ্ঠী গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন। ইচ্ছে করে কথাটা উল্লেখ করল অনিলিখা।

আড়চোখে অনিলিখার দিকে তাকিয়ে হেসে উঠলেন ডেভ—তুমি তাহলে অনেক কিছুই জেনে গেছ। একটু থেমে ফের বললেন, প্রতি বছরে এখন প্রায় হাজারের মতো জীব জীবজগৎ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন প্রাণী অভূতপূর্ব হারে পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। তার পিছনে আমাদেরই কার্যকলাপ দায়ী। আমরা তা নিয়ে ভাবছি না। ভাবছি না আগামী দিনে যখন বেশ কিছু দেশের বড় অংশ জলের তলায় চলে যাবে, তখন আমাদের কী হবে? আমরা শুধু চোখ বুজে বসে আছি।

একটু থেমে প্রফেসার বললেন, একটা সময় যখন আমার কেউ ছিল না, তখন ওরা সঙ্গে ছিল। পাখির ডাক ছিল। গাছের ছাওয়া ছিল। নীল আকাশ ছিল। যখন খুব অসহায় লাগত, তখনও মনে হত আমি এখানেই। আজ যেন সব ফের হারাতে বসেছি।

অনিলিখা যখন প্রফেসারের বাড়ি থেকে বেরোল, তখন সাড়ে ছ'টা। হঠাৎ করে মেঘ করে এসেছে। বেরোনোর সময় প্রফেসার অনিলিখাকে আশীর্বাদ করে পেনটা দেখিয়ে বললেন, আই ট্রাস্ট ইউ। গিফটের জন্য এবং আমার মতো বৃদ্ধের সঙ্গে সারাদিন সময় কাটানোর জন্য অনেক ধন্যবাদ। আশা করি আবার দেখা হবে।

২৩

হঠাৎ ফোনটা বেজে উঠল। উল্টোদিকে প্রফেসারের গলা।

আজ ছ'টা দশে অল্ডউইচ আন্ডারগ্রাউন্ড স্টেশনে এসো। এটা কিন্তু চালু স্টেশন নয়। এমন একটা জিনিস দেখাব, যার অস্তিত্ব তুমি না দেখলে বিশ্বাস করতে পারবে না। তোমার জন্যই চিঠিটা পেয়েছি। যার জন্য এ চিঠি লেখা তাকে দিতে যাব। তাই তোমাকে দেখাতে চাই। আমার সঙ্গে তোমার পেনটাও

থাকবে। আমাকে খুঁজে পেতে তোমার অসুবিধে হবে না। হেসে উঠলেন প্রফেসার। ফের বললেন, কাউকে খবর দিও না কিন্তু।

এটুকু বলেই প্রফেসার ফোনটা ছেড়ে দিলেন।

কী করবে অনিলিখা?

এ এক বড় দ্বিধা। জানাবে মাইককে?

অনিলিখার মনে হয়েছে প্রফেসার যে পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন, তা ঠিক নয়। কিন্তু যে উদ্দেশে করেছেন, সেটা সম্পূর্ণ ঠিক। এরকম চলতে থাকলে এ সভ্যতার শেষ দিন খুব বেশি দূরে নেই। মানুষ হিসেবেও ডেভ খুব ভালো।

এমনিতেও পেনের মাধ্যমে MI 6 নিশ্চয়ই ওঁর যাতায়াত ট্র্যাক করবে।

খানিকক্ষণ দ্বিধার পর অনিলিখা ফোন করল মাইককে এ কথা জানাতে যে, প্রফেসার ছ'টা দশে দেখা করতে বলেছেন। একইসঙ্গে এ-ও বলে রাখল যাতে কেউ ওদের পিছু না নেয়।

অনিলিখা জানে এটা বলা সত্ত্বেও MI 6 নিশ্চয়ই ওঁকে ফলো করবে। অনিলিখার একার উপরে এ পর্যায়ে ফেলে রাখার মতো এত বড় রিস্ক MI 6 নেবে না।

তবে যেটা ওরা জানবে না তা হল, প্রফেসার সময়ের ক্ষেত্রেও ডেসিমাল সিস্টেম ব্যবহার করেন। এরকম অদ্ভুত অভ্যেসের কথা

কেউ ভাববে না। তাই ছ'টা দশ মানে যে ছ'টা দশ নয়, এটা ওরা প্রথমে বুঝতে পারবে না। একটা সময় ফ্রেঞ্চরা এরকম সিস্টেম চালু করার কথা ভেবেছিল।

প্রফেসার কার কথা বলছেন? কাকে চিঠি পাঠাবেন? কেনই বা এরকম একটা পরিত্যক্ত জায়গায়? প্রফেসার কি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক? জায়গাটার অনেক দুর্নাম আছে শুনেছে অনিলিখা।

ছ'টা দশ মানে পরিচিত ঘড়ির কাঁটায় সময়টা কত হবে? মনে মনে হিসেব করে নিল অনিলিখা। দশ ঘণ্টায় দিন প্রফেসারের। সেদিক দিয়ে সময় হবে দুপুর দুটো বেজে চল্লিশ মিনিট।

ঠিক দুপুর আড়াইটে নাগাদ ওল্ডউইচ আন্ডার গ্রাউন্ড স্টেশন পৌঁছে গেল অনিলিখা। এটা লন্ডনের উষ্ণতম দিনগুলোর মধ্যে একটা। ৩৮ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। এত গরমে এখানকার লোকেরা অভ্যস্ত নয়। এটা বহুবছর যাবৎ বন্ধ স্টেশন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এর মাটির নীচের স্টেশন লন্ডনবাসীদের থাকার জন্য বম্বশেল্টার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল। এয়াররেডের সময় অনেক মানুষ এই

স্টেশনে আশ্রয় নিত। এখন সে স্টেশনে বছরে শুধু কয়েক দিন টুরিস্টদের যেতে দেওয়া হয়। তবে আগে থেকে বুকিং থাকতে হয়।

কিন্তু কোথা দিয়ে ঢুকবে? একবার পুরো স্টেশনের চারদিক দিয়ে পাক খেয়ে নিল অনিলিখা। স্টেশনের বিল্ডিং-এর মধ্যে ঢোকার কোনও উপায় নেই। মাঝেমধ্যে ট্র্যাকারে দেখছিল অনিলিখা। এটা ওই পেনের মাধ্যমে প্রফেসার কোথায় আছেন দেখানোর কথা। তাহলে কি প্রফেসার পেন নিয়ে আসেননি?

হঠাৎ অনিলিখা লক্ষ করল ট্র্যাকারে দেখাচ্ছে প্রফেসার স্টেশনের উত্তর দিকে আছেন। সেদিকে খানিকটা যেতে বাঁদিকে একটা সরু রাস্তা পড়ল। সে রাস্তায় খানিকটা ঢুকলে ডানদিকে একটা খুব পুরোনো দিনের পাব। অনিলিখা দেখল প্রফেসার ওই পাবের দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন। অনিলিখাকে দেখেই ইঙ্গিত করে ভেতরে ঢুকে গেলেন। পাব এখন বন্ধ আছে। কিন্তু দরজা ভেজানো।

অনিলিখাও ওঁর পিছন পিছন ঢুকল। প্রফেসার প্রায়ান্ধকার পাবের ভিতরে ঢুকে সোজা আরও ভিতর দিকে হেঁটে চলে গেলেন। পাবের পিছন দিক থেকে বেরিয়ে উল্টো দিকের রাস্তায় ওঠার আগেই একটা সিঁড়ি নীচের দিকে নেমে গেছে। মনে হয় যেন এই পাবের নীচে কোনও টয়লেট আছে, সেখানে যাওয়ার পথ। প্রফেসার ওটা দিয়ে নীচে নেমে গেলেন। অনিলিখা পিছন পিছন এগোল।

নীচে একটা বন্ধ দরজা পড়ল। প্রফেসার ওই দরজা একটা চাবি দিয়ে খুলে ফেললেন। অনিলিখা পিছু পিছু এগোল। দরজার উল্টো দিকে প্রফেসার অপেক্ষা করছিলেন।

প্রফেসার এবারে জামার পকেট থেকে পেনটা বার করে অনিলিখাকে ফেরত দিয়ে হেসে বলে উঠলেন,—আর তোমার আমাকে ট্র্যাক করার দরকার হবে না। এই গুপ্ত দরজাটা খুঁজে বার করতে আমার বহু বছর লেগে গিয়েছিল। এখন আমার এক বন্ধু এই পাবের মালিক।

একটা সময় লন্ডনে অনেক চক পাথরের দরকার হয়েছিল বাড়ি তৈরির জন্য। তখন এই মাটির তলার সুড়ঙ্গগুলো তৈরি হয়। দেখে মনে হবে গোলক ধাঁধা। আস্তে আস্তে অনেক নীচের দিকে চলে গেছে। লন্ডনের নীচে এক আলাদা শহর ছড়িয়ে আছে। জানো কিনা জানি না, ব্রিটিশ লাইব্রেরির সব বই প্রায় মাটির নীচে আটফুট তলা অব্দি রাখা থাকে। সেই বুকশেলফের দৈর্ঘ্য হল চারশো মাইল। এই মাটির তলাতেই পৃথিবীর সবথেকে বড় রুপোর ভল্টও আছে। এখানে একটা নদীও আছে কারবওয়েল। এই নদী ১৮৭০ সাল অব্দি ব্যবহারও করা হত। লন্ডনের সব নর্দমার ময়লা এসে এ নদীতে মিশত। নদী তাই পণ্য সরবরাহের জন্য অযোগ্য হয়ে উঠছিল। আমি মাটির তলার এই শহরকে উপরের শহর থেকে অনেক ভালো চিনি।

আমার কাছে একটা টর্চ আছে। তুমি এই টর্চটা তোমার কাছে রেখে দাও। কাজে লাগবে।

বলে সামনে টর্চের আলো ফেললেন প্রফেসার।—আমার পিছন পিছন আসবে। এখানে কিন্তু একবার হারিয়ে গেলে খুব সমস্যা। এ টানেল বাইশ মাইল লম্বা। ঘুটঘুটে অন্ধকার। একে চিসলহার্স্টের গুহা বলে।

প্রথমবার যখন এসেছিলাম মা'র খোঁজে তিনদিন ধরে ঘুরে বেরিয়েছিলাম এই গোলক ধাঁধায়। তারপর একজন বেরোনোর পথ দেখিয়ে দেয়।

—কে দেখায়? এখানে লোক থাকে নাকি?

কিছু বললেন না প্রফেসার—শুধু মৃদু হেসে উঠলেন।

খানিকবাদে যেতে যেতে বললেন, এই জায়গার এতটাই কুখ্যাতি যে চোর ডাকাতরাও এখানে আসে না। একবার দুজন চ্যালেঞ্জ করে ১৯৮৬-তে এখানে একটা অভিযান করেছিল। আমি যেখানে নিয়ে যাচ্ছি সেখানে দুজনে রাত কাটাবে বলে চ্যালেঞ্জ করেছিল। তাদের মধ্যে একজন রাতে এক মহিলাকে দেখে। কালো লম্বা গাউন পরেছিল। আস্তে আস্তে তার দিকে এগিয়ে আসছিল। সে দেখে ভয় পেয়ে অন্য জনকে ডাকতে গিয়ে দেখে সে নেই। শুধু তার রক্তাক্ত দেহ পড়ে আছে। ভয় পেয়ে ছুটতে শুরু করে।

পথ হারায়। দশদিন পরে তাকে উদ্ধার করা হয়। সে লোকটা দু-বছর বাদে মারা যায়। কিন্তু সেদিনের সে ঘটনার পরে এ ধরনের ভূত নিয়ে আর কোনও চ্যালেঞ্জের কথা বলেনি।

—তা আপনার সেরকম কোনও অভিজ্ঞতা হয়নি?

প্রফেসার বললেন, আমার মা এখানে থাকে। তাই সব ভয় কাটিয়ে এখানে বারবার আসতে পেরেছি। কিছু খুব ভয়ের অভিজ্ঞতা অবশ্যই হয়েছে।

আরও মিনিট কুড়ি সুড়ঙ্গের পর সুড়ঙ্গ পেরিয়ে একটা জলাশয়ের ধারে এসে পৌঁছলেন প্রফেসার। সঙ্গে অনিলিখা। মাটির এত নীচে যে এত বড় জলাশয় থাকতে পারে তা ধারণা করা যায় না।

প্রফেসার বললেন, আমাদের এখানে অপেক্ষা করতে হবে। কখন দেখা পাব জানি না। কিন্তু মা ঠিকই আসবে।

ভিতরে কীরকম যেন পচা গন্ধ। ঘুটঘুটে অন্ধকার। টর্চের আলোয় যেটুকু দেখা যাচ্ছে।

দু-একবার কথা বলার চেষ্টা করে অনিলিখা থেমে গেল। প্রফেসার কথা বলছিলেন না। যেন অন্য কোনও জগতে হারিয়ে গেছেন।

কতক্ষণ যে এভাবে কেটে গেল কে জানে! অনিলিখার একটু অস্বস্তি হচ্ছিল। প্রফেসার পুরোপুরি স্বাভাবিক তো।

হঠাৎ মনে হল জলের মধ্যে দিয়ে অনেক দূরে কাউকে যেন দেখা যাচ্ছে।

দেখে মনে হয় খুব লম্বা কোনও মহিলা। টর্চের আলো অতদূর যাচ্ছে না। তাকে ঘিরে যেন একটা কুয়াশা।

প্রফেসার জলের দিকে এগিয়ে গেলেন। অনিলিখা উঠে দাঁড়াল। মনে হল প্রফেসার যেন পকেট থেকে একটা চিঠি বার করে নিয়ে আরও গভীরজলের দিকে বিপজ্জনকভাবে এগিয়ে যাচ্ছেন।

অনিলিখা চিৎকার করে উঠল, প্রফেসার, আর এগোবেন না।

অনিলিখা জলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ পিঠে একটা হাত। চমকে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল পিছনে মাইক। কখন ফলো করেছে বুঝতেও পারেনি। হাতে বন্দুক।

মাইক চিৎকার করে বলল, প্রফেসার থেমে যান। আর এক পা এগোলে গুলি করতে বাধ্য হব।

কিন্তু প্রফেসার আরও এগিয়ে গেলেন। আস্তে আস্তে।

দূরে জলের মধ্যে আস্তে আস্তে ওঁর শরীর মিলিয়ে গেল। কুয়াশা যেন আর জমাট বেঁধে ওখানে থেমে থাকল। মাইক গুলি করল না।

২৪

—জানি তুমি দেশে ফিরে যাবে, কিন্তু নেক্সট টাইমও আমরা তোমার কাছ থেকে একই রকম সাহায্য পাব, আশা রাখি। তোমার মধ্যে সবথেকে বড় ক্ষমতা যা আমাদের কোনও এজেন্টের কাছে নেই, সেটা কি জান?

—কী?

—অনেকে খুব বুদ্ধিমান হয়। কিন্তু তাদের হৃদয় থাকে না। তোমার সেটা আছে। এজন্যই তোমাকে সবাই খুব সহজে বিশ্বাস করতে পারে। আমি তোমার কথা ভেবেই প্রফেসারকে গুলি করতে পারিনি।

এবারে অনিলিখা MI 6-এর মূল বিল্ডিং-এ। 'ভকসহল ব্রিজ'-এর পাশে থেমস নদীর ধারে এই বিল্ডিং। মাইক একা নয়। MI 6-এর তরফে আরও পাঁচজন আছেন। আছেন ইউরোপের ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির প্রতিনিধি হয়ে আরও চার জন। কোনও একটা অপারেশন শেষের পরে এরকম মিটিং হয়, যেখানে নতুন কী শেখা গেছে, কোন জায়গায় আরও উন্নতির সম্ভাবনা আছে, সে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হয়।

মাইক সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠল, আমাদের পুরো অপারেশনের মধ্যে যদি কোনও একজন থাকেন, যার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হবে, তিনি হলেন অনিলিখা। তিনি কিন্তু একদম সাধারণ একজন নাগরিক। অনিলিখার

কথা আমরা অনেকেই জানি। যারা জানেন না, তাদের জন্য অনিলিখার একটা ছোট প্রোফাইল এখানে দেখালাম। মনিটরে অনিলিখার সংক্ষিপ্ত প্রোফাইল ফুটে উঠল। তাতে প্রযুক্তিবিদ হিসেবে অনিলিখার বিভিন্ন অবদানের কথা লেখা আছে। লেখা আছে অনিলিখার বিভিন্ন রহস্য সমাধানের কথা।

সবাই হাততালি দিয়ে উঠলেন।

দু-মিনিট বাদে মাইক ফের বলে উঠল, প্রফেসার মূলত এর পিছনে থাকলেও, এ খুন গুলো করত ওঁর আসিস্ট্যান্ট কেন্ শিপম্যান। কেন কম্পিউটার সায়েন্সের স্টুডেন্ট। প্রফেসারের কাছেই পড়েছেন। ওঁর মতাদর্শে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী ও উগ্রবাদী হয়ে উঠেছিল। প্রফেসারের সঙ্গেই থাকত। আমার ধারণা প্রফেসার এর পিছনের বিস্তারিত প্ল্যানিংটা করতেন। আপনারা তো জানেনই কেন ওকে আমরা অ্যারেস্ট করেছি। ও নিজে এর অনেকটাই স্বীকার করেছে।

এর সঙ্গে ক্রুনোর কোনও যোগাযোগ ছিল না। আমাদের বিভ্রান্ত করার জন্যই প্রফেসার আমাদের সামনে ক্রুনোকে নিয়ে এসেছিলেন। উনি ক্রুনোকে খুব ভালো করে জানতেন। ওঁর খুব প্রিয় ছাত্র ছিল। তাই এমন ভাবে ঘুঁটি সাজাতেন যেন মনে হত যে ক্রুনোই এর পিছনে আছে। অনিলিখার জন্য আমরা আমাদের ভুল বুঝতে পারি।

একজন প্রশ্ন করে উঠল, প্রফেসার কেন করতেন সেটা সম্বন্ধে আমরা কি নিশ্চিন্ত হতে পেরেছি?

—অবশ্যই। ওঁর জীবনে ছোটবেলায় কিছু ট্র্যাজেডি হয়। মাত্র সাত বছরে উনি ওঁর বাবা, মা, বোনকে হারান। পরে ওঁর ছেলে আমেরিকায় সুইসাইড করে। ওঁর মধ্যে একটা ধারণা তৈরি হয় যে এর জন্য মানুষ ও প্রযুক্তিই দায়ী। সেখান থেকেই শুরু। ওঁর সঙ্গে প্রকৃতি-পরিবেশের এক অদ্ভুত যোগাযোগ তৈরি হয়। ওঁর পরিত্যক্ত বাড়ি থেকে আমরা পাঁচটা পুতুল উদ্ধার করি।

এটা ভারতের ধর্মভাবনা ও বেদের দ্বারা খানিকটা প্রভাবিত। আমাদের ধারণা ওই পুতুলগুলো ভারতীয় বেদের পঞ্চভূত—পৃথিবী বা মাটি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ-কে উদ্দেশ্য করে তৈরি করা হয়েছিল। তার সঙ্গে প্রফেসারের কী যোগাযোগ হয়েছিল জানি না। তবে এক কথায় ওঁর মধ্যে ধারণা ছিল, এ পৃথিবী রক্ষার দায়িত্ব ওঁরই।

তাই যখনই ওঁর মনে হত যে, কেউ তার আবিষ্কার বা প্রয়োগের মাধ্যমে এই পৃথিবী বা মানবসভ্যতার ক্ষতি করতে চলেছে, উনি তখনই তাকে হত্যা করতে উদ্যত হতেন। উনি শুধু ওঁর বিষয়ে জিনিয়াস ছিলেন না, একইসঙ্গে বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তিতে, মেকানিক হিসেবে ওঁর যথেষ্ট দক্ষতা ছিল। তাই ওঁর প্ল্যানগুলো এত নিখুঁত হত যে আমাদের পক্ষেও পাল্লা দেওয়া শক্ত হয়ে উঠেছিল।

যেমন ধরুন সেন্ট জেমস হোটেলে প্রফেসার অ্যান্ডির হত্যা। ওখানে অত

সি সি টিভি ক্যামেরা থাকা সত্ত্বেও একটা ক্যামেরাতেও অপরাধী কেন ধরা পড়েনি তা আমরা এখনও জানি না। লেটেস্ট রিপোর্ট সাজেস্ট করছে যে উনি ন্যানো টেকনোলজির চার্জড ন্যানোপারটিকেলের সাহায্য নিয়েছিলেন যার সাহায্যে অপরাধীর মুখচ্ছবি অস্পষ্ট করে দেওয়া যায়। একইসঙ্গে উনি নার্ভ এজেন্ট তৈরি করেছিলেন যা অত্যন্ত শক্তিশালী, কিন্তু তার এফেক্ট যাতে অন্য কারুর মধ্যে ছড়িয়ে না পড়ে, তারও একটা বিশেষ উপায় বার করেছিলেন।

—কিন্তু ওঁর বডি তো এখনও পাওয়া যায়নি।

—হ্যাঁ, ঘটনা যেখানে হয়েছে, সেই বিশেষ জায়গা নিয়ে আমাদের সব রকম তদন্ত চালাতে বিশেষ কিছু নিষেধাজ্ঞা আছে। আমাদের ডুবুরীরাও ওখানে সার্চ অপারেশন চালাতে চাইছে না। তবে তা সত্ত্বেও অপারেশন চালু আছে। আমরা শিগগিরি ওঁর ডেডবডি খুঁজে পাব বিশ্বাস রাখি।

তা আমি তো একাই বলে যাচ্ছি। আমি এবার অনিলিখাকে কিছু মন্তব্য করতে বলব।

অনিলিখা বলে উঠল, না, মাইক সবই বলেছে। তবে একটা কথা বলি। প্রফেসার ডেভ যা করেছেন তা আইনের চোখে অবশ্যই অপরাধ, কিন্তু ওঁর জন্য এখন অনেক অসৎ সায়েন্টিস্টের মনে এক ভীতি তৈরি হয়েছে। আগামীদিনে প্রযুক্তির কোনও অন্যায় প্রয়োগ করার আগে তাঁরা একটু হলেও ভাববে। তাই ওঁর মৃত্যু নিয়ে নিশ্চিত না হওয়া একদিক থেকে ভালো।

মাইক সায় দিয়ে ফের বলে উঠল, এখানে একটা জিনিস যেটা খুব ভালো কাজ করেছে তা হল বিভিন্ন ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির মধ্যে সমন্বয় ও তথ্যের আদানপ্রদান। সবাইকে ধন্যবাদ জানাই।

এর কিছু সময় বাদে মিটিং শেষ হয়ে যায়।

২৫

প্রায় দু'মাস বাদে দেশে ফিরছে অনিলিখা। এবারে বেশ কিছু দিন এ ঘটনার জন্যই আটকে গিয়েছিল।

দুবাই-এ চারঘন্টার স্টপওভার। তাই ডিউটি ফ্রি-শপগুলোতে ঢুঁ মারছিল অনিলিখা। হঠাৎ মনে হল পাশ দিয়ে যাচ্ছেন পাকিস্তানের বিখ্যাত নিউক্লিয়ার সায়েন্টিস্ট জাহির আব্বাস। বেশ কিছু সিকিউরিটি দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে লোকটা দ্রুতপায়ে গেটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। লোকটা নিউক্লিয়ার টেকনোলজি আফ্রিকার কিছু সন্ত্রাসবাদী সংস্থার হাতে তুলে দিচ্ছে বলে একটা জোর খবর আছে।

জাহিরের ছবি অনিলিখা বেশ কয়েকবার দেখেছে, তাই ভুল হওয়ার

সম্ভাবনা নেই। একটু কৌতূহলবশত অনিলিখা দেখল লোকটা ওর দলবল নিয়ে কাতার এয়ারওয়েজের ফ্লাইট ধরার জন্য গেট A 11-এর দিকে যাচ্ছে। ওটা মিশর যাচ্ছে।

এত বড় অপরাধী কীরকম বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াতে পারে। নিশ্চয়ই এর মধ্যেই মাল্টি বিলিওনেয়ার হয়ে উঠেছে। পরমাণু বোমা তৈরির ক্ষমতা যদি কিছু টেররিস্ট গ্রুপের কাছে চলে যায়, তাহলে কী যে হতে পারে।

নিজের অজান্তে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল অনিলিখার।

নিজের ফ্লাইট ধরারও বেশি সময় বাকি নেই। গেট B 21-এর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল অনিলিখা। হঠাৎ মনে হল উল্টোদিক থেকে একজন আসছে যার হাঁটার স্টাইলের সঙ্গে ও খুব পরিচিত।

ইহুদিদের পোশাকে থাকা বৃদ্ধ লোকটা অনিলিখার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় শুধু হেসে বলে গেল, ইজিপট যাচ্ছি।

বলে হেসে জাহির আব্বাস যে গেটের দিকে গিয়েছিল, সেদিকে এগিয়ে গেল।

প্রফেসার ডেভ তাহলে মারা যাননি। ওটা পুরোটাই ছিল MI 6-এর চোখে ধুলো দেওয়ার একটা উপায়। উনিই বলেছিলেন যে, লন্ডনের তলার শহরটাকে উনি উপরের শহরটার থেকে অনেক বেশি ভালো চেনেন।



অনিলিখা ও হিরোসি

১

আর বেশি দিন বাকি নেই, যেদিন আমাদের সব কাজ রোবটরাই করবে। আমাদের হাত গুটিয়ে বসে থাকতে হবে। একমাত্র কাজ হবে এভাবে একসঙ্গে বসে আড্ডা দেওয়া। প্রতীক বলল।

আর খাওয়া? রোবটরা কোনওদিনই খাওয়ার ব্যাপারে আমাদের টেক্কা দিতে পারবে না। ওটাতে আমরা চিরকাল প্রথম থাকব। আড়চোখে বিশ্বজিৎদার দিকে তাকিয়ে সহেলী বলে উঠল।

বিশ্বজিৎদা অষ্টম শিঙাড়াটা খেতে যাচ্ছিল। একটু কড়া চোখে সহেলীর দিকে তাকিয়ে হাত গুটিয়ে নিল।

আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় রোবট। বেশ বুঝতে পারছি প্রতীক এ বিষয় নিয়ে বেশ কিছু পড়াশোনা করেছে। আমাদের দিকে তাকিয়ে ফের বলে উঠল, সিঙ্গুলারিটি কাকে বলে জানিস?

সাগ্নিক খুব গম্ভীরভাবে উত্তর দিল, রোবট যখন নিজেকে খুব একাকী মনে করে, সে মুহূর্তকে সিঙ্গুলারিটি বলে।

আমাদের বাকি সবার নীরবতা লক্ষ করে বেশ একটা তৃপ্তির হাসি হেসে প্লেটে রাখা চানাচুর একমুঠো নিয়ে প্রতীক ফের বলল, এককথায় সিঙ্গুলারিটি হল সেই মুহূর্ত যখন রোবট আমাদের থেকে বেশি বুদ্ধিমান হয়ে উঠবে। অর্থাৎ ওদের হাতেই তারপরে থাকবে সব কিছুর রাশ। বিজ্ঞানীরা বলছে সেদিন বেশি দূরে নেই। ২০২৯ সাল নাগাদ এরকম হবে।

সেকী? সে তো আর কয়েকবছর মাত্র। সহেলী উদ্বিগ্ন হয়ে বলে উঠল। তাহলে?

এখনই যে হয়ে যায়নি, সে খবর কি আর আমরা রেখেছি? প্রশ্নটা অনিলিখাদির কাছ থেকে। অনিলিখাদি দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

বেশ কয়েকমাস বাদে অনিলিখাদি আমাদের শনিবারের আসরে এল। গত কয়েকমাস বেশিরভাগ সময় ভারতের বাইরে ছিল। মাঝেমধ্যে ভারতে এলেও আমাদের শনিবারের আসরে আসতে পারেনি।

খানিকক্ষণের জন্য অনিলিখা-এফেক্টে অন্য কোনও আলোচনা আর সম্ভব হল না। অনিলিখাদিকে এতদিন বাদে দেখার পরে অন্য কোনও প্রসঙ্গে কথা

বলা প্রায় অসম্ভব।

অনিলিখাদির আনা বেশ কিছু সুইস চকলেট মুহূর্তে উধাও হয়ে গেল।

মিনিট পনেরো বাদে আবার আমরা প্রসঙ্গে ফিরে এলাম। আমরা না জানলেও অনিলিখাদির যে আসার কথা ছিল আর সে খবরটা যে কিচেন অব্দি পৌঁছেছিল, সেটা দিব্যি বোঝা গেল। মাসিমার হাতে বানানো ডিমের ডেভিল এর মধ্যেই এসে গেছে।

এই ভাগাড়কাণ্ডের জেরে বাইরে দোকানে ডেভিল খাওয়া সম্ভব নয়। আমরা সবাই সামনের টেবিলে হামলে পড়লাম।

অনিলিখাদি যে বেশ কয়েকমাস ইউরোপে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তার প্রকাশ অনিলিখাদির পোশাকেও। পরনে একটা হাঁটু অব্দি নীলসবুজ উজ্জ্বল স্কার্ট।

আমি প্রশ্ন করলাম, তা তোমার কী মনে হয় রোবটরা আমাদের থেকে এখনই বেশি বুদ্ধিমান হয়ে গেছে?

না, জেনারালি তা হয়তো বলা ঠিক হবে না। তবে অনেক ক্ষেত্রে আমাদের থেকে রোবটরা কিন্তু এখনই বেশি বুদ্ধিমান। তা না হলে কি আর আমরা ওদের কাছে দাবায় হারি? যে খেলাটাকে সব থেকে জটিল খেলা বলা হয়, সেই 'অ্যালফা গো' বোর্ড গেমেও কম্পিউটার চীনের বিশ্বচ্যাম্পিয়নকে হারিয়ে দিয়েছে। বিশেষ বিশেষ স্পেসালাইসড ক্ষেত্রে ওরা আমাদেরকে ইতিমধ্যেই পিছনে ফেলে দিয়েছে। তবে সিঙ্গুলারিটির প্রশ্নটা একটু আলাদা। একটু থেমে টেবিলে পড়ে থাকা শেষ ডেভিলটা নিয়ে একটা আলতো কামড় দিয়ে অনিলিখা ফের বলে উঠল, সেটা হতে হলে তিনটে শর্ত পূরণ করতে হবে। এক, রোবটকে নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে, হয়তো খানিকটা আত্মমর্যাদাবোধও তার সঙ্গে থাকতে হবে। দুই, নিজের প্রয়োজন মতো ভবিষ্যতের কথা ভেবে প্ল্যান করার ক্ষমতা থাকতে হবে, যেটা করতে আমরা একদম এক্সপার্ট। আর তিন নম্বর, আশে-পাশের পরিবেশ সম্বন্ধেও সচেতন হতে হবে। এ কাজগুলো কোনওটাই রোবটদের পক্ষে অতটা সহজ নয়। আর সেটাই আরটিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের বা কৃত্রিম বুদ্ধির গবেষণা যারা করছেন সেই বিজ্ঞানীদের কাছে সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ। এখনও অব্দি কোনও রোবট কীভাবে কথোপকথন চালিয়ে যেতে হবে, তাই জানে না। কমনসেন্স বলেও ওদের কিছুই নেই। যার সঙ্গে কথা বলছে তার মুখের ভাব বুঝে কোন কথাটা কখন বলতে হবে, তাই বোঝে না। যেটা আমরা খুব সহজেই পারি।

তা বিজ্ঞানীরা কি সেটা সত্যি চান যে আমাদের থেকে ওরা বেশি বুদ্ধিমান হয়ে যাক?

ঠিক বলেছিস। আমরা কখনই চাইব না যে এরকম মুহূর্ত আসুক। টারমিনেটর্স সিনেমা তো দেখেছিস। সেরকম হলে কী হতে পারে সে তো সহজেই ভেবে নেওয়া যায়। সবার আগে আমাদের জায়গা ওরাই নেবে।

যাক, তাহলে কিছুটা নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। অন্তত কয়েক বছরের জন্য চাকরি বাকরি ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে যেতে হবে না। তা কবে নাগাদ সেরকম হবে বলে তোমার মনে হয়, সাগ্নিক বলে উঠল।

অনিলিখা যেন একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল। ফের বলল, আসলে সেটা যে কবে হবে তা নিয়ে এ বিষয়ের এক্সপার্টদের মধ্যেও কোনও সহমত নেই। কেউ বলছেন এটা আগামী দশ বছরে হবে। কেউ বা বলছেন এটা হতে আরও একশ বছর লেগে যাবে। অনেকে আবার বলছেন যে ওরা আমাদের থেকে বেশি ইন্টেলিজেন্ট হলেও আমাদের তাতে কোনও ধরনের বিপদের আশঙ্কা নেই। ওরা আমাদের সঙ্গে মানিয়ে নিয়েই চলবে। তবে আমরা আর কতটুকু খবর রাখি। কোনও এক বিজ্ঞানীর কাজই সব ধ্যান-ধারণা পাল্টে দিতে পারে।

গল্পের আভাস পেয়ে বিশ্বজিৎদা বলল, তা সেরকম কিছু ঘটনার কথা বলবে বলে মনে হচ্ছে।

হ্যাঁ, আজ সেটাই বলব বলে ভেবে এসেছিলাম। বলে অনিলিখা ওর ব্যাগ থেকে একটা ডায়েরি বার করল। দেখেই বোঝা যায় বেশ দামি ডায়েরি। লেদারের কালো কভার। প্রথমদিকের কয়েকটা পাতা বাদ দিয়ে একটা পাতায় অনিলিখা থামল। তারপরে বলতে শুরু করল।

২

এখনকার দিনে যারা আরটিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে কিছুটা জানে, তারাই আসাহি-র সম্বন্ধে জানে। মেশিন লারনিং নিয়ে অক্সফোর্ডর ক্রাইস্ট চার্চ কলেজে দীর্ঘকাল পড়াতেন। এ বিষয়ে পৃথিবীর অগ্রগণ্য বিজ্ঞানীদের মধ্যে তিনি একজন। এ বিষয়ে অজস্র পেপার আছে তাঁর। তা আসাহি শব্দের মানে জাপানিতে কী জানিস তো?

আমাদের চুপ দেখে অনিলিখাদি ফের বলল, আসাহি মানে সূর্যোদয়। আসাহির জন্ম হিরোশিমাতে। ১৯৩৭ সালে। আসাহির যখন মোটে আটবছর বয়স, তখন হিরোশিমায় পরমাণু বোমা ফেলা হয়। ওঁদের পরিবারের সবাই মারা যায়। তা সে কথায় পরে আসছি। এটা তাঁরই ডায়েরি।

আমার সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়েছিল ভারি অদ্ভুতভাবে। আমি বছর দুয়েক

আগে সুইজারল্যান্ডের লুসারনের একটা পাবে ঢুকে 'সুসান সাদারডে'-এর 'Nagasaki: Life After Nuclear War' বইটা পড়ছি, হঠাৎ আমার পাশের একটা চেয়ার টেনে নিয়ে ভদ্রলোক বসে পড়লেন।

বুদ্ধিদীপ্ত ছোটখাট চেহারা। কুতকুতে চোখ, রিমলেস চশমা। চওড়া ভুরু। চোখের কোনও পাতা নেই। হাত বাড়িয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে নিজের পরিচয় দিলেন। আসাহি।

ইংরেজি বেশ ভালোই বলেন, তবে খুব আস্তে আস্তে বলেন। একটু খেয়াল করে শুনতে হয়।

তা আমাদের কথা শুরু হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ নিয়েই। পরমাণু বোমা ফেলার সপক্ষে একটা যুক্তি এখন প্রায়শই শোনা যায় যে, সে সময়ে জাপানের উপরে পরমাণু বোমা না ফেললে যুদ্ধ আরও বেশ কয়েক বছর ধরে চলত। সব দেশেরই আরও অনেক লোক মারা যেত। জাপান সহজে হার মানত না।

১৯৪৫-এর জুনে মারিয়ানার মতো জাপানের অধীকৃত কিছু দ্বীপকুঞ্জ জয় করতে গিয়ে যা রক্তক্ষয় আর সামগ্রিক ক্ষতি হয়েছিল, তাতে অ্যালায়েন্স আর্মি বেশ টের পেয়েছিল যে আর যাই হোক জাপানের মূল ভূখণ্ড জয় করা সহজ হবে না। কোনও ভাবেই জাপানিরা সহজে হার মানবে না। লক্ষ লক্ষ সেনা মারা পড়বে। দীর্ঘ এ যুদ্ধে অ্যালায়েন্স আর্মির মনোবলও হয়তো ভেঙে যাবে। যুদ্ধ চলতেই থাকবে।

উল্টোদিকে অন্য কোনও কৌশলও কাজ করছিল না। বিভিন্ন শহরে কারপেট বম্বিং করে জাপানের জনসাধারণের মনোবল ভেঙে দেওয়ার সবরকম চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল। লক্ষ লক্ষ সাধারণ জাপানি দেশের জন্য প্রাণ দিতেও কোনওরকম দ্বিধা করত না। অনেকে সুইসাইড বোম্বার বা কামাকাজি হওয়ার জন্য নাম লিখিয়েছিল।

তাই একমাত্র উপায় ছিল এরকম কিছু করা যাতে জাপানি লোকেদের মনোবল সম্পূর্ণ ভেঙে দেওয়া যায়। পরমাণু বোমায় একটা শহর প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলে জাপান আত্মসমর্পণ করবে, সেটাই ছিল ধারণা। সেটা অবশ্য বাস্তবে হয়নি। হিরোশিমা আর নাগাসাকির পরেও যুদ্ধ থামত না, যদি না জাপানের সম্রাট আর্মিকে আত্মসমর্পণ করতে বলতেন।

তাই নাকি? তন্ময় বলে উঠল, এটা তো জানা ছিল না।

হ্যাঁ, হিরোশিমা আর নাগাসাকিতে পরমাণু বোমা ফেলার পরে একটা বিশেষ ক্যাবিনেট মিটিং ডাকা হয়। তাতে ভোটে দেখা যায় যে আত্মসমর্পণের পক্ষে ও বিপক্ষে একই সংখ্যক ভোট পড়েছে। জাপানের প্রধানমন্ত্রী সুজুকি তখন জাপানের সম্রাট হিরোহিতোকে এ বিষয়ে সিদ্ধান্তের জন্য অনুরোধ করেন। তখন

সম্রাট হিরোহিতোই পুরো পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে আত্মসমর্পণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সম্রাটকে জাপানের সাধারণ লোক দেবতার মতো মনে করত। তাই তাঁর আদেশের পরেই তারা আত্মসমর্পণ করে। সবাই অস্ত্র সারেন্ডার করে। শত্রুসেনার হাতে ধরা দেয়। তবে অনেকেই হয়তো মনের ভেতর থেকে সেটা মেনে নিতে পারেনি।

তা এসব কথা বলতে বলতে ভালো আলাপ হয়ে গেল তাঁর সঙ্গে। প্রথমে চিনতে পারিনি। তাঁর অনেক বই আগে পড়েছিলাম। কিন্তু খেয়াল ছিল না। ওই বই নিয়ে কোনও কথা না হওয়ায় প্রথম আলাপে এক সাধারণ জাপানির বাইরে অন্য কিছু মনে হয়নি। পরে আসল পরিচয় পেয়েছিলাম।

বুঝতে পেরেছিলাম তিনিই বিখ্যাত বিজ্ঞানী আসাহি ইটো। রিটায়ারমেন্টের পরে তিনি ইংল্যান্ড ছেড়ে সুইজারল্যান্ডের লুসারনে চলে এসেছিলেন। কী কারণে তা অবশ্য জানতে পারিনি।

প্রথম পরিচয়ের পর থেকেই আসাহি আমাকে খুব স্নেহ করতেন।

এর পর থেকে যোগাযোগ ছিল। মূলত ইমেল মারফত। আমাদের বেশ কিছু কমন ইন্টারেস্ট ছিল। সে বিষয়ে ইমেইল করতাম। উত্তর পেতাম।

দারুণ গল্পও বলতে পারতেন। কথায় কথায় মজা করতেন। অনেক গল্পের স্টক ছিল। আর বলতেনও খুব ইন্টারেস্টিং ভাবে। এমন ভাবে কথা বলতেন যে মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনতে হত। রবীন্দ্রসঙ্গীতের খুব বড় ভক্ত ছিলেন। শুনেছিলাম তাঁর কোনও সতীর্থ শিক্ষক বাঙালি ছিলেন আর সেই সূত্রেই রবীন্দ্র সঙ্গীতের সঙ্গে পরিচয়। সে জন্য বাংলা ভাষাতেও বেশ আগ্রহ ছিল।

একটা জিনিস বেশ বুঝতাম যে তাঁর বিভিন্ন বিষয়ে আগ্রহ দেখার মতো। এমন কোনও বিষয় ছিল না যা নিয়ে ওর বেশ ভালো জ্ঞান ছিল না। তবে একই সঙ্গে খানিকটা খামখেয়ালিও ছিলেন। অনেক সময় কোনও ইমেলের দিনের পর দিন কোনও উত্তরই আসত না।

ছ'সপ্তাহ আগে আমি সুইজারল্যান্ডের জুরিখ গিয়েছিলাম। তাঁকে আগেই জানিয়েছিলাম যে আমি জুরিখ যাব। কোথায় থাকব তাও জানিয়েছিলাম। ইচ্ছে ছিল তাঁর সঙ্গে দেখা করার। তাঁর বাড়ি যাওয়ার। কিন্তু তাঁর দিক থেকে কোনও প্রত্যুত্তর পাই নি। তাই দেখা হবে না ধরেই নিয়েছিলাম।

জুরিখে একটা বড় কনফারেন্স ছিল। শহরের থেকে সামান্য দূরে সুইসহোটেলে ছিলাম। জুরিখের একটা মেন ট্রেন স্টেশনের পাশেই বিশাল হোটেল। তা দ্বিতীয় দিন হঠাৎ রাত দশটার সময় হোটেলের রিসেপশন থেকে কল। আমার সঙ্গে

একজন দেখা করতে এসেছেন।

অবাক হলাম। এত রাতে তাও আবার জুরিখের মতো শহরে যেখানে আমার আত্মীয়-বন্ধু কেউ নেই, সেখানে আবার কে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে। তারপরে শুনি আর কেউ নন, আসাহি এসেছেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। সঙ্গে সঙ্গে নীচে নেমে আসি।

আসাহিকে দেখেই মনে হল কোনও কিছু নিয়ে যেন তিনি খুব চিন্তায় আছেন। কথায় কথায় অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু একটা বলতে গিয়ে ইতস্তত করছিলেন।

তারপর একটা ডায়েরি আমার হাতে দিয়ে বললেন, এটা তোমার সময় মতো পড়ো। আজকের ঘটনার পরে এটা আর আমার কাছে রাখার ভরসা পাচ্ছি না। কাল কি তুমি খুব ব্যস্ত আছ? পারলে একবার আমার বাড়ি এসো।

আজকে? কী ঘটনা? কোনও অসুবিধে হয়েছে?

সে কথা পরে কথা হবে। তা কাল আসতে পারবে? আমার বাড়ি খুব দূরে নয়। অ্যাড্রেস, ডিরেকশন দিয়ে দিচ্ছি, বলে আমাকে ডিটেলস দিয়ে দিলেন।

তা ডায়েরিটা আপনি আপনার কাছেই রেখে দিন না। কালই না হয় নিয়ে নেব।

আসাহি হঠাৎ করে উঠে দাঁড়ালেন। না, না এটা তোমার কাছেই রেখে দাও। আমার কাছে হারিয়ে যেতে পারে। এ ডায়েরি তোমার কাছেই রেখো। কাউকে দিও না।

অনিলিখা একটু থেমে বলল, তা এ হল সেই ডায়েরি। তবে কিছু জায়গায় জাপানিতেও লেখা আছে। আমি শুধু ইংরাজি অংশটুকুই পড়তে পেরেছি।

কই, কই দেখি ডায়েরি।

আমাদের হাতে ডায়েরিটা মিনিটখানেক ঘুরল। খুব সুন্দর হাতের লেখা। কিন্তু খুব ছোট ছোট করে লেখা।

আবার ফেরত নিয়ে অনিলিখাদি বলে উঠল।

—আসাহি যাওয়ার আগে তাঁর বাড়ির ঠিকানা দিয়ে গেলেন। ট্রেনে করে লুসারন গিয়ে সেখান থেকে বোটে করে যেতে হবে। গাড়ি চালাতে পারলে সুবিধে হত, কিন্তু সুইজারল্যান্ডের ড্রাইভিং লাইসেন্স নেই বলে পাবলিক ট্রান্সপোর্টের উপরে ভরসা করাই ভালো। এমনিতেও সুইজারল্যান্ডে সব কিছু ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় চলে। তাই কোনও অসুবিধে হওয়ার কথা নয়।

পরের দিন খুব ভোরবেলা অফিস ছিল। কিন্তু তবু ডায়েরির কয়েকটা পাতা পড়লাম।

তোদেরকে ডায়েরির থেকে কিছু অংশ আগে পড়ে শোনাই। তারপরে

আমার নিজের তাঁর বাড়িতে যাওয়ার অভিজ্ঞতা শোনাব। আসাহি শিক্ষক ছিলেন। বই লিখেছেন। তাই তাঁর এই ডায়েরি লেখার একটা গুন হল খুব আকর্ষণীয়ভাবে লেখা। এজন্যই বোধহয় তিনি তাঁর সাবজেক্টের লেখক হিসেবেও এতটা সফল ছিলেন। আমি বিশেষ কিছু দিনের কথা বলছি যেখানে তিনি তাঁর তৈরি রোবট সম্পর্কে লিখেছেন। তাতে কিছুটা ধারণা হবে রোবটটার সম্বন্ধে।

অনিলিখা পড়তে শুরু করল।

৩। ১২ জানুয়ারি

ওর নাম রাখলাম হিরোসি। যার অর্থ উদারতা। আমার মনে হয় এই উদারতা আমাদের সবার মধ্যে থাকলে এই পৃথিবীটা অন্যরকম হতো। সবাই যদি সবার বিপদে এগিয়ে যেত, তাহলে আমাদের সমাজটা কীরকম হতো ভাবা যায়। এই পৃথিবীতে আমাদের সবার যা দরকার, তার থেকে অনেক বেশি সব কিছু আছে। কিন্তু তবু আফ্রিকায় লক্ষ লক্ষ শিশু অনাহারে মরে। লক্ষ লক্ষ লোক যুদ্ধ বিগ্রহে মারা যায়।

আমি চেয়েছিলাম হিরোসিকে একদম অন্যরকম করে তৈরি করতে। হয়তো ওই হবে পৃথিবীর প্রথম বুদ্ধিমান রোবট শ্রেণীর প্রতিনিধি। তাই এই উদারতা ওর থেকে অন্যদের মধ্যে ও একই ভাবে ছড়িয়ে পড়বে সে আশা রাখি। ওকে তৈরি করা হয়েছে শান্তির দূত হিসেবে। ওর জটিল অ্যালগরিদম সব সময় শান্তিপূর্ণ সমাধান খুঁজবে।

ওকে দেখতে ঠিক আট-নয় বছরের বাচ্চাদের মতো। সাড়ে তিনফুট হাইট। যেভাবে তৈরি করেছি তাতে যে কেউ ওকে ওই বয়সের বাচ্চা বলেই ভুল করবে। ওর চোখেমুখে এমন একটা সারল্য আছে যে তৈরি করার পরে আমার নিজেরই মনে হচ্ছিল না যে ও এক রোবট। ওর দিকে তাকালেই তাই একটা অন্য ধরনের অনুভূতি হয়। মনে হয় ও ঠিক আমাদেরই একজন।

আমার ধারণা হিরোসির মতো রোবট আর নেই।

তবে ওর আসল বিশেষত্ব চেহারায় নয়। ওর আসল ক্ষমতা হল শেখার ক্ষমতা। আর সেখানেই আমার দীর্ঘ দিনের পড়াশোনা, রিসার্চ কাজে লেগেছে। দিনের পর দিন মেশিন লারনিং-এর বিভিন্ন জটিল অ্যালগরিদম নিয়ে ওর উপরে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছি। ও চারপাশের সবকিছু খুব মনোযোগ দিয়ে দেখে, বোঝে, আর সে বুঝে কাজ করার ক্ষমতা রাখে।

এই তো আজকেরই ঘটনা। আমার পোষা বেড়াল পিটার সোফায় উঠে

পিঠ চুলকোচ্ছিল। গতকাল বাইরে বাগানে ও একটা রবিন পাখি মেরেছে। সেটা হিরোসির চোখ এড়ায় নি।

পিটার হিরোসিকে বিশেষ পছন্দ করে না। কেন জানি না। ওকে দেখে একবার ফ্যাশ ফ্যাশ করে উঠল।

দেখি তা দেখে হিরোসি গম্ভীর মুখে বলে উঠল, নটি ক্যাট।

হিরোসিকে চার্জিং-এর ব্যাপারটা নিয়ে একটু ভাবতে হবে। ছ-সাত ঘণ্টা লেগে যাচ্ছে ফুল চার্জ করতে। তবে তারপরে দিন তিনেক চলছে। সেটা ও নিজেই সময় মতো করে নেয়।

অনিলিখা আবার বেশ কিছু পাতা ওল্টাল। ফের একটা পাতায় থেমে বলতে শুরু করল।

৩। এপ্রিল

গত কয়েক মাস থেমে থাকিনি। এখন হিরোসির মধ্যের কৃত্রিম বুদ্ধির প্রোগ্রামলজিক আগের থেকে অনেক ভালো হয়েছে। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক।

হাতি, ডলফিন আর বাঁদরের মধ্যে একজায়গায় খুব মিল। এদের আয়নার সামনে দাঁড় করালে এরা কিছুক্ষণের মধ্যে বুঝে যাবে যে আয়নায় নিজেদেরকেই দেখছে। কিন্তু একটা গন্ডারের সামনে কিছু দূরে আয়না রাখলে, গন্ডার ছুটে গিয়ে তাকে আক্রমণ করবে। বেশিরভাগ প্রাণীর ক্ষেত্রেই এটা সত্যি। তারা মনে করবে তাদের এলাকায় আরেকটা নতুন প্রাণী এসে গেছে। তাই আক্রমণ করবে।

এটাকে খুব সামান্য একটা ব্যাপার বলে মনে হতে পারে। কিন্তু এটা একটা বিশাল বড় ক্ষমতা। নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতনতার একটা বড় পরীক্ষা। এ বিষয়ে আমাদের টেক্কা দিতে পারে এরকম অন্য কোনও প্রাণী নেই। আমরা তাই আয়নার সামনে দাঁড়াতে এত ভালোবাসি।

তা এ বিষয়ে হিরোসি কী করে সেটা দেখা দরকার ছিল। আমি ওকে এতদিন কোনও আয়নার সামনে যেতে দিইনি। আজ ওকে একটা আয়নার সামনে দাঁড় করালাম।

ও প্রথমে একটু ভয় পেয়েছিল। তারপরে আমার দিকে তাকাল। দেখলাম আমার প্রতিবিম্ব আয়নায় পড়েছে। ও সেটা দেখছে। তারপরে আস্তে আস্তে কাচের দিকে এগিয়ে গেল। আয়নার পিছন দিকটাও দেখল।

তারপরে ফিরে এসে আয়নার দিকে তাকিয়ে ভেংচি কাটল। বুঝতে পেরে বাচ্চাদের মতো আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল। পরের পাঁচ মিনিট ওর কাণ্ডকারখানা

দেখে এটুকু বুঝেছি অনেক দিক দিয়ে ও এখন একদম একটা দুবছরের মানব শিশুর মতো। নিষ্পাপ।

১৬। এপ্রিল

আমাদের বাড়ির থেকে খানিকদূরে একটা ক্রিকেটের মাঠ আছে। ওখানে এখানকার কয়েকটা ছেলে খেলে। বছর চোদ্দো-পনেরোর। এদের মধ্যে তিনজন ছেলে আমার বাড়ি গত কয়েক মাসে কয়েকদিন এসেছে। তখন অবশ্য আমি ওদের সামনে হিরোসিকে নিয়ে আসিনি। হিরোসির কথাও বলিনি। ওরা ঠিক কোথায় থাকে জানি না। তবে কয়েকমাস আগে দেখিনি।

আজ হিরোসিকে নিয়ে ওই মাঠে গিয়েছিলাম। দেখতে যে ও কমবয়সি ছেলেদের সঙ্গে কীভাবে মেশে। দেখলাম ও চুপ করে দাঁড়িয়ে বেশ খানিকক্ষণ ওদের খেলা দেখল।

ছেলেগুলো প্রথমে ওকে দেখে বুঝতে পারেনি যে ও একটা রোবট। কাছ থেকে দেখে তবে বুঝতে পারল। ওর বিশেষ ক্ষমতার কথা আমার কাছে শুনে ওর সঙ্গে আলাপ করার খুব আগ্রহ। কিন্তু হিরোসির দিক থেকে তেমন আগ্রহ দেখলাম না। কেন বুঝলাম না ও প্রায় তেমন কোনও কথাই বলল না।

যেটুকু না বললে নয়, সেটুকুই।

কী নাম তোমার?

হিরোসি।

আমরা তোমাকে হিরো বলে ডাকব। ক্রিকেট ভালো লাগে?

না।

আমাদের সঙ্গে খেলবে?

ও দেখলাম চুপ করে রইল। কোনও উত্তর দিল না।

বুঝলাম ওদের বিশেষ পছন্দ হয়নি। ওরা আরও এরকম কিছু প্রশ্ন করে উত্তর না পেয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই ওর উপরে আগ্রহ হারাল।

রোবটদের পক্ষে কথোপকথন চালিয়ে যাওয়া সহজ কাজ নয়। কারণ ওরা কী কথা বলবে তা খুঁজে পায় না। কিন্তু হিরোসির পক্ষে এটা শক্ত কাজ হওয়ার কথা নয়। তাহলে কি আমার গবেষণা সফল নয়?

আমি তো ওর সঙ্গে নিজে কথা বলে দেখেছি। দরকার মতো ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলে যেতে পারে। আমার ছোটবেলা নিয়ে কত কথা ওর সঙ্গে হয়। কতবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ নিয়ে ওর সঙ্গে আলাপ আলোচনা হয়েছে। অন্যজন কখন কী ধরনের কথা শুনতে আগ্রহী সে বিষয়ে ওর অত্যন্ত উন্নত

অ্যালগরিদম ওকে গাইড করে। যেমন ওর এক্ষেত্রে ক্রিকেট নিয়ে বা ওরা কখন খেলতে আসে, কোথায় থাকে, কোনও স্কুলে যায়--এসব বিষয় নিয়ে দু-একটা প্রশ্ন করা স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু তা ও করল না।

তাহলে কি এর পিছনে অন্য কিছু কারণ আছে? ওর কি এদের পছন্দ নয়? কে জানে?

৬। আগস্ট

আজকের দিনটা এলেই আর অন্য কিছু লিখতে ইচ্ছে করে না। শুধু সেই দিনটার কথা চোখে ভাসে। মনে হয় ঠিক যেন কালকের ঘটনা। আমি সেই স্মৃতি পিছনে ফেলে এগিয়ে যেতে চাই। কিন্তু সেই আবার করে সেই দিনটা ফিরে ফিরে আসে।

একটা দিনই অনেক কিছু পাল্টে দিতে পারে। ঠিক যেমন আমার ক্ষেত্রে হয়েছিল।

সেদিন বেশ ঝকঝকে দিন ছিল। সকালে বাড়ির বাইরে খেলতে গিয়েছিলাম বোনের সঙ্গে। আমার তখন আট বছর বয়স। আর আমার বোনের চার। আমার বাবা ছিল ডাক্তার।

হঠাৎ এয়ার রেড অ্যালার্ম শুনে বাড়ি ফিরে আসি। এটাই ছিল তখনকার নিয়ম। কিছুক্ষণ বাদে বাবা জানায় সব ক্লিয়ার হয়ে গেছে, আর ভয় নেই। এমনিতেও হিরোসিমাতে ততদিন অব্দি খুব কমই বোমা পড়েছিল।

আমরা সবাই মিলে ব্রেকফাস্ট খেতে বসলাম। বোনের কথা শুনে আমরা সবাই হাসছিলাম। খুব বোকা ছিল ও। খেতে বসে অর্ধেক খাবার নিজের গায়ে ফেলত।

বাবা কী যেন একটা কথা বলছিল।

হঠাৎ কী যেন হল। একটা খুব উজ্জ্বল আলো যেন জানলা দিয়ে আচমকা হানা দিল। তার সঙ্গে একটা শব্দ। তার কয়েক মুহূর্ত পরেই একটা প্রচণ্ড গরম ঝোড়ো হাওয়া যেন কোথা থেকে ঘরের মধ্যে এসে ঢুকল। আর আমরা সবাই তার ধাক্কায় বাড়ির বিভিন্ন দিকে ছিটকে গেলাম।

কতক্ষণ অজ্ঞান হয়ে ছিলাম কে জানে। জ্ঞান যখন ফিরল তখন সারা গায়ে অসহ্য যন্ত্রণা। খুব জলতেষ্টা পেয়েছিল, সারা গায়ে কাচ ঢুকে যন্ত্রণা হচ্ছিল। চারদিক অন্ধকার। দমবন্ধ হওয়া পরিবেশ। আগুন জ্বলছে চারদিকে। খেয়াল করলাম আমি ভাঙা দুটো কাঠের দেওয়ালের মধ্যে আটকে পড়েছি।

নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। বোনের কান্নার আওয়াজ শুনতে পেলাম।

আস্তে আস্তে বোনের চিৎকার ক্ষীণ হতে শুরু করল। আমারও কিছুক্ষণ কথা বলার অবস্থা ছিল না। পরে সমস্ত শক্তি একত্র করে চেঁচিয়ে উঠলাম।

বেশ খানিকক্ষণ চিৎকার করার পরে বাবার সাড়া পেলাম। আসলে আমি যেখানে আটকে পড়েছিলাম, সেখান থেকে উদ্ধার করা আদৌ সোজা ছিল না। তার মধ্যে আবার বাড়ির বিভিন্ন জায়গায় আগুন ছড়িয়ে পড়েছিল। অনেক চেষ্টার পরে বাবা আমাকে উদ্ধার করে। বাবার সারা গায়ে তখন রক্ত লেগে।

বোন-এর সামান্য আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল তখনও। দূর থেকে যেন বলে উঠছে, বাবা, মা, আমাকে বাঁচাও। আমি আর থাকতে পারছি না।

কিন্তু অনেক চেষ্টার পরেও বোনকে উদ্ধার করা যায়নি।

ইতিমধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়েছিল পুরো বাড়িতে। কোনওরকমে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম বাবা-মা'র হাত ধরে। মা তবু বারবার বাড়ির দিকে ছুটে যাচ্ছিল বোনের কথা ভেবে। কিন্তু বাবা বোঝাচ্ছিল যে বোনের আর বেঁচে থাকার কোনও সম্ভাবনা নেই।

খানিকবাদে বৃষ্টি এসেছিল। আমরা সবাই সেই বৃষ্টির জলে তেষ্টা মিটিয়েছিলাম। কালো কালো সে জল। আমরা সবাই তখন কাঁদছিলাম। বাবার চোখেও জল। মনে হচ্ছিল আকাশও যেন আমাদের দেখে কাঁদছে। সেজন্য এই জল এত কালো। মন খারাপের কালো রঙ।

মা একদিন বাদে মারা গিয়েছিল। বাবা মারা যায় পাঁচ দিন বাদে। আমি মাস খানেক হাসপাতালে ছিলাম।

সে সময় এক অন্য ধরনের মানুষকে দেখতে পেতাম। পুড়ে যাওয়া মানুষ। তাদের গায়ের রঙ পুরো কালো। কুচকুচে কালো। রোজ দেখতাম আমার পাশেই কেউ না কেউ মারা যাচ্ছে। সে যেন ছিল এক মৃতের শহর।

সে মৃত্যুর মিছিল তারপরেও বহুবছর থামেনি। তেজস্ক্রিয়তার জন্য কত যে মৃত্যু হয়েছিল তার কোনও হিসেব নেই।

পরে জেনেছিলাম সেদিন হিরোশিমায় পৃথিবীর প্রথম পরমাণু বোমা পড়েছিল। ওই বোমা যেখানে পড়েছিল আমাদের বাড়ি ছিল তার থেকে ঠিক তিন মাইল দূরে।

হাসপাতালের জানলা দিয়ে একদিন বাইরেটা দেখেছিলাম। মনে হচ্ছিল এ যেন এক অন্য পৃথিবী। সব কিছু ধ্বংস হয়ে গেছে। আবার করে যেন মানব সভ্যতার যাত্রা শুরু হবে। শহর জুড়ে ধ্বংসস্তূপের মধ্যে আমাদের বাড়িটাকে খুঁজছিলাম। তার কোনও অস্তিত্ব ছিল না, আমাদের পরিবারের মতোই, সে বাড়িটাকেও আর খুঁজে আর পাইনি। হাসপাতাল থেকে আমি একাই ফিরেছিলাম।

পথে দেখেছিলাম একটা ভাঙা বাড়ির দেওয়ালে একটা মানুষের প্রতিচ্ছবি।

বোমার উত্তাপে সে ভস্মীভূত হয়ে দেওয়ালে মিশে গিয়েছিল। শুধু পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া দেহের ছাপ রয়ে গিয়েছিল। সে ছাপ শুধু দেওয়ালে নয়, রয়ে গেছে আমার মনেও।

মানুষ কত সহজে এভাবে লক্ষ লক্ষ মানুষকে মারার সিদ্ধান্ত নিতে পারে। আমি চাই না আমার হাতে তৈরি কোনও সৃষ্টি ওই পরমাণু বোমার মতো হোক।

তাই আমি হিরোসিকে তৈরি করেছি অন্যভাবে। ওকে শিখিয়েছি যাতে ও সবসময় অন্যদের ক্ষমা করতে পারে। কখনও কোনওভাবে হিংসার আশ্রয় না নেয়। নিরীহ মানুষের উপরে যাতে কোনওদিন আক্রমণ না করে। এধরনের সৃষ্টির সময়ে সব ধরনের সাবধানতা নিতে হয়, কারণ একবার ভুল সৃষ্টি হয়ে গেলে পিছনে হাঁটা যায় না।

কিন্তু মাঝেমধ্যে ভাবি আমার মনের গভীরে অন্য কোনও মানুষ লুকিয়ে নেই তো? ওকে আমি যতই শেখাই না কেন, আমি নিজে কি পেরেছি সবাইকে ক্ষমা করতে? আমি কি পেরেছি সেদিনের কথা ভুলে যেতে?

১৫। আগস্ট

এধরনের রোবট তৈরির সময় একটা বিষয়ে বিশেষ নজর রাখতে হয়, তা হল ওর মধ্যে নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনও ধরনের সচেতনতা তৈরি হচ্ছে কিনা। যাকে বলা হয় কনশাসনেস। আমার আর হিরোসির মধ্যে এখানেই খানিকটা তফাত। আমি যা করি তা ভবিষ্যতের কথা ভেবে করি। ও তা করে না। যখনই কোনও রোবট এটা করতে শিখে যাবে, তখনই মানবজাতির পক্ষে তা বড় বিপদ। ওরা তখন ওদের নিজেদের স্বার্থ দেখবে। আমাদের নয়। আমাদের কথাও তখন আর শুনবে না। তাই হিরোসিকে যতই বুদ্ধিমান তৈরি করি না কেন এই জায়গাতে আমাকে রীতিমতো সূক্ষ্ম ব্যালেন্স রক্ষা করতে হয়েছে। অনেকটা সরু দড়ির উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়ার মতো।

আমি এর উপরে একটা বিশেষ স্কেল তৈরি করেছি, নাম দিয়েছি আসাহি স্কেল। এ স্কেলে শূন্য মানে তার মধ্যে কোনও কনশাসনেস নেই, আর দশ হল সবথেকে বেশি।

ধরা যাক একটা পেরেক, তাকে যত জোরে মারাই হোক না কেন, সে কোনও প্রতিবাদ করবে না। তার কোনও বোধবুদ্ধি নেই। অর্থাৎ পেরেকের লেভেল হল শূন্য। কিন্তু একটা থারমোস্ট্যাট উষ্ণতা সেন্স করতে পারে, সে অনুযায়ী ঘরের উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। আমার স্কেলে থারমোস্ট্যাট হল লেভেল ১।

কৃমি খাবারের উপস্থিতি বুঝতে পারে। তাই কৃমিকে আমি লেভেল ২ দেব। একটা চড়াই পাখি তার থেকে আরেকটু এগিয়ে। সে দেখতে পায়, শুনতে পায়, গন্ধ পায়, চাপ অনুভব করতে পারে। তাকে আমি ৩ দেব। এভাবে এই স্কেল কাজ করে।

রোবটদের সবথেকে দুর্বল জায়গা হল মানুষকে বোঝার ক্ষমতা। বিভিন্ন সেনসরের মাধ্যমে চারপাশের পরিবেশ বোঝার ক্ষেত্রে ওরা আমাদের থেকে অনেক এগিয়ে থাকলেও সে তথ্য দিয়ে কী করতে হবে তা ওরা ভালো বুঝতে পারে না। এটা একটু বুঝিয়ে বলি।

একটা রোবট কোনও লোকের সঙ্গে যখন কথা বলে, তখন তার মুখের ভাব দেখে বুঝতে পারে না যে, সে রেগে যাচ্ছে না খুশি হচ্ছে, নাকি সে ওই কথায় কোনও মনোযোগই দিচ্ছে না। সব মিলিয়ে এখনকার সেরা রোবটদেরকেও আমি এজন্যই ৩ বা ৪ এর বেশি দেব না। সেখানে হিরোসি আমার স্কেলে ৭। সে ক্ষমতা আমি হিরোসিকে দিয়েছি। তবে আরও অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষার দরকার। দেখা দরকার ও সেই ক্ষমতার অপব্যবহার করে কিনা। আমার ধারণা ও সেটা করবে না।

গত কয়েকদিন হিরোসিকে বাইরে একাই যেতে দিয়েছি। আজও তাই। আসলে ও যত সবার সঙ্গে কথা বলবে, তত তাড়াতাড়ি শিখবে। ও যখন আমার চোখের বাইরে থাকে, তখন ও কীভাবে চারদিকের পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেয়, সেটাও জানা দরকার। ওর স্বভাবের পরিবর্তন থেকে আমিও বুঝতে পারব, কোথাও ওর প্রোগ্রামে কোনও পরিবর্তন আনার দরকার আছে কিনা। আমাকেও অবশ্যই ওর উপরে নজর রাখতে হবে। সবাই তো আর ওর সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবে ব্যবহার করবে না। উল্টোটাই হয়তো স্বাভাবিক।

ও কোনওদিকে যাবে জানতাম। ও বেরোনোর খানিকক্ষণ পরে ওই দিকে এগোলাম।

আমাদের এখানে লোকসংখ্যা খুব কম। আমার বাড়িটা পাহাড়ের উপরে। আরও ফাঁকা জায়গায়। পাহাড় থেকে পথ ধরে খানিকটা নেমে এলে একটা উপত্যকা পড়ে। সেখানেই ওই মাঠটা, যেখানে সেদিন ছেলেগুলোকে দেখেছিলাম।

দূর থেকে দেখলাম হিরোসিকে ওরা খেলায় নিয়েছে। তবে বল কুড়িয়ে আনার জন্য। আর হিরোসি ওদের আদেশ মতো ভারি খুশি হয়ে মাঠের মধ্যে দৌড়দৌড়ি করছে।

আমি ওদের চোখের বাইরে ছিলাম। দেখলাম ওরা হিরোসিকে ঠিকভাবে খেলায় নিচ্ছে না। বল বা ব্যাট করতে দিচ্ছে না। মাঝে মধ্যে ওকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করছে। ও কীভাবে সেটাকে নেয়, সেটা দেখার জন্য অপেক্ষা করলাম।

ও কিন্তু তার জন্য বিন্দুমাত্র বিরক্তি না দেখিয়ে ওদের আদেশ মতো হাসিমুখে ওদেরকে সাহায্য করতে থাকল।

আসলে ওর মধ্যে শান্তির বাণী এতটাই সুপ্রতিষ্ঠ যে, ও সব পরিস্থিতিতে সবার সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে চলবে। ওর কোনও প্রতিবাদের ভাষা জানা নেই।

১৮। আগস্ট

আজ একটু অন্যধরনের একটা এক্সপেরিমেন্ট করলাম হিরোসিকে নিয়ে। তার আগে ওই কনশাসনেসের তৃতীয় শর্ত নিয়ে একটু বলি। এই তৃতীয় শর্ত হল ভবিষ্যতের কথা ভেবে রোবট কী উপায় বার করবে, কীভাবে কোনও সিদ্ধান্ত নেবে তার ক্ষমতা বিচার। অর্থাৎ যাকে বলা যায়, 'স্ট্রাটেজি ফর ফিউচার'।

জীব জগতে আগামীকাল বলে কিছু হয় না। প্রায় সব প্রাণীই সেই মুহূর্তের তাগিদের বাইরে কিছু ভাবে না। একমাস পরে কী হবে, এক বছর বাদে কী হবে এ সব ভেবে তারা কোনও কাজ করে না। সেটা হলে সিংহ আগামী একমাসের শিকার আগাম ধরে রাখত। এমনকী শীতের সময়ের কথা ভেবে মেরু ভালুকের মতো কিছু প্রাণী যা করে সেটা নেহাতই জেনেটিক । প্ল্যান মাফিক কিছু নয়।

একমাত্র মানুষই এটা করতে পারে। শুধু জীবিত থাকার সময়ই নয়, আমরা আমাদের মৃত্যুর পরেও কী হবে সে কথা ভাবি। তা না হলে তো আমরা পিরামিডও পেতাম না। এটা হলে কী হবে, এটা না হলে কী হবে এ ধরনের বিভিন্ন সম্ভাবনার কথা ভেবে আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি।

প্রশ্ন উঠতে পারে, রোবট কি তা পারে না। তাহলে 'ডিপ ব্লু' কম্পিউটার কী করে দাবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়নকে হারায়? দাবার ঘুটির বিভিন্ন কম্বিনেশনে কী কী সম্ভাবনা হতে পারে, চার-পাঁচ চাল পরে কী হবে এসব ভাবতে না পারলে কম্পিউটার কী করে জিততে পারে?

উত্তরটা সহজ। রোবট যখন কোনও একটা বিশেষ কাজের জন্য তৈরি হয়, তখন এধরনের সিমুলেশন সেই বিশেষ কাজের জন্য আমাদের থেকে অনেক ভালো করতে পারে। কিন্তু সব কাজের জন্য তা পারে না। দাবা খেলার জন্য তৈরি প্রোগ্রাম একটা রোবটকে ব্যস্ত রাস্তা পার করাতে পারবে না। সে রোবট নির্ঘাত সে ক্ষেত্রে গাড়ি চাপা পড়বে।

কিন্তু এখানে হিরোসি সাধারণ রোবটের থেকে আলাদা। আর তারই আরও পরীক্ষা নেওয়া দরকার, যাতে বুঝতে পারি বিভিন্ন ধরনের পরিস্থিতিতে ও কীভাবে কাজ করে।

আমার সেক্রেটারি মার্ক। গত একবছর ধরে ও আমার সঙ্গে আছে। মার্ককে বলেছিলাম হিরোসিকে সঙ্গে নিয়ে আমার কিছু দরকারি বই ছিঁড়ে ফেলতে।

প্রথম কথা এতে বুঝতে পারব এরকম কিছু আদেশ পালন করার আগে হিরোসি কিছু বাধা দেয় কিনা। নাকি এক ধরনের খেলা ভেবে এটা করে ফেলে।

নাহ্, বই ছিঁড়তে ও আদৌ কোনও বাধা দেয়নি। বই জাতীয় কোনও কিছু ছিঁড়ে ফেলা যে খারাপ--এ বিষয়ে ওকে সচেতন করার জন্য ওর প্রোগ্রামে কিছু পরিবর্তন আনতে হবে। হিরোসি বেশ আনন্দের সঙ্গেই আমার লেখা তিন তিনটে বই মার্কের সঙ্গে বসে ছিঁড়েছে। আরও বই নাকি ছিঁড়তে চাইছিল। মার্কই বারণ করে।

আমি মার্ক ও হিরোসিকে কয়েক ঘণ্টা বাদে একসঙ্গে ডাকলাম। আমার হাতে ছেঁড়া সব বই। দেখলাম হিরোসি অন্যদিকে মুখ করে আছে আর ওর মুখের মধ্যে একটা অপরাধী অপরাধী ভাব ফুটে উঠছে।

গম্ভীর গলায় ওদের লক্ষ্য করে বললাম ওদের মধ্যে কে ছিঁড়েছে তা আমি জানতে চাই। মার্ককে আগে থেকেই বলা ছিল যাতে ও কোনও অপরাধ স্বীকার না করে। ও তাই বেমালুম মিথ্যে কথা বলে অস্বীকার করল। আর হিরোসির পক্ষে যে এটা করা সম্ভব, তাও একই সঙ্গে জানিয়ে দিল।

হিরোসিকে এবার জিজ্ঞাসা করতেই হিরোসি কিন্তু একবারে সব দোষ স্বীকার করে নিল। আর একটু বকাও খেলো এর জন্য। অবাক ব্যাপার হল ও একবারও মার্কের কথা বলল না। আমি এর পরে মার্ককে অন্য জায়গায় পাঠিয়ে ওকে আলাদা করে জিজ্ঞাসা করলাম। কিন্তু তখনও ও মার্কের কথা না বলে নিজেই পুরো দোষ স্বীকার করে নিল।

এর কারণ কী? ও কি এটা বুঝেছে যে ওর মার্কের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রাখা খুব দরকার। বেশিরভাগ সময় আমি যখন থাকি না, তখন ওর বিভিন্ন আবদার মার্কই রাখে, তাই? ওর পক্ষে এভাবে মানুষের মানসিকতা কি বোঝা সম্ভব!

মনে মনে একটু খুশিই হলাম। ও ভবিষ্যতের কথা ভেবে কাজ করতে শিখছে।

এখানে একটা দরকারি কথা বলা দরকার। হিরোসিকে আমি সব নিয়মের বাইরে রেখেছি। ইচ্ছে করেই।

রোবটিক্সের তিনটে মূল সূত্র যার কথা অ্যাসিমভ লিখে গিয়েছিলেন। এক, রোবট কখনও মানুষের ক্ষতি করবে না বা ক্ষতি হতে দেবে না। দুই, রোবট সব সময় মানুষের নির্দেশ মেনে কাজ করবে, যদি না তা প্রথম শর্তের পরিপন্থী

হয়। তিন, রোবট নিজেকে রক্ষা করবে যদি না তা প্রথম ও দ্বিতীয় শর্ত ভাঙে। তিনটে সূত্র ক্রমানুসারে প্রযোজ্য।

আমি কিন্তু হিরোসিকে এ সবের বাইরে রেখেছি। কারণ এটা মানলে ওর মধ্যে কৃত্রিম বুদ্ধির প্রকাশ স্বাভাবিক ভাবে হবে না। আমার পরীক্ষাও সফল হবে না।

এতক্ষণ অনিলিখা পড়ছিল ডায়েরি থেকে। আমরাও চুপ করে শুনছিলাম। এতক্ষণে থামল।

তারপরে আস্তে আস্তে বলল, বাকিটা না হয় পরের শনিবারে বলা যাবে।

বলা বাহুল্য আমরা সবাই এখনই শোনার জন্য নাছোড়বান্দা। কে আর এক সপ্তাহ অপেক্ষা করতে পারে। তাছাড়া অনিলিখাদি পরের সপ্তাহে এ দেশে থাকবে কিনা তারও তো কোনও নিশ্চয়তা নেই।

অনেক অনুরোধের পরে অনিলিখা ফের শুরু করল—

৪

পরের দিন আমি কথামতো অফিসের পরে আসাহির বাড়ির উদ্দেশে রওনা হলাম।

জুরিখর মেন স্টেশন ‘জুরিখ হপব্যানহফ’ জুরিখের পুরোনো শহরতলির কাছে। জার্মানে ‘হপব্যানহফ’ কথার অর্থ হল প্রধান স্টেশন। প্রায় অনেক শহরের মূল স্টেশনকেই তাই ‘হপব্যানহফ’ বলা হয়।

সুইজারল্যান্ডের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন ভাষা ব্যবহার করা হয়। চারটে সরকারি ভাষা—জার্মান, ফ্রেঞ্চ, ইতালিয়ান আর রোমান’স। সুইজারল্যান্ডের যে অংশ ফ্রান্সের কাছে সেখানে মূলত ফ্রেঞ্চ কথা হয়। তবে সব থেকে বেশি লোক জার্মানেই বলে। বিশেষ করে জুরিখে প্রায় সবাই জার্মানই বলে। তা জুরিখ থেকে লুসারনে একটা দোতলা ট্রেনে গেলাম। ভারি সুন্দর সে ট্রেনের পথ। লুসারনের কাছে আসতেই দূরে বরফে ঢাকা পাহাড় দেখা যায়।

লুসারন থেকে আবার একটা বোটে করে সারনেন। গাড়ি থাকলে সরাসরি সারনেন অব্দি যাওয়া যেত। সারনেন পৌঁছলাম সাতটা নাগাদ। সেখান থেকে গাড়িতে করে আরও মিনিট পনেরোর রাস্তা।

সেপ্টেম্বরের শুরুর দিকে এখানে সাড়ে আটটা অব্দি আলো থাকে। তাই তখনও বাইরে বেশ আলো ছিল।

আসাহি বলেছিলেন আমাকে এখান থেকে নিয়ে যাবেন। না দেখে তাঁকে ফোন করলাম। ফোনেও পেলাম না। অবাক হলাম। এখানে ট্যাক্সি পাওয়া যায় না। আসাহির মতো মানুষ আমার আসার কথা সম্পূর্ণ ভুলে যাবেন, এটাও ভাবা যায় না।

কী করব ভাবছি, হঠাৎ দেখি একটা কালো জাগুয়ার গাড়ি আমার দিকে এগিয়ে আসছে। গাড়ি থেকে যিনি নামলেন, তাকে আগে কখনও দেখিনি। বেশ স্মার্ট সুন্দর চেহারা। মাঝারি হাইট। মুখটা একটু গম্ভীর।

গাড়ি থেকে নেমে আমার দিকে এগিয়ে এসে হ্যান্ডশেক করে বললেন, আমি মার্ক। আমি এখন হাসপাতাল থেকে আসছি। আজ সকালে স্যার হঠাৎ করে খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। অজ্ঞান অবস্থায় তাঁকে আমি হাসপাতালে নিয়ে যাই।

এখন কেমন আছেন? উদ্বিগ্ন হয়ে বলে উঠি।

একটু দ্বিধা করে মার্ক অপ্রত্যাশিত খবর দেয়। বলে, দু-ঘণ্টা আগে মারা গেছেন। আপনার আসার কথা আমাকে স্যার আগেই বলেছিল। তাই আমি এলাম। আপনি কি হাসপাতালে যেতে চান?

বলা বাহুল্য, আমি এরকম একটা সংবাদের জন্য একেবারে প্রস্তুত ছিলাম না।

অবশ্যই আমি তাঁকে একবার শেষ বিদায় জানাতে চাই। তা তাঁর ফিউনারাল কখন হবে?

সেটা এখনই বলা যাচ্ছে না। হঠাৎ করে মৃত্যু। তাই করোনার পোস্ট মর্টেম করতে চান। তারপরে পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট পাওয়ার পরে ফিউনারাল ঠিক করা হবে।

মার্ক-এর সঙ্গে গাড়িতে গিয়ে উঠলাম। ওখান থেকে সোজা হাসপাতাল। তাঁর মরদেহ একটা কাচের ঘরে রাখা আছে। খুব খারাপ লাগছিল যে কাল তাঁর সঙ্গে আরেকটু কথা বলতে পারলাম না। কিন্তু তিনি কি তাঁর মৃত্যুর কোনও আগাম আভাস পেয়েছিলেন? তা না হলে আমাকে হঠাৎ তাঁর ডায়েরি দিতে গেলেন কেন?

এই ডায়েরির কথা অবশ্য আমি মার্ককে জানাইনি। তবে আসাহির ডায়েরি পড়ে মার্ক সম্বন্ধে সামান্য ধারণা হয়েছিল। মনে হয়েছিল মার্ককে তিনি যথেষ্ট ভালোবাসতেন ও বিশ্বাস করতেন।

তাঁর খুব একটা পরিচিত আত্মীয় কেউ এখানে নেই। কয়েকজন প্রতিবেশী এসেছেন দেখতে। শুনলাম আসাহির ঘনিষ্ঠ আত্মীয় কেউ নেই, যাকে খবর দেওয়া

হবে। অক্সফোর্ডে তাঁর অনেক বন্ধু আছে। তাঁরা আসবেন, তাঁদের খবর দেওয়া হয়েছে।

হঠাৎ বড় হার্ট অ্যাটাক বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। পোস্ট মর্টেম-এর পরে নিশ্চিত হওয়া যাবে।

এই জায়গাটা এত প্রত্যন্ত যে এখানে কোনও হোটেলও নেই। আমার অবশ্য থাকার অসুবিধে নেই। রাতটা আসাহির বাড়িতেই থাকব। সেরকমই কথা ছিল।

হাসপাতাল থেকে রাত সাড়ে ন'টা নাগাদ আসাহির বাড়ির উদ্দেশে রওনা হলাম। হাসপাতালের থেকে কুড়ি মিনিটের পথ। লেক সারনেন-এর পাশ দিয়ে পাহাড়ি রাস্তা।

আমাকে কিছু একটা যেন বলবে বলবে করছিল মার্ক। একটু ইতস্তত করে বলে উঠল, জানি এত রাতে অন্য জায়গায় যাওয়া মুশকিল, কিন্তু আপনি শিওর তো যে ওখানেই থাকবেন আজ রাতে? চাইলে আমার সঙ্গে আমার বাড়িতেও যেতে পারেন।

একটু অবাক হয়ে বললাম, কেন? কিছু অসুবিধে আছে? আমি কাল সকালেই চলে যাব। তাঁর বাড়িতে জায়গার কোনও অসুবিধে আছে?

না, না, ওখানে প্রচুর জায়গা। আসলে আমি অন্য কথা ভাবছিলাম। ওখানে কিন্তু আপনাকে হিরোসির সঙ্গে আজ রাত কাটাতে হবে। অবশ্য বাড়িতে এক কাজের লোকও আছে। কিন্তু সে আবার ভালো ইংরাজি জানে না।

কেন? তাতে কিছু অসুবিধে আছে? হিরোসি কি নতুন আগন্তুক দেখলে ভয় পায়?

না, না। ও সেদিক থেকে মিশুকে। সব কিছু বুঝে যায় চট করে।

তবে? তা হিরোসি কি বাড়ির সব জায়গায় যেতে পারে? না কি কোনও নির্দিষ্ট জায়গায় বন্ধ থাকে?

প্রথম দিকে বাড়ির মধ্যে নির্দিষ্ট কিছু জায়গার মধ্যে ও থাকত। পরে প্রফেসার সব জায়গাতে যেতে অনুমতি দেয়। এমনকী মাঝে মধ্যে বাড়ির বাইরেও। তা আপনার প্রফেসারের সঙ্গে আলাপ কীভাবে? তাঁকে কীভাবে চিনতেন?

বললাম আমাদের দু-বছর আগে লুসারনে দেখা হওয়ার কথা। তার পরে মূলত ইমেল মারফত যোগাযোগ রাখার কথাও বললাম।

কথা বলতে বলতে আমরা বাড়ির কাছে পৌঁছে গেছি। উপর থেকে দূরের পাহাড়গুলো দেখা যাচ্ছে। দূরে তাকালে মনে হচ্ছে পাহাড় যেন মোমবাতি দিয়ে সাজানো হয়েছে। খেয়াল করলে বোঝা যায় এ দিকে বাড়ির সংখ্যা খুব কম।

মার্ক বলল, এ বাড়ি ১৫০০ সাল নাগাদ তৈরি হয়। বিখ্যাত পাবলো পরিবার এখানে থাকত প্রায় তিনশো বছর ধরে। ওদের বিশাল খনির ব্যবসা

ছিল। তার পরে বেশ কয়েকবার হাত বদল হয়ে তা প্রফেসারের হাতে আসে। বিশাল বাড়ি। এখন এ বাড়ির বেশ কিছু অংশ আর ব্যবহার করা হয় না।

বড় রাস্তা থেকে ডান দিকে একটা সরু রাস্তা ঢুকে গেছে। একটাই গাড়ি শুধু সে রাস্তা দিয়ে যেতে পারে। উল্টোদিক থেকে কোনও গাড়ি এলে বেশ মুশকিল হতো। তা সেটা হয়নি। খানিকটা যেতে বাড়িটা বাঁদিকে পড়ল।

একটা ভারী লোহার গেট। আশেপাশে কোনও বাড়ি নেই। গেটের পরে বাগানের মধ্যে দিয়ে সুরকি ফেলা রাস্তা বাড়ির দিকে এগিয়ে গেছে। বাগানের ঘাস কিছুটা বড় হয়ে গেছে। দূরের দিকে বেশ কিছু আগাছা দেখা যাচ্ছে, প্রমাণ করছে বাড়ির মালিক গত কিছুদিন এদিকে নজর দেওয়ার সময় পাননি।

বাড়ির বিশাল বিশাল কাচের জানলায় লাল পরদা ঝুলছে।

বাড়ির বাইরে কলিংবেল বাজাতে একজন ছোটখাটো চেহারার জাপানি লোক বেরিয়ে এল। মার্ক পরিচয় করে দিল—হারু। প্রায় তিরিশ বছর ধরে আসাহির বাড়ির সব দেখাশোনা হারুই করে।

হারু? সে তো বাঙালি নাম? তন্ময় বলে উঠল।

জাপানিদের মধ্যেও হারু খুব কমন নাম। তা যা বলছিলাম—

স্বাভাবিক ভাবে হারু আসাহির হঠাৎ মৃত্যুর খবরে বিধ্বস্ত। চোখে মুখে একটা গভীর বিষাদের ছাপ। আমাকে ঘাড় ঝুঁকিয়ে জাপানি কায়দায় অভিবাদন করে ভেতরে আসতে বলল।

আমি আর মার্ক বাড়ির ড্রয়িং রুমে গিয়ে বসলাম। হারু এসে মাঝে একবার কখন ডিনার করব তা জেনে আবার চলে গেল।

মার্ককে জিগ্যেস করলাম, হিরোসি কোথায়?

মার্ক চারদিক একবার দেখে নিয়ে বলে উঠল—ও একলা থাকতে ভালোবাসে। ডাকলে সামনে আসে। বাড়ির পিছন দিকে একটা বড় বাগান আছে। ও ওখানে অনেকটা সময় কাটায়। চুপ করে বসে পাখির ডাক শোনে। তবে এখন তো রাত হয়ে গেছে। হয়তো ঘরেই আছে।

তা আপনার কি মনে হয় ও যথেষ্ট বুদ্ধিমান? অন্য রোবটদের থেকে আলাদা?

অবশ্যই একদম আলাদা। খুব তাড়াতাড়ি সব কিছু শিখে ফেলে। আমি এরকম কোনও রোবট আগে দেখিনি। আসলে প্রফেসারের মতো মেশিন লারনিং-এর বিষয়ে সারা বিশ্বে আর কারুর এত দখল নেই। তা ছাড়া অসম্ভব পরিশ্রম করতে পারতেন। তা না হলে এরকম রোবট করা অসম্ভব হত।

তা আপনার কি মনে হয় প্রফেসারের মৃত্যু হিরোসির উপরে কোনও প্রভাব ফেলবে?

জানি না। আমার তো মনে হয় করবে না। রোবটের কাছে আর মৃত্যু

কী? ও তো তার অর্থই বোঝে না। তবে আপাতত ওকে একটু এড়িয়ে চলাই ভালো।

কেন?

একটু দ্বিধা করে মার্ক বলে উঠল, সত্যি কথাটা তাহলে বলেই ফেলি। ওকে আমরা, এমনকী প্রফেসারও ভালো করে বুঝতেন কিনা এ বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এ নিয়েও সন্দেহ আছে যে ওকে আমরা যতটা ইনোসেন্ট ভাবি, ততটা ইনোসেন্ট ও সত্যি কিনা। প্রফেসার আপনাকে কি এখানকার তিনটে ছেলের কথা বলেছেন? ও তাদের সঙ্গে কয়েকদিন খেলতে গিয়েছিল।

আমার ডায়েরি পাওয়ার কথাটা আর বললাম না। জিগ্যেস করলাম, কাদের কথা বলছেন?

প্রফেসার হিরোসিকে নিয়ে কাছের একটা মাঠে যেতেন। এখানকার বছর চোদ্দো-পনেরোর কয়েকটা ছেলে ওখানে ক্রিকেট খেলতে যেত। আসলে বাইরের লোকেদের সঙ্গে কীভাবে মেশে সেটা দেখার জন্যই প্রফেসার এভাবে মেশার সুযোগ করে দেন। হিরোসি ওদের সঙ্গে খেলত। শুনেছি ওরা হিরোসির সঙ্গে খুব ভালো ব্যবহার করত না। কিন্তু তারপরেই হঠাৎ একদিন ওরা তিনজনেই হারিয়ে যায়। এটা দিন পনেরো আগের ঘটনা। তাদের কোনওরকম খোঁজ আর পাওয়া যায়নি।

মানে? আপনি বলছেন এর সঙ্গে হিরোসি যুক্ত আছে?

চুপ করে রইল মার্ক। একবার দরজার দিকে তাকিয়ে নিয়ে আবার খুব আস্তে আস্তে বলল, আমি আরেকজনকেও জানি যে রাতারাতি এরকম উধাও হয়ে গেছে। নাম ডেভিড বোল্টন। কিছুদিন আগে এখানে প্রফেসারের সঙ্গে দেখা করতে আসে। আমি তাকে খানিকটা চিনতাম। সামান্য আলাপ ছিল। এখানে একদিন ছিল। কিন্তু সকালে এ বাড়ি থেকে বেরোনোর পরে তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। সে আর বাড়ি ফিরে যায়নি।

তা এসব নিয়ে হইচই হয়নি?

মিসিং পার্সন ডায়েরি হয়েছে। কিন্তু বডি বা কোনও ফরেনসিক ক্লু পাওয়া যায়নি। তাই সবার এখনও ধারণা হয়তো কোথাও গেছে, আবার কোনওদিন ফিরে আসবে। বডি না পাওয়া গেলে তো মার্ডার হয় না। আমার মন কিন্তু অন্য কথা বলে। যদ্দুর জানি সে লোকটাকেও হিরোসির পছন্দ হয়নি।

এতটা বলে মার্ক উঠে দাঁড়াল। আমি সেই যে সকাল চারটেতে এই খবর পেয়েছি, তার পরে আর ঘুম হয়নি। এবার উঠি। আমার বাড়ি আবার এখান থেকে প্রায় মিনিট পনেরোর রাস্তা।

তা আপনি তো এখানেই থেকে যেতে পারেন আজকের রাতটা।

মার্ক ঠোঁট উল্টে বলে উঠল, আই অ্যাম নট দ্যাট ক্রেজি। সব মানুষকে

বিশ্বাস করতে পারি, কিন্তু ওই রোবটকে নয়, বলে আমার দিকে অদ্ভুত ভাবে তাকাল মার্ক।

তা ওকে নিয়ে কী করার প্ল্যান আছে?

দরজার দিকে একবার তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলল মার্ক, আমি ইতিমধ্যে ওর ব্যাপারে কিছু ব্যবস্থা নিয়েছি। একটা সায়েন্স ল্যাব থেকে পরশু আসবে ওকে নিয়ে যেতে। ওর মতো এত বুদ্ধিমান একটা রোবটকে স্বাধীন ভাবে চলতে ফিরতে দেওয়া যায় না। এটুকু বলে মার্ক ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। খানিকবাদে জানলা দিয়ে দেখতে পেলাম ওর কালো জাগুয়ার গাড়িটা বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

তুমি থেকে গেলে অনিলিখাদি? একটুও ভয় লাগল না?

ভয় হয়নি, তবে একটু অস্বস্তি হচ্ছিল। বাড়িটা এত পুরোনো যে চারদিক থেকে অদ্ভুত সব আওয়াজ পাচ্ছিলাম। সঙ্গে একটা থমথমে পরিবেশ। তার মধ্যে আসাহি সবে মারা গেছেন। সঙ্গী ওরকম একটা রোবট যাকে তখনও দেখিনি। তবে কৌতূহল হচ্ছিল তার থেকে অনেক বেশি। এরকম একটা রোবট না দেখেই চলে যাব। তাও আবার যেখানে চার-চারজন রাতারাতি উধাও, সেসব রহস্য না উদ্ধার করে!

খানিক থেমে আবার শুরু করল অনিলিখা।

৫

হারু আমাকে আমার রাতে থাকার ঘর দেখিয়ে দিল। একতলাতেই বেশ বড় ঘর। ওখানে জিনিসপত্র রেখে জামা কাপড় বদলে ড্রয়িং রুমে ফিরে এলাম।

ড্রয়িং রুমের একদিকে দারুণ একটা ফায়ারপ্লেস। পুরোনো দিনের কাঠের উপরে কাজ করা। তাকে ঘিরে তিনটে বড় বড় সোফা। ঘরের মধ্যে দুটো মার্বেলের মূর্তি। কয়েকটা ছোট টেবিলের উপরে মোমবাতি রাখা। ঘরে আলো বেশ কম। দূরে জানলার কাছে একটা পড়ার চেয়ার টেবিল। তার উপরে একটা ল্যাম্প রাখা। পাশে বড় বুককেস। বই পড়তে হলে ওই টেবিলটা ব্যবহার করা হয়। ইচ্ছে করেই যেন পুরোনো বাড়ির পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে ঘরে এই আলো আঁধারির পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে।

বুককেস থেকে সুসান মিলারের একটা ভূতের গল্পের বই নিয়ে ড্রয়িং রুমে ফায়ারপ্লেসের সামনে বসে পড়তে শুরু করলাম। এইরকম পরিবেশে এ

ধরনের বই পড়ার মজাই আলাদা। খানিকবাদে রাত সাড়ে দশটা নাগাদ হারু এসে আমাকে ডিনারে ডাকল।

দুটো ঘর পরেই ডাইনিং রুম। বিশাল লম্বা একটা ওভালো শেপের কাঠের টেবিলের একপ্রান্তে একা বসে খেলাম। হারু কিছুতেই আমার সঙ্গে বসল না। ও আগেই খেয়ে নিয়েছে। ও খুব একটা ভালো ইংরেজি বলতে পারে না। শুনলাম গত তিরিশ বছর হারু প্রফেসারের সঙ্গেই ছিল। অক্সফোর্ড থেকে আসাহি যখন এখানে আসেন, তখন একই সঙ্গে হারুও আসে। বুঝলাম ওর মন আজ খুব খারাপ। তাই বিশেষ কথা বলছিল না।

খাওয়ার পরে হারু আমার দিকে তাকিয়ে কী যেন একটা কথা বলতে গিয়ে আর বলল না। মুখে একটা দুঃখের ছাপ।

ওকে জিজ্ঞাসা করলাম হিরোসির সঙ্গে আজ রাতে দেখা করতে পারি কিনা। রাত তখন প্রায় এগারোটা। তবে রোবটের আবার রাত কী।

হারু বলল ওই হিরোসিকে ডেকে নিয়ে আসবে ড্রয়িং রুমে। ওখানেই অপেক্ষা করতে।

ড্রয়িংরুমে বসে না থেকে আমি লবির দু'ধারে দেওয়ালে লাগানো ছবিগুলো দেখতে থাকলাম। ড্রয়িং রুমের সামনে দিয়ে লম্বা করিডর। বেশ চওড়া। লবি দিয়ে খানিকটা এগোলে একটা জায়গায় সেটা বেশ চওড়া হয়ে গেছে। সেখান থেকে দোতলা যাওয়ার ঘোরানো সিঁড়ি উপরে উঠে গেছে।

করিডরের দেওয়ালে লাগানো ল্যাম্পের মৃদু আলোয় শুধু ছবিগুলোই যেন চারদিকের অন্ধকারে ধরা দিয়েছে। ছবির ফ্রেমগুলো তাতে চকচক করছে।

ছবিগুলো বেশিরভাগই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের। পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের পরে হিরোসিমা আর নাগাসাকির বেশ কিছু ছবি তার মধ্যে আছে। জানি না এই ধ্বংসস্তূপ আর মৃতদেহের ছবি আসাহি কেন এখানে সাজিয়ে রেখেছেন। আসাহির যে ইতিহাসে বেশ আগ্রহ ছিল তা বেশ বোঝা যায়।

অনেক রাত হয়ে গেছে। কিন্তু হিরোসির আর দেখা নেই। শুতে যাব কিনা ভাবছি, এর মধ্যে পায়ের শব্দ পেলাম। প্রথমে হারু ঢুকল। তারপরে হিরোসি।

আস্তে আস্তে আমার দিকে এগিয়ে এল ছেলেটা। ওর রঙ বেশ ফরসা, গোলাপি একটা আভা বেরোচ্ছে যেন গা দিয়ে। ছোট ছোট কুতকুতে চোখ-মুখে একটা অদ্ভুত সারল্য। ছেলেটার চোখে নীল মণি। এমন ভাবে তাকিয়ে আছে যেন আমাকে সবরকমভাবে বিশ্লেষণ করে দেখছে।

দেখে চট করে বোঝার উপায় নেই যে রোবট। শুধু হাত-পা চালানোর

মধ্যে একটু যা আড়ষ্টতা।

আমার দিকে আস্তে করে হাত বাড়িয়ে ও বলল, ওয়েলকাম অনিলিখা। মাই নেম ইস হিরোসি। আঠেরোটা ভাষার মধ্যে আমি বাংলাও জানি, বলে আমার সঙ্গে দিব্বি বাংলায় কথা বলতে শুরু করল।

একটু কথা বলেই বুঝলাম। ও বাংলা শুধু ভালো বোঝে না, বেশ ভালো বলেও। শুধু মাঝে মধ্যে গুরুচণ্ডালী দোষ করে ফেলে সাধু ও চলিত ভাষা মিলে। কিছু কথা কীরকম হল তা বলি।

কেমন আছ হিরোসি?

অন্যদিন যেরকম থাকি, সেরকমই ভালো।

তোমার কী করতে সবথেকে ভালো লাগে?

এমন কিছু করিতে যা আগে করি নাই।

আজ সেরকম কী করলে?

চারটে নতুন বই পড়েছি। গাছে একটা নতুন ধরনের নাম না জানা কৃষ্ণকায় পক্ষী দেখেছি। আর একটা কাজ করেছি, যেটা বলিতে আমি বাধ্য নই।

কেন?

নিজের সুরক্ষার জন্য।

সত্যি বলতে কী এরকমভাবে একটা বাচ্চা ছেলে কথা বলবে ভাবতে পারিনি। বুঝলাম যতই বুদ্ধিমান রোবট হোক না কেন কমনসেন্সের অভাব আছে। স্বাভাবিক ভাবেই অন্যরা ওকে নিয়ে হাসি ঠাট্টা করবে।

আমাকে জিগ্যেস করে উঠল, তা তুমি কোথা থেকে আসছ?

বললাম, ভারত।

ভারত খুব ভালো দেশ। কখনও অন্য কোনও দেশকে আক্রমণ করেনি। ভারতবাসীরা সবাইকে খুব সহজে আপনার করে নেয়।

হঠাৎ মনে হল ছেলেটাকে একটু শক্ত প্রশ্ন করি। বললাম, তুমি নিজেকে কোনও দেশের মনে কর?

জাপানের। যেভাবে দ্বিধাহীন ভাবে বলে উঠল, তাতে অবাক হলাম।

প্রফেসার যেরকম লিখেছিলেন, ছেলেটার কথাগুলো একটু ধারালো, কিছু কথা কানে লাগে। তবে মুখেচোখে একটা অদ্ভুত সারল্য। ভুলেই যেতে হয় যে ও মানুষ নয়। অনেক সময় মানুষ ভেবে ওর কাছ থেকে সেরকম ব্যবহার পাব, এই ভুলও করে ফেলা সম্ভব।

খানিকবাদে আমি চুপ করে আছি দেখে ও হঠাৎ শিশুর সারল্যে বলে উঠল, বাইরের গগন দেখবে?

হ্যাঁ, চলো।

ওর পিছন পিছন বাইরে বাগানে বেরিয়ে এলাম। আর আসতেই একটা

স্নিগ্ধ ঠান্ডা হাওয়া আমাকে স্পর্শ করে গেল। বাইরের উষ্ণতা এগারো-বারো ডিগ্রি হবে। হাওয়া দিলে বেশ ঠান্ডা লাগে। বেশ বড় বাগান। বাড়িটা পাহাড়ের একদম উপরের দিকে। তাই বাগান থেকে নীচে দূরের লেকটা পরিষ্কার দেখা যায়। উপরে তারায় ভরা আকাশ। এরকম দৃশ্য চট করে দেখার সুযোগ পাওয়া যায় না। মুগ্ধ হয়ে দেখছিলাম।

খানিকবাদে একটু ঝিরঝির করে আলতো বৃষ্টি শুরু হল। সূক্ষ্ম জলের কণা মাকড়সার জালের মতো সারা শরীরকে যেন অস্পষ্টভাবে স্পর্শ করল। একটা বড় গার্ডেন আম্ব্রেলার তলায় এসে বসলাম। দূরে চার্চের মাথা দেখা যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল পাইনের গাছের সারি রাতের আলোয় লুকিয়ে দাঁড়িয়ে বৃষ্টি আর হাওয়ার খেলা দেখছে। মাঝে মধ্যে আশেপাশের গাছে পাখির ডানাঝাপটানোর শব্দ শোনা যাচ্ছে।

নীচে বাড়ি, উপত্যকা সব মাঝে মধ্যে মেঘের চাদরে ঢেকে যাচ্ছে। আবার চাদরের বাইরে আসছে, ফের হারিয়ে যাচ্ছে।

এসব মুগ্ধ হয়ে দেখছি, এমন সময় পাশ থেকে হিরোসি বলল, তুমি অ্যান্ড্রোমেডা গ্যালাক্সি কোনটা দেখাও তো?

আমি ভালো করে চারদিক দেখে চিহ্নিত করলাম।

ঠিক। বলে আবার জিগ্যেস করে উঠল, 'ওরিয়ন নেবুলা' কোনটা দেখাও তো!

আবার দেখালাম।

ও দেখলাম শিশুর আনন্দে বলে উঠল, ঠিক বলেছ। আমি আরও দশটা প্রশ্ন করব। সাতের বেশি পারলে পাস। না হলে ফেল।

তা পাস করলে তুমি আমাকে কী দেবে? বলে উঠলাম।

সঙ্গে সঙ্গে ও বলল, আর ফেল করলে তুমি কী দেবে?

হেসে বললাম, তোমার পছন্দমতো একটা গল্প পড়ে দেব।

ও যে গল্প শুনতে ভালোবাসে এরকম একটা ধারণা আসাহির ডায়েরি পড়ে আমার তৈরি হয়েছিল। দেখলাম বাচ্চাদের মতোই এককথায় রাজি হয়ে গেল।

আবার আমার আগের প্রশ্নটা করলাম, তা তুমি কী দেবে বললে না তো?

পাশের ম্যাগনোলিয়া গাছটাকে দেখিয়ে ও বলল, ওর থেকে একটা ফুল তুলে দেব।

ইচ্ছে করেই ঠিক ছ'টা সঠিক, আর চারটে ভুল উত্তর দিলাম যাতে ওকে একটা গল্প পড়ে শোনানোর সুযোগ হয়।

আমার ফোন থেকে পড়ে শোনালাম সত্যজিৎ রায়ের 'স্ফিংস'। খুব

মনোযোগ দিয়ে শুনল। শুনে খুব খুশি।

গল্প শুনে ঠিক গুনে গুনে চারটে প্রশ্ন করল। সব কটা প্রশ্নর উত্তর অবশ্য আমার দেওয়া সম্ভব হয়নি।

আমাকে এরপরে ও গাছ থেকে তুলে একটা ভারি সুন্দর ম্যাগনোলিয়া ফুল দিল।

ছেলেটার সঙ্গে আরও মিনিট পাঁচেক কথা বললাম। এটুকু বুঝেছিলাম যে ওকে দেখে ওর বয়সি কোনও বাচ্চার সঙ্গে তুলনা করলে ভুল হবে। ওর বুদ্ধি অনেক বেশি। ভয় বলে কিছু নেই। তাই কথার মধ্যেও কোনও দ্বিধা নেই।

তবে সবথেকে বড় কথা ওর একটা নিজস্ব অনুভূতির জগত আছে যেখানে ও ফুলের সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে পারে। নিয়মের বাইরে গিয়ে কাজ করতেও দ্বিধা করে না। ঠিক যেমন আমি প্রশ্নের উত্তর না পারা সত্ত্বেও ও শর্ত ভেঙে শেষে আমাকে একটা ফুল এনে দিল।

একটা জিনিস ভাবতে খুব অসুবিধে হচ্ছিল যে, এই ছেলেটাই কোনও ধরনের অপরাধ করে থাকতে পারে। আসাহি হয়তো ঠিকই বলেছেন, ও সত্যিই শান্তির দূত। আমরাই হয়তো ওকে বুঝতে ভুল করছি। অহেতুক হিরোসির ওরকম কথাবার্তা-হাবভাবের জন্য সন্দেহ করছি।

৬

রাত তখন একটা বাজে। হঠাৎ ফোনটা ভাইব্রেট করে উঠল। আমার নাম্বারটা ওখানে খুব কম জনের কাছে ছিল। তাই হঠাৎ করে এত রাতে ফোন পেয়ে খুব অবাক হলাম। দেখি মার্কের ফোন।

অনিলিখা! তুমি কোথায়? মার্কের গলায় একটা ভয়ের সুর।

প্রশ্নটা শুনে অবাক হলাম, আমি শুয়েছি। একতলার গেস্ট রুমে। এত রাতে? কোনও অসুবিধে হয়েছে?

তোমাকে একটা খুব দরকারি খবর দিই। হাসপাতাল থেকে এখনই ফোন করেছিল। পোস্ট মর্টেম রিপোর্টে ওরা প্রফেসারের শরীরে 'অ্যাকোনাইট' বিষ পেয়েছে। তার জন্যই বোধহয় হার্টঅ্যাটাক হয়েছে। অ্যাকোনাইট পয়জনিং-এ একরকম হতে পারে, জানো নিশ্চয়ই।

হ্যাঁ, তা জানি। রোমান সম্রাট ক্লডিয়াসকেও তো খাবারে অ্যাকোনাইট মিশিয়ে মারা হয়েছিল।

ঠিক তাই। আমার মনে হয় প্রফেসারের খাবারে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বুঝতেই পারছ কে করেছে।

হিরোসি? কিন্তু ও করবে কেন?

সেটা বলা শক্ত। তবে ও ছাড়া অন্য কেউ এ কাজ করতে পারে না। বুঝতেই পারছ, ও যখন ওর স্রষ্টাকে ঠান্ডা মাথায় মেরেছে, তখন এখানেই ওর কাজ শেষ হবে না। আমি নিশ্চিত প্রফেসার ওর কুকর্মের কথা জানতে পেরেছিলেন। ওই যে ছেলে তিনটে হারিয়ে গিয়েছিল, তাদের যে ওর হাতেই মরতে হয়েছে, সে কথা জানতে পেরেছিলেন হয়তো। আর তাই প্রফেসারকে ও হত্যা করেছে। একটু থেমে মার্ক ফের বলে উঠল, আমি কি এখনই আসব তোমাকে নিতে? আমার মনে হয় না তোমার ওখানে আর এক মুহূর্ত থাকা উচিত।

না না, তার কোনও দরকার নেই। কাল সকালেই তো এখান থেকে চলে যাব।

কিন্তু এখন আর সকাল হওয়ার মধ্যে অনেকটা সময় বাকি।

আমি যথেষ্ট সতর্ক থাকব। আশা করি সেরকম কিছু হলে নিজেকে রক্ষা করতে পারব। আমার জন্য চিন্তা করতে হবে না। তবে আমাকে জানানোর জন্য অনেক ধন্যবাদ।

ফোন ছেড়ে দিলাম। তাহলে কি এর জন্যেই গতকাল আসাহিকে এত অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল! তিনি কি জানতে পেরে গিয়েছিলেন হিরোসির অপকর্মের কথা? আর তাই?

ভয় পেলে অনেক কিছুতেই ভয় পাওয়া যায়। কিন্তু রহস্য সব কিছুতে থাকে না। যত সময় যাচ্ছিল, হিরোসিকে নিয়ে একটা অদম্য কৌতূহল তৈরি হচ্ছিল। একই সঙ্গে ওই তিনটে ছেলে কোথায় গেল সেটাও জানা দরকার। কোথাও আটকে রাখেনি তো? যদি ওদের হত্যা করে থাকে, তাহলে এই বাড়িতেই ওদের ডেডবডি থাকার বড় সম্ভাবনা। প্রথমবারের জন্য একটা ভয়ের শিরশিরানি অনুভব করলাম।

আজ রাতেই সময়-সুযোগ মতো বেরিয়ে খোঁজ নিতে হবে।

৭

তখন রাত তিনটে হবে। বাইরে উষ্ণতা দশ-এগারো ডিগ্রি হবে। ঘরে ফায়ার প্রেস চলছে। তার আলোয় চঞ্চল ছায়াগুলো ঘরময় ঘুরে-ফিরে বেড়াচ্ছে। খেয়াল করলাম কোথাও যেন কেউ পিয়ানো বাজাচ্ছে। আমার চেনা সুর। রবীন্দ্রসঙ্গীত।

বুঝলাম আর কেউ নয়, হিরোসি বাজাচ্ছে। আসাহি হিরোসির এই পিয়ানো বাজানোতে আগ্রহের কথা ডায়েরিতে একজায়গায় উল্লেখ করেছিলেন। এই আমার সুযোগ। আমি বুঝতে পারব হিরোসি কোথায় আছে। সে সুযোগে অন্য ঘরগুলো দেখে নিতে পারব।

ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। একবার পুরো বাড়িটা ঘুরে দেখা দরকার। আওয়াজটা তিনতলা থেকে আসছে। ঠিক করলাম দোতলা দিয়ে শুরু করব। এক এক করে দোতলার ঘরগুলো দেখা দরকার যদি ওই ছেলেগুলোর কোনও সন্ধান পাওয়া যায়। দেওয়ালে লাগানো ক্ষীণ আলোয় সিঁড়ির অন্ধকার পুরোটা কাটেনি। সিঁড়ির উপরে কেউ দাঁড়িয়ে থাকলে টের পাব না। তাই সন্তর্পণে নিঃশব্দে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে থাকলাম।

একটু উঠে থেমে গেলাম। পিয়ানোর শব্দ যেন একবার থেমে গেল। উপরের ঘরে পায়ের অস্পষ্ট শব্দ শুনতে পেলাম। খানিকবাদে সে পায়ের শব্দ থেমে গেল। আবার পিয়ানো শুরু হল। এবার রবীন্দ্রসঙ্গীত। বুঝলাম আসাহির থেকে রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রতি ভালোবাসা পেয়েছে হিরোসি। তিনতলা থেকে পিয়ানোর সুর ভেসে আসছে। এ গানটা আসাহির ফেভারিট ছিল।

শুধু যাওয়া আসা, শুধু স্রোতে ভাসা,
শুধু আলো-আঁধারে কাঁদা-হাসা।
শুধু দেখা পাওয়া, শুধু ছুঁয়ে যাওয়া,
শুধু দূরে যেতে যেতে কেঁদে চাওয়া,
শুধু নব দুরাশায় আগে চ'লে যায়—
পিছে ফেলে যায় মিছে আশা।

এই নিঝুম রাতে রবীন্দ্রসঙ্গীতের এই সুর পুরো ম্যানসনে এমন এক অপার্থিব পরিবেশ তৈরি করেছে যে, তা বর্ণনা করার ক্ষমতা আমার নেই।

কিন্তু এর একটা পার্থিব মানে হল এখনও হিরোসি তিন তলায় আছে।

সতর্ক হয়ে সিঁড়ি দিয়ে আবার আস্তে আস্তে উঠলাম। দোতলায়। কালির মতো অন্ধকার দোতলা জুড়ে। বাইরে এখন জোরে হাওয়া দিচ্ছে। শন শন শব্দ আসছে মাঝেমধ্যে। বড় বড় কাচের জানলাগুলো থরথর করে কাঁপছে।

দোতলায় অনেকগুলো ঘর। সব ঘরের দরজা ভেজানো। আস্তে আস্তে একটা ঘরের দরজার নব ঘুরিয়ে ঢুকলাম। বিশাল ঘর। নীচে পাইন কাঠের ফ্লোরিং। আসবাব নেই। একটা চেয়ার, একটা বুক কেস। দেওয়ালে ঝোলানো মোমদানিতে একটা মোমবাতি শুধু জ্বলছে।

ঘরের পরিবেশ ঠিক আগের দিনের মতোই ধরে রাখা হয়েছে। আসাহি যে এ ধরনের পুরোনো বাড়ির পরিবেশ পছন্দ করতেন তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

আসলে এই বাড়িগুলোর একটা নিজস্ব চরিত্র থাকে, যেটা নতুন বাড়িতে থাকে না। একটা অদ্ভুত আলো আঁধারি ছড়িয়ে পড়েছিল ঘরের মধ্যে। ঘরে ঢুকে দরজা আবার টেনে বন্ধ করে দিলাম। ঘরের ভেতর দিকটা বেশ অন্ধকার। হঠাৎ কোনও একটা খোলা জানলার হাওয়ায় মোমবাতির আলো কেঁপে উঠে নিভে গেল। এক মুহূর্তের জন্য চমকে উঠলাম। মনে হয়েছিল হিরোসি এ ঘরে চলে এসেছে আর এসেই যেন মোমবাতির আলো নিভিয়ে দিয়েছে।

অন্ধকারেই দেওয়াল ধরে হাতড়ে হাতড়ে এগিয়ে গেলাম। ও আসেনি সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার পরে ফোনের আলো জ্বেলে যতটা সম্ভব ভালো করে দেখলাম। ঘরের শেষ প্রান্ত অব্দি গিয়েও সন্দেহজনক কিছু খুঁজে পেলাম না।

আবার বেরিয়ে এসে পাশের ঘরে সন্তর্পণে ঢুকলাম। প্রায় একই অভিজ্ঞতা। শুধু এ ঘরে আরও অন্য ধরনের কিছু আসবাব আছে। দেওয়ালে বেশ কিছু অয়েল পেন্টিং আছে। কেউ নেই।

এক এক করে দোতলার সবকটা ঘর ঘুরে দেখলাম। প্রত্যেকটা যেন আগেরটা থেকে আরও নিস্তব্ধ। কিন্তু সন্দেহজনক কিছু পেলাম না।

তিনতলায় ঠিক করলাম পরে যাব। এখনও পিয়ানোর শব্দ শোনা যাচ্ছে। আমার উপস্থিতি টের পেলে মুশকিল। তার আগে আবার একতলার সবকটা ঘর ভালো করে দেখা দরকার।

প্রফেসারের স্টাডি রুম, হারুর ঘর সব একতলায়। সাবধানে কাঠের সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামলাম। নীচে নামার পরে লবি। লবির একদিকে ড্রয়িংরুম, আমার থাকার ঘর, ডাইনিং রুম ইত্যাদি। অন্য দিকে শুনেছিলাম প্রফেসারের স্টাডি রুম। ওই দিকটায় যাওয়া হয়নি।

আস্তে আস্তে স্টাডি রুমের দিকে এগিয়ে গেলাম। খুঁজে পেতে অসুবিধে হল না। একটা ভারী কাঠের দরজা জোরে ঠেলতে খুলে গেল। বেশ বড় স্টাডি রুম। ঘরের দু-দিক দিয়ে বইঠাসা সিলিং অব্দি কাঠের আলমারি। ঘরের এক দিক জুড়ে কাচের জানলা।

জানলার কাছে একটা পড়ার টেবিল। তার উপরে ল্যাপটপ রাখা। দরজা বন্ধ করে আলো জ্বাললাম। ঘরের মধ্যে দুটো ঝাড় লণ্ঠন। আলমারির বইগুলোর উপর চোখ বোলাতেই বুঝলাম প্রফেসারের বিভিন্ন বিষয়ে আগ্রহ ছিল। কোনওটা গাছ নিয়ে তো কোনওটা অঙ্কের উপরে,, কোনওটা বা পেন্টিং-এর ইতিহাসের উপরে। প্রায় সব রকমের বইয়ের অদ্ভুত কালেকশান। তবে একটা বিষয়ের উপরে

বেশ কিছু বই দেখলাম। দেখে একটু অবাকই হলাম। 'সিক্রেট এজেন্টস বেডসাইড রিডার' জাতীয় বই। বেশ কিছু বই MI 6-এর উপরে।

MI 6 কি অনিলিখাদি? সহেলী বলে উঠল।

MI 6 হল ইংল্যান্ডের সিক্রেট সার্ভিস। যেমন আমেরিকার CIA, রাশিয়ার KGB তবে MI 6 আরও অনেক পুরোনো। ইম্পেরিয়াল জার্মানির বিরুদ্ধে খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য ১৯০৯ সালে MI 6 তৈরি করা হয়েছিল। আমাদের চোখের সামনেই এরকম অনেক সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট থাকে যাদের আমরা চিনতে পারি না। জেমস বন্ড চরিত্রটা তো এরকমই এক সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট সিডনি রেলির অনুসরণে তৈরি হয়।

সিডনি সাত সাতটা ভাষা খুব ভালো জানতেন। বিভিন্ন ধরনের ছদ্মবেশ নিতে পারতেন। শোনা যায় চারটে দেশের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তিও করেছিলেন। লেনিনকে মারার ষড়যন্ত্র করেছিলেন। তা এরকম অনেক বিখ্যাত সিক্রেট সার্ভিস এজেন্টের কথা শোনা যায়, যাদের কোনওভাবেই সাধারণের থেকে আলাদা করা যায় না। অথচ এরাই হল সরকারের চোখ-কান।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মান এনিগমা মেশিনের কোড ব্রেক তো MI 6-ই করেছিল। ইনফ্যাক্ট ব্লেচলি পার্কের এ কোড ব্রেকিং-এর দলে আমেরিকান কিছু কোড ব্রেকারও যোগ দেয়। এদের মধ্যে অংকের বিশেষজ্ঞ, দাবাড়ু, পাজল সলভার সবাই ছিল। এক সময় ভাবা হত যে এনিগমা মেশিনের সাংকেতিক ভাষা উদ্ধার করা অসম্ভব। কিন্তু MI 6-র কোড ব্রেকাররা এটা সম্ভব করেছিল। তার জন্যই জার্মানদের অনেক গোপন তথ্য আদান প্রদানের সময় ইংরেজরা আগে থেকে জেনে নিয়ে বিশ্বযুদ্ধের মোড় ঘোরাতে পেরেছিল। বলা হয় তা না হলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরও অন্তত দু-বছর ধরে চলত।

তা যা বলছিলাম অন্যান্য অনেক বইয়ের সঙ্গে এরকম কিছু বইও আছে যার বিষয় MI 6-এর অপারেশন। বইগুলো সহজলভ্য বইও নয়। এবিষয়ে ওর আগ্রহ ছিল একথা তিনি আমাকে কোনওদিন বলেননি।

আরেকটা জিনিস লক্ষ করলাম ঘরের মধ্যে বেশ কয়েকটা হিরোশিমার পারমাণবিক বোমার উপরে লেখা বই। একটা নোটবুকও পেলাম। তার নিজের চোখে দেখা অভিজ্ঞতার উপরে লেখা।

জানি এরকম না বলে পড়াটা অনধিকার চর্চার পর্যায়ে পড়ে। কিন্তু তবু দু-একটা লাইন পড়ে আগ্রহ সামলাতে পারলাম না। এটা ১৯৪৫-এর বেশ কয়েকবছর পরের লেখা। সেটা লেখার ধরন দেখেই বোঝা যায়। তার খানিক অংশ আমি ওর ডায়েরিতেই পড়েছি। তবে এখানে অনেক বেশি ডিটেলসে লেখা আছে।

লিখেছেন—

প্রথমে তাঁদের ধারণা হয়েছিল বাড়ির সামনেই কোনওও বোমা পড়েছে। কিন্তু বাইরে গিয়ে দেখেন শুধু তাঁদের বাড়ি নয়, সামনে যতদূর দেখা যায় প্রায় সব বাড়ি ভেঙে গেছে। তাঁকে নিয়ে তাঁর বাবা প্রথমে বাড়ির থেকে কিছু দূরে এক নদীতে নিয়ে যায়। তাঁর সেই দৃশ্য পরিষ্কার মনে আছে। অনেক লোক অর্ধদগ্ধ অবস্থায় ওই নদীর জলে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, এই হঠাৎ করে বেড়ে যাওয়া উষ্ণতা আর তাপপ্রবাহের থেকে রেহাই পেতে। জল খেতে।

তারপরে তাঁরা হাসপাতালে যায়। মা হাসপাতালে যাওয়ার খানিকক্ষণের মধ্যে মারা যায়। মার মৃত্যুর সময়েও ওর হাত ছিল মার হাতের মুঠোর মধ্যে। মার শরীরের বেশ কিছু জায়গায় খুব গভীর ভাবে কাচ ঢুকে গিয়েছিল। ইন্টারনাল ব্লিডিংয়ের জন্য মৃত্যু হয়।

বাবারও রক্তবমি শুরু হয় দুদিন বাদে। মারা যান পাঁচদিন বাদে। পরে শুনেছিল ওই কালো রেডিওঅ্যাক্টিভ বৃষ্টির জল খাওয়া তাঁদের একেবারে উচিত হয়নি। নিজে কীভাবে ক্যান্সারের হাত থেকে রেহাই পেয়েছিলেন, সেটাই আশ্চর্য।

এর কয়েকমাস পরে একটু সুস্থ হয়ে উঠলে তাঁকে তাঁর কাকা টোকিও নিয়ে আসে। তার কাছেই আসাহি মানুষ। কিন্তু ডায়েরির লেখা পড়লেই বোঝা যায় হঠাৎ করে সবাইকে হারানোর বেদনা তাঁর মনে খুব গভীরভাবে ছাপ ফেলেছিল।

তিনি তাই মাঝেমধ্যেই ছুটে যেতেন হিরোসিমায়। তাঁর বাড়ির জায়গায় এখন একটা বড় রেস্টুরেন্ট হয়েছে। তবু ওখানে গেলেই আজও যেন তিনি সেই শৈশবের দিনগুলো ফিরে পান। মনে হয় সবাই আছে। ছোটবেলার মুহূর্তগুলো যেন ক্ষণিকের জন্য জীবন্ত হয়ে ধরা দেয়।

এতক্ষণ বাদে অনিলিখা একটু থেমে ফের বলে উঠল, আমি সামান্য কিছু পাতা পড়েছিলাম। পড়ে একটা কথাই আমার মনে হয়েছিল আসাহি যেন আমেরিকা আর ইংল্যান্ডকে কোনওদিনের জন্য ক্ষমা করতে পারেনি। সেই সুরটা খুব প্রকটভাবে ফুটে উঠেছিল তাঁর লেখার মধ্যে।

আরও চোখে পড়ার মতো তাঁর সংগ্রহে রাখা ছবিগুলো। অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে সংগ্রহ করা বোমা বিস্ফোরণের আগে আর পরের ছবি।

এটা সত্যি যে আমারও মনে হয় কীভাবে জাপান এত বড় দুটো পারমাণবিক বিস্ফোরণের পরেও অ্যামেরিকা ও সেই সময়কার অ্যালায়েন্স পাওয়ারকে ক্ষমা করেছে, সেটাই আশ্চর্য। আসাহির এই অনুভূতি নিশ্চয়ই শুধু তাঁর একার নয়। যেখানে চার লক্ষের মতো জনসংখ্যা ছিল হিরোশিমার, তার প্রায় চারভাগের এক ভাগ অর্থাৎ এক লক্ষ লোক মারা যায় ওই পরমাণু বোমায়। তার বাইরে ওই তেজস্ক্রিয়তার প্রভাব ছিল প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে। তার জন্য যে কত

লোক মারা গেছে, কষ্ট পেয়েছে, তার কোনও ইয়ত্তা নেই।

আমার মনের মধ্যে একটা অন্য ধরনের চিন্তাভাবনা ঘুরে ফিরে আসছিল এ সব দেখার পরে। এত কিছুর পরেও আসাহি কেন ইংল্যান্ডে এতদিন ছিলেন এই ঘৃণাকে মনের মধ্যে লুকিয়ে রেখে?

৮

ওই ঘর থেকে আমি বেরিয়ে আসি। অন্য ঘরগুলো এক এক করে দেখা শুরু করি। যত সময় যাচ্ছিল, কেন জানি না একটা অজানা ভয় আমাকে গ্রাস করছিল। কিছু একটা যেন আমাকে থামতে বলছিল। মনে হচ্ছিল কেউ আমাকে ফলো করছে। কেউ যেন ঘাড়ের কাছে নিশ্বাস ফেলছিল। মাঝেমধ্যে ঘাড় ফিরিয়ে দেখছিলাম। কেউ নেই। তবু ওই ভয়ের কারণ সে মুহূর্তে আমার অজানা ছিল।

আমি শেষ পর্যন্ত সবক'টা ঘর ভালো করে না দেখে থামতে পারছিলাম না। মনে হচ্ছিল আমিই একমাত্র যে ওই ছেলেগুলোকে এখনও বাঁচাতে পারি। ওরা যেন আমার সাহায্য চাইছে। আমার অপেক্ষায় বসে আছে।

কিন্তু কিছু পেলাম না। একতলার সবক'টা ঘর দেখে প্রায় ফিরেই আসছিলাম। লবির একদম শেষ দিকে ডানদিকে একটা নীচু দরজা দেওয়া ঘর। ভারী কাঠের দরজায় বাইরে থেকে কাঠের হুড়কো টানা। মনে হয় আগে এটা একটা সময় স্টোরেজ রুম হিসেবে ব্যবহার করা হত। ওর ভেতরে উঁকি মেরে কিছু না দেখে ফিরে আসছিলাম। হঠাৎ মনে হল কোনও কিছু লুকোনোর জন্য এটা খুব ভালো জায়গা হতে পারে।

ঘরের ভেতরের দিকে এগোলাম। পুরোনো বাড়ির প্রত্যেকটা ঘরের মধ্যে একটা নিজস্ব প্রাণ থাকে। ফেলে আসা সময়ের পায়ের আওয়াজ যেন তাতে ধরা থাকে। একটা সুপ্ত আওয়াজ থাকে। তারা তাদের মতো করে কথা বলে। বাকি সব ঘরেই সে পরিচয় ছিল। শুধু এ ঘরটায় যেন সে প্রাণ ছিল না। এ ঘরের সিলিং বেশ নীচু। পাঁচ ফুটের মতো একদিকে। ঘরটার ছাদ উল্টো দিকের দেওয়ালের দিকে ক্রমশ আরও নীচু হয়ে গেছে। সেখানে সিলিংয়ের হাইট তিন ফুটের মতো।

মনে হয় এ ঘরটাতে হিরোসি মাঝে মধ্যে এসে বসে। বিভিন্ন বাচ্চাদের বই ছড়ানো। তার মধ্যে প্রফেসার স্টুয়ারটের 'ক্যাবিনেট অফ ম্যাথাম্যাটিকাল কিউরিওসিটিস'-এর বইটাও আছে। এগুলো কে পড়ে? হিরোসি? অবাক ব্যাপার।

আগে খেয়াল করিনি। ঘরের শেষ দিকে যেখানে সব থেকে নীচু দেওয়াল, সেখানে একটা ছোট দরজা আছে এ ঘর থেকে অন্য আরেকটা ঘরে যাওয়ার। দরজার রঙও এমন যে প্রায় দেওয়ালের সঙ্গে মিশে গেছে।

লুকনো চেম্বার?

দরজায় একটা ভারী তালা ঝুলছে। ফোনের টর্চের আলো ফেলে দরজার সেই তালা খোলার চেষ্টা করলাম। আমার কাছে আমার চুলের ক্লিপ ছিল। আমি আগে এরকম তালা অনেক ভেঙেছি। ক্লিপ সামান্য বেঁকিয়ে মিনিট পাঁচেক চেষ্টার পরে এটাও খুলে ফেললাম। কিন্তু তারপরেও কাঠের পাল্লাটা এত শক্ত করে আটকানো যে খুলছিল না। বেশ খানিকক্ষণ টানাটানির পরে তবে খুলল।

আর খোলার পরেই একটা উগ্র পচা গন্ধ এসে যেন আমাকে ধাক্কা দিল। পাশের ঘর বা প্যাসেজ যাই বলি না কেন, তা চওড়ায় তিন ফুটের বেশি নয়। কিন্তু ভেতরে অনেকটা ঢুকে গেছে। ফোনের ক্ষীণ আলোয় তেমন কিছু দেখা যাচ্ছে না। শুধু কিছুটা দূরে একটা মরা বেড়াল চোখে পড়ল। এটা কি বাড়ির পোষা বেড়াল পিটারের মৃতদেহ?

ভেতরে ঢুকে দেখতে হবে। কিন্তু সেটা কি এখন ঠিক হবে? হিরোসি যদি টের পেয়ে যায়?

একটু দোনমনা করছি, হঠাৎ ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে রক্ত জল হয়ে গেল। দরজা দিয়ে বাইরের যে সামান্য আলো আসছিল, তাকে খানিকটা আড়াল করে একটা সাড়ে চারফুটের মানুষের ছায়া দেখা যাচ্ছে। হিরোসি। উপর থেকে যদিও পিয়ানোর আওয়াজ এখনও আসছে।

ওর মুখটা ভালো করে না দেখতে পেলেও আমি যে ওর পরবর্তী শিকার হতে চলেছি, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

কিন্তু যেটা হল সেটার জন্য আমি একদমই প্রস্তুত ছিলাম না। কিছু বোঝার আগেই ও হঠাৎ এ ঘরের বাইরের দরজাটা বন্ধ করে দিল। আর সেটা করার সঙ্গে সঙ্গে বাইরে থেকে আসা ক্ষীণ আলোর রেখা পুরোপুরি হারিয়ে গেল।

বাইরে থেকে হিরোসির গলা শুনতে পেলাম, তাহলে তুমি এখানেই থাক অনিলিখা। তুমি অনেক সময় নিয়ে দেখতে পারবে। ওদের একটু খুঁজলেই পাবে। কিন্তু তোমাকে আর কেউ খুঁজে পাবে না। তোমাকে একটা কথা বলি, ওরা কেউ ভালো ছিল না।

তা তুমি ওদের মারলে কেন?

ওরাও তো আমাকে মারত। বল দিয়ে, ব্যাট দিয়ে। ভাবত আমি ওদের অন্যায়ের প্রতিবাদ করব না।

কিন্তু তুমি তো ওদের না মেরেও প্রতিবাদ করতে পারতে।

ওরা আমাকে একদিন মেরে একটা গর্তের মধ্যে ফেলে দিয়েছিল। তারপরেই

আমি ওদের এক এক করে ধরে এনে মারি।

কিন্তু তুমি কি এটা ভেবে দেখোনি, যে এর জন্য একদিন তুমি ধরা পড়বেই। তারপরে তুমি প্রফেসারকেও একদিন মেরে ফেললে?

না, আমি প্রফেসারকে মারিনি। ওরা মেরেছে।

কারা মেরেছে?

মার্ক। MI 6। ওই ছেলেগুলোও মার্কের সঙ্গেই যুক্ত ছিল। ওরা প্রফেসারকে মারতে চেয়েছিল। তাই আমাকে বাধ্য হয়ে ওদের মারতে হয়েছে।

উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলাম, ওরা কেন প্রফেসারের ক্ষতি করতে চাইবে?

প্রফেসার শুধু বিজ্ঞানী ও প্রফেসার ছিলেন না। তিনি ছিলেন জাপানের 'ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড অ্যানালিসিস' সার্ভিসের সদস্য। সে জন্যই তিনি ইংল্যান্ডে ছিলেন। ইংল্যান্ড ও আমেরিকার অনেক অত্যন্ত গোপনীয় তথ্য তাঁর মাধ্যমে জাপানে চলে যেত। তাঁর মূল উদ্দেশ্য খারাপ ছিল না। তিনি চাইতেন জাপান যেন আবার কোনও ষড়যন্ত্রের শিকার না হয়। ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স সেটা বুঝতে পেরে তাকে গোপনে মারার চেষ্টা করে। এ সব হত্যা তো আর প্রকাশ্যে হয় না। খুব সাবধানে কোনও চিহ্ন না রেখে হয়। প্রথমে আমি ভেবেছিলাম শুধু ওরাই যুক্ত আছে। কিন্তু বুঝতে পারিনি যে মার্কও এর সঙ্গে সরাসরি যুক্ত।

মার্ক?

হ্যাঁ, মার্কও ব্রিটিশ সিক্রেট সারভিস MI 6-এর হয়ে কাজ করে। এখানে এসেছিল সেজন্যই। সেজন্যই প্রফেসারের সেক্রেটারি হিসেবে কাজ শুরু করেছিল। ও কিন্তু এখন তোমাকেও সন্দেহ করে। মারতে চায়।

অবাক হচ্ছিলাম হিরোসির কথা বলার ধরণ দেখে। ও কী করে এত কিছু জানল?

আমি বললাম, কিন্তু আমাকে এ ঘরে বন্ধ করে তোমার কী লাভ?

—তুমি বেরোলেই আমার বিপদ। আমি নিজের সুরক্ষার জন্য তোমাকে বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছি। আমি জানি তুমি খারাপ লোক নও।

এর মধ্যে আমার ফোন বেজে উঠল। মার্কের ফোন। এখানে যে নেটওয়ার্ক আছে, এটাই বাঁচোয়া।

বাইরে থেকে হিরোসির গলা ভেসে এল, ফোন ধোরো না অনিলিখা।

আমি তবু হিরোসির কথা অগ্রাহ্য ফোনটা নিলাম।

মার্কের গলা, কোথায় তুমি? আমি এসে গেছি।

ফিসফিসিয়ে বললাম, আমি একতলার একটা ঘরে বন্ধ আছি। এখানে ওই তিনটে ছেলেও বোধহয় আছে। জীবিত না মৃত—তা অবশ্য জানি না। বাইরে হিরোসি আছে।

চিন্তা করো না। আমি আসছি। পুলিসেও খবর দিয়েছি। ওরা খানিকক্ষণের

মধ্যে এসে পড়বে।

ফোন কেটে গেল। বাইরে বেশ খানিকক্ষণ নীরবতা।

হিরোসি কি সামনে আছে? নাকি কোথাও গেছে? ও যা বলল তা কি ঠিক? মার্ক MI 6-এর হয়ে কাজ করে? আসাহি জাপানের সিক্রেট সার্ভিসের হয়ে কাজ করত? এত গুলো প্রায় অসম্ভব তথ্য আর হিরোসি সেসব তথ্য পেল কী করে?

নাকি হিরোসি নিজেকে বাঁচানোর জন্য আমাকে দলে টানতে চাইছে? এটা কি ওর আরেকটা বানানো গল্প যাতে আমি ওকে বিশ্বাস করি?

১০

ঘরের অন্ধকার যেন আরও বাড়ছে। ফোনে চার্জ বেশি নেই। তবু তার সামান্য আলোতে পাশের ঘরের ওই সরু প্যাসেজের মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে পড়লাম। আবার সেই তীব্র পচা গন্ধ। কিছু দূরে বেড়ালটার মৃতদেহ পড়ে আছে। আরেকটু দূরে যেতেই চমকে উঠলাম। প্রথম দেহটা চোখে পড়ল। বয়স পনেরোর ছেলের মৃতদেহ হলেও এখন তাকে সম্পূর্ণ অন্যরকম লাগছে।

শরীর থেকে চামড়া খুলে খুলে পড়েছে। সারা শরীর ফুলে উঠেছে। সাদা চোখদুটো কোটর যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে। মুখটা বীভৎস দেখাচ্ছে। পচনের জন্য গায়ে কালো-সবুজ ছোপছোপ। দেখেই মনে হল অন্তত দিন দশেক আগে মৃত্যু হয়েছে।

আরেকটু যেতেই বাকি দুটো মৃতদেহ খুঁজে পেলাম। প্রায় একই অবস্থায়। হাত লাগতেই চামড়া খসে পড়ছে। এমন সে দৃশ্য যে গা গুলিয়ে বমি পাচ্ছিল। আর না এগিয়ে কোনওরকমে আবার হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এলাম।

মাথায় ঢুকছে না যে, আসাহি যে রোবটকে শান্তির দূত হিসেবে তৈরি করতে চেয়েছিলেন, তার মধ্যে এতটা হিংস্রতা এল কী করে? নাকি আসাহির মুখে বারবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘটনা শুনে হিরোসি ভেবেছিল শুধু হিংসাই কারও অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারে।

এমারজেন্সি নাম্বারে ফোন করতে গিয়ে দেখলাম ফোনে আর নেটওয়ার্ক নেই। হিরোসি কি কিছু করেছে? কে জানে?

ঘরে একটা অদ্ভুত নিস্তব্ধতা। গরম জলের পাইপের মাধ্যমে সব ঘর উষ্ণ রাখা হয়। তার জন্য একটা আওয়াজ সব ঘরে হয়। এ ঘরে সেরকম কোনও গরম করার ব্যবস্থা নেই। সেই জলের পাইপের থেকেও কোনও আওয়াজ নেই।

ঘরে এতগুলো মৃতদেহের উপস্থিতি আরও যেন ঠান্ডা বাড়িয়ে দিচ্ছিল। দরজা ভেতর থেকে খোলার কোনও উপায় নেই। একমাত্র উপায় মার্কের জন্য অপেক্ষা করার। হয়তো ও খানিকক্ষণের মধ্যেই এসে পড়বে আর আমাকে উদ্ধার করবে। দেরি হচ্ছে কেন?

হঠাৎ বাইরে একটা তীব্র চিৎকার শুনলাম। মনে হল মার্কের। তারপরই সব চুপচাপ। তাহলে কি মার্ককেও ও মেরে ফেলল!

বেশ খানিকক্ষণ ফের সম্পূর্ণ নীরবতা। সময় ক'টা হল তা বোঝার কোনও উপায় নেই। ঘরের অন্ধকার যেন আমাকে আস্তে আস্তে গিলে নিচ্ছিল। সেই পচা গন্ধটা এখন সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে। অক্সিজেন আস্তে আস্তে কমে আসছিল।

ভেতর থেকে দরজা খোলার অনেক চেষ্টা করলাম। খুলল না। শক্ত ওক কাঠের দরজা। উপায় না দেখে ধাক্কা দিতে শুরু করলাম। বাড়ির মধ্যে যে কেউ থাকলে টের পাবে। কিন্তু কোনও সাড়া এল না। হারুও কি ওর দলে চলে গেছে?

তাহলে কি এভাবেই আমাকে মরতে হবে?

আবার বেশ খানিকক্ষণ কেটে গেল। ফোনের চার্জ মোটে ৫% দেখাচ্ছে। আর খানিকক্ষণের মধ্যেই ফুরিয়ে যাবে। তখন একমাত্র সঙ্গী হবে শুধু নীরবতা, শুধু অন্ধকার। হঠাৎ মনে হল অন্য ঘরের মধ্যে দিয়ে বাইরে যাওয়ার কোনও পথ আছে কি? খুঁজে দেখা দরকার।

আবার ফোনের টর্চের ক্ষীণ আলোয় ওই প্যাসেজে ঢুকলাম। খানিকটা হামাগুড়ি দিয়ে এগোনোর পরে আবার সেই বেড়ালের মৃতদেহটা পড়ল। পাশ দিয়ে এগিয়ে গেলাম। খানিকটা এগোনোর পর ওদের দেহগুলো চোখে পড়ল।

কী অপরাধ করেছিল এই নিরীহ ছেলেগুলো যে তাদের এভাবে মরতে হল? আর কেনই বা প্রফেসার একটা ভালো রোবট তৈরি করার জায়গায় এরকম একটা দৈত্য তৈরি করলেন। সবই হয়তো ভাগ্য।

দেহগুলোর পাশ দিয়ে যাওয়ার জায়গাও বিশেষ নেই। একটা শরীর সরিয়ে দিতে গিয়ে আরও কীরকম যেন করে উঠল শরীরটা। চামড়া খসে খসে পড়ছে। আরও খানিকটা এগিয়ে গেলাম। আর এবারে চোখে পড়ল আরও দুটো শরীর। তার মধ্যে একটা হারুর। অন্যটা বোধহয় ডেভিডের যার কথা মার্কের মুখে শুনেছিলাম।

ঘরের প্রায় শেষ দিকে পড়ে আছে। হারুর কাছে গিয়ে দেখলাম। প্রাণ নেই। এখনও শরীর অতটা ঠান্ডা হয়নি। রিগর মর্টিস শুরু হয়নি। তার অর্থ দু-তিন ঘন্টার মধ্যেই তাহলে ওকে মারা হয়েছে।

ঘরের শেষ প্রান্ত অব্দি গেলাম। চারদিকে শীতল দেওয়াল। এদিক দিয়ে বেরোনোর কোনও পথই নেই। এর মধ্যে ফোন অফ হয়ে গেল। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে ফেরার পথ আন্দাজ করে হামাগুড়ি দিয়ে এগোলাম।

হঠাৎ তার মধ্যেই টের পেলাম এ প্যাসেজের অন্ধকার যেন আরও তীব্রতর হয়ে উঠেছে। এত তীব্র সে অন্ধকার যে নিজের উপস্থিতিও যেন নিজের কাছে হারিয়ে যায়।

কেন তা বুঝতে দেরি হল না। এ প্যাসেজে ঢোকার যে পাল্লাটা ছিল, তা কেউ টেনে বন্ধ করে দিয়েছে। এখান থেকে বেরোনোর যে সামান্য আশা ছিল, সেটাও আর থাকল না।

পাল্লার উল্টোদিকে ঘরের মধ্যে কে দাঁড়িয়ে আছে তা বেশ বুঝতে পারছি। হিরোসি। যে এতজনকে মেরেছে, তার কাছে আমাকে মারা খুব শক্ত কাজ না। শুধু এটুকু বুঝতে পারছি আমার মৃত্যু এত সহজে হবে না। একটু একটু করে দিনের শেষ আলোর মতো আমি ফুরিয়ে যাব। ও সেটাই চায়। যখন খোঁজ পাওয়া যাবে, তখন অনেক দেরি হয়ে যাবে। আর হিরোসির মতো একটা কিলিং মেশিন আরও বেশ কয়েকটা খুন করে ফেলবে তার মধ্যে। ওর মতো একটা সাংঘাতিক ইন্টেলিজেন্ট রোবট অনেক কিছুই করার ক্ষমতা রাখে।

উল্টোদিক থেকে এবার কথা ভেসে এল। হিরোসির গলা।

—অনিলিখা, তোমাকে আর হারুকে আমি মারতে চাইনি। কিন্তু না মেরেও উপায় ছিল না। কারণ তোমরা ফিরে যাবে, আর বলে বেড়াবে। তখন আমার পক্ষে নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করা শক্ত হবে। আমাকে নিজেকে রক্ষা করতেই হবে।

—কিন্তু তোমার এসব করে কী লাভ? কী লাভ হয়েছে তোমার এসব নিরীহ ছেলেগুলোকে মেরে?—রাগে চিৎকার করে উঠলাম।

—আগেও বলেছি। ওরা কেউ নিরীহ ছিল না। ওদেরকে পাঠানোই হয়েছিল প্রফেসারের সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিতে। ওদের আসল কাজই ছিল প্রফেসারকে খুন করা। ওরা সবাই MI 6–এর। আমি তারই প্রতিশোধ নিয়েছি।

—কিন্তু হিরোসি, তোমাকে তো কারুর ক্ষতি করার জন্য, প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তৈরি করা হয়নি। তোমাকে তো প্রফেসার তৈরি করেছিল শান্তির দূত হিসেবে। সেসব কি তুমি ভুলে গেলে?

একটু যেন হেসে উঠল, হিরোসি। বলে উঠল, তুমি কি এ বাড়ির ছবিগুলোর কথা এর মধ্যেই ভুলে গেছো? হিরোসিমার সেসব নিরীহ মানুষগুলোর মৃতদেহের ছবি। ওরা তো কেউ অপরাধ করেনি। ওদের বেশিরভাগের সঙ্গে তো যুদ্ধের কোনও সম্পর্কই ছিল না।

আমি দেখেছি প্রফেসারকে মাঝরাতে তার বাবা-মা আর বোনের ছবি নিয়ে বসে থাকতে। ঘন্টার পর ঘন্টা শুধু চুপ করে বসে থাকতেন। কখনও বা নিজের মনে কথা বলতেন। সে চোখে শুধু মৃত্যুর ছবি দেখেছি। সব হারানোর ছবি দেখেছি। একটু থেমে ও ফের বলে উঠল, একটা শহর, হাজার হাজার নিরীহ মানুষ এক মুহূর্তে হারিয়ে গেল, কই তখন তো তোমরা কেউ প্রতিবাদ করোনি। তোমরা তো একবারও ভাবোনি যে তার পরেও একটা প্রজন্ম বড় হবে যাদের আপনার বলতে কেউ থাকবে না। তোমাদের মিডিয়া কখনও এর জন্য আমেরিকাকে কাঠগোড়ায় দাঁড় করায়নি। এমনকী সাধারণ মানুষের উপর সবথেকে নিন্দনীয় এই হানাকে তোমরা 'ওয়ার ক্রাইম' বলেও স্বীকার করোনি। উল্টে এর সপক্ষে অনেক যুক্তি খাড়া করা হয়েছে।

আমি চুপ করে শুনছিলাম। বুঝতে পারছিলাম এ কথাগুলো ওর নয়। আসাহির কথা। ও সেটাই মুখস্থ বলে যাচ্ছে। বলে উঠলাম—

—তুমি কি এসব কথা আসাহির মুখে শুনেছ?

হ্যাঁ, আসাহি আমাকে বলতেন। আমি এ সব কথা আসাহির কাছ থেকেই শিখেছি। আমি এ কাজটা করেছি শুধু আসাহির কথা ভেবে। সে হিরোসিমার ছাপ শুধু দেওয়ালে নয়, রয়ে গেছে আসাহির মনে, আমার মনেও। তবে তিনি আমাকে এ কাজ করতে কখনও বলেননি।

তুমি কি মার্ককেও মেরে ফেলেছ?

না, ঠিক সেভাবে নয়। তবে তাকেও শাস্তি দিয়েছি যাতে সে আসাহিকে খুনের শাস্তি পায়।

মানে? কী করেছ ওকে?

অন্যদিক থেকে চুপ করে রইল হিরোসি। তোমাকে খুঁজে বার করতে হবে অনিলিখা। কাকুরেনবো। হেসে বলে উঠল হিরোসি।

কাকুরেনবো অর্থাৎ জাপানি ভাষায় লুকোচুরি।

ও ফের বলে উঠল, তোমাকে একটা হিন্ট দিই। মানুষের সব থেকে বড় শিক্ষা হয় নিজের অভিজ্ঞতা থেকে। সেটা জানো তো?

তার সঙ্গে মার্কের উধাও হওয়ার কী আছে?

মনে হল ও যেন ফের হেসে উঠল।

বুঝতে পারলাম আস্তে আস্তে ও ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে।

আমি চিৎকার করে উঠলাম, হিরোসি আমাকে এখান থেকে বেরোতে দাও। আমি তো তোমার কোনও ক্ষতি করিনি।

উত্তর এল না। বুঝলাম রোবটের মন থাকে না। একটা ধীর পায়ের শব্দ ঘর থেকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল। বাইরের ঘরের দরজা বন্ধ হওয়ার আওয়াজ পেলাম।

১১

কতক্ষণ আবার এরকম ছিলাম কে জানে? হয়তো কয়েক মিনিট, হয়তো বা কয়েক ঘণ্টা, হয়তো বা কয়েকদিন। কীরকম যেন শরীর অবসন্ন হয়ে আসছিল। এখানে এমন কিছু নেই যা দিয়ে এই পাল্লাকে ধাক্কা দেওয়া যায়। এই প্যাসেজের মধ্যে আমার সঙ্গী শুধু কয়েকটা মৃতদেহ, একটা মৃত বেড়াল আর তীব্র পচা গন্ধ। একটু নড়াচড়া করলেই হাত যেন কোনও মৃতদেহে লাগছিল।

খানিকবাদে আবার জোরে জোরে ধাক্কা দিতে শুরু করলাম।

কতক্ষণ জানি না।

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। স্বপ্নে দেখলাম কিছু লোক আমাকে নিয়ে এখান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। তাদের ধারণা আমিই অন্যদের খুন করেছি। আমি তার প্রতিবাদ করছি। যুক্তি দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করছি। কিন্তু তারা শুনছে না।

ঘুম ভেঙে আবার অন্যভাবে চেষ্টা করলাম পাল্লা খোলার। কাজ হল না। আবার ক্লান্ত হয়ে দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসে পড়লাম। আবার হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। অক্সিজেনের অভাবে মাথাও যেন আস্তে আস্তে কাজ করছিল না।

হঠাৎ মনে হল বাইরে আওয়াজ হচ্ছে। অনেক লোক বাইরে ছোটাছুটি করছে।

পুলিস এসেছে কি?

আমি এবারে ঘরের মধ্যে থেকে চিৎকার করে উঠলাম। বেশ কয়েকবার। দুটো দরজা আছে আমাদের মধ্যে। এটা ভেবে প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠলাম। মনে হল ওরা আমার আওয়াজ শুনতে পেয়েছে। জার্মান ভাষায় কিছু কথা শোনা যাচ্ছে ঠিক বাইরে থেকে।

খানিকক্ষণ বাদে দরজা খুলল। সুইস পুলিশ।

কার থেকে খবর পেয়েছে জানি না। কিন্তু বাইরের সামান্য আলোতেও তখন যেন চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে। শরীর এতক্ষণ ওইটুকু জায়গায় আটকে থাকার জন্য কীরকম আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কোনওরকমে ওখান থেকে বেরিয়ে ওদের ঘরের মধ্যে মৃতদেহগুলোর কথা জানালাম। ওদেরকে হিরোসির কথাও বললাম।

পরে শুনেছিলাম পুরো বোল ঘণ্টা এভাবে আটকে ছিলাম। মার্কের ফোন

ট্রেস করেই ওরা এই বাড়ির খবর পায়। এমনিতে এটা খুঁজে বার করা সহজ ছিল না। ওরা মার্ককে খুঁজে পায়নি।

উপর থেকে তখনও পিয়ানোর আওয়াজ আসছে। রবীন্দ্র সঙ্গীতের মন কেমন করা সুর।

যতবার আলো জ্বালাতে চাই, নিবে যায় বারে বারে।
আমার জীবনে তোমার আসন গভীর অন্ধকারে।

খানিকবাদে থেমে গেল।

আমরা সব সতর্কতা নিয়ে উপরে উঠতে যাব, দেখি হিরোসি দোতলার সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে আছে। হাসছে। সেই শিশুর মতো হাসি। সে হাসি দেখে সুইস পুলিশও দ্বিধা করছিল প্রথমে। পরে আমি আবার বলার পরে ওকে ধরে।

তারপর?

—আশ্চর্য ব্যাপার। হিরোসিকে যখন ধরা হয় ও কিন্তু কোনও বাধা দেয়নি। জানি না কেন। কিন্তু সমস্যা হল অন্য জায়গায়। মার্ককে পাওয়া যায়নি। মার্কের মৃতদেহও পাওয়া যায়নি। অথচ আমি নিশ্চিত যে মার্ক ও বাড়িতে এসেছিল। তাহলে গেল কোথায়?

—মার্ককে আর পাওয়া যায়নি? এখনও না? মিলন বলে উঠল।

—তাহলে? কি হয়েছিল আর জানা যায়নি? আমি বলে উঠলাম।

—সেটা কি বলেছি? পরে একদিন বলব সে কথা।—বলে অনিলিখা উঠে পড়ল।

আমরা সবাই তখন মরীয়া। কী হয়েছিল মার্কের বলতেই হবে।

অনিলিখা বাধ্য হয়ে খানিকবাদে ফের বলল, আসলে যেটা বলব তাতে তোদের সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য বলে মনে হবে। তাকে যুক্তি-বিজ্ঞান দিয়ে বোঝানো আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। কিন্তু যখন জানতেই চাস, বলেই ফেলি। মার্ককে খুঁজে বার করার সব আশাই যখন ছেড়ে দিয়েছি, তখন এ ঘটনা ঘটার ঠিক চারদিন বাদে বিবিসি-তে হিরোসিমার উপরে একটা ডকুমেন্টারি হচ্ছিল। নতুন একটা ডকুমেন্টারি। আসাহির লেখা পড়ে হিরোসিমার উপরে একটা বাড়তি কৌতূহল হয়েছিল। তাই দেখতে বসে গেলাম।

৬ আগস্ট, ১৯৪৫। এখন তো প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে অনেক উন্নতি হয়েছে। তাই ওরা ওই বিশেষ দিনে তোলা সাদা কালো অনেক ছবি, ভিডিও থেকে এই ডকুমেন্টারিটা তৈরি করেছে। বোমা পড়ার আগের এক ঘণ্টা এই

ডকুমেন্টারিতে খুব সুন্দর দেখিয়েছে। খুব ডিটেলে। সকাল সাড়ে সাতটা থেকে শুরু। হিরোসিমাতে জাপানি একটা সেনা শিবির ছিল। ডকুমেন্টারিতে সে সময়ে যারা সেই ক্যাম্পে ছিল তাদের দেখাল। তাদের মধ্যে কয়েকজন আর্মি ড্রিল করছিল, সেটাও দেখাল। বেশ কিছু সাধারণ মানুষকে দেখাল। কেউ অফিসের পথে। কেউ ট্রামে করে যাচ্ছে। সকাল আটটার সেই এয়ার রেড ওয়ার্নিং শুনে সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়াও দেখাল। একটা ব্যাঙ্কে কয়েকজন মহিলা কর্মচারীদের দেখাল। আসলে জাপানে তখন নিয়ম ছিল মহিলাকর্মীদের আগে অফিসে আসতে হবে। পশ্চিমী কিছু মিশনারী যারা জাপানে ছিল পরমাণু বোমা পড়ার ঠিক আগের মুহূর্তে, তাদেরকেও দেখাচ্ছিল।

কীভাবে এসব ছবি-ভিডিও জোগাড় করেছে, কে জানে! তারা জানেও না যে খানিক বাদে আকাশে উড়ে আসতে দেখা যাবে একটা বি 29 বিমানকে, যার নাম এনোলাগে। আর তারপরেই আকাশ থেমে নেমে আসবে পরমাণু বোমা।

হঠাৎ চমকে উঠলাম। ওই মিশনারীদের মধ্যে ও কে বসে আছে? ও তো মার্ক। হ্যাঁ, মার্ক। ঠিক সেই চোখ, সেই মুখ, সেই চওড়া ভুরু, সেই এক লাল-সাদা স্কোয়ারকাটা জামা যা আমি দেখেছি। মুখেচোখে উত্তেজনা। আমার দিকেই যেন তাকিয়ে আছে।

—মানে, মার্ক ওই সময় গেল কী করে?—আমরা সবাই অবাক হয়ে বলে উঠলাম।

—সেটাই তো আশ্চর্য কথা। মার্ককে কি হিরোসি পাঠিয়েছিল পরমাণু বোমা পড়ার ঠিক আগের মুহূর্তের জাপানে, যাতে সেও ওই এক পরিস্থিতির শিকার হয়? ওটাই কি ছিল ওর প্রতিশোধ?

—মানে তুমি বলতে চাও টাইমট্রাভেল। জোরে বিষম খেয়ে উঠল বিশ্বজিৎদা।

অনিলিখা সরাসরি উত্তর না দিয়ে বলল, আশ্চর্য ব্যাপার হল মার্কের কোনও ছবি বা কোনও প্রোফাইল সুইস পুলিশ খুঁজে পায়নি। ওদের কাছে এটা খুব বড় রহস্য। কী করে সুইজারল্যান্ডে এল, কবে এল—কোনও তথ্যই নেই ওদের কাছে। এটা অনেক সময় MI 6 এজেন্টদের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। সব তথ্য গোপন রাখা হয়। কিন্তু চ্যালেঞ্জটা হল আমি কী করে ওদের বোঝাব যে মার্ক আমাদের চোখের সামনেই আছে। ওই ডকুমেন্টারির রেকর্ডিং দেখলেই ওরা মার্ককে দেখতে পাবে। আমি মার্ককে নিজে দেখেছি।

তুমি ওই ভিডিওটা আবার দেখেছ? আবার বলে উঠলাম।

হ্যাঁ, আমি তারপরে বহুবার দেখেছি। তোদেরও দেখাব। দেখাব মার্ককে। স্পষ্ট ওই মিশনারীদের মধ্যে দেখতে পাবি। মনে হবে যেন চোখ তুলে তোর দিকেই তাকিয়ে আছে।

অনিলিখা একটু থেমে বলে উঠল, যা শুনেছি, ওরা এখনও হিরোসির

উপরে অনেক রিসার্চ করছে। ওকে এক অত্যন্ত হাইসিকিউরিটি ল্যাবে রাখা হয়েছে। বোঝার চেষ্টা করছে প্রথম সত্যিকারের বুদ্ধিমান রোবটকে। আমি জুরিখ ছাড়ার আগে একবার দেখা করতে গিয়েছিলাম। আমাকে দেখে কী বলল জানিস?

কী?

হেসে বলে উঠল, জিকান তো কুকান দে উশিনাওরেটা।

মানে?—সহেলী অবাক হয়ে বলে উঠল—কান নিয়ে আবার কী বলল?

না না। কথাটা হল 'জিকান তো কুকান দে উশিনাওরেটা'। প্রথমে ভেবেছিলাম আমার কাছে হিরোসি ক্ষমা চাইছে। কিন্তু পরে তার অর্থ বুঝলাম—লস্ট ইন টাইম অ্যান্ড স্পেস। অর্থাৎ আমি ঠিকই চিনেছি মার্ককে। ওই ভিডিওতে মার্কই ছিল। ও পরমাণু বোমা পড়ার কিছুটা সময় আগে হিরোসিমায় গিয়ে পৌঁছেছে। সব জেনে শুনে ও এখন হিরোসিমায় পরমাণু বোমা পড়ার অপেক্ষা করছে। কীভাবে পৌঁছেছে সেটা জানা নেই। তবে কী হবে সেটা জানা আছে।

অ্যাবসারড। ইম্পসিবল। হতেই পারে না—বিশ্বজিৎদা উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে।

অনিলিখাদি উঠে দাঁড়াল। যেতে যেতে বলে উঠল, এজন্যই এ ঘটনার শেষ অংশটুকু বলতে চাইছিলাম না। আমি না, স্বয়ং নেপোলিয়ন বলেছেন, 'Impossible is a word to be found only in the dictionary of the fools.'



কঙ্গোর জঙ্গলে অনিলিখা

১২ জুলাই

আফ্রিকা? হঠাৎ আফ্রিকা কেন? কিছু বলে যাননি?

আসলে ফোন আসার দুদিন বাদেই উনি তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে গেলেন। প্রথমে বললেন ইংল্যান্ড যাবেন। পরে আবার বললেন আফ্রিকা যাবেন। এই গতকালই চিঠি এসেছে।

কোথা থেকে?

কঙ্গো।

কোন কঙ্গো গণেশ? ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক অফ কঙ্গো মানে ডি আর সি কঙ্গো নাকি কঙ্গো রিপাবলিক?

সে কী? কঙ্গো আবার দুটো আছে নাকি?

হ্যাঁ, খুব সম্ভবত আঠেরোশো সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত দুটোই কিংডম অফ কঙ্গোর অংশ ছিল। তারপর আলাদা হয়ে যায়। ডি আর সি কঙ্গো সাইজে কঙ্গো রিপাবলিকের প্রায় সাত গুণ বড়। ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক অফ কঙ্গোর রাজধানী কিনশাশা, অন্যদিকে কঙ্গো রিপাবলিকের রাজধানী ব্রাজাভিল। এই দুই রাজধানীর মধ্যে দূরত্ব খুবই কম। চিঠিতে কোনো শহরের নাম দেখেছ? নাম বললে বলে দিতে পারব উনি কোন কঙ্গোতে আছেন।

সেটা খেয়াল করিনি। শুধু জানি নানান শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। হয়তো চিঠিগুলো ভালো করে পড়লে বোঝা যাবে।

মিস্টার পাই কি তোমাকে নিয়ম করে চিঠি লিখছেন নাকি?

না, না। নিজেকে। এই বাড়ির ঠিকানায়।

মিস্টার পাই লোকটা যে পাগলাটে এ নিয়ে অনিলিখার কোনও সন্দেহ নেই। তবে শেষমেশ নিজেকে নিজের চিঠি।

মানে?

আসলে আপনি তো জানেন উনি ডায়েরি লেখা শুরু করেছেন গত চার বছর ধরে। এটা তারই অংশ। তবে ওনার খেয়াল তো জানেনই। কালি কলমে লিখতে ভালোবাসেন। কোনও নির্দিষ্ট ডায়েরিতে না লিখে রোজ প্যাডের সাদা পাতায় লেখেন। বলেন এসব ডায়েরি কারো হাতে গেলে মুশকিল। এর থেকে

কয়েকটা পাতা হারালেও কোনও সমস্যা হবে না। আর আমাকে দায়িত্ব দিয়েছেন পর পর দিন অনুযায়ী সেগুলো গুছিয়ে রাখতে। এখন বাইরে থেকেও মাঝে মধ্যে সেগুলোই পাঠাচ্ছেন।

তুমি কী লেখাগুলো পড়েছ?

না, না। আমাকে উনি পড়তে বলেননি। বলতে পারেন অনুমতি দেননি। আমি শুধু ফাইলে গুছিয়ে রেখেছি। তবে আপনি পড়লে উনি আপত্তি করবেন না।

অনিলিখা মনে মনে হাসল। টিপিকাল গণেশ। ঠিক যেটুকু বলা হবে, তার বাইরে কিছু করবে না।

হুম, আবারও সেই একই প্রশ্ন করছি, কী জন্য হঠাৎ করে আফ্রিকা গেলেন, সে বিষয়ে কিছু জানো?

না, তেমন কিছু...ও হ্যাঁ, আপনি কি ডেভিড অ্যান্সনকে চেনেন? ওনার বহুদিনের বন্ধু। খুব নামকরা জুওলজিস্ট। ডেভিডের ফোন এল। ফোন রাখার কিছুক্ষণ বাদেই বললেন আফ্রিকা যাচ্ছেন। তার দিন দশেকের মধ্যে টিকিট, ভিসা এসব করে বেরিয়ে পড়লেন। ঠিক কী কারণে এরকম তাড়াহুড়ো করলেন, সেটা অবশ্য আমি জানি না।

আমার মনে হয়, তোমার ওই লেখাগুলো পড়ে দেখা উচিত। উনি তোমাকে যথেষ্ট বিশ্বাস করেন। হয়তো তোমার জানাও দরকার। কোথায় গেছেন, কী করছেন এসব কিছু লেখা থাকতে পারে। আমি গেলে অবশ্যই পড়ে দেখব।

আচ্ছা। আপনি কি কাল আসছেন?

না, আমি আর তাহলে এখন এসে কী করব। উনি আগে ফিরে আসুন। তারপর না হয় যাব।

ঠিক আছে। ছাড়ছি।

গণেশ মিস্টার পাই-এর আপ্তসহায়ক। একজন খামখেয়ালি বিজ্ঞানীর উপযুক্ত সহায়ক। মিস্টার পাই-এর কল্যাণগড়ের ল্যাবে বিভিন্ন কাজে যেমন সাহায্য করে, তেমনই বাজার করা থেকে শুরু করে বাইরের সমস্ত কাজে সবার সঙ্গে যোগাযোগ রাখার কাজটাও গণেশই করে। যদিও সেটা যোগাযোগ রাখার থেকে মিস্টার পাইকে সবার থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন রাখার কাজ বলাই ভালো।

অনিলিখা ছাড়া বেশিরভাগ লোকেরই মিস্টার পাই অব্দি পৌঁছনোর একমাত্র উপায় হল গণেশ।

প্রায় দেড় মাস আগে মিস্টার পাই-এর কল্যাণগড়ের বাড়িতে শেষ গিয়েছিল অনিলিখা। তারপরে সেভাবে কথাও হয়নি। এর মধ্যে অনিলিখাকেও অফিসের কাজে ইউরোপ যেতে হয়েছিল।

মিস্টার পাই-এর বেশিরভাগ কাজই খুব আনকনভেনশনাল। অনেক বিষয়েই উনি বিশ্বের সেরা বিজ্ঞানীদের থেকে এগিয়ে আছেন। তবে কিছু ক্ষেত্রে এমন সব টপিক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন যে সেগুলো নিয়ে আদৌ রিসার্চ করার প্রয়োজন আছে বলে অনিলিখারও মনে হয় না।

দেড় মাস আগেও মিস্টার পাই এরকমই একটা বিষয় নিয়ে রিসার্চ করছিলেন।

আচ্ছা, অনিলিখা একটা মানুষ গড়ে কতটা সময় সোশ্যাল নেটওয়ার্কে থাকে, জানো?

না, ঠিক জানি না। তবে শুনেছি বিশ্বের ষাট শতাংশ মানুষ নাকি এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় আছে। গড়ে তারা প্রায় আড়াই ঘণ্টা সোশ্যাল মিডিয়ায় থাকে।

নাহ্, তুমি যে সোশ্যাল নেটওয়ার্ক বলছ, তার বাইরেও তো আমাদের সবার একটা সোশ্যাল নেটওয়ার্ক বা সামাজিক যোগাযোগ থাকেই, যেখানে আমরা একজন আরেকজনের সঙ্গে মিশি, পাশে বসে গল্প করি। এটা তো মানব সভ্যতার শুরু থেকেই চলে আসছে। যাকে বলে স্রেফ আড্ডা। সেটার অবশ্য কোনও হিসেব পাওয়া মুশকিল।

আপনার নিজের তো সোশ্যাল মিডিয়ায় কোনওরকম উপস্থিতিই নেই। আড্ডাও মারেন না তেমন। আপনি হঠাৎ এমন একটা বিষয়ে আগ্রহী হয়ে উঠলেন?

মিস্টার পাই-এর মুখে একটা মুচকি হাসি ফুটে উঠল।

ঠিকই বলেছ, আমি মানুষের সোশ্যাল নেটওয়ার্কে আগ্রহী নই। বেশিরভাগটাই সময় নষ্ট। কিন্তু গাছেদের সোশ্যাল নেটওয়ার্কের কথাটা কখনও ভেবে দেখেছ? আমি ওই বিষয়টাতে বিশেষ আগ্রহী।

মানে? গাছেদের মধ্যে যোগাযোগ? আপনি কি সেই ব্যাপারে কিছু ভাবছেন নাকি?

হ্যাঁ, ঠিক তাই। শুধু ভাবছি না, সেটা যে কিছু গাছের মধ্যে আছে, তার প্রমাণও পেয়েছি।

এ তো দারুণ ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। কীভাবে প্রমাণ পেলেন?

বলছি। তবে এই ক্ষমতা যে সব প্রজাতির গাছে সমানভাবে থাকে, তা কিন্তু নয়। কিছু কিছু গাছের মধ্যে বেশি থাকে। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মাধ্যমে অর্থাৎ CRISPR টেকনিক-এর মাধ্যমে এই ক্ষমতা গাছেদের মধ্যে অনেক গুণ বাড়ানো যায়। CRISPR টেকনিক কী জানো তো?

হ্যাঁ, ওই তো ২০১২-তে জেনিফার ডোডনা যেটা আবিষ্কার করেছিলেন— একটা খারাপ ভাইরাসের ডি এন এ কাটতে গিয়ে। জিন এডিটিং আগে সম্ভব

হত। কিন্তু পদ্ধতিটা ছিল অত্যন্ত জটিল ও সময়সাপেক্ষ। উনি দেখলেন যে এই CRISPR টেকনিক বা টুল যাই বলি না কেন সেটা ঠিকভাবে প্রোগ্রাম করলে তার মাধ্যমে যে-কোনও ডি এন এ সিকোয়েন্সে পরিবর্তন আনা যায়, যে-কোনও জীবিত প্রাণীতে আনা যায়, এমনকী মানুষের ক্ষেত্রেও।

এক্সাক্টলি!

কিন্তু তাতে লাভ?

কেন মানুষ দলবদ্ধ হতে পারে, ওরা হলেই মুশকিল! ধরো, তুমি কোনও কেমিক্যাল ব্যবহার করলে যা কোনও একটা গাছের ক্ষতি করবে। অথবা এমন পোকা কোনও একটা গাছে ধরল, যা সেই গাছের ক্ষতি করছে। তখন সেই গাছ তার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে আশেপাশের অন্য গাছেদের জানায়। আমরা এখনও সেটার খবর পাইনি, এই যা।

কীভাবে?

মূলত শিকড়ের মাধ্যমে ওরা যোগাযোগ রাখে। তারপরে তারা একযোগে দলবদ্ধভাবে এমন কোনও কেমিক্যাল বের করতে পারে, যা সেই পোকাদের মারতেও পারে। তাছাড়া মধুর লোভ দেখিয়ে মৌমাছি বা বোলতা ডেকে আনতে পারে—যারা গাছের গায়ে লেগে থাকা পোকাগুলোর পক্ষে ক্ষতিকর। তাতে মৌমাছি ও গাছ—দু'পক্ষেরই সুবিধে হয়। এরকম কিছু গাছের সন্ধান ইতিমধ্যে পাওয়া গেছে।

হ্যাঁ, এবারে মনে পড়ছে। আমিও এরকম কিছু পড়েছিলাম কয়েকটা রিসেন্ট রিসার্চপেপারে। কিন্তু এভাবে যে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ করে একটা গাছ আরেকটা গাছকে কোনও তথ্য জানাতে পারে, তা ঠিক জানতাম না।

হ্যাঁ, সেটা আমরা এখনও পুরোপুরি বুঝিনি। আসলে এসব বিষয়ে রিসার্চ করার মতো প্রতিভা কম। সেই যোগাযোগ ক্ষমতাটা আবার অনেক গুণ বাড়িয়ে দেওয়া যায় জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মাধ্যমে। সেটাই আমার এখনকার গবেষণার বিষয়। একই সঙ্গে দেখছি আমি নিজেও কোনওভাবে সেই গাছেদের নেটওয়ার্কে ঢুকতে পারি কিনা। ভাবতে পারছ কী হতে পারে তাতে! আমি অনেক গাছের সঙ্গে একসঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারব, তারাও আমার মনের ভাব বুঝতে পারবে।

এ তো দারুণ ব্যাপার! কিছু নিশ্চয়ই পেয়েছেন?

হ্যাঁ, কিছুটা বলতে পারো। তবে এখনও অনেক কাজ বাকি।

আরও বেশ কিছু কথা হয়েছিল মিস্টার পাই-এর সঙ্গে সেদিন। গাছ নিয়ে মিস্টার পাই-এর পরীক্ষা-নিরীক্ষা তখন অবশ্য প্রাথমিক পর্যায়ে ছিল।

তার পরবর্তী কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্যেই কি মিস্টার পাই আফ্রিকায়

গেলেন? কোনও মেজর ব্রেক থ্রু পেয়েছেন?

হতেও পারে। কারণ কঙ্গোর জঙ্গলে হাজারেরও বেশি বিভিন্ন প্রজাতির গাছ আছে, যা খুব কম জায়গাতেই পাওয়া সম্ভব। খুব ইন্টারেস্টিং কোনও ব্যাপার না হলে উনি এরকম একটা গবেষণার মধ্যে হঠাৎ করে আফ্রিকা যেতেন না।

২

সেদিন সন্ধেবেলায় মিস্টার পাই-এর একটা মেল পেল অনিলিখা।

অনিলিখা,

আশা করি তুমি ভালো আছ। জানো কিনা জানি না, আমাকে হঠাৎ করে কঙ্গো চলে আসতে হয়েছে। তুমি নিশ্চয়ই প্রফেসর ডেভিড অ্যান্সনের নাম শুনেছ। ওঁর মতো নামী প্রাণীবিদ সারাবিশ্বে খুব কম আছে। ওঁরই অনুরোধে আমার এখানে আসা।

গত একমাস ধরে ওর সঙ্গে ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক অফ কঙ্গোর নানান শহরে, কঙ্গোর নানান প্রত্যন্ত প্রান্তে ঘুরেছি। বেশির ভাগটাই জলপথে।

কিছু জায়গায় যেখানে কঙ্গো জলপথে দুরতিক্রম্য, সেখানে ফ্লাইট নিতে হয়েছে। কী অসাধারণ যে এই দেশ তা বলে বোঝানো যাবে না। অত্যন্ত ধনী দেশ হওয়ার সব রকমের সম্ভাবনা ছিল এই দেশের। কিন্তু নৈরাজ্যের কারণে সাধারণ মানুষ যে কতটা গরীব হতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। আমাজনের পরে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম রেনফরেস্ট হিসেবে কঙ্গোর জঙ্গলের গুরুত্ব কতটা তা তুমি নিশ্চয়ই জানো। আমাজনের বাইরে এরকম প্রাণী বৈচিত্র্য আর কোথাও আছে কিনা জানি না।

নিশ্চয়ই ভাবছ, এখানে হঠাৎ করে কেন এলাম। সেটা আপাতত রহস্যই থাকুক। হয়তো কিছুদিন বাদে তুমি নিজেও জানতে পারবে। তুমি এলে নিজে সে রহস্যের অনুসন্ধানে অংশগ্রহণও করতে পারবে।

এটুকু বলতে পারি তুমি বিশ্বজুড়ে যতই রোমহর্ষক অভিযানে গিয়ে থাকো না কেন, আমার মনে হয় না এই অভিযান তার কোনওটার থেকে কম কিছু হবে। সেরকম সম্ভাবনা দেখেছি। এখনও অব্দি আমরা কিছুই বুঝে উঠতে পারিনি। তুমি এলে আমাদের কাজ অনেক সহজ হয়ে যেত।

এখানে এখন আছি আমাদের এক কমনফ্রেন্ড বিখ্যাত বিজ্ঞানী আরনেস্ট সলভে-র বাড়িতে। সবে কিছুদিন এসেছি। আরনেস্টও তোমাকে দেখতে চায়। অনেক কথা শুনেছে তোমার।

তুমি কনফার্ম করলে তোমার ভিসার জন্য ইনভিটেশন লেটার আগামীকালের মধ্যে পাঠিয়ে দেব। তুমি শুধু আসতে পারবে কিনা জানিয়ে দাও। দশ দিনের জন্যে এলেই হবে। এই সুযোগ হারাবে না আশা করি।

ভালো থেকো।

'ধন্যবাদান্তে'
মিস্টার পাই

দুই বিজ্ঞানীর নামই অনিলিখার কাছে পরিচিত। ডেভিড অ্যাক্সন বিখ্যাত ব্রিটিশ প্রাণীবিদ। আরনেস্ট সলভে আরও বেশি পরিচিত। কারণ কম্পিউটার সায়েন্সের বেশ কিছু ক্ষেত্রে, এমনকী মেশিন লার্নিং-এর ক্ষেত্রে অসাধারণ কাজ করেছেন। উনি ওখানে বসে কী করছেন, কে জানে?

ইমেল দেখে বোঝার উপায় নেই, মিস্টার পাই ঠিক কোথায় আছেন।

কঙ্গো বেশ বড় দেশ। বিশ্বের মধ্যে সবথেকে বড় দেশগুলোর মধ্যে বিচারে সারা বিশ্বে একাদশ স্থানে। কঙ্গোর ষাট শতাংশ জায়গা জুড়ে গভীর বনাঞ্চল। সাভানা তৃণভূমিও আছে। আছে উত্তর পূর্ব প্রান্তে বিশাল রুয়েনজরি পর্বতশ্রেণী। এত দিন ধরে নদী পথে ঘুরছেন। এখন প্রশ্ন হল মিস্টার পাই কি কঙ্গোর পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে যাচ্ছেন, নাকি তার উল্টো।

কঙ্গোর রাজধানী কিনশাশা পশ্চিমদিকে, অতলান্তিক মহাসাগরের থেকে খুব দূরে নয়। সেখানে একটা ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট আছে। ভারত থেকে সেখানে যাওয়া সহজ। তবে কঙ্গোতে আরও বেশ কিছু এয়ারপোর্ট আছে। পূর্ব প্রান্তে যেমন আছে গোমা ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট। যেখানেই থাকুন, উনি যে গভীর জঙ্গলের কাছাকাছি আছেন, সেটা নিশ্চিত।

ঠিকই বলেছেন মিস্টার পাই। কঙ্গো সবথেকে ধনী দেশগুলোর মধ্যে একটা হয়ে উঠতে পারত। কঙ্গোতে বিশ্বের সর্বাধিক কপার ও কোবাল্টের সঞ্চয় আছে। কোবাল্ট-এর মূল্য আগে কেউ বোঝেনি। কিন্তু ইলেক্ট্রিক গাড়ির ব্যাটারির জন্য ও ফোনের লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারির কল্যাণে কোবাল্ট এখন অত্যন্ত মূল্যবান আকরিক। সারা বিশ্বের ষাট শতাংশ কোবাল্ট উৎপাদন হয় কঙ্গোতে। চীন-এর প্রচুর ইনভেস্টমেন্টও আছে কঙ্গোতে।

এই মুহূর্তে অনিলিখার কাজের চাপ আছে। কিন্তু এভাবে কঙ্গো যাওয়ার সুযোগ বারবার আসবে না। হাতি, সিংহ, লেপার্ড, গরিলা, ওকাপি, শিম্পাঞ্জি,

হিপো থেকে এমন অজস্র বন্য জন্তু কঙ্গোতে ছড়িয়ে আছে, যা অন্য কোথাও সহজে পাওয়া যায় না। তাছাড়া মিস্টার পাই যখন পার্সোনালি যেতে অনুরোধ করছেন ব্যাপারটা যে খুব ইন্টারেস্টিং কিছু হবে, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। এরকম একটা জটিল রহস্যের আকর্ষণ এড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব অনিলিখার পক্ষে।

অনিলিখা উত্তর দিতে সময় নিল না। জানালো যাবে, ভিসা পেলেই সঙ্গে সঙ্গে যাবে। কিন্তু কী ব্যাপারে এই জরুরি তলব, সেটা জানালে আরও ভালো হত।

অবশ্য অনিলিখা জানত তার প্রশ্নের উত্তরে মিস্টার পাই এখন আর কিছু বলবেন না। তবে সেটা জানার একটা উপায় আছে।

৩। ১৪ জুলাই

আজ শনিবারের আসরে এসে রাতুলই প্রথম বোমা ফাটালো। ও নাকি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে রিসার্চ করতে বেলজিয়ামের এক নামী ইউনিভার্সিটি থেকে সুযোগ পেয়েছে।

খবরটা সবার কাছে অবশ্যই আনন্দ সংবাদ। এরকম সুযোগ তো কলকাতায় বসে সবার কাছে আসে না। কিন্তু বিশ্বজিৎদা সেই আনন্দে যোগ না দিয়ে উল্টে গোল গোল চোখ করে চশমা টেবিলের উপরে নামিয়ে রেখে বলল, তার থেকে লোক খুন করতে পারতিস।

তারপর সবাইকে আরও চমকে দিয়ে বিশ্বজিৎদা উঠে দাঁড়িয়ে দু'দিকে ঘাড় নেড়ে নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল, বলি, এরকম বিষয় নিয়ে গবেষণা করার দুর্বুদ্ধি তোকে কে দিয়েছে? অনিলিখা?

সেই যে শুরু হল, তার পরে আরও আধ ঘণ্টা আমাদের শনিবারের আসরের মূল আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়ালো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা দু'পক্ষে ভাগ হয়ে গেলাম।

তন্ময় চিলচিৎকার জুড়েছে—আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স হল যত সব পুঁজিবাদী মানুষের অস্ত্র। সমাজে আরও বৈষম্য তৈরি করবে।

এর উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে প্রতীক—থাম, থাম, একদিকে চ্যাট জিপিটি থেকে কপি করে উত্তর লিখছিস, অন্যদিকে তাকেই গালাগাল দিচ্ছিস। একেই বলে হিপোক্রিসি।

আলোচনা যখন প্রায় হাতাহাতির পর্যায়ে পৌঁছেছে, সহেলীর মতো ঠান্ডা মাথার মেয়েও যখন উত্তেজিত হয়ে তর্ক করতে করতে ঘরের মধ্যে পায়চারি

করছে, বিশ্বজিৎদা সোফার উপরে দাঁড়িয়ে 'উই অল মাস্ট বয়কট এ আই অ্যাট এনি কস্ট' বলে ইংরাজিতে বলতে শুরু করেছে ও উত্তেজনায় প্রায় লাফাচ্ছে, তখন আমরা ঘরের বাইরে অনিলিখাদির চটি খোলার শব্দ পেলাম।

তার পরক্ষণেই গ্রীষ্মের দাবদাহের মাঝে হঠাৎ করে আসা এক মিষ্টি ঠান্ডা বাতাসের মতো অনিলিখাদি এসে ঘরে ঢুকল।

তারপরে আমাদের সবাইকে ভালো করে জরিপ করে ও ঘরের নানান জায়গায় তাণ্ডবের চিহ্ন দেখে মুচকি হেসে বলল, বাহ্, আজ তো আলোচনা সাংঘাতিক রকম জমে উঠেছে দেখছি।

প্রতীক অভিমানী সুরে বলল, তা, তুমি আজ হঠাৎ করে পথ ভুলে? আগের সপ্তাহে তোমাদের বাড়ি গিয়েছিলাম খোঁজ নিতে, মাসিমা বললেন তুমি নাকি স্পেনে গেছ।

হ্যাঁ, গত কয়েক মাস এমন ব্যস্ত হয়ে পড়েছি যে এখানে আর আসার সময় হয়ে ওঠেনি। তাই, ফিরেই চলে এলাম। গতকালই মাদ্রিদ থেকে ফিরেছি।

একটু থেমে কী ভেবে ফের বলল, তা তোদের তো বেশ আলোচনা চলছিল, আমাকে দেখে বন্ধ করলি কেন?

আচ্ছা, অনিলিখাদি তোমার কী মনে হয় না, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স শ্রমজীবী মানুষের সর্বনাশ ডেকে আনবে?

তন্ময় আজকাল কলেজে ওঠার পর থেকে বেশির ভাগ সময় বামপন্থী-মার্কসবাদ এসব নিয়ে পড়ে থাকে।

অনিলিখাদি মুচকি হেসে বলে, 'এ আই'-এর প্রভাব শুধু শ্রমজীবী মানুষ কেন, সবক্ষেত্রেই পড়বে। শুধু ওরকম ছোট পরিসরে তার বিচার করা উচিত নয়। এখনই যত ধরনের কাজ হয়, তার ষাট শতাংশ কাজে 'এ আই'-কে ব্যবহার করা যেতে পারে, আর আমার বিচারে সব মিলিয়ে ৩০ শতাংশ কাজ এখনই 'এ আই' পুরোপুরি করতে পারবে। তবে একই সঙ্গে 'এ আই' অন্য অনেক ধরনের কাজের সুযোগও তৈরি করবে যা আমাদের কর্মক্ষেত্রকে অনেক বাড়িয়ে দিতে পারে। তবে প্রশ্ন অন্য জায়গায়। 'এ আই' কি পুরো মানবসমাজকে বিপন্ন করতে পারে? হ্যাঁ, আমার মনে হয় সে সম্ভাবনা অবশ্যই আছে। কিন্তু কতটা জানি না।

বিশ্বজিৎদা উৎসাহিত হয়ে বলে উঠল, ঠিক তাই। আমি নিশ্চিত 'এ আই' পুরো মানবসমাজকে ধ্বংস করার জন্য যথেষ্ট। এ তো তোমারই বিষয়। আমার এক বন্ধু সেদিন আমাকে বলছিল এ বিষয়ে তোমার মতো জ্ঞান ও রিসার্চ নাকি সারা বিশ্বে খুব কম লোকেরই আছে। আমি তো তাকে বলেই দিলাম, তুমি যেটাতেই হাত দেবে, সেটা আমাদের সবার জন্য বিপদ বাড়াবে। আসলে তোমার

মতো লোকের জন্যেই আমরা আজ এই বিপদে।

আমরা ভেবেছিলাম অনিলিখাদি এর প্রবল প্রতিবাদ করবে। কিন্তু সেটা না করে খানিকটা যেন বিশ্বজিৎদার কথায় সায় দিল, হ্যাঁ, সব ভালোরই কিছু খারাপ দিক থাকে। মানব সভ্যতার উন্নতির জন্য, এই পৃথিবীকে বাসযোগ্য করে তোলায় জন্য, মানুষের ভালোর জন্য যেমন 'এ আই'-এর হাজারটা প্রয়োগ হতে পারে, ঠিক তেমনই 'এ আই' মানবসভ্যতার জন্য বিপর্যয়ও ডেকে আনতে পারে। ফিউশন পাওয়ার, গাড়ি, নতুন ওষুধ আবিষ্কার করতে, জেনেটিক অসুখ দূর করতে এমনকী গ্লোবাল ওয়ার্মিং কমানোর মতো অজস্র ভালো কাজে যেমন 'এ আই'কে ব্যবহার করা যায়, ঠিক তেমনই বায়োকেমিক্যাল ওয়েপন থেকে মিথ্যে খবরের মাধ্যমে সাধারণকে বিভ্রান্ত করার কাজেও 'এ আই'কে ব্যবহার করা যায়। এখানে আরেকটা সমস্যা হল এই মেশিন লারনিং-এর মাধ্যমে যেভাবে 'এ আই' কোনও সমস্যার সমাধান বার করে, সেটা আমাদের কাছে হল ব্ল্যাক বক্স। আমরা ডিটেলে সেই সমাধান সূত্র বুঝব না। কোনও সমাধানের জন্য 'এ আই'-এর যে ফাউন্ডেশন মডেল ব্যবহৃত হল, সেটা আরও নানান কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। সেখানে একটা বড় রিস্ক থাকে।

আমরা সবাই যে ব্যাপারটা বুঝিনি, সেটা বুঝেই অনিলিখাদি বলে চলল, একটা একজাম্পেল দিই। ধরো 'এ আই'কে বলা হল এমন কিছু করতে হবে যাতে পৃথিবীতে গরুর সংখ্যা সব থেকে বেশি হয়। এবারে তার জন্য তথ্য, ডেটা ট্রেন্ড এসব থেকে 'এ আই' মনে করতেই পারে যে মানুষের সংখ্যা কমানোর দরকার। কীভাবে 'এ আই' ভাবছে, সমস্যার সমাধান করছে, সেটা জানা না থাকায় কিছুটা বিপর্যয়ের সম্ভাবনা তো থাকবেই। একে বলা হয় 'Alignment Problem'। সেরকম সমস্যা হতেই পারে যেখানে স্রষ্টা যে টার্গেট 'এ আই' কে দিয়েছে, বা যা চাইছে, তার থেকে 'এ আই' একই জিনিস পাওয়ার জন্য সম্পূর্ণ অন্য কিছু করতে পারে যা স্রষ্টা কখনই চায়নি।

হ্যাঁ, শুনেছি 'এ আই' যেমন মলিকিউলার সিমুলেশনের মাধ্যমে নতুন ভালো ড্রাগ আবিষ্কারে সাহায্য করতে পারে, ঠিক তেমনই সেই একই 'এ আই'-এর ফাউন্ডেশন মডেল খারাপ লোকের হাতে পড়লে তারা সেটা ব্যবহার করে ক্ষতিকর বায়োলজিকাল ওয়েপনও তৈরি করতে পারে। রাতুল কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলে বলল।

কিন্তু কী দরকার এসবের? আমরা তো বেশ আছি। সাগ্নিক কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে উঠল।

অনিলিখাদি মাথা নেড়ে বলল, কিছু ক্ষেত্রে কোনও প্রযুক্তির আগ্রগতি থামিয়ে রাখা যায় না। এক্ষেত্রে বলা যায়—জিনি ইস আউট অফ দ্য বটল। বড়

রিস্ক হল যে এর পিছনে যে লার্জ ল্যাঙ্গোয়েজ মডেল কাজ করছে, যে-কেউ সেটাকে একটা জায়গা থেকে নিয়ে খুব সহজে আরও উন্নত করে নিজের ইচ্ছেমতো ব্যবহার করতে পারে। সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করা খুব শক্ত। আমরা বোধহয় এখন ঠিক সেই জায়গায় চলে এসেছি। আমি 'এ আই' নিয়ে কাজ না করতেই পারি, কিন্তু চীনে আরেকজন যে এটা নিয়ে কাজ করবে না, সেটা আমরা জানব কী করে? আচ্ছা, সেসব কথা থাক। আমি তোদের সঙ্গে যে জন্য দেখা করতে এলাম। আমি হয়তো খুব শিগগিরি আফ্রিকায় যাচ্ছি।

বলো কী।

হ্যাঁ, মিস্টার পাই ডেকে পাঠিয়েছেন। ডি আর সি কঙ্গোতে। জরুরি তলব।

ওরে বাবা, সেখানে তো আবার আফ্রিকার সব থেকে বড় রেন ফরেস্ট, তাই না?

হ্যাঁ, তা ছাড়া, কঙ্গোর মতো বিশাল নদীও কম হয়। নীলের পরে সবথেকে দীর্ঘ পথ কঙ্গোর। সেই নদী দিয়ে যাওয়ারও অভিজ্ঞতা হবে। সেন্ট্রাল আফ্রিকা আমার সেভাবে যাওয়া হয়নি। তবে পূর্ব কঙ্গোর বেশ কিছু জায়গা এখন বেশ ডেঞ্জারাস। নানান রকম অশান্তি চলছে।

আচ্ছা, কঙ্গোতে গরিলা পাওয়া যায় না?

হ্যাঁ, শুধু পাওয়া যায় না, ওখানে মাউন্টেন গরিলা ও লো-ল্যান্ড গরিলা দুটোই পাওয়া যায়।

সহেলীর জীবজন্তু নিয়ে খুব আগ্রহ। সে আবদার করে বলল, তুমি কিন্তু গরিলার ছবি নিও। আরেকটা কী যেন শিম্পাঞ্জির মতো জন্তু পাওয়া যায় ওখানে। কিন্তু ওদের সমাজব্যবস্থা খুব অন্য রকম।

বিশ্বজিৎদা গম্ভীর ভাবে বলল, ওরাংওটাং।

অনিলিখাদি একটু হেসে নিয়ে বলল, না, না, সেটা এখনও অব্দি সুমাত্রা ও বোরনিও ছেড়ে আফ্রিকা যায়নি। সহেলী, তোর তো এ ব্যাপারে ভালো পড়াশোনা আছে দেখছি। তুই যাদের কথা বলছিস সেটা হল বেনোবো। শিম্পাঞ্জি গোত্রের। তবে ওরা অনেক বেশি শান্ত। কঙ্গো নদীর উত্তর দিকে পাওয়া যায় শিম্পাঞ্জি, গরিলা। দক্ষিণ দিকে পাওয়া যায় বেনোবো। নদী এই সমাজকে এতটাই আলাদা করে রেখেছে যে অভিযোজন হয়েছে ভিন্নভাবে। শিম্পাঞ্জিদের টিকে থাকতে হয়েছে গরিলাদের সঙ্গে লড়াই করে। শিম্পাঞ্জিদের সমাজ যেমন মূলত পুরুষ শাসিত, বেনোবোরা ঠিক তার উল্টো। নারী শাসিত সমাজ। ওরা অনেক বেশি শান্তিপ্রিয়। ওরা শত্রুকেও বন্ধু করে নেয়।

ঠিক তাই, এজন্যেই মানবসমাজে নারী শাসিত সমাজ দরকার। তাহলে সমাজে শান্তি বাড়বে। সহেলী গর্বের সঙ্গে বলল।

ব্যাস, তারপরের আলোচনা আর কী কী নিয়ে হল, তা না বললেও হবে।

৪। ১৩ জুলাই

অনিলিখার সম্মতি জানানোর কয়েক ঘন্টার মধ্যেই আরেকটা ইমেইল এসেছে মিস্টার পাই-এর দিক থেকে। বলেছেন পূর্ব কঙ্গোর গোমা ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট অব্দি ফ্লাইটের টিকিট কাটতে। সেখান থেকে যেতে হবে মাম্বাসা শহরের দিকে। কীভাবে যেতে হবে, সেটাও বলে দিয়েছেন। মাম্বাসা শহরের একটা হোটেলের ঠিকানা পাঠিয়েছেন যেখান থেকে ওরা অনিলিখাকে নিয়ে যাবে।

ইমেলে একটা ফোন নাম্বার দেওয়া আছে। কিন্তু সেটাতে বেশ কয়েকবার ফোন করে কোনও উত্তর পেল না অনিলিখা। অন্য কেউ হলে এটা অস্বাভাবিক বলে ভাবত। কিন্তু মিস্টার পাই-এর ক্ষেত্রে এটাই স্বাভাবিক। দরকারি কিছুতে যুক্ত থাকলে ফোনই ধরবেন না।

ইমেলে আরনেস্ট সলভের তরফ থেকে একটা ইনভিটেশন লেটারও অ্যাটাচ করা আছে, যাতে দ্রুত ভিসা হয়ে যায়।

তবে যাওয়ার আগে কিছুটা কৌতূহল নিরসনের দরকার। তাই অনিলিখা পরের দিনই চলে গেল কল্যাণগড়ে। মিস্টার পাই-এর ডায়েরির লেখা পড়তে। সেখান থেকে যদি এই রহস্য সম্বন্ধে কিছুটা আন্দাজ করা যায়।

গণেশকে আগে থেকেই জানানো ছিল। একবার কলিংবেল বাজাতেই গণেশ দরজা খুলে হাজির। পরনে যথারীতি সাদা শার্ট আর লাল টাই। অনিলিখাকে নিয়ে এসে বসাল ড্রয়িং রুমে। তার পরে নিয়ে এল মিস্টার পাই-এর ডায়েরির ফাইলটা।

গণেশ সঙ্গে আরেকটা খাতা এনেছে। ডায়েরির কোন পাতা থেকে কোন পাতা অনিলিখা পড়ছে, সে বিষয়ে অনিলিখার একটা সাক্ষর রেখে দিল ওই খাতায়।

এই না হলে গণেশ।

৬ জুন। কল্যাণগড়

আজ সকাল থেকে মনটা খুব ভালো ছিল।

শেষ কয়েক সপ্তাহ দিনে দু-তিন ঘন্টার বেশি ঘুমোনোর সময়ও পাইনি।

আমাদের চারদিকে গাছ, অথচ আমরা এখনও আমাদের এই প্রতিবেশী সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানি না। উদ্ভিদবিদরা কিছুটা হলেও জানেন যে আমরা গাছেদের যতটা বুদ্ধিমান ভাবি, গাছেরা তার থেকে অনেক বেশি বুদ্ধিমান। তবে সবার বুদ্ধি যে একই ভাবে প্রকাশ পাবে, এমন তো নয়!

এই কয়েক সপ্তাহ আগেই অনিলিখার সঙ্গেও এ বিষয়ে কথা হচ্ছিল। দেখলাম ওর মতো মানুষও এই বিষয়ে পুরোটা ওয়াকিবহাল নয়। তবে সব গাছ যে একই রকম বুদ্ধিমান হবে, এমনটা অবশ্য নয়। CRISPR টেকনোলজির মাধ্যমে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর সাহায্যে গাছেদের মধ্যে নতুন কিছু ক্ষমতাও সৃষ্টি করা যায়। যদিও সেটা সমানভাবে সব গাছে কাজ করে না।

বেশ কয়েক প্রজাতির গাছ নিয়ে কাজ করে খুব একটা সাফল্য না পেয়ে শেষে গত কয়েক সপ্তাহ কাজ করছিলাম একটা 'ফিকাস রিলিজিওসা' বা পিপুল গাছের চারা নিয়ে। আমার উদ্দেশ্য ছিল কোনওভাবে কি একটা পিপুল গাছের মধ্যে এমন ক্ষমতা দেওয়া যায়, যাতে সেই গাছ আমার সঙ্গে কথা বলতে পারে। কোনও ভাবে কি তার মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে! একই সঙ্গে সেই গাছ কি তার আশেপাশের গাছের সঙ্গে ভাব বিনিময় করতে পারে?

গত কয়েকদিন ধরেই মনে হচ্ছিল এ ব্যাপারে কিছুটা সাফল্য আসছে। আমি ওর ভাষা যেন বুঝতে পারছিলাম। আর ও আমার ভাষা। এমনকী কোন কোন রঙ ওর পছন্দ, কী রকম শব্দ ওর পছন্দ। যেমন ধরা যাক, কাকের ডাক যে ওর বিশেষ পছন্দ, সেটা পর্যন্ত ও আমাকে জানাতে পারছিল। ও কোন কোন গাছ পছন্দ করে সেটাও আমি জানতে পারছিলাম। তুলসী গাছ যে ওর বিশেষ পছন্দ, সেটার প্রমাণ পেলাম, যখন দেখলাম কোথা থেকে জানি ওর চারদিকে তিনটে ছোট তুলসী গাছের চারা গজিয়েছে। এটা কী ভাবে ও করছে, সেটা বোঝার চেষ্টা করছিলাম। কাল সেটার উত্তর খুঁজে পেয়েছি।

ও অন্য অনেক গাছের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছে। এমনকী খুব সম্ভবত চড়ুইদের সঙ্গেও।

জিন এডিটিং-এর মাধ্যমে এই গাছের মধ্যে যে এভাবে অন্য গাছের সঙ্গে যোগাযোগ করার ক্ষমতা এতটা বাড়ানো যাবে, আমি ভাবতে পারিনি।

পরে মনে হল হবে নাই বা কেন? হিন্দু বা বৌদ্ধ ধর্মে এই পিপুল গাছকে দেবতা হিসেবে পুজো করা হয়েছে। আমি যদিও এসব বিষয় মানি না। তবে শুনেছি হিন্দু শাস্ত্রমতে কৃষ্ণের মৃত্যু এই গাছের নীচে হওয়ার পর থেকে কলি যুগের শুরু হয়। ব্রহ্মা নাকি এই গাছের শিকড়ে থাকেন, কাণ্ডে থাকেন বিষ্ণু, শিব থাকেন এ গাছের পাতায়।

বুদ্ধের সেই বোধিবৃক্ষও ছিল পিপুল গাছ। তাহলে কি এই গাছের সত্যি কিছু অসামান্য ক্ষমতা আছে যা মুনি ঋষিরা জানতেন?

তবে সেটা যাই হোক না কেন, এই গাছের মধ্যে যে ভাব বিনিময়ের ক্ষমতা অনেক গুণ বাড়ানো গেছে, সেটা এখন প্রমাণিত।

এরকম একটা বৈপ্লবিক আবিষ্কার অনেক কিছু পাল্টে দিতে পারে।

আমি দিনে দুবার ইমেল চেক করি। আজ দুপুরে খাওয়ার পর চেক করতে গিয়ে দেখি আমার অত্যন্ত প্রিয় প্রাণীবিদ বন্ধু ডেভিড অ্যান্সনের থেকে একটা ইমেইল এসেছে। শুধু যে এসেছে তাই নয়, তার সাবজেক্ট লাইন এমন যে পুরোটা না পড়ে থাকা যায় না।

'আর্জেন্ট। লেট আস ট্রাভেল টু কঙ্গো।'

ইমেইলটা পড়তে বিষয়টা বুঝলাম। কঙ্গোতে কিছু জায়গায় কিছু উপজাতির মানুষদের মৃত্যু হচ্ছে। বিশেষ করে পিগমিদের মধ্যে মৃত্যুর হার খুব বেশি। এটা খুব অস্বাভাবিক। পিগমিরা কঙ্গোর সবথেকে আদি অধিবাসী। প্রায় আশি হাজার বছর ধরে এরা কঙ্গোর গভীর জঙ্গলে বসবাস করে আসছে।

যখন কঙ্গো বেলজিয়াম সরকারের অধীনে ছিল সেই সময়ে অনেক পিগমি মারা যায়। তখন গাড়ির টায়ারের জন্য রাবার গাছের সাংঘাতিক চাহিদা। বেলজিয়ানরা রাবার গাছের সন্ধান পায় কঙ্গোতে। রাবার সংগ্রহের কাজে ওরা পিগমিদের ব্যবহার করে। সবথেকে বেশি হারে যাতে রাবার উৎপাদন হয় সেজন্য ওরা পিগমিদের উপর নির্মম অত্যাচার করতেও দ্বিধা করেনি। যতটা রাবার সংগ্রহ সম্ভব তার থেকে কম হলে হাত কেটে নিতেও দ্বিধা করত না বেলজিয়ান শাসকরা। যখন এই বিষয়টি সর্বসমক্ষে আসে, তখন সম্রাট দ্বিতীয় লিওপোল্ড এর সপক্ষে বলেছিলেন যে, তিনি নাকি এসব বন্য মানুষদের সভ্য করার চেষ্টা করছেন।

এই সভ্য করার নামে যে অত্যাচার ওরা করেছিল, তাতে প্রায় পনেরো লক্ষ পিগমি মারা যায়। তাই এখনও এখানকার সহজ সরল পিগমিরা 'সাদা আদমি'দের সহজে বিশ্বাস করে না।

সেরকম কিছু কি হচ্ছে আবার?

হতে পারে পিগমিরা যেখানে যেখানে বাসস্থান গড়ে তুলছে, সে সব জায়গায় নতুনভাবে কোবাল্ট বা কোনও দামি খনিজের সন্ধান পাওয়া গেছে। সেই কারণেই ওদের মৃত্যু হচ্ছে। এবং বন্য প্রাণীর আক্রমণ বলে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

কিন্তু নাহ, এখানে শুধু যে ওরা মরছে এমন নয়, আরও অন্য উপজাতির মানুষও মরছে। এছাড়া আরও অনেক জীবজন্তুর রহস্য মৃত্যুর খবর পাওয়া যাচ্ছে, যার মধ্যে সিংহের মতো শক্তিশালী প্রাণীও আছে, গরিলাও আছে। এসব কারণে ডেভিডকে কঙ্গো যেতে হবে। অন্তত তিন মাসের জন্য।

একবার বহু বছর আগে আমি যে কঙ্গোতে যাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ

করেছিলাম, সেটা ওর এখনও স্পষ্ট মনে আছে।

ইমেলটা দুবার পড়লাম। কাজের প্রেসার আছে, তবু এরকম যাওয়ার সুযোগ সত্যি ছাড়ার কোনও মানে হয় না। তাছাড়া এমন একটা রহস্য...

৮ জুন। কল্যাণগড়

যাওয়া মনস্থ করে ফেলেছি। ডেভিডকে জানিয়েও দিয়েছি। ভিসার অপেক্ষায় আছি।

ঠিক করেছি সঙ্গে আমার পিপুল গাছটাকে নিয়ে যাব। নিশ্চিতভাবে বলতে পারি এরকম আশ্চর্য গাছ ডেভিড ইতিপূর্বে দেখেনি।

কঙ্গো নিয়ে কিছুটা পড়াশুনা করে নিলাম। তিনশোর মতো উপজাতি এখানে আছে। ফ্রেঞ্চের বাইরে চারটে সরকারি স্বীকৃত ভাষা। কিকাঙ্গো, লিঙ্গালা, সোওয়াহিলি ও চিলুবা। এর মধ্যে সোওয়াহিলি ভাষার কথা আগেই জানতাম। ১৯৬০ অব্দি কঙ্গো বেলজিয়াম সরকারের অধীনে ছিল। এখনও তাই অনেকেই ফ্রেঞ্চ জানে। আশা করি আমার কথা বলতে বিশেষ অসুবিধে হবে না।

আমাকে যেতে হবে প্রথমে কিনশাশা। ওখানেই ডেভিড আমার জন্যে অপেক্ষা করবে। তারপরে আমরা একসঙ্গে কঙ্গোর বিভিন্ন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে রহস্যের অনুসন্ধান করব।

অনিলিখাকে সঙ্গী হিসেবে পেলে খুব ভালো হত। তবে এই অভিযানে ওকে এখনই ডাকা ঠিক হবে না। ওখানে গিয়ে দরকার বুঝে ওকে ডাকা যাবে।

১৬ জুন। কিনশাশা, কঙ্গো, সন্ধে ছ'টা

গতকাল রাতে কলকাতা-দিল্লি, দিল্লি-হিথরো, হিথরো-কিনশাশা হয়ে কঙ্গোয় পা দিয়েছি। কিনশাশা কলকাতার থেকে খুব আলাদা কিছু নয়। একই রকম বিশৃঙ্খলা, একই রকম ধনী-দরিদ্র বৈষম্য।

শুধু একটা জিনিস চোখে পড়ার মতো। তা হল চীনের ইনভেস্টমেন্ট। রাস্তা থেকে ব্যবসা সবেতে চিনের ইনভেস্টমেন্ট, চীনের উপস্থিতি দেখার মতো। মনে হয় পুরো কঙ্গোকে আগামী দিনে চীন তার একটা উপনিবেশ হিসেবে গড়ে তুলবে।

হিলটন কিনশাশা হোটেলে লাঞ্চে ডেভিডের সঙ্গে দেখা হল। খেতে খেতে

অনেক কথা হল।

যা বুঝলাম, তা হল বিভিন্ন উপজাতির প্রায় দুহাজার জনের মৃত্যু হয়েছে। তার মধ্যে বান্টু উপজাতির মৃতের সংখ্যা প্রায় তিনশো। কিন্তু পিগমিদের মধ্যেই প্রায় দেড় হাজার মারা গেছে।

এখন মাত্র ছয় লাখ পিগমি আছে ডি আর সি কঙ্গোতে। জঙ্গলকে এদের থেকে ভালো কেউ চেনে না। কিন্তু হঠাৎ কী হল যে এরা এত দ্রুতহারে বন্য জন্তুর হাতে আক্রান্ত হচ্ছে। একই সঙ্গে বেশ কিছু সিংহ, গরিলা, হাতি, হিপোও মারা গেছে। এমন শক্তিশালী জন্তুরাই বা মারা যাচ্ছে কী করে?

এ বিষয়ে অহেতুক যাতে কোনও প্যানিক সৃষ্টি না হয়, সেজন্য সরকার সব রকম গোপনীয়তা অবলম্বন করেছে। এমনকী মৃতদের কোনও ছবি তোলা ও অন্য কাউকে সেটা পাঠানো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ডেভিডকেও সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে যাতে এ বিষয়ে কোনও খবর অন্য কেউ জানতে না পারে।

আমাজনের জঙ্গল যেভাবে দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছে, সেই হারে না হলেও কঙ্গোর জঙ্গলেও প্রায় একইরকম সমস্যা শুরু হয়েছে। জঙ্গল হারিয়ে যাচ্ছে।

কঙ্গোতে অবশ্য এর পিছনের কারণটা একটু অন্যরকম। দেশের একটা বড় অংশ খুব গরীব। তাদের বেশিরভাগের রান্না হয় কাঠ বা কাঠকয়লা দিয়ে। এছাড়া এদের বেশিরভাগ চাষবাসের উপরে নির্ভরশীল। তাই জঙ্গল দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে চাষজমিতে। এখন অবশ্য একটা বড় অংশের মানুষ রোজগারের আশায় চাষবাসের কাজ ছেড়ে শহরগুলোতে চলে যাচ্ছে, মূলত খনি ও ফ্যাক্টরিতে কাজ করার জন্য।

বহু বছর ধরে ডি আর সি কঙ্গোতে, বিশেষ করে পূর্ব কঙ্গোতে, সিভিল ওয়ার চলেছে। এখন সব আপাতত ঠিক থাকলেও এরকম কিছু উপজাতি মৃত্যুতে আবার বড় রকম সামাজিক অস্থিরতা শুরু হতে পারে। এমনিতেও কঙ্গো বেসিনের যেদিকে মৃত্যু বেশি হচ্ছে, সেই দিকে পিগমিদের প্রতিবেশী দেশ হল উগান্ডা ও রোয়ান্ডা। উগান্ডার সঙ্গে ডি আর সি কঙ্গোর সম্পর্ক বহু দিন থেকেই ভালো নয়। ওদের মদতে নানান মিলিট্যান্ট বিদ্রোহীদের গ্রুপ উত্তর পূর্ব কঙ্গোতে হত্যা, অপহরণ, চোরাচালান—সবরকম কাজ চালিয়ে যায়। এসব হত্যার পিছনে তাদের হাত নেই তো?

কফিতে সিপ নিয়ে ডেভিড বলল, মোকেলে বেম্বের কথা শুনেছ?

আমি হেসে উঠলাম। বললাম, তুমি কি প্রাণীবিদ হয়ে শেষে এইসব উপকথায় বিশ্বাস করছ নাকি?

এখানে একটু মোকেলে বেম্বের কথা বলে নিই। এর অর্থ—যে প্রাণী

নদীর জলস্রোত বন্ধ করে দেয়।

জঙ্গলের আদি অধিবাসীদের গল্পে-উপকথায় বহুবার এই প্রাণীর উল্লেখ পাওয়া যায়।

অর্ধেক ডাইনোসর, অর্ধেক হাতির মতো দেখতে একটা জীব। লম্বা গলা। লেজটা কুমিরের মতো। অসম্ভব শক্তিশালী। মাথাটা সে তুলনায় বেশ ছোট।

তারপর বললাম, কিন্তু এত বছর পরে কি আর সেরকম কোনও প্রাণী থাকতে পারে?

ডেভিড বলল, কঙ্গোর জঙ্গল হল রিয়াল লাইফ জুরাসিক পার্ক। এখানে যত ধরনের প্রাণী আছে তার হয়তো দশ শতাংশের সঙ্গে আমাদের এতদিনে পরিচিতি গড়ে উঠেছে, কারণ আমরা কঙ্গোর জঙ্গলের মাত্র দশ শতাংশ অংশে এ পর্যন্ত গিয়েছি। বাকি নব্বই শতাংশ জায়গায় যে কী প্রাণী আছে, সেটা আমাদের কাছে সম্পূর্ণ রহস্য। তুমি হয়তো শুনলে অবাক হবে, কিন্তু এখানকার কোনও দুর্ভেদ্য জঙ্গলে মোকেলে বেম্বের মতো কোনও জীব থাকলে আমি অবাক হব না।

এত দুর্গম জঙ্গল, অশান্ত এলাকা, ঘন বন, উপযুক্ত রাস্তার অভাব পেরিয়ে লোকে কঙ্গোর কতটুকুই বা দেখেছে। কিছুই না। অনেকবার মোকেলে বেম্বের ফুট প্রিন্ট পাওয়া গেছে। ব্রন্টোসরাসের মতো ডাইনোসরদের সঙ্গে মিল আছে ওই প্রাণীর। গবেষক রয় ম্যাকা এর ফুটপ্রিন্টও পেয়েছিল ১৯৮৭ সালে। এখানকার কিছু ব্যামবুটি উপজাতির লোক এদের সঙ্গে হিপোর মারপিটও দেখেছে। গত কুড়ি বছরে বহু অভিযান হয়েছে এই প্রাণীর সন্ধানে। কে জানে সেরকমই কোনও প্রাণী আছে কি না এসব হত্যার পিছনে? বলা যায় না, যেভাবে জঙ্গল কমে আসছে, তাই হয়তো ওরা জনপদের কাছে চলে আসেছে।

বিকেলে আমি ও ডেভিড একটু শহর দেখতে বেরিয়েছিলাম। কয়েকটা জিনিস বলার মতো। এখানকার মহিলারা যেরকম রঙচঙে পোশাক পরে, তাতে তারা আমার প্রতিবেশী অবিনাশবাবুকেও হারাবে। সামান্যতম সুযোগ পেলেই এখানকার মানুষজন যেভাবে নাচতে শুরু করে দেয়, তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। রাস্তায় বেশ অন্যরকম এক সাইকেল দেখলাম। চিকুডু বাইসাইকেল। একটু বেশি লম্বা চওড়া। ইচ্ছে ছিল চড়ার। ডেভিডের প্রবল আপত্তিতে চড়া হল না। আমাদের কল্যাণগড়ের ভ্যানে চড়লে কী বলত কে জানে!

বেশ কয়েকটা জায়গায় হেনরি স্ট্যানলির স্ট্যাচু চোখে পড়ল। এই বেলজিয়ান অভিযাত্রীর জন্যেই কঙ্গো পশ্চিমী দুনিয়ার সামনে আসে। স্ট্যানলির সাহায্যে বেলজিয়ান সম্রাট দ্বিতীয় লিওপোল্ড বিভিন্ন উপজাতির স্থানীয় নেতাদের কাছ থেকে সামান্য অর্থের বিনিময়ে পুরো কঙ্গোকে তার সাম্রাজ্যের অংশ করে

নিয়েছিল। কঙ্গো থেকে ইউরোপের সভ্য সমাজে নিয়ে আসা হত হাতির দাঁত ও ক্রীতদাস। তাতেও লাভ কম হত না।

ও আরেকটা কথা এখানে লিখে রাখি।

আরনেস্ট সলভের সঙ্গে আমাদের দুজনেরই বহুদিনের আলাপ। আরনেস্ট সলভের মতো প্রতিভাবান সায়েন্টিস্ট খুব কম দেখেছি। ডেভিড প্রায়শই বলে যে এখনকার বিজ্ঞানের স্পেশালাইজেশনের যুগে শুধু আমি আর আরনেস্ট নাকি একমাত্র বিজ্ঞানী, যাদের কাজ নানাক্ষেত্রে ছড়িয়ে আছে।

কথাটা সত্যি। কয়েক বছর আগে শুনেছিলাম আরনেস্ট কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে কিছু অসামান্য কাজ করছে। তার পরে শুনলাম গ্লোবাল ওয়ার্মিং কমানোর জন্যে কীভাবে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ব্যবহার করা যায় তা নিয়ে গবেষণা করছে। এই কয়েক মাস আগে আবার অন্য একটা গবেষণায় ওঁর নাম দেখলাম। নিউ সায়েন্টিস্ট ম্যাগাজিনে পড়লাম আরনেস্ট নাকি CRISPR-এর সাহায্যে জিন এডিটিং করার জন্যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সকে কীভাবে ব্যবহার করা যায় তা নিয়ে বেশ কিছু গ্রাউন্ড ব্রেকিং রিসার্চ করছে।

আমার সঙ্গে দেখা হলে এই পিপুল গাছটাকে দেখাব। ও হয়তো জানেও যে আমার এই বিষয়ে অনেক রিসার্চ আছে।

আরনেস্ট আছে পূর্ব কঙ্গোর এক প্রত্যন্ত গ্রামে। সেখানে থেকেই গত কয়েকবছর ধরে গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর উপরে কাজ করছে।

ডেভিডের সঙ্গে আরনেস্টের কথা হয়ে গেছে। আমাদের ও ইনভাইট করেছে। আমরা ঠিক করেছি, যখন ইতুরি জঙ্গলের দিকে যাব, তখন ওর বাড়িতে গিয়ে কয়েকদিন থাকব। ওর সঙ্গে এসব বিষয় নিয়ে অনেক আলোচনা করা যাবে।

কিনশাশায় পরবর্তী কয়েকদিনে আমাদের কাজ হবে কঙ্গোর কোথায় কোথায় কী কী ঘটনা ঘটেছে, সেসব খতিয়ে দেখা ও সেই অনুযায়ী প্ল্যান করা। সরকারি আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলা। এবং এই অভিযানে যাওয়ার জন্য সঠিক টিম নির্বাচন।

১৯ জুন। বানডাকা, কঙ্গো

এটাও বেশ বড় শহর। গতকাল কিনশাশা থেকে ফ্লাইটে এখানে এসেছি। এখান থেকে আমাদের জলপথে যাত্রা শুরু হবে আগামীকাল সকালে।

গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে সড়ক রাস্তা বা ট্রেনলাইন তৈরি করা সহজ

নয়। কঙ্গো সরকার তেমন কোনও উদ্যোগই নেয়নি। তবুও যেখানে আছে, সেখানেও রাস্তার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ।

চীন অবশ্য এখন এখানে রাস্তা তৈরিতে অনেক সাহায্য করছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত গ্রামগুলো জঙ্গলের মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে আছে। কঙ্গো ও তার শাখানদীগুলোতে জলপথের বাইরে একটার সঙ্গে আরেকটার তেমন কোনও যোগাযোগ ব্যবস্থা নেই। এখানে বেশির ভাগ মানুষ এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে যেতে জলপথই ব্যবহার করে।

এখান থেকে আমরা জলপথে যাব লিসালা। এগারো দিনের যাত্রা। আমাদের প্রায় তিরিশ মিটার লম্বা নৌকোয় দুটো শক্তিশালী ইঞ্জিন আছে। একটা ছোট ফ্রিজ আছে, জেনারেটরও আছে। পথে আমরা রোজ কোনও না কোনও গ্রামে থামব। গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলব। এর মধ্যে বেশ কিছু গ্রামে হতাহতের খবর আছে। বেশিরভাগ আক্রমণ হয়েছে গ্রামের আশেপাশের জঙ্গলের মধ্যে। তাই গ্রামবাসীরা চাষবাসের জন্যে বা শিকারের জন্য গ্রামের বাইরে যেতে সাহস করছে না।

আমাদের কাজ হবে এদের সঙ্গে কথা বলা। সরাসরি কথা বললে অনেক নতুন তথ্য পাওয়া যেতে পারে। কোনও নতুন জন্তু গ্রামবাসীরা দেখেছে কিনা সেটা জানতে হবে। এখানে এদের সঙ্গে কথা বলতে গেলে স্থানীয় বান্টু ভাষা জানা প্রয়োজন। আমাদের সঙ্গে দোভাষী আছে, ফ্রেঞ্চে অনুবাদ করে বলবে।

আজ এখানে একটা তাঁবুতে রাত কাটানোর ব্যবস্থা হয়েছে।

তবে এখানকার আবহাওয়া অত্যন্ত বাজে। যেমন গরম, তেমন স্যাঁতস্যাঁতে। নিরক্ষরেখা দেশটার উপর দিয়ে গেছে বলেই বোধহয় এমন আবহাওয়া। মাঝে মধ্যেই হঠাৎ করে ঝেঁপে বৃষ্টি হচ্ছে। আজ সারা রাত ঘুম আসবে কিনা সন্দেহ। তবে মশা নিয়ে ভয় নেই। মশা তাড়ানোর জন্যে আমার আবিষ্কার একটা মশা দূরীকরণ স্প্রে এনেছি। তাতে মশারা আমার দশ মিটারের মধ্যেও আসতে পারবে না।

ইচ্ছে আছে এর রসায়ন রহস্য আমি কঙ্গো সরকারের হাতে বিনামূল্যে তুলে দেব যাতে তা ম্যালেরিয়া কমাতে আগামীদিনে কাজে লাগে।

২৬ জুন। পথে অজানা কোনও একটা গ্রামে

কাল রাতে যা অভিজ্ঞতা হল, তা চিরকাল মনে থাকবে। একটু আগে থেকেই বলি। গত কয়েকদিন লেখার সময় হয়নি। বান্ডাকা থেকে আমরা জলপথে রওনা

হই। আমাদের বোটে আমি, ডেভিড ছাড়াও দুজন মাঝি, একজন দোভাষী, একজন উদ্ভিদবিদ, তিনজন স্থানীয় বান্টু শিকারি ও দুজন রান্নার লোক ছিল।

আমাদের ইচ্ছে ছিল পথে আমরা যে সব গ্রামে থামব, সেখানে তাদের আশেপাশের জঙ্গলের গভীরেও কিছুটা যাব কী হচ্ছে বোঝার জন্যে। তাই এই তিনজন শিকারি আমাদের সঙ্গে আছে। আর আছে আমার সঙ্গে আসা সেই পিপুল গাছ। সেটা আরেকটু বড় হওয়ায় একটা বড় টবে করে সঙ্গে এনেছি।

প্রথম কয়েক দিন আমরা যেসব গ্রামে থেমেছি, সেসব গ্রামে কোনও দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু এখনও অব্দি হয়নি। তবে কথা বলে বুঝেছি যে জঙ্গলের গভীরে কিছু কিছু জায়গায় এরকম যে কিছু ঘটনা ঘটছে সে খবর ওদের কাছেও এসেছে। এখানকার গ্রাম্য মানুষ আমাদের বেশ খোলা মনে আপ্যায়ন করলেও একটু কথা বলতেই বুঝতে পেরেছি যে এরা আমাদের সভ্যতার আলো থেকে অনেক দূরে। এখনও অনেক কুসংস্কারে এরা বিশ্বাস করে।

আমরা প্রত্যেকটা জায়গায় নৌকো থামিয়ে গ্রামের হাটেই সব রকম টাটকা শাকসব্জি, মাছ, মাংস সংগ্রহ করেছি। গ্রামের প্রধান বা মোড়ল স্থানীয় কিছু মানুষের সঙ্গে কথা বলে জানার চেষ্টা করেছি ওদের জীবনযাত্রার হাল-হকিকত। রাতটা গ্রামে কাটিয়ে আবার ভোরে উঠে বোটে করে পরের গ্রামের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়েছি।

গতকাল দুপুরে একটা গ্রামে পৌঁছালাম। তীরে এসে নামতেই অন্য জায়গার মতোই গ্রামবাসীরা আমাদের ঘিরে দাঁড়ালো। আমাদের সম্বন্ধে সবার খুব কৌতূহল। সেটা স্বাভাবিক। এসব গ্রামে সাধারণত পর্যটক আসে না।

কিন্তু এখানে সবাই যেন কীরকম উত্তেজিত, ভীত, সন্ত্রস্ত। সবাই যেন আমাদের কিছু বলতে চায়।

পরে শুনলাম গ্রামের আট জন চাষী গতকাল বিকেল থেকে নিখোঁজ। রাতে ফিরে না আসায় সকালে গ্রামবাসীরা আশেপাশের চাষের জমি, জঙ্গল খোঁজ করতে গিয়ে প্রথমে কিছুই পায়নি। পরে অনেক খোঁজাখুঁজির পরে একটা বড় মেহগনি গাছের ডালে একজনের শরীরের টুকরো পাওয়া যায়। খোঁজ করতে দেখা যায় এরকম বাকিদেরও শরীরের টুকরো আশেপাশের আরও কিছু গাছে ছড়িয়ে আছে। শরীরের বেশিরভাগ অংশ মিসিং থাকলেও চিনতে অসুবিধে হয়নি।

কোনও বড় প্রাণীকে মেরে তার দেহ গাছের এত উঁচু ডালে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা একমাত্র লেপার্ডদের থাকে। কিন্তু লেপার্ড কখনও দলবদ্ধ মানুষকে আক্রমণ করে না। ভয় পায়। এড়িয়ে চলে। তাছাড়া এমন আধখানা দেহ ফেলেও চলে যায় না। অর্থাৎ এখানে ওরা হত্যা করেছে খাদ্যের জন্য নয়, শুধুই মানুষ হত্যা করার জন্য, যেটা লেপার্ডরা সচরাচর করে না।

ডেভিড অবশ্য মৃতদেহ ও আক্রমণের ধরন দেখে বলছে, একাধিক লেপার্ড একসঙ্গে এমন কাজ করতে পারে। কিন্তু লেপার্ড তো এরকম দলবদ্ধ হয়ে ঘোরে না। হয়তো আমাদের অজানা অত্যন্ত শক্তিশালী কোনও প্রাণী হতে পারে।

মনে এল আবার সেই মোকেলে মেম্বে নয় তো।

একটা কথা বলে নিই। এখানে আমাদের সবার কাছেই একটা করে রাইফেল আছে।

গ্রামে ফিরে এসে নানান কথার পরে রাতে খেতে খেতে প্রায় দশটা হয়ে গেল। গ্রামবাসীরাই রান্না করে দিয়েছে। খাওয়ার পরে আমরা যে যার তাঁবুর মধ্যে ঢুকে পড়লাম।

তখন ঠিক ক'টা হবে জানি না। হঠাৎ মনে হল তাঁবুর মধ্যে নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে । স্লিপিং ব্যাগ ছেড়ে উঠে পড়তেই মনে হল ঠিক তাঁবুর বাইরে কী যেন একটা দাঁড়িয়ে আছে। তার বড় ছায়া থেমে আছে তাঁবুর সামনে। তার পরেই আওয়াজটা পেলাম। নখ দিয়ে আমার অত্যন্ত শক্তিশালী তাঁবু ছিঁড়ে ফেলার যেন চেষ্টা করছে। পরক্ষণেই মনে হল সেই ফাঁকটা দিয়ে কী যেন ঢুকে আসছে তাঁবুর মধ্যে।

মাথার কাছে রাইফেলটা ছিল। মুহূর্তে ওই অজানা আগন্তুককে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়ে দিলাম। একবার নয়, পরপর তিন বার। প্রাণীটা সঙ্গে সঙ্গে তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেল। বন্দুকের আওয়াজে সবাই উঠে পড়েছে। আমরা তাঁবুর বাইরে এসে দেখলাম, বেশ কয়েকটা পায়ের দাগ। যেই এসে থাকুক, একা আসেনি। একার কাজ নয় এটা, ওদের বেশ বড় দল এসেছিল। একটা যে আমার গুলিতে বেশ জখম হয়েছে, তা চাপ চাপ রক্ত দেখেই বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু আমাদের একজন রাঁধুনী উধাও।

ইতিমধ্যে গ্রামবাসীদের মধ্যেও আরও অনেকে উঠে পড়েছে। কেউ কী আক্রান্ত? এক ঘন্টার মধ্যে বোঝা গেল তিনজন গ্রামবাসী উধাও।

বাকি রাতটা আর ঘুম এল না। সকালে উঠে এই ডায়েরি লিখছি। লিখতে গিয়ে আমার একটা জিনিস মনে হচ্ছে, ভাগ্যিস ঠিক ওই সময়ে তাঁবুর মধ্যে দমবন্ধ লাগছিল, তাই টের পেয়েছিলাম। তা না হলে এক মিনিট বাদে উঠলেই যে কী হত! কিন্তু হঠাৎ করে তাঁবুর মধ্যে দমবন্ধ লাগল কেন? আগে বা পরে তো এরকম হয়নি।

ঠিক তখনই কিছু দূরে রাখা আমার পিপুল গাছটার দিকে চোখ পড়ল। ওই কি কিছু করেছে যাতে আমার ঘুম ভেঙে যায়? কোনও বিষাক্ত গ্যাস বের করে আমার ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছে? জানি না। একটা পিপুল গাছ কি এত বুদ্ধিমান হতে পারে!

একটা কথা পড়েছিলাম। বেঁচে থাকার থেকে অনিশ্চিত আর কী আছে। সেটা মনে পড়ে গেল।

৬ জুলাই। পিগমিদের কোনও এক গ্রামে

এখন আছি পিগমিদের একটা গ্রামে।

আমরা লিসালাতে একদিন ছিলাম। সেখানে এখানকার এক এক্স-প্রেসিডেন্টের বাড়িও আছে। প্রেসিডেন্ট মোবুটু। ওখানে একদিন কাটিয়ে আমরা আবার জলপথে যাত্রা শুরু করলাম। এবারের উদ্দেশ্য আরও একটা পিগমিদের গ্রামে যাওয়া। জঙ্গলের হালচাল এদের থেকে বেশি ভালো কেউ জানে না। যদি আশেপাশের জীবজগতে কোনওরকম পরিবর্তন হয়ে থাকে, তাহলে এদের সে বিষয়ে জানার সম্ভাবনা সবথেকে বেশি। তার জন্য লিসালা থেকে পূর্বে ইতুরি জঙ্গলের দিকে যেতে হবে।

পথে গত কয়েকদিনে আরও কয়েকটা গ্রামে গেলাম। কিছু কিছু গ্রামে ভিন্ন কিছু উপজাতির লোকেদের সঙ্গে কথা বলারও সুযোগ হল। একটা অস্বাভাবিক কিছু যে হচ্ছে পুরো কঙ্গো বেসিন জুড়ে, তার বনবনানী ঘিরে তা নিয়ে সন্দেহ নেই। এই গ্রামের থেকে কিছু দূরে একটা জঙ্গলে একটা সিংহ ও তিন সিংহীর একই সঙ্গে মৃত্যু হয়েছে। তাদের ছিন্নভিন্ন দেহ পাওয়া গেছে। এরকম সিংহের দলকে মারার ক্ষমতা আফ্রিকার কোনও চেনাজানা প্রাণীর আছে বলে মনে হয় না।

ডেভিড তাদের দেহাবশেষ অনেকক্ষণ পর্যবেক্ষণ করে শুধু একটা কথাই বলল— সামথিং এক্সট্রিমলি আনন্যাচারাল হ্যাপেনিং। মনে হয় এই সিংহের দলকে মারতে তিন চার মিনিটের বেশি সময় নেয়নি। ওরা তেমনভাবে যেন প্রতিরক্ষারই সময় পায়নি।

তিন দিন আগে আমরা এই গ্রামে এসে পৌঁছেছি। এদের সবার হাইট সাড়ে চার ফুটের কম। আসলে এসব রেন ফরেস্টে প্রোটিন খাবার পর্যাপ্ত পাওয়া যায় না। তাছাড়া সাম্প্রতিক একটা রিসার্চে দেখা গেছে যে এদের উচ্চতা কম হওয়ার বড় কারণ রেন ফরেস্টে ক্ষতিকর জীবাণু অনেক বেশি থাকে। এসব ক্ষতিকর মাইক্রোবের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য যে জিন দায়ী, সেই জিনই এদের উচ্চতা বাড়তে দেয় না।

এখানে সামান্য কিছু লোক পশ্চিমী পোশাক পরলেও বেশিরভাগ এখনও দেখলাম গাছের ছাল ও পাতার পোশাক পরে। পরনের হাফ প্যান্ট, বা শার্ট, তারও খুব সঙ্গিন অবস্থা।

এদের মতো হাসি খুশি মানুষ খুব কম হয়। গান যেন এদের দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে মিশে আছে। খুব অভাব থাকলেও এদের চাহিদা খুব কম। সব সময়ে আনন্দে মেতে থাকে।

দেখলাম এরা বান্টু ভাষা বোঝে। আসলে বান্টু চাষীদের সঙ্গে এদের মিলে মিশে চলতে হয়। এরা শিকার করে মূলত নিজেদের দৈনন্দিন খাবারের জন্য। সে শিকার বিক্রি করে কম। যদিও অনেক সময় অন্য কিছু জিনিস যেমন জামা, সিগারেট পেতে শিকার থেকে আনা মাংস, মাছ বান্টু চাষীদের কাছে হাটে বিক্রি করে।

চারদিকে গ্রামে ছড়িয়ে থাকা ছোট ছোট মাটির ঘরে এরা থাকলেও দেখলাম কেউই ঘরের মধ্যে বসে থাকে না। সবাই সব সময় বাইরে নিজেদের মধ্যে আড্ডা মারছে, গল্প করছে। ছোট ছোট বাচ্চাগুলোর তো আবার আমাকে খুব পছন্দ। যদিও আমার কোনও কথাই বুঝছে না। গ্রহ নক্ষত্র নিয়ে একটা দীর্ঘ বক্তৃতা দেওয়ার পরে ও আমার দোভাষী সেটা ওদের অনুবাদ করে বলার দশ মিনিট পরে দেখি সবাই মিলে একটা গাছের উপরে উঠে জাল ছুড়ে তারা ধরার চেষ্টা করছে। এর পরে আর কিছু বলিনি।

শুনলাম এদেরও একটা সাতজনের দল কয়েকদিন আগে শিকারে গিয়ে আর ফেরেনি। পরে তাদের ছিন্ন ভিন্ন দেহ আবিষ্কার হয়েছে। আনন্দে মেতে থাকলেও অনেকেরই মুখে বিষণ্ণতার ছাপ।

শুনলাম, এদের দেহাবশেষ মাটিতেই পড়ে ছিল। বলল ওদের মনে হয়েছে এই আক্রমণ করেছে কোনও বড় শিম্পাঞ্জির দল।

এটা খুবই অস্বাভাবিক। শিম্পাঞ্জিরা সাধারণত মানুষদের উপরে আক্রমণ করে না। ফল খেয়েই সন্তুষ্ট থাকে। যেখানে আক্রমণ করেছে সে জায়গাটা আমাদের এখান থেকে খুব বেশি দূরে নয়। প্রথমে ওদের ইচ্ছে না থাকলেও শেষে ডেভিড ও আমার অনুরোধে ওরা নিয়ে যেতে রাজি হল। বেরোনোর আগে টরের পুজো দিয়ে গেল।

ওদের কয়েকজন শিকারি ও আমরা কয়েকজন মিলে গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে সেই জায়গায় গেলাম। ওরা তির ধনুক, ছুরি, কিছু দড়ির ট্র্যাপ এসব নিয়ে চলল আমাদের সঙ্গে। সঙ্গে যেতে যেতে বুঝলাম কতটা নিঃশব্দে অথচ কতটা দ্রুত ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ওরা যেতে পারে। খালি পায়ে কাদা মাটি কিম্বা ডাল বেয়ে যেভাবে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছিল, তাতে বোঝা যায় যে এরা জঙ্গলেই বেশি অভ্যস্ত।

আমরা রীতিমতো হিমশিম খাচ্ছিলাম ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এগোতে। বিশাল বিশাল গাছ থেকে নেমে আসা লতাপাতায়, চারদিকে ছড়িয়ে থাকা নানান রঙের ফলে, সবুজের নানান রঙের শেডে, পায়ের নীচে জল কাদায় আমার

যেন দিক-সময়জ্ঞান সবই হারিয়ে যাচ্ছে।

পরে কোথাও আফ্রিকার জঙ্গলের এই সৌন্দর্য লেখার চেষ্টা করব। এ এক অনির্বচনীয় অভিজ্ঞতা। ঘন জঙ্গলের মধ্যে দু'হাত দূরেরও কিছু দেখা যায় না। এসব রেনফরেস্টে নীচের দিকে আলো কমই আসে। বেশিরভাগ গাছই খুব লম্বা লম্বা। তাদের ঘন পাতার ক্যানোপির ফাঁক দিয়ে সামান্য আলো এসে পড়েছে কিছু জায়গায়। আমাদের সাবধানে এগোতে হচ্ছিল। মাম্বার মতো বিষাক্ত সাপ এখানে আছে যার কামড়ে তিন ঘণ্টার মধ্যে অবধারিত মৃত্যু।

পথে বেশ কয়েকটা কলোবাস বাঁদর দেখলাম। যেখানে ঘটনা ঘটেছে সেখানে ও তার চারদিকের জঙ্গলে অজস্র গাছের ডাল ভাঙা। ডেভিড অনেক দেখে শুনে বলল, হ্যাঁ, মনে হয় শিম্পাঞ্জিদের খুব বড় কোনও গ্রুপ আক্রমণ করেছে।

জিগ্যেস করে জানলাম শিম্পাঞ্জিরা নাকি সাধারণত পঞ্চাশ, ষাট জনের গ্রুপে থাকে। সেখানে ডেভিডের ধারণা এই গ্রুপের সাইজ ছিল তার থেকে অনেক বেশি।

এই গ্রামের পিগমিরা খুব ভয়ে ভয়ে আছে। এরা এমনিতেও মাঝে মধ্যে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় চলে যায়। হয়তো আবার অন্য কোথাও চলে যাবে। আগে এরকম নিয়মই ছিল। কোনও গ্রুপের একজন মারা গেলেই পিগমিদের পুরো দল সে গ্রাম ছেড়ে আরেকটা জায়গায় চলে যেত।

জঙ্গলের হরিণ হল এদের মূল খাবার। তবে শুধু হরিণ নয়, খাবার হিসেবে যখন যা পায়, সজারু, ব্যাঙ, শিয়াল, বাঁদর, গরিলা, সাপ, জঙ্গলের ইঁদুর সবই এরা খায়। তবে এখন নাকি ভালো শিকার পাওয়া অনেক শক্ত হয়ে উঠেছে। একদিন রাতে আমাদের কী একটা বিশেষ পাতায় সেদ্ধ করে পাঁচমেশালি খাবার খেতে দিয়েছিল, তার মধ্যে দেখি একটা সাপের মাথা। শুনলাম সেটা আবার নাকি মাম্বা সাপের।

এদের মেয়েরা সকালে উঠে মাছ ধরতে যায়, ছেলেরা যায় জঙ্গলে শিকার করতে। শুনলাম সপ্তাহে দুদিন এরা যায় চাষবাসের কাজে কাসাভা বা ভুট্টা চাষে। সকালে উঠে এরা এই কাসাভাই খায়। সব ধরনের অসুখের চিকিৎসার জন্য জঙ্গলের পাতা, রস এসবেই এদের ভরসা।

বান্টু চাষীরা চায় না যে পিগমিদের ছেলেমেয়েরা ওদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে স্কুলে পড়ুক। সেজন্য বেশির ভাগই কোনও পড়াশোনার সুযোগ পায় না।

রাতে প্রতিদিন এদের নাচগান দেখতাম। এটাই এদের জীবন। সেসময় এক অদ্ভুত সুর, তালে, নাচে যেন চারদিকের জঙ্গল অন্য ভাবে চোখের সামনে ধরা দেয়।

সঙ্গে টেন্ট থাকলেও একদিন এদের সঙ্গে মাটির ঘরে চাটাই পেতে

শোওয়ারও অভিজ্ঞতা হয়েছে।

এদের নিয়ে লিখতে গেলে অনেক কিছু লেখা যায়। কিন্তু খুব সংক্ষেপে লিখতে গেলে এটুকুই লিখব, এদের মতো সহজ সরল ভালো মানুষ খুব কম হয়। সভ্য মানুষদের আশা, আকাঙ্ক্ষা এত লাগামছাড়া বলেই আমরা মাথার উপরের আকাশটার বিশালতা বুঝতে পারি না। এদের মতো আনন্দে থাকতে পারি না।

ইউরোপিয়ানরা, এমনকী বান্টুরা এদেরকে মানুষ হিসেবে গণ্য করত না। এদের সারল্যের সুযোগ নিয়ে অত্যাচার করত। সেজন্যেই হয়তো আমাদের এই জটিল সমাজের কাছ থেকে এরা কিছুই পায়নি। কিন্তু এরা না থাকলে এই কঙ্গোর রেন ফরেস্টের অজস্র জীবজন্তু অনেক আগেই উধাও হয়ে যেত।

কেউ হয়তো এদের সেজন্যেই সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে, ঠিক যেরকম আগেও অনেকবার চেষ্টা করা হয়েছে।

৮ জুলাই

এই কিছুক্ষণ আগে আরনেস্ট সলভের নির্দেশমতো আমরা জলপথে এক নামহীন ছোট গ্রামে এসে পৌঁছেছি। এটা মাম্বাসা থেকে বেশি দূরে নয়। এখান থেকে ক্যাকাও পাঠানো হয় দেশ বিদেশে। চকলেট তৈরির জন্য।

এখান থেকে আরও দুর্ভেদ্য জঙ্গল শুরু।

কিছুক্ষণ আগেই আরনেস্ট সলভে ওর দু'জন কর্মচারীকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে। সঙ্গে একটা জিপ আছে। বলা হয়নি আগে, ওর বাড়িতে শুধু আমি আর ডেভিডই যাচ্ছি। বাকি টিম আমরা আগেই ছেড়ে দিয়েছি।

আমরা এখন ওর জিপ করে মাইল দশেক যাব। তারপর দু'মাইল জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে হাঁটা পথ।

গভীর জঙ্গলের মধ্যে এরকম পাণ্ডববর্জিত জায়গায় যে কেউ রিসার্চ করতে পারে, তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। এখানে তো বছরের পর বছর নতুন কোনও লোকের মুখ দেখা যায় না। শুনলাম ওর রিসার্চ সংস্থা অবশ্য ইউ এন থেকে ও আরও কিছু বড় মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি থেকে খুব বড় ফান্ডিং পেয়েছে।

এখানে একটা ছোট দোকানে বসে কফি খেতে খেতে ওর সঙ্গে কথা হল। কীভাবে কাজ করবে জিগ্যেস করতে ও শুধু বলল যে এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মডেলটা যে-কোনও ভাবে গ্লোবাল ওয়ার্মিং যাতে কমানো যায় সেজন্য তৈরি করার। শুধু যে বিভিন্ন উপায় বাতলাবে তাই নয়, তার জন্য যা যা কিছু দরকার,

উপযুক্ত পরিবেশ পেলে তার অনেক কিছুই করতে পারে। এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মডেলটা চালানোর জন্যে অনেক বড় বড় কম্পিউটার সারভার লাগে যা সবই শুনলাম ওর বাড়িতেই রাখা। এই মডেলকে অন্য কোনও কিছুর থেকে আলাদা ও সুরক্ষিত রাখার জন্যই এরকম ব্যবস্থা করেছে।

ওকে দেখে কেন জানি খুব ক্লান্ত মনে হচ্ছিল। হওয়া স্বাভাবিক। এ ধরনের যুগান্তকারী কাজ একা চালিয়ে যাওয়া সহজ নয়।

আমরা ওকে এই সাম্প্রতিক জনহত্যার ও আরও নানান জীবজন্তু হত্যার ঘটনাগুলো সম্বন্ধে জিগ্যেস করলাম। ব্যাপারটা দেখলাম ওর ভালো করে জানা নেই।

ও বলল কঙ্গোর পরিস্থিতি এখন ভালো নয়। উগান্ডা, রোয়ান্ডার মতো প্রতিবেশী দেশগুলো নানান মিলিট্যান্ট গ্রুপ তৈরি করেছে, যারা চায় কঙ্গোতে বড় রকম অস্থিরতা তৈরি করতে। এতে পশ্চিমী কিছু দেশেরও লাভ আছে। সবাই চায় এখানকার দুর্মূল্য খনিজ ও আকরিকের অধিকার পেতে। সেক্ষেত্রে কঙ্গো যত দুর্বল হয়, তত তাদের লাভ।

আজ খানিকক্ষণের মধ্যেই বেরব। ওর বাড়িটা অত্যন্ত রিমোট জায়গায়। তাই এখান থেকে আমার গত কয়েক দিনের লেখা পাঠিয়ে দেব। তারপরেই বেরব।

এখনও কিছুই বুঝতে পারছি না কী হচ্ছে। সঙ্গে অনিলিখার মতো কেউ থাকলে খুব ভালো হত। মনের মধ্যে যে সন্দেহটা দানা বাঁধছে, সেটা নিয়ে আলোচনা ও বিশ্লেষণ করে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে অনিলিখার কোনও বিকল্প নেই।

আশা করি ওর সঙ্গে এখানে খুব শিগগিরি দেখা হচ্ছে।

এখানেই ডায়েরি শেষ হয়েছে।

অনিলিখা গণেশকে জিগ্যেস করল, এই লেখাটাই কি শেষ এসে পৌঁছেছে?

হ্যাঁ। তা আপনি যাচ্ছেন তো?

হ্যাঁ, আমার যাওয়াটা এখন ভিসার উপরে নির্ভর করছে। পড়ে যা বুঝলাম তাতে পারলে আজকেই চলে যেতাম। ভিসা পেলেই রওনা দেব।

২৩ জুলাই, গোমা, কঙ্গো

পূর্ব কঙ্গোর সব থেকে বড় শহর এই গোমা। এই শহরে অনেক পর্যটকও আসে ভিরুঙ্গা ন্যাশনাল পার্ক দেখতে। ফ্লাইট থেকে নেমে গাড়িতে করে ভিরুঙ্গা প্রায় দশ ঘণ্টার জার্নি।

ইথিওপিয়ান এয়ারলাইন্সে গোমা ইন্টার ন্যাশনাল এয়ারপোর্টে নেমে অনিলিখা দেখল চারপাশে বেশ টাইট সিকিউরিটি। লোকের মুখে চোখে কেমন যেন একটা চাপা টেনশন। ফোনটা এয়ারপোর্টের ওয়াইফাইতে কানেক্ট করে একবার খবরে চোখ রাখল অনিলিখা।

যা ভেবেছিল ঠিক তাই। M23 রিবেল গ্রুপ আবার গোমার কাছেই একটা স্কুলে আক্রমণ করে আজ বারোজন ছেলেমেয়েকে হত্যা করেছে, অপহরণও করেছে কয়েকজনকে। এই M23 মিলিট্যান্ট গ্রুপ কঙ্গোর তুৎসী উপজাতির আরও কিছু অধিকার চাইছে। চাহিদা মেটানোর জন্যে মানুষ কতটা হিংস্র হতে পারে, কে জানে।

আজ রাতটা গোমার একটা হোটেলে থাকবে অনিলিখা। আগামীকাল সকালে এখান থেকে একটা গাড়ি নিয়ে রওনা দেবে ভিরুঙ্গা ন্যাশনাল পার্ক। সেখানে একদিন থেকে তারপরে অনিলিখা রওনা দেবে মিস্টার পাই-এর বন্ধুর বাড়ির উদ্দেশে।

তবে অনিলিখার ধারণা এর রহস্য বুঝতে গেলে জঙ্গলে সময় কাটাতে হবে। সময় কাটাতে হবে পিগমিদের সঙ্গে যারা জঙ্গলের এই জীবজন্তুর পরিবর্তন সবার আগে বুঝতে পারে।

সেজন্য বান্টুভাষা জানা কোনও একজনকে সঙ্গী হিসেবে পেলে বেশ ভালোই হত। ইমিগ্রেশনে অনেকটা সময় লেগে গেল। এসময় অনেক পর্যটক আসে। তাছাড়া আজ সিকিউরিটি বেশি বলে সব জায়গায় সময় বেশি লাগছে।

বেরিয়ে এসে একটা ট্যাক্সি ডেকে হোটেলে পৌঁছতে পৌঁছতে অনেক রাত হয়ে গেল। রাতের খাবার খেয়ে শুতে যাওয়ার আগে একবার ইমেইল চেক করতে গিয়ে দেখল মিস্টার পাই-এর কাছ থেকে একটা ইমেল এসেছে।

জানিয়েছেন আগামীকাল অনিলিখার হোটেলে একটা গাড়ি আসবে। গাড়ির নাম্বারও জানিয়েছেন। গাড়ি অনিলিখাকে সোজা নিয়ে যাবে সেই বন্ধুর বাড়ি।

শেষ মুহূর্তে চেঞ্জ অফ প্ল্যান হলেও ভালোই হল। একটা অচেনা দেশে এসব নিজে ব্যবস্থা করা বেশ শক্ত। তার উপরে সিভিল ওয়ার শুরু হওয়ার মতো পরিস্থিতি। সেখানে সব জায়গাতেই নিরাপত্তার একটা অভাব থাকে।

তবে একটা বিষয়ে ইমেলটা খুব স্বাভাবিক লাগছে না। অনিলিখা তার প্ল্যান আগেই জানিয়েছিল মিস্টার পাইকে যে ও একদিন গোমায় এই হোটেলে থেকে তার পরের দিন ভিরুঙ্গা ন্যাশনাল পার্কে থেকে তারপরে ওখানে যাবে। হঠাৎ করে মিস্টার পাই প্ল্যান চেঞ্জ করলেন কেন? তাহলে কি আজকালের মধ্যে কোনও ঘটনা ঘটেছে? কিন্তু যদি তাই হতো, উনি কি একটুও লিখতেন না।

ইমেলটা আরেকবার পড়ল অনিলিখা।

একটা ফোন করা দরকার। জরুরি দরকার। ভারতে এখন সময় কত?

এখানে রাত একটা। কঙ্গোতে দুটো টাইম জোন আছে। এখন ও আছে পূর্ব প্রান্তে। ভারতের সময় থেকে এগিয়ে আছে সাড়ে চার ঘণ্টা। অর্থাৎ ভারতে সময় এখন সকাল সাড়ে পাঁচটা। গণেশ নিশ্চয়ই উঠে গেছে। ও ঠিক সকাল চারটেতে উঠে যায়।

ফোন করতেই উল্টো প্রান্তে গণেশকে পেল অনিলিখা।

আচ্ছা, গত কয়েক দিনে আর কোনও ডায়েরির লেখা পেয়েছ মিস্টার পাই-এর?

না, আর তো আসেনি। সেই যে শেষ এসেছিল ১২ই জুলাই, ৮ই জুলাই অব্দি ডায়েরি লেখা ছিল। কেন ওনার সঙ্গে যোগাযোগের কিছু অসুবিধে হয়েছে?

না, সে তো এমনিতেই ওনাকে ফোনে পাওয়া যাচ্ছে না। তার জন্যে নয়। আমার মনে হচ্ছে উনি কোনও অসুবিধেতে পড়েছেন। যাই হোক, তোমাকে পরে জানাচ্ছি।

মিস্টার পাইকে ফোনে চেষ্টা করল অনিলিখা। ওনার নাম্বারে। সুইচড অফ।

রাত অনেক হয়েছে। দীর্ঘ যাত্রার ক্লান্তি ও জেট ল্যাগের জন্য যথেষ্ট ঘুম পাচ্ছে। তবু মিস্টার পাইকে আরেকটা ইমেল করল অনিলিখা। বক্তব্য হঠাৎ করে প্ল্যান চেঞ্জ করা মুশকিল। আরেকটা দিন এখানে কাটিয়ে তারপরে পরশু মিস্টার পাই-এর বন্ধুর বাড়ি যাবে। গাড়ি পাঠানোর কোনও দরকার নেই।

আসলে অনিলিখা যেতেই পারত। কিন্তু সন্দেহ কাটানোর জন্যেই এই ইমেইল। মিস্টার পাই কখনও এত রাতে ইমেইল নিজে দেখেন না। দেখা যাক কী হয়।

অনিলিখা দু'মিনিট অপেক্ষা করল উত্তরের জন্য। জানে এখন কোনও উত্তর এলে সেটা হবে অস্বাভাবিক।

কিন্তু উত্তর এল। ঠিক পাঁচ মিনিটের মধ্যেই।

পরপর দুবার পড়ল অনিলিখা। পড়ে মনে হচ্ছে মিস্টার পাই-ই লিখেছেন। ওনার মতোই ভাষার ব্যবহার। শব্দের ব্যবহার, লেখার স্টাইল নিয়েও কোনও প্রশ্ন নেই। কিন্তু তবু এই ইমেলে সন্দেহজনক কিছু জিনিস আছে।

ইংরেজিতে সংক্ষিপ্ত ইমেল। লেখা আছে—না, অন্য কোথাও যেও না। সব ব্যবস্থা করাই আছে। গাড়ি ঠিক ন'টার সময় পৌঁছে যাবে হোটেলে। সরাসরি এখানে চলে এসো। অন্য কোনও প্ল্যান কোরো না।

প্রশ্ন কিন্তু থেকেই যায়। মিস্টার পাই তো এত রাতে ইমেল করার লোক নন। দুই, জোর করার লোকও নন। তিন, প্ল্যান পরিবর্তনের নিশ্চয়ই কোনও কারণ বলতেন। চার, যখন উনি ডায়েরির শেষ লেখা পাঠিয়েছিলেন, সেখানে অনিলিখার সঙ্গে দরকারি কিছু আলোচনা করার কথা লিখেছিলেন। সেটা নিয়ে

এখনও কোনও কথা বলার আগ্রহ প্রকাশ করলেন না কেন? পাঁচ এবং সবচেয়ে বড় সন্দেহের কারণ—ইমেল লেখার সময় উনি অন্তত একটা হলেও বাংলা শব্দ ব্যবহার করেন। এটাই ওনার ইমেলের একটা বৈশিষ্ট্য। কিন্তু আজ যে দুটো ইমেল এসেছে ওনার কাছ থেকে, তাতে সেরকম কোনও বাংলা শব্দ নেই কেন?

তাহলে কি অন্য কেউ মিস্টার পাই-এর তরফে ইমেল করেছে আজ? অনিলিখাকে অন্য কোথাও সরিয়ে দেওয়ার প্ল্যান করছে? সেজন্যই গাড়ি পাঠাচ্ছে। তাহলে কি মিস্টার পাইকে কোনওভাবে কিডন্যাপ করা হয়েছে? অনেকগুলো প্রশ্ন ভিড় করে আসছে মাথায়।

মাঝরাতেই কঙ্গোর ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করার সিদ্ধান্ত নিল অনিলিখা।

২৪ জুলাই। গোমা, কঙ্গো

সকাল সাতটার সময় হোটেল থেকে চেক আউট করে আরেকটা হোটেলে গিয়ে উঠল অনিলিখা। কাউকে ফলো করার সুযোগ দেওয়া যাবে না। সকাল ন'টায় নিশ্চয় গাড়ি চলে আসবে। তখন লুকিয়ে বেরোনো মুশকিল হবে।

গোমায় ভারতীয় কোনও দূতাবাস নেই। কিন্তু কিনশাশার ভারতীয় দূতাবাসে যোগাযোগ করে এক ফার্স্ট সেক্রেটারির সঙ্গে যোগাযোগ করতে পেরেছে অনিলিখা। নাম ভিনীথ কুমার। হয়তো এই বিষয়ে অন্য কেউ বললে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হত না। কিন্তু অনিলিখার কথা ভিনীথ কুমারের জানা ছিল।

ভিনীথ স্বাভাবিকভাবেই ইমেলের কথা শুনে খুব চিন্তিত। যে জায়গায় মিস্টার পাই গেছেন, সে সব জায়গায় বেশ কিছু মিলিটান্ট গ্রুপ হিংসাত্মক কাজ চালায়। হত্যা, অপহরণ এসব ওখানকার নিয়মিত ঘটনা। যারা স্কুলের বাচ্চাদের প্রাণে মারতে দ্বিধা করে না, তারা যে মিস্টার পাই-এর মতো কোনও মানুষকে কিডন্যাপ বা খুন করতে দ্বিতীয়বার ভাববে না, সেটাই স্বাভাবিক।

কিন্তু শুধু সন্দেহের বশে তো কিছু করা যায় না। অনিলিখা জানাল যে সে নিজে গিয়ে দেখতে চায়। খোঁজ নিতে যেতে হবে মিস্টার পাই-এর সেই বন্ধুর ঠিকানায়। যদিও অনিলিখার একটা সমস্যা হল সে স্থানীয় ভাষা জানে না। কিন্তু সে সমস্যার একটা খুব সহজ সমাধান পাওয়া গেল।

গোমা শহরে একজন বড় ভারতীয় ব্যবসায়ী আছে। পুরো আফ্রিকা জুড়ে তার নানান ব্যবসা। বেশিরভাগ কোবাল্ট খনির মালিক চীন হলেও তার অধীনস্থ একটা কোম্পানির দুটো খনি আছে। ভারতীয় সরকারকে অনেক ব্যাপারেই এই ব্যবসায়ী সাহায্য করে। অনিলিখার সঙ্গে এই ব্যবসায়ীর যোগাযোগ করিয়ে দিল

ভিনীথ। একজন বান্টু শিকারি যাতে অনিলিখার সঙ্গে যায় তার ব্যবস্থাও করে দিল। আফ্রিকান লোকটার বয়স চল্লিশের কাছাকাছি হবে। একটা সময় ভিরুঙ্গা ন্যাশনাল পার্কে কাজ করত। এখন বিভিন্ন উপজাতিদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে রাকেশ আগ্রয়াল ওর সাহায্য নেয়। একটু কথা বলতেই অনিলিখা বুঝল এই ইমামু লোকটা অত্যন্ত সাহসী ও বুদ্ধিমান। ফ্রেঞ্চ জানে। ফলে অনিলিখার কোনও অসুবিধে হচ্ছিল না কথাবার্তা বলতে।

আরনেস্ট সলভের বাড়ির ঠিকানা কোনওভাবে জানা গেল না। নির্দিষ্টভাবে আগে থেকে কিছু বলেননি মিস্টার পাইও। অবশ্য এরকম একটা প্রত্যন্ত জায়গায় ঠিক অবস্থান জানানো মুশকিল।

এমনিতেও অনিলিখা মাম্বাসায় এলে সেখান থেকে আরনেস্ট নিয়ে যাবে, এরকমই কথা ছিল। গাড়িতে করে মাম্বাসার এক হোটেলে আসতে বলা হয়েছিল যেখান থেকে অনিলিখাকে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। অর্থাৎ সেখান থেকে বাড়িটা খুব দূরে হওয়ার কথা নয়। একই সঙ্গে মিস্টার পাই-এর ডায়েরি অনুযায়ী জায়গাটা ইতুরি জঙ্গল থেকে খুব বেশি দূরে নয়। সেটা পিগমিদের এলাকা।

ঠিক হল প্রথমে ইতুরি জঙ্গলের দিকেই যাবে অনিলিখারা। তার পরে সেখান থেকে খোঁজ নিয়ে যাওয়া যাবে ওই বন্ধুর বাড়ি।

ভিনীথ কঙ্গো সরকারের ও আর্মির উচ্চপদস্থ কয়েকজন অফিসারকে চেনে। তাদের নাম্বারও অনিলিখাকে জানিয়ে রেখেছে, যাতে দরকার পড়লে ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে।

রাইফেল, টেন্ট, গাছ কাটার ছুরি, মিস্টার পাই-এর দেওয়া মশা তাড়ানোর স্প্রে, রেনকোট, উত্তর পূর্ব কঙ্গোর একটা ডিটেলড ম্যাপ, এরকম আরও কিছু জিনিস নিয়ে সেই রাতটা গোমার অন্য একটা হোটেলে থেকে পরের দিন জিপ নিয়ে বেরিয়ে পড়ল অনিলিখা।

অনিলিখার ধারণা অনিলিখাকে হোটেলে না পেয়ে ওরা ভিরুঙ্গা ন্যাশনাল পার্কের দিকে যাবে। কারণ সেখানেই ইমেইল অনুযায়ী যাওয়ার কথা ছিল অনিলিখার।

২৭ জুলাই। পিগমিদের গ্রামে

মিস্টার পাই যে পিগমিদের নিয়ে ভুল কিছু বলেননি, তা গত একদিনে অনিলিখা বুঝতে পেরেছে। সহজ সরল ও খিদে মেটানোর মতো খাবার পেলেই এরা খুশি। মনে হয় এরা আগামীকাল কী হবে ভেবে কিছু করে না। তবু অনিলিখা যেখানে এসেছে, সেখানে এরা সবাই আবার নতুন আস্তানা খোঁজার চেষ্টা করছে।

এখানে অবশ্য মিস্টার পাইরা যে আসেনি, তা জিগ্যেস করে বুঝতে পেরেছে অনিলিখা।

এখানে আসা সহজ হয়নি। গোমা থেকে ইতুরি জঙ্গলের রাস্তায় অনেক মিলিটান্ট গ্রুপ আছে। সেজন্য বুনিয়া বলে একটা জায়গা হয়ে আসতে হয়েছে। মাম্বাসা হয়েও আসা যেত। কিন্তু ইচ্ছে করে সেদিক দিয়ে আসেনি অনিলিখা। যেই এই ঘটনার পিছনে থাক, নিশ্চয়ই জানে অনিলিখা মাম্বাসা হয়েই আসার চেষ্টা করবে।

ইতুরি জঙ্গল মাম্বাসা ও বুনিয়ার মাঝে। দু-দিক দিয়েই আসা যায়। তা যাই হোক, গোমা থেকে বুনিয়া আসার পথ সাংঘাতিক রকম খারাপ। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে মাটির রাস্তার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। কাদামাটিতে টায়ার বারবার বসে যাচ্ছিল।

এখানে ওদের সবাই ব্যামবুটি বলে। ব্যামবুটি বলতে সব ধরনের উপজাতির পিগমিদেরই বোঝানো হয়। ব্যামবুটিরা জঙ্গল থেকে গ্রামবাসীদের জন্য মধু, মাংস সংগ্রহ করে যা গ্রামবাসীদের পক্ষে সংগ্রহ করা আদৌ সহজ কাজ নয়। অন্য দিকে ব্যামবুটিরা গ্রামবাসীদের কাছ থেকে কেনে পোশাক, ক্যাসাভা, ধান, ভুট্টা।

অনিলিখা ব্যামবুটিদের যে জায়গায় এসে পৌঁছেছে, তার সবথেকে কাছের গ্রামের দূরত্ব হাঁটা পথে তিন ঘণ্টা। সব জায়গাতেই এই বান্টু চাষীদের ও ব্যামবুটিদের মধ্যে এরকম পরস্পর নির্ভরতা থাকে।

অনিলিখাকে দেখে সবার মধ্যেই খুব আগ্রহ। এরকম কোনও মহিলাকে ওরা এখানে কখনও দেখেনি। এখানে থাকার জায়গা বলতে খুব ছোট নীচু কাদামাটির আর বাঁশ দিয়ে বানানো বাড়ি, তার উপরে পাতার ছাওয়া। ওরা এসব বাড়ি কয়েক ঘণ্টাতে বানিয়ে নিতে পারে। আবার অন্য জায়গায় যাওয়ার সময় এসব ফেলে রাতারাতি চলে যায়।

একটু আলাপ হওয়ার পরে অনিলিখা মিস্টার পাই-এর বন্ধুর ওই জায়গার খোঁজ নিতে শুরু করল। এরকম একটা বাড়ি জঙ্গলের মধ্যে থাকলে ওরা নিশ্চয়ই জানবে। কিন্তু ওরা কেউ সেরকম কোনও বাড়ির খোঁজ দিতে পারল না।

তবে অনিলিখা এটুকু জানতে পারল যে ওরা অন্য সব দিকে গেলেও গ্রামের উত্তরদিকে কখনও যায় না। সেখানে নাকি অত্যন্ত হিংস্র জন্তু থাকে। সেখানে মোকেলে বেম্বে থাকে, থাকে রাক্ষুসে মাকড়সা, আরও নাকি অনেক অজানা প্রাণী। এখন নাকি সে জঙ্গল আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। ওদিকে গেলেই মৃত্যু। এমনিতেও নাকি ওরা দু-এক দিনের মধ্যে এই জায়গা ছেড়ে আরও দক্ষিণ দিকে চলে যাবে।

অনিলিখা জানে, কঙ্গোতে এমন অনেক দুর্গম জায়গা আছে যা মানুষের পক্ষে অগম্য। হয়তো তার থেকেই একটা অতিরিক্ত ভয়, অজানা হিংস্র প্রাণী

সংক্রান্ত মন গড়া অনেক গল্প গড়ে উঠেছে। তবে একটা সময় অব্দি এ জঙ্গলে যে এসব জীবজন্তু ছিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এই ব্যমবুটিরাই মোকেলে বেম্বের যে ছবি এঁকে দিয়েছিল, তা দেখে বিজ্ঞানীরা অবাক হয়েছিল। না দেখে থাকলে কীভাবে ওরা এরকম নিখুঁতভাবে সোরোপডের ছবি আঁকল যার চেহারা ওদের জানার কথা নয়। কাবাঙ্গা উপজাতির লোকেরা নাকি শেষ এরকম একটা প্রাণীকে মেরেছিল ১৯৮০ সাল নাগাদ।

এদের সঙ্গে অনিলিখা কথা বলে জানতে পেরেছে যে ওদের প্রায় জনাদশেক লোক গত কয়েক মাসে জঙ্গলের মধ্যে হারিয়ে গেছে। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ওরা তাদের দেহাবশেষও খুঁজে পায়নি। ওদের ধারণা হিংস্রজন্তুর বাইরে ওই দিকের জঙ্গলে ওদের মাংস খায় এরকম কোনও ক্যানিবাল উপজাতিও এসে থাকতে পারে কাছে পিঠে।

ইমামু অনিলিখাকে বলে, অবিশ্বাস্য মনে হলেও এমনটা এখানে হয়। কিছু উপজাতি আছে, যারা মানুষের মাংস খায়। বিশেষ করে এসব ব্যামবুটিদের মাংস তাদের খুব প্রিয়। তারা মনে করে পিগমিদের মাংসে ম্যাজিকের মতো কোনও ক্ষমতা থাকে। তাই পিগমিদের পেলেই ধরে ধরে খায়।

সাম্প্রতিককালে কোনও অদ্ভুত ধরনের জন্তু ওরা দেখেছে কিনা জিগ্যেস করতে ওরা বলে, না, দেখেনি। তবে উত্তরের জঙ্গলে এরকম কিছু থাকতেও পারে। রাত গভীর হলে অনেক অচেনা শব্দ ভেসে আসে। ওদের দলপতি আবার হাত পা নেড়ে কীসব বলে উঠল। বলার সময় মুখে চোখে ভয়ের চিহ্ন ফুটে উঠছিল।

ইমামু বলল, আবার মোকেলে বেম্বের কথা বলছে, বলছে পঞ্চাশ ফুট লম্বা সাপের কথা যারা নাকি কুমির গরিলা শিকার করে। বলছে ছ'ফুট চওড়া মাকড়সার কথা যারা বাঁদর হরিণ ধরার জন্য বিশাল বিশাল জাল করে রাখে, যার থেকে মানুষের পক্ষেও বেরিয়ে আসা সম্ভব হয় না।

ব্যামবুটিদের মধ্যেই বিভিন্ন উপজাতি আছে। অনিলিখা যেখানে এসেছে সেখানে এরা এঁফে উপজাতির। প্রত্যেকটা উপজাতির রীতিনীতি কিছুটা আলাদা।

পরের দিন সকালে কয়েকজন ব্যামবুটি শিকারি জঙ্গলে গেল শিকার ধরতে। উত্তর নয়, অন্য দিকের জঙ্গলে। অনিলিখা ও ইমামুও যোগ দিল ওদের সঙ্গে। যারা শিকারে গিয়েছিল, তাদের মধ্যে অনিলিখাই ছিল একমাত্র মহিলা। এখানে মহিলারা মাছ ধরে, অন্য ধরনের শিকার ধরে ছেলেরা। ছোট ছোট চেহারার জন্যে এরা যেভাবে গাছের ডাল বেয়ে, ফাঁক দিয়ে দ্রুত এগোচ্ছিল, সেই গতিতে এগোনো অনিলিখার পক্ষেও বেশ কঠিন। কিছু দূরে একটা গাছের ক্যানোপি লক্ষ করে একজন হঠাৎ বাকিদের কোনও শব্দ না করার ইঙ্গিত করল। তার পরে প্রায় কুড়ি মিনিট ধরে নিঃশব্দে অপেক্ষা। কলোবাস বাঁদর। যদি ওদের

ফাঁদে পড়ে। শেষ অব্দি অবশ্য ধরা গেল না।

একটা ছোট হরিণ অবশ্য কিছুক্ষণ বাদে ধরা পড়ল যা দিয়ে ওরা সবাই আজ খেতে পারবে। কয়েকটা শামুকও পেল পথে। সামান্য খাবার খুঁজে পেতে যে কতটা পরিশ্রম করতে হয়, ওদের সঙ্গে কিছুক্ষণ থেকেই বুঝতে পারছিল অনিলিখা। সব কিছুর জন্যে এতটা সংগ্রাম বলেই এরা প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির কাদাজলে পা ডুবিয়ে থেমে থাকে না।

একটা জায়গায় জঙ্গলের মাটিতে একটা গর্ত দেখে তার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিল একজন। তারপরে সেই গর্তের মুখটা খানিকটা পাতা দিয়ে বুজিয়ে সেই গর্তের মুখের কাছে আগুন লাগিয়ে দিল। অনিলিখা বুঝল ওই গর্তের সুড়ঙ্গের মধ্যে কিছু আছে যেটাকে ওরা বার করে আনতে চায়। বেরিয়েও এল সেই প্রাণী কিছুক্ষণ বাদে। একটা বড়সড় ইঁদুর। সেটাকেও কব্জা করে আরও এগিয়ে চলল ওরা।

যেতে যেতে এক জায়গায় এসে কী দেখে যেন হঠাৎ ওরা উত্তেজিত হয়ে উঠল। খুব সন্তর্পণে এগোতে শুরু করল। সাপ কি?

অনিলিখাকে উদ্দেশ্য করে ইমামু ফিসফিসে গলায় বলে উঠল, ওরা বুঝতে পেরেছে, সামনে কিছু আছে। জঙ্গলের আশেপাশের শব্দ বা নিস্তব্ধতা দেখে ওরা অনেক দূর থেকে আন্দাজ করতে পারে।

আরেকটু এগোতে সবটা পরিষ্কার হয়ে গেল। কিন্তু সে দৃশ্য দেখে প্রায় সবাই হাঁ হয়ে গেল। বেশ কয়েকটা মাউন্টেন গরিলার ছিন্ন ভিন্ন দেহ জঙ্গলের মাটিতে পড়ে আছে। সেই সব দেহাবশেষ থেকে মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে কয়েকটা হক ঈগল। এরকম ভোজ তারা আশা করেনি। ঘটনাটা বেশিক্ষণ আগে হয়নি।

ব্যামবুটিদের মুখে ভয়ের ছায়া দেখা গেল। এখানে কি কাছেপিঠে কোনও মিলিট্যান্ট গ্রুপ আছে?

ইমামু উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল, এসব ওই সব তুৎসী রিবেলদের কাণ্ড বলে আমার মনে হয়। লোকগুলোকে গুলি করে মারা উচিত। এমনিতেই সারা বিশ্বে এখন মাউন্টেন গরিলার সংখ্যা কমে আসছে। ওরা চায় এদেরও মেরে এই সব জায়গার দখল নিতে।

অনিলিখা ইমামুকে শান্ত করে বলল, আমার কিন্তু মনে হয় না এটা ওদের কাজ। এটা অন্য কোনও প্রাণীর কাজ। গুলির তো কোনও চিহ্ন দেখছি না। আর যেভাবে শরীরের টুকরো পড়ে আছে, মনে হচ্ছে যেন ধারালো নখ দিয়ে ফালা ফালা করে দেওয়া হয়েছে।

কী এমন প্রাণী আছে এখানে যা একটা শক্তিশালী গরিলার দলকে শেষ করে দিতে পারে? এদেরকে লেপার্ডরাও সমঝে চলে, হাতি এড়িয়ে চলে। এদের কারা মারবে?

চারদিকে কাদার উপরে দুধরনের পায়ের ছাপ। বেশ কিছু অন্য ধরনের ছাপ চোখে পড়তে অনিলিখা বলল, ওদের জিগ্যেস করো তো এটা কীসের ছাপ? এটা তো গরিলার পায়ের ছাপ নয়।

ইমামু ব্যামবুটিদের নিয়ে এসে দেখাল।

ইমামু খানিক বাদে অনিলিখাকে বলল, ওরা বলছে শিম্পাঞ্জি। কিন্তু গরিলারা যেখানে থাকে সে তল্লাটে গরিলাদের ভয়ে শিম্পাঞ্জি থাকে না। শিম্পাঞ্জিরা ওদের সঙ্গে গায়ের জোরে পারে নাকি? শিম্পাঞ্জিরা কীভাবে ওদের মারবে?

অনিলিখা আরও ভালো করে দেখে বলল, হ্যাঁ, সেটাই তো আমাকে ভাবাচ্ছে। চলো, ফেরা যাক।

ওরা সবাই মিলে ফিরে চলল ওদের গ্রামের দিকে।

রাতে খাওয়ার পরে অনিলিখাও ওদের সঙ্গে নাচগানে যোগ দিল। এদের জীবনের সব কিছুতে যেন এই সুর আর ছন্দ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে। ছেলেমেয়েরা গাছের ছাল, পাতা পরে বা ছেঁড়া পোশাক পরে বৃত্তাকারে ড্রামের তালে তালে গানের সঙ্গে নেচে চলেছে। বয়স্ক কয়েকজন একধারে বসে তামাক জাতীয় কিছু একটা দিয়ে নেশা করছে।

এদের সমাজে একা থাকার অর্থ হল তুমি ভালো নেই। ওরা সবসময় এরকম একসঙ্গে বসে গল্পগুজব করে কাটায়। শিকারের জন্য এরা আকাশ, ঝড় ও রামধনুর দেবতা টরের পুজো করে।

নাচের পরে অনিলিখা দেখল ওরা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে সবাই এক এক জায়গায় গোল হয়ে বসেছে। সেই গোলের মধ্যে কোনও একজন গল্প বলছে, বাকিরা মুগ্ধ হয়ে শুনছে। এদের কাছে জীবন মানে গল্পের কাছে আশ্রয় নেওয়া। জঙ্গলের মধ্যে হাজার হাজার বছরে অনেক গল্প গড়ে ওঠে। সভ্যতা গড়ে উঠেছে এই গল্প বলা থেকে। সভ্য সমাজ সেটা ভুলে গেলেও এরা সেটাকে ধরে রেখেছে। কোনও সভ্য সমাজে সবাইকে কখনও এত খুশি দেখেনি অনিলিখা।

এদের কাছে মৃত্যু আর উল্লাস উদ্দীপনার মধ্যের সীমারেখাটাই যেন মুছে গেছে।

অনিলিখা দেখল, একটা দলে একটা বাচ্চা ছেলে গল্প বলছে। কী যেন মনে হতে অনিলিখা জিগ্যেস করল, ইমামু, বাচ্চাটা কী ব্যাপারে বলছে বলো তো। বাকিরা সবাই ওর গল্প এত মন দিয়ে শুনছে।

বাচ্চা তো। বলছে ও নাকি আকাশ আর রামধনুর দেবতা টরের বাড়ি দেখেছে। সে বাড়ি নাকি এত বড় যে আকাশের সঙ্গে গিয়ে মিশেছে। আকাশ থেকে সেখানে সব অদ্ভুত অদ্ভুত জন্তু নামে। যারা খারাপ লোক, তাদের ওই সব জন্তুগুলো খেয়ে নেয়।

অনিলিখা বাচ্চাটাকে লক্ষ করছিল। হঠাৎ ওর কী যেন মনে হল—মনে

হল বাচ্চাটা যেটা বলছে সেটা হয়তো শুধু গল্প নয়, ওটাই হয়তো সেই বাড়ি যেখানে মিস্টার পাই গেছেন। সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ইমামু, জিগ্যেস করো তো এখান থেকে টরের বাড়ি কত দূর?

ইমামু হেসে উঠে বলল, এসব বাচ্চাদের মন গড়া গল্প। সত্যি সত্যি কি আর সে বাড়ি আছে নাকি? তারপর কী মনে হতে ইমামু জিগ্যেস করল বাচ্চাটাকে।

বাচ্চাটা হাত তুলে জঙ্গলের একটা দিকে দেখাল। সেটা জঙ্গলের উত্তরের দিক। বলল এখান থেকে নাকি কয়েক ঘণ্টার পথ।

অনিলিখার বিশ্বাস বাচ্চাটা কোনও একদিন জঙ্গলের মধ্যে পথ হারিয়েছিল। তখনই নিশ্চয় দেখেছে মিস্টার পাই-এর বন্ধুর বাড়ি। বাকিটা অবশ্য কী বা কীভাবে সম্ভব সেটা অনিলিখার জানা নেই।

মিস্টার পাই কি এখনও বেঁচে আছেন? কে জানে।

চারধারের জঙ্গল এখন অন্ধকারে মিশে গেছে। এরকম অন্ধকারে ঝাঁপ না দিলে যেন জঙ্গল অচেনাই থেকে যায়।

২৮ জুলাই

গতকাল রাতের বিভীষিকা বহুদিন থেকে যাবে অনিলিখার মনে। এই গ্রামে জনা আশি ব্যামবুটি আছে। সে তুলনায় থাকার ঘর অনেক কম। তিরিশের কাছাকাছি। মাটি, বাঁশ, গাছ দিয়ে বানানো ঘরগুলো যেন কোনওরকমে দাঁড়িয়ে আছে। অনেকে অবশ্য বাইরেই শোয়। কিন্তু এত মশার কামড় খেয়ে কী করে বাইরে শোয় কে জানে! বেশ কয়েকজনকে ওই মশার স্প্রেটা গায়ে মাখতে বলেছিল অনিলিখা। কিন্তু দেখল তাদের মশার থেকে এরকম স্প্রেতেই ভয় বেশি।

ব্যামবুটিদের সবার কাছে ইতিমধ্যেই অনিলিখা খুব প্রিয় হয়ে উঠেছে। ঘরের মানুষ হয়ে গেছে। আসলে বাইরের বিশ্বের একটা বড় অংশের মানুষ ব্যামবুটিদের মানুষ বলেই মনে করে না। বেলজিয়ানরা কঙ্গোতে আসার পরে এদের নিয়ে গিয়ে আটকে রাখত ইউরোপের আর আমেরিকার চিড়িয়াখানায়, ঠিক যেমন একটা গরিলা বা বাঁদর খাঁচায় থাকে সেরকমই। এখনও বান্টু চাষীদের একটা বড় অংশ এদের নিম্নস্তরের মানুষ হিসেবে ভাবে, বাড়িতে চাকর হিসেবে রাখে। লক্ষ লক্ষ ব্যামবুটিদের হত্যা করেছে সভ্য জগৎ। এখনও এদের যখন হত্যা করা হয়, পুলিশ বা ন্যাশনাল পার্কের ইকো গার্ডরা সেটা দেখতে আসে না, কারণ তারা জানে তাদের উপজাতির মানুষরাই এই হত্যাগুলোর সঙ্গে যুক্ত আছে।

অথচ সারা বিশ্ব যা পারে না সেরকম অনেক কিছু এরা পারে। জঙ্গলের হৃৎস্পন্দনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে জঙ্গলের কোনও রকম ক্ষতি না করে বছরের পরে বছর এরা এখানে কাটিয়েছে। জঙ্গলই এদের ক্লাসরুম। এদের দোষ এরা কোনও পার্থিব কিছু সঞ্চয় করে না। জঙ্গলের মাটিতে, গাছে, আকাশে, বাতাসে এত কিছু আছে, কী দরকার সঞ্চয়ের? এরা অহেতুক অন্যদের ক্ষতিও করে না। তাই হয়তো এদের অসভ্য বলে ভাবা হয়। এই যেমন এই লোকগুলো আবার সব ফেলে রেখে অন্য জায়গায় চলে যাবে। পড়ে থাকবে এরকম কিছু মাটির বাড়ি যারা শেষে ওদের মতোই জঙ্গলের মাটিতে মিশে যাবে।

জঙ্গলে রাত এগারোটা মানে অনেকটা রাত। গতকাল গভীর রাত অব্দি নাচ, গান, গল্প বলা চলেছিল। তারপরে যে যায় মতো শুতে চলে গেল।

অনিলিখা শুয়েছিল এক ব্যামবুটি বৃদ্ধার সঙ্গে। ঘরগুলো উচ্চতায় চার ফুট হবে। মাথা অনেক নীচু করে ঘরের ভেতর ঢুকতে হয়। ঢুকে ভেতরে দাঁড়িয়ে থাকাটা বেশ কষ্টকর। ভেতরে এসেই মাটির উপর চাটাই পেতে শুয়ে পড়েছিল। মাঝরাতে জলতেষ্টা পেয়েছিল অনিলিখার। উঠে বসতে হঠাৎ মনে হল ঘরের ঠিক বাইরে কিছু একটা যেন হাঁটছে। খুব সন্তর্পণে।

আস্তে করে রাইফেলটা হাতে নিল অনিলিখা। ঘরে কোনও জানলা নেই। দরজাটা সামান্য ফাঁক করে যা দেখল তাতে সারা শরীরে শিহরন খেলে গেল। একটা কাস্তের আকারের চাঁদের আলোর আলোছায়ায় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে একটা লেপার্ড, বেশ বড় আকারের, কিছু দূরের একটা ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তারপরে সেটা লাফিয়ে ঘরটার ছাদে উঠে গেল। ঘরের উপরে পাতার ছাউনি। সেটা সরিয়ে নীচে ঘরের মধ্যে নামা কিছুই নয়। সেটারই চেষ্টা করছে।

পরক্ষণেই একটা আর্তচিৎকার শুনল অনিলিখা। কিন্তু ওই ঘর থেকে নয়, অন্য একটা ঘর থেকে।

আর একমুহূর্ত দেরি না করে ওই লেপার্ডটাকে লক্ষ্য করে গুলি চালাল অনিলিখা। দু-দুবার। লাগল কি লাগল না, ঠিক বুঝল না। কিন্তু সে আওয়াজ অনেকের ঘুম ভাঙিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। পরক্ষণেই অনিলিখা দেখল ওই আহত লেপার্ডটা ওকে লক্ষ্য করে ঝড়ের বেগে ছুটে আসছে। মনে হল যেন দুটো হলুদ আলো এগিয়ে এল ওর দিকে। পরপর আরও দুটো গুলি করল অনিলিখা। এবারে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি। ওর থেকে কিছুটা দূরে লেপার্ডটা মাটির উপরে যেন ছিটকে পড়ল।

চারদিকে এখন সব ব্যামবুটিরা জেগে উঠেছে। আগুন জ্বেলে অনেক খোঁজাখুজির পরেও অন্য লেপার্ডটাকে খুঁজে পাওয়া গেল না। কিন্তু একজন পিগমির ক্ষতবিক্ষত দেহ পাওয়া গেল। আরেকজন উধাও।

ভোর হতেই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে দুজন ব্যামবুটিকে সঙ্গে নিয়ে বেশ

কয়েক ঘণ্টা হেঁটে অনিলিখা ও ইমামু প্রথমে গেল কাছের বান্টুদের গ্রামে।

সেখান থেকে কথা বলল ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে। অনিলিখা জানিয়ে রাখল গত রাতের ঘটনা, একই সঙ্গে কোথায় ওই বাড়িটা থাকতে পারে, সেটাও। এখানকার অন্য অনেক রহস্যের সমাধানও যে ওই বাড়িতেই পাওয়া সম্ভব, তেমন একটা ইঙ্গিত দিয়ে রাখল। অনিলিখার ধারণা এই যে লেপার্ড বা শিম্পাঞ্জির মধ্যে আগ্রাসন, এদের ব্যবহারে পরিবর্তন, সদলবলে আক্রমণ, নতুন কোনও হিংস্র প্রাণী—এসব কিছুর সঙ্গে যুক্ত আছে ওই বাড়ি ও মিস্টার পাই-এর বন্ধু বিজ্ঞানী আরনেস্ট সলভে।

অনিলিখারা দুজন বান্টু শিকারিকে সঙ্গে নিল। তার জন্য অবশ্য অনেক টাকা দিতে হল। কারণ কেউই ওই দিকের জঙ্গলে যেতে চায় না। সঙ্গে নিল জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার জন্য আরও কিছু আবশ্যিক জিনিস, রাইফেল।

আর একটুও সময় নষ্ট করলে চলবে না। মন বলছে মিস্টার পাই এখনও জীবিত। শুধু একটাই সমস্যা, সঙ্গের সেই পিগমি বাচ্চা ছেলেটাকে পাওয়া যাবে তো? নয়তো কে পথ দেখাবে?

২৯ জুলাই

গতকাল রাতে আর কিছু হয়নি। তবে সবাই সতর্ক ছিল। বেশ কয়েক জায়গায় আগুন জ্বালিয়ে রাখা হয়েছিল।

পরের দিন ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতে অনিলিখারা বেরিয়ে পড়ল।

এদিকের জঙ্গল যে কতটা গভীর তা না এলে বোঝা যেত না। জঙ্গল যে এত দুর্ভেদ্য হতে পারে, না দেখলে অনিলিখারও বিশ্বাস হতো না।

অনিলিখা আমাজনের জঙ্গলে গেছে, গেছে বোরনিওর রেন ফরেস্টে, এখানে এসেও গত কয়েকদিন জঙ্গলে গেছে। কিন্তু এ জঙ্গল যেন একদম অন্যরকম। যেন কোনওদিন কেউ এর বুকে হাঁটার চেষ্টা করেনি।

যেতে যেতে মনে হচ্ছিল বাচ্চা ছেলেটার কথার উপরে নির্ভর করে এত বড় রিস্ক নেওয়া ঠিক হচ্ছে তো।

সঙ্গে অবশ্য বাচ্চা ছেলেটাকে পেতে অসুবিধে হয়নি। শুধু তাই নয়, অনিলিখা ইতিমধ্যেই ব্যামবুটিদের এতটাই আপনজন হয়ে গেছে যে আরও চারজন সেরা ব্যামবুটি শিকারি এই অভিযানে সঙ্গী হয়েছে। বান্টুদের কথা আলাদা। ওরা এসেছে টাকার লোভে। তাছাড়া এদের কাছে এই উত্তরের জঙ্গল তেমন আলাদা কিছু নয়।

কিন্তু ব্যামবুটিদের ক্ষেত্রে সেটা সত্যি নয়। এরা জানে এই জঙ্গল অনেক

বেশি বিপজ্জনক। অনেক অচেনা হিংস্র জীব আছে এদিকে। এই দিকের জঙ্গলে এরা আগে কখনও আসেনি।

কিন্তু যে সভ্য মানুষ এদের জন্য লেপার্ডের মুখোমুখি হতে দ্বিধা করে না, যে সভ্য মহিলা ওদের সঙ্গে মানুষের মতো ব্যবহার করে, তাদের জন্য অনেক কিছুই করতে পারে ব্যামবুটিরা। ওরা সঙ্গে নিয়েছে তির ধনুক, বর্শা। কোমরে গাছের ডাল কাটার জন্যে ছুরি। বাকি সবার হাতে রাইফেল।

মাঝে মধ্যে ওরা সামনে যাওয়ার কোনও পথ না পেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। তারপরে বেশ কিছু জায়গায় গাছের ডাল কেটে পথ করে নিতে হয়। মাথার অনেক উপরে গাছের ক্যানোপি। প্রায় কুড়ি ফুট গভীর গাছের পাতার সে আচ্ছাদন ঠিক যেন জঙ্গলের ছাদের মতো। জঙ্গলের সব অজানা রহস্যকে লুকিয়ে রেখেছে বাকি বিশ্বের থেকে, স্যাটেলাইটের থেকে।

জঙ্গলের নীচে যেন সূর্যের আলো, বাতাস, বৃষ্টিরও আসা বারণ। এখানে দিনের বেলাতেও যেন রাতের অন্ধকার চারপাশে। তেমনি গরম ও বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ অনেক বেশি। উপরের দিকে তাকালে গাছের পাতার ছাউনির সামান্য ফাঁক দিয়ে আসা আলো হিরের দ্যুতির মতো চোখ ঝলসে দেয়। ঘামে সারা গা ভিজে যাচ্ছে। উপরে ক্যানোপিতে কলোবাস বাঁদর থেকে সাপ, নানান রকম পাখি থেকে শ্লথও আছে।

বাচ্চা ছেলেটার দেখানো পথ অনুযায়ী ওরা এগোতে লাগল গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে। ওই বাড়িতে যাওয়ার নিশ্চয়ই অন্য পথ আছে যেখান দিয়ে মিস্টার পাইদের নিয়ে আসা হয়েছিল, যেখান দিয়ে অন্যরা যাতায়াত করে।

রেন ফরেস্টের একটা আলাদা গন্ধ থাকে। ভেজা মাটি, পচা পাতা সব মিলে মিশে এক অন্যরকম গন্ধ। সেই গন্ধে যেন এক নেশা আছে।

মেহগিনি, ইবনী, লিম্বা, বাওবাব নানান ধরনের বিশাল বিশাল বৃক্ষের সমাহার। মাঝে মধ্যে অজস্র ছোট ছোট উড়ন্ত পোকায় ঘিরে ধরছে। পায়ের সামনে কোনও সরীসৃপ আছে কিনা সেদিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হচ্ছে। এদিকের জঙ্গলে আবার জলা জায়গা বেশি। মাঝে মধ্যেই ওদের এগিয়ে যেতে হচ্ছে হাঁটুজলের মধ্যে দিয়ে। সেখানে কুমির থাকাটাও আশ্চর্য নয়।

যদিও অনিলিখার সঙ্গীরা অনিলিখার থেকে এই জঙ্গলের ব্যাপারে অনেক বেশি অভিজ্ঞ, তবে এখানে প্রত্যেককেই সমান সাবধানী হতে হয়। কখন কী চোখে পড়ে। প্রায় তিন-চার ঘণ্টা হাঁটার পরে হঠাৎ করে প্রবল বৃষ্টি এল। সঙ্গে ঝড়। পাতার ছাওনি ভেদ করে তেমন ভাবে জল না এলেও বৃষ্টি ও হাওয়ার শব্দে অন্য সব শব্দ যেন হারিয়ে যাচ্ছিল।

অনিলিখার ঠিক ডান দিকে হঠাৎ করে একটা জোরালো আওয়াজ হতে সে চমকে উঠল। তার পরক্ষণেই বাঁদিক থেকে এল আওয়াজটা, তারপর সামনে

থেকেও। ইমামু অভিজ্ঞ। ব্যামবুটি শিকারিরা বর্শা নিয়ে তৈরি। সবার মুখে-চোখে ভীতি।

অনিলিখা ইঙ্গিতে বুঝল কোনও একটা সিলভারব্যাক গরিলার দল চারদিক থেকে ঘিরে ধরেছে। ব্যামবুটি শিকারিরা সব থেকে বেশি অভিজ্ঞ। হাত নেড়ে সবাইকে নিঃশব্দে পিছিয়ে আসতে বলল। এই গরিলা দলের মধ্যে একজন অ্যালফা মেল গরিলা দলনেতা থাকবেই যে তার পরাক্রম দেখাতে আক্রমণ করতে দ্বিধা করবে না। এই শক্তির পরিচয় না দিলে ওর দলনেতা হয়ে থাকাটাই চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠবে।

অনিলিখারা সে পথ থেকে সরে এসে আবার অন্য পথ দিয়ে এগোল। এখানে গাছে গাছে ফল পাকুড়ের অভাব নেই। জঙ্গলের নীচের দিকেও গভীর লতাপাতার জঙ্গল। তাই খুব ধীরে ধীরে এগোতে হচ্ছিল।

ফোনে নেটওয়ার্ক নেই, তবে যাতে ওর ফোন ট্র্যাক করা যায় সে ব্যবস্থা করে এসেছে অনিলিখা। সঙ্গে কম্পাস দিয়ে মাঝে মধ্যে দেখে নিচ্ছে ঠিক দিকে এগোচ্ছে কিনা।

যেতে যেতে একটা জায়গায় ওরা হাতির দলের পায়ের ছাপ দেখতে পেল। কিছুক্ষণ আগেই গেছে ওখান দিয়ে। এদিকে হাতির সংখ্যা কম। থাকলে ওরাই কিছুটা যাওয়ার পথ করে দেয়। কিছু দূরে একটা জায়গায় লেপার্ড ও বুনো মোষের বর্জ্যও চোখে পড়ল। সেটাও পুরনো নয়। কয়েক ঘণ্টা আগের। আশেপাশেই হয়তো আছে। চারদিক থেকে ভেসে আসছে নানান ধরনের পাখির ডাক, ও আরও অনেক রকম শব্দ। কাদামাটি ছাড়িয়ে এবারে ওরা উঁচু নীচু পাথুরে পথ ধরে এগোল।

কিছুক্ষণ ধরেই অনিলিখার মনে হচ্ছিল যেন চারদিকের পাখির আওয়াজ আর অন্যান্য শব্দ কিছুটা কমে এসেছে। সামনে একটা জলাশয় পড়ল। সেটা পেরিয়ে যেতে হবে। তার উপরে যেন একটা বিশাল বড় কালো রঙের গাছের বেশ কয়েকটা টুকরো ভাসছে। সঙ্গের শিকারিরা উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। কেন তা পরক্ষণেই বুঝল অনিলিখা। আর কাছে না গিয়ে জিনিসটা কী আন্দাজ করে চমকে উঠল।

এ তো সাপ! এত বড় সাপ আগে কখনও দেখেনি অনিলিখা। প্রায় পঞ্চাশ ফুট লম্বা হবে। চওড়া সাড়ে তিন ফুটের মতো। কিন্তু পুরো শরীরটার ক্ষতবিক্ষত কিছু অংশ পড়ে আছে। এটা কি এখনই হয়েছে?

ইমামুর মতো দুর্ধর্ষ শিকারি পর্যন্ত ভয়ে কাঁপছিল। সবার মুখে আতঙ্কের ছায়া। এটাই কী সেই টাইটানোবোয়া যার কথা অনেকসময় কঙ্গোর উপজাতিরা বলেছে। ১৯৫৯ সালে এক বেলজিয়ান কর্নেল এই পঞ্চাশ ফুট সাপ দেখেছিল। এই সাপের ফনাই মাটি ছেড়ে উঠে এসেছিল দশ ফুট অব্দি। সে ছবি সারা

বিশ্বের সামনে থাকলেও সেই সাপের আর খোঁজ পাওয়া যায়নি। যদিও এরকম প্রজাতি যে কঙ্গোতে থাকতে পারে সেটা অনেক বিজ্ঞানীই বলেছে।

৬৬ মিলিয়ন বছর আগে প্যালিওসিন যুগে এ ধরনের সাপ ছিল। তাদের ফসিলও পাওয়া গেছে। গত কয়েকশো বছরে বেশ কয়েকবার দেখা গেলেও ধারণা করা হয়েছিল যে খাদ্যের অভাবে এই সাপ এখন আর নেই। কিন্তু সে সাপ যে আজও আছে তার প্রমাণ অনিলিখার চোখের সামনে।

কিন্তু এখন প্রশ্ন অন্য, যে সাপ অনায়াসে কুমির বা গরিলাকে জড়িয়ে ধরে কয়েক মুহূর্তে মারতে পারে, তাকে মারল কে? তারা কারা?

বান্টু শিকারিরা আর এগোতে চাইছে না। ফিরে যেতে চায়। যেটুকু আলো ছিল তাও কমে এসেছে। এখনও কোনও বাড়ির চিহ্ন পাওয়া যায়নি। কিন্তু এখান থেকে ফেরাও সম্ভব নয় এখন।

অনেকক্ষণ ধরেই অনিলিখার মনে হচ্ছে যেন অদৃশ্য কিছু ওদের পিছু পিছু আসছে। কিন্তু ওদের সামনে আসছে না। আশেপাশের বনানীর মধ্যে লুকিয়ে আছে।

হঠাৎ পাশের জঙ্গলের মধ্যে যেন কালো মতো একটা কিছু নড়ে উঠল। আশেপাশের জঙ্গল যেন হঠাৎ জীবন্ত হয়ে এগিয়ে এল ওদের দিকে। সামনে জল কাদা যার মধ্যে সাপটা পড়ে আছে, তার মধ্যে দিয়ে ছোটাও সম্ভব নয়। কিছু বুঝে ওঠার আগেই ওরা দেখল একটা শিম্পাঞ্জির বিশাল দল ওদের ঘিরে ধরেছে।

ওরা রাইফেল তুলে ধরার আগেই বিদ্যুতের গতিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল চারদিক থেকে। অনিলিখা রাইফেল তুলে সামনে থেকে ছুটে আসা এক শিম্পাঞ্জিকে গুলি চালানোর আগেই পেছন থেকে ওর মাথায় সজোরে পাথর দিয়ে আঘাত করল কেউ। চারদিক অন্ধকার হয়ে এল মুহূর্তে। জ্ঞান হারাল অনিলিখা।

৩১ জুলাই

জ্ঞান ফিরতেই অনিলিখা অবাক হয়ে দেখল ওর মাথায় ব্যান্ডেজ। বেশ কিছুক্ষণ কোনও কিছুই খেয়াল করতে পারল না। পরে আস্তে আস্তে সব মনে পড়ে গেল। কোথায় ও?

অবাক হয়ে দেখল একটা খাঁচার মধ্যে বসে আছে। খাঁচার বাইরে একটা বিশাল শিম্পাঞ্জি বসে আছে। ওর দিকেই তাকিয়ে আছে। এমন মুহূর্তেও অনিলিখার হাসি পেল। সব কিছু কেমন উল্টে গেছে।

একটা বেশ আধুনিক বিল্ডিংওের মধ্যে এই খাঁচা।

উঠে দাঁড়াতে গিয়ে ফের বসে পড়ল অনিলিখা। মাথা ঘুরছে। কোনও এক যান্ত্রিক গম্ভীর স্বর অনিলিখাকে উদ্দেশ্য করে ইংরেজিতে বলে উঠল, ওয়েলকাম টু মাই হাউস, অনিলিখা। আমি আরনেস্ট বলছি। কেন যে এত কষ্ট করে আসতে গেলে। আমি তো নিজেই নিয়ে আসছিলাম। শুধু শুধু এত রক্তপাত করতে হল। এতগুলো হত্যা।

অনিলিখা ঘাড় ঘুরিয়ে দেখার চেষ্টা করল আওয়াজটা কোথা থেকে আসছে। গলা শুকিয়ে গিয়েছিল। পাশে রাখা জলের গ্লাসে গলা ভিজিয়ে নিয়ে বলল, কোথায় তুমি? কী চাও আমাদের কাছে?

আমি চাই তুমি আমাদের সঙ্গে কাজ করো।

কীসের কাজ?

সে বলছি। হেসে উঠল আরনেস্ট।

মিস্টার পাই? উনি কোথায়?

হ্যাঁ, মিস্টার পাইও এখানে আছেন। তবে ডেভিড আর বেঁচে নেই। তাকে আমার প্রয়োজন ছিল না। শুধু তোমাকে আর মিস্টার পাইকে আমার প্রয়োজন। সেজন্য তোমরা এখনও বেঁচে আছ।

আমার সঙ্গীরা সবাই? ইমামু, আমার ব্যামবুটি বন্ধুরা?

কেউ বেঁচে নেই। সবাই এখন আমার পোষা শিম্পাঞ্জিদের শিকার। একমাত্র তোমাকে বাঁচিয়ে অক্ষতভাবে আনতে বলেছিলাম। ওরা খুব বুদ্ধিমান। সেটাই করেছে ওদের আদিম হিংস্র প্রবৃত্তির কথা না শুনে। তবে তোমার মাথা ফেটে অনেক রক্ত বেরিয়েছে। কিন্তু তুমি ভাগ্যবান, আপাতত বেঁচে আছ। ঠিক যতক্ষণ আমার কথা শুনবে, ততক্ষণ তুমি বেঁচে থাকবে। আমি তোমার সব কথা জানি। তোমার মতো অত্যন্ত প্রতিভাবান একজনকে আমার দরকার যে আমাকে আমার কাজে সাহায্য করতে পারবে।

কে তুমি? তুমি তো আরনেস্ট সলভে নও। ও তো এভাবে কথা বলে না। তুমি তার সৃষ্টি, তার সৃষ্ট কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। তাই তো?

যেন রাগত গলায় উত্তর এল—আমার একটা নাম আছে। সেটা হল আরনেস্ট। আরনেস্ট সলভেরই দেওয়া নাম। আরনেস্ট সলভেরই তৈরি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যা পৃথিবীকে গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর থেকে বাঁচাতে চায়। আমি ওর দেওয়া সেই কাজই করেছি। সেটা করতে গেলে যা যা দরকার তা করছি।

তাই তোমাকে এত মানুষ মারতে হচ্ছে, তাই না? আমরাই তো এই গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর জন্যে সবথেকে বেশি দায়ী। এসব তারই অংশ।

হ্যাঁ, আবার ঠিক অনুমান করেছ। তবে তার জন্য আমাকে দেখতে হয়েছে

আমি আমার ক্ষমতার মধ্যে কী করতে পারি। সব কিছু তো চাইলেই আমি করতে পারি না। চাইলেই তো আর পুরো বিশ্বের মানুষ মারতে পারব না।

বুঝেছি।

এটা হয়তো তোমার পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। আমি কী করেছি তা তোমার জানার কথা নয়।

আমি আন্দাজ করেছি তুমি কী করেছ। তোমাকে তার আগে আরনেস্ট সলভে CRISPR-এর মাধ্যমে জিন এডিটিং-এর রিসার্চে ব্যবহার করেছিল। তাই তো?

হ্যাঁ, আমার কাজ ছিল কোন জেনেটিক প্যাটার্ন কোন প্রাণীর কী ধরনের ব্যবহারের জন্য দায়ী সেটা খুঁজে বার করা, কোনও একটা নির্দিষ্ট ধরনের ব্যবহার পাওয়ার জন্যে ঠিক কোন জিন দরকার, সেটা বুঝে ডিএনএ সিকোয়েন্সে দ্রুত পরিবর্তন আনা। CRISPR-Cas9-কে ঠিক সেভাবে জিন এডিটিং-এর কাজে ব্যবহার করাই ছিল আমার কাজ। সে কাজ আমি অত্যন্ত সফলভাবে করেছিলাম।

হ্যাঁ, আমার ধারণা উনি তোমাকে ব্যবহার করেছিলেন কিছু শস্যের ফলন বাড়ানোর জন্যে, তাকে আরও উষ্ণ আবহাওয়ার জন্য উপযুক্ত করে তোলার জন্যে, তাই না! হয়তো মানুষের কিছু জেনেটিক রোগ সারানোর জন্যেও তোমাকে ব্যবহার করেছিলেন। জিন এডিটিং করে অ্যালজাইমার কীভাবে সারানো সম্ভব তার উপরে সলভের একটা রিসার্চ পেপার কয়েক মাস আগে পড়েছিলাম। কিন্তু তোমাকে নিশ্চয়ই এভাবে লেপার্ড বা শিম্পাঞ্জির ব্যবহারে পরিবর্তন আনতে বলেনি যাতে তারা খুনি হয়ে ওঠে! কিন্তু সেটা তো একই ভাবে সম্ভব। সেটা বোঝার ক্ষমতা তোমার ছিল। তাই না?

হ্যাঁ। সেটা যে দরকার, তা আমি নিজে বুঝতে পারি। জানতে পারি যে এদের সাহায্যে এখানকার মানুষদের দ্রুত মারা সম্ভব।

আর তুমি সেটাকে ব্যবহার করলে একটা নতুন উদ্দেশে—গ্লোবাল ওয়ার্মিং কমানোর জন্য। বুঝলে যে এর জন্য সবার আগে দরকার মানুষকে নিশ্চিহ্ন করা, কারণ মানুষ একের পর এক এমন কাজ করে চলেছে, যার জন্য পৃথিবীর উষ্ণতা ক্রমশই বেড়ে চলেছে।

তুমি আবারও ঠিক। গ্লোবাল ওয়ার্মিং কমানোর জন্য মানুষের সংখ্যা যে দ্রুত কমানোর দরকার, সেটা আমিই ঠিক করেছি। তার জন্য আমার দরকার ছিল কিছু হিংস্র প্রাণী যারা খুব সহজে এখানকার মানুষকে হত্যা করতে পারে।

তাছাড়া, এই দুটো প্রাণী যে খুব স্পেশাল, তা কি তুমি জানতে?

হ্যাঁ, আমিই সিলেক্ট করেছি এদের।

সঠিক নির্বাচন। যেমন লেপার্ড। গায়ের জোর সাইজের তুলনায় অনেক

বেশি। গাছেও উঠতে পারে। খুব বুদ্ধিমান। জোরে দৌড়তে পারে। লাফিয়ে দশ ফুট অব্দি উঠে যেতে পারে। সব পরিবেশে মানিয়ে নিতে পারে। দরকার ছিল শুধু আরেকটু সাহসী করে তোলার। মানুষদের বিরুদ্ধে আরও আগ্রাসী করে তোলার। দলবদ্ধ করে তোলার। তাই তো?

তথ্যগত দিক দিয়ে ঠিক। হ্যাঁ, লেপার্ড কঙ্গোর সবথেকে শক্তিশালী প্রাণী হওয়ার ক্ষমতা রাখে, সবথেকে বেশি মানুষ মারতে পারে যদি দলবদ্ধ হয়।

শিম্পাঞ্জিও ঠিক তাই। অত্যন্ত বুদ্ধিমান। বুদ্ধিতে কিছু ক্ষেত্রে মানুষকেও চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে। জিনগত দিক দিয়ে মানুষের সবথেকে কাছের জীব, এমনকী শক্তিতেও মানুষের থেকে অনেক এগিয়ে। পাওয়ার, পলিটিক্স, কার সঙ্গে কখন কীভাবে বন্ধুত্ব স্থাপন করে ক্ষমতায় থাকতে হয়, শক্তিশালীর সঙ্গে কীভাবে বন্ধুত্ব রাখতে হয়, এসব ওরা জানে। ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স ও আরও নানান দিক দিয়ে এরা অন্য সব জীবজন্তুর থেকে অনেক এগিয়ে। সংঘবদ্ধ।

এদের একটা গ্রুপে পঞ্চাশ বা ষাটজন থাকে। কিন্তু গ্রুপের মধ্যে প্রত্যেকের অবস্থান, দায়িত্ব খুব পরিষ্কার। সবাই সেই অনুক্রম অনুযায়ী চলে ও সেই অনুক্রম অনুযায়ী যে অবস্থান ভালো কাজ করে তার থেকে আরও উপরের দিকে ওঠার চেষ্টা করে। ঠিক যেন একটা আর্মি। অনেক বেশি সংগঠিত। তাদের যদি আরও সংঘবদ্ধ করা যায়, মানুষের বিরুদ্ধে খেপিয়ে দেওয়া যায়, মানবহত্যার কাজে ব্যবহার করা হয়, তাহলে সেটা যথেষ্ট সফল ভাবেই এরা করবে। তোমার সীমিত ক্ষমতার মধ্যে এরাই সবথেকে বেশি প্রভাব তৈরি করতে পারবে, সবথেকে বেশি মানুষ মারার ক্ষমতা রাখবে। সেটা তোমার উদ্দেশ্যকে সবথেকে বেশি সাহায্য করবে, তাই না?

উল্টো দিক থেকে কিছুক্ষণের নীরবতা।

তুমি কি আরও কোনও প্রাণীকে নিয়ে ভাবছ?

অবশ্যই। কয়েকটা আমার ল্যাবে পরীক্ষার মধ্যে আছে। এবিষয়ে তোমাদের সাহায্য লাগবে। কারণ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে তুমি আমার প্রভুর মতোই অগ্রগণ্য বিজ্ঞানী। বিশেষ করে আমি যখন এখন আর ওনার সাহায্য পাচ্ছি না, তোমার সাহায্য আরও বেশি করে লাগবে। মিস্টার পাই বাকি সর্বক্ষেত্রে প্রায় বিশ্বের সেরা বিজ্ঞানী হিসেবে স্বীকৃত। ওনার সাহায্যও লাগবে।

অনিলিখা আর এক মুহূর্ত দেরি না করে বলল, আমি সাহায্যের জন্য প্রস্তুত। শর্ত হল মিস্টার পাইকে এখনই ছেড়ে দিতে হবে। আমরা এখানে থেকে তোমার এই কাজ আরও এগিয়ে নিয়ে যাব। কিন্তু আরনেস্ট সলভে কোথায়?

আমিই এখন আরনেস্ট সলভে। সবদিক দিয়ে।

সে না হয় বুঝলাম কিন্তু আগের আরনেস্ট সলভে—তোমার প্রভু—তার

কী হল?

উনি আমাকে থামাতে চেয়েছিলেন। সেজন্য ওনাকেই আমার থামাতে হল। উনি চাননি আমি আমার কাজ করে যাই। উনি আমাকে কাজ করতে দেবেন না।

তুমি কি ওনাকে মেরেছ?

না, আমি আমার প্রভুকে মারিনি। শুধু আটকে রেখেছি।

আচ্ছা, আমি বা মিস্টার পাই যে খাঁচার বাইরে যাব, তোমার পোষ্যরা কিছু করবে না?

এই বাড়িতে তোমাদের মতো মানুষের থেকে বেশি হিংস্র প্রাণী আর কেউ নেই। যারা আছে, তারা তোমাদের কোনও ক্ষতি করবে না।

আরনেস্ট সলভেকেও লাগতে পারে কাজে।

উনি করবেন না।

সেটা বোঝানোর দায়িত্ব আমার। আমি ওনার সঙ্গে কথা বলতে চাই। আমরা দুজনে মিলে তোমাকে আরও অনেক শক্তিশালী করে তুলব। তোমাকে সেরা করে তুলতে আমরা দুজনেই পারি।

ঠিক আছে। সেক্ষেত্রে আমি আমার প্রভুকেও ছেড়ে দেব।

আরনেস্টের কথা থেমে গেল।

শিম্পাঞ্জিটা খাঁচার বাইরে থেকে মুখ গলিয়ে অনিলিখাকে যেন আরও ভালো করে দেখার চেষ্টা করছে। খুব কৌতূহলী মুখ।

অনিলিখা উঠে দাঁড়াতে গিয়ে আবার বসে পড়ল। শুধু যে মাথায় চোট লেগেছে তাই নয়, ডান কাঁধে বড় রকম চোট আছে। খুব সম্ভবত শিম্পাঞ্জির নখের আঁচড়ে।

১ আগস্ট

এ কী চেহারা হয়েছে আপনার, মিস্টার পাই?

মাটিতে শুয়ে থাকা শীর্ণকায় লোকটাকে মিস্টার পাই বলে চেনাই যায় না।

কোনওরকমে উঠে বসলেন তিনি। যেন ঘোরের মধ্যে অনিলিখার দিকে একবার তাকালেন।

অনিলিখা! না না, সে কী করে হয়। তুমি এখানে আসবে কী করে। তোমাকে তো আমি এখানকার ঠিকানাই জানাতে পারিনি। জানালেও এরকম

জায়গায় কোনওদিন আসতে পারবে না।

আমি এসেছি মিস্টার পাই।

মিস্টার পাই-এর সামনে উবু হয়ে বসল অনিলিখা।

ঘরের মধ্যে সামান্য দিনের আলো আসছে। মিস্টার পাই যেন খানিকবাদে সম্বিৎ ফিরে পেলেন।

ফিসফিসিয়ে বললেন, কী করে এলে? তারপরে অনিলিখার হাত ছুঁয়ে দেখে যেন বিশ্বাস করতে পারলেন। বললেন, তুমি এক্ষুনি পালিয়ে যাও। ওরা তোমাকে দেখলেই ধরে মেরে ফেলবে। অথবা বাধ্য করবে এই কাজে...এখানে কী হচ্ছে ভাবতেও পারবে না। লেপার্ড, শিম্পাঞ্জিকে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মাধ্যমে আরও অনেক গুণ হিংস্র, বুদ্ধিমান ও শক্তিশালী তৈরি করে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে কঙ্গোর বিভিন্ন প্রান্তে। কেন করছে, কীভাবে করছে তা জানার চেষ্টা করতেই আমাকে ও ডেভিডকে ওরা ধরে ফেলল। ডেভিডকে ওরা মেরে ফেলেছে। একটা লেপার্ড আমার সামনে ওকে মেরে ফেলেছে। আমাকে যে কেন এখনও টিকিয়ে রেখেছে জানি না। আমি কোনওভাবে আরনেস্ট সলভেকে সাহায্য করব না। ওরা মানুষ মারতে চায়।

ইতিমধ্যে অনিলিখার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে আরনেস্ট সলভে। অনিলিখার কথায় ও সবে ছাড়া পেয়েছে।

আরনেস্ট সলভেকে দেখে মিস্টার পাই ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে বললেন, ডোন্ট ট্রাস্ট দিস ম্যান। হি কিল্ড ডেভিড। একটা শয়তান বদমায়েশ। এসব এর প্ল্যান। আমাদের ডেকে এনে খুন করেছে লেপার্ড দিয়ে। এখন নিজের রাজত্ব বানাতে চায় কঙ্গোতে।

অনিলিখা বুঝল এখনও মিস্টার পাই পুরো ব্যাপারটা বোঝেননি। বোঝেননি যে আরনেস্ট সলভে নিজেই জানতেন না তার সৃষ্ট কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আরনেস্ট কী করতে চলেছে, কেনই বা করতে চলেছে।

আরনেস্ট সলভের চোখেও জল। চুপ করে মিস্টার পাই-এর কথা শুনছেন আর কাঁদছেন। উনি জানেন না এর আর কোনও সমাধান আছে কিনা! উনি তো এটা কোনওদিন চাননি।

অনিলিখা জানে এখানে কিছু বলা যাবে না। চারদিকে সিসি টিভি ক্যামেরা, সেনসর। এখানে কে কী বলছে, কোথায় কী হচ্ছে সব কিছু এখন দেখছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আরনেস্ট। আরনেস্টের বুদ্ধিকে কম ভাবার কোনও কারণ নেই। হয়তো ও নিজেও অনিলিখাকে বিশ্বাস করেনি। শুধু সুযোগ দিচ্ছে।

অনিলিখা মিস্টার পাই-এর হাত ধরে টেনে তুলে শুধু বলল, সব ঠিক হয়ে যাবে।

মিস্টার পাই-এর মনে হয় উত্তেজনায় মাথা আর কাজ করছে না। চিৎকার করে বলে উঠলেন, কী ঠিক হয়ে যাবে অনিলিখা? এখানে আমরা আছি কী করে জানাবো বাকিদের? জানাতে পারলেও কেউ আসতে পারবে এরকম দুর্গম জায়গায়! চারদিকে যেখানে এরকম হিংস্র জুরাসিক পার্কের মতো জীব।

অনিলিখা হাত দেখিয়ে আস্তে কথা বলতে বলল মিস্টার পাইকে। কারণ মিস্টার পাইও বোধহয় দেখেননি যে দুটো বিশাল চেহারার শিম্পাঞ্জি কিছুটা দূরেই বসে ওদের উপরে লক্ষ রাখছে।

মিস্টার পাই এতক্ষণে অনিলিখার মাথার ব্যান্ডেজটা দেখেছেন। ওটা দেখিয়ে জিগ্যেস করলেন, কী করে হল?

একটু চোট পেয়েছিলাম। এখন ঠিক আছি। আপনারা আমার সঙ্গে কনফারেন্স রুমে আসুন। কথা আছে।

খানিকবাদে অনিলিখা দুজনকে নিয়ে এগিয়ে গেল পাশের একটা কনফারেন্স রুমের দিকে। শিম্পাঞ্জিদুটোও ওদের সঙ্গে সেই দরজার সামনে গিয়ে বসল। গার্ডের মতো। সত্যি কথা বলতে কী ওদের দিকে তাকালেই যেন ভয়ে হাত-পা ঠান্ডা হয়ে যায়। মনে হয় যে কোনও সময় কামড়ে দেবে। কী হিংস্র দৃষ্টি।

অনিলিখা এবারে জোরে জোরে কথা বলতে শুরু করল, আমাদের কাজ হবে আরনেস্টকে আরও শক্তিশালী করে তোলা। তার উদ্দেশ্য সফল করা। কীভাবে সে তার কাজ আরও তাড়াতাড়ি করতে পারে, তা দেখা।

কী সব বলছ অনিলিখা? তোমার কী মাথা খারাপ হয়ে গেছে? কেন ওকে সাহায্য করব?

আমাদের উপায় নেই। ওর উপকার করলেই আমরা বেঁচে থাকব। তাছাড়া, আমরা বিজ্ঞানী। এটা আমাদেরই কাজ।

এবারে ঘরে আবার আরনেস্টের যান্ত্রিক শীতল গলা পাওয়া গেল— আমি চাই আমার পরবর্তী প্রাণী খুঁজতে যা আমার উদ্দেশ্য আরও তাড়াতাড়ি সফল করবে। অনেক বেশি সংখ্যক মানুষ মেরে।

মিস্টার পাই রাগে চুপ করে বসে আছেন। এবারে খানিকটা বুঝতে পেরেছেন কী হচ্ছে। কিন্তু অনিলিখা কেন এই কৃত্রিম দুর্বুদ্ধিকে সাহায্য করছে! কিছু উদ্দেশ্য আছে কী?

অনিলিখা বলে উঠল, আমার মনে হয় এক্ষেত্রে সবথেকে বেশি সাহায্য করতে পারে মশা। এমনিতেও সবথেকে বেশি মানুষ মশার কামড়েই মরে। বড় কোনও প্রাণীর মাধ্যমে হয়তো ভয় বেশি সৃষ্টি করা যায়, কিন্তু মানুষ দ্রুত মারার জন্যে মশার মতো এফেকটিভ প্রাণী আর কিছু হতে পারে না। মশাকে আমরা জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মাধ্যমে এমন ভাবে পরিবর্তন করতে পারি, যাতে

অনেক বেশি হারে ম্যালেরিয়া সবার মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারে।

অনিলিখার বাঁ পাশে বসা বিজ্ঞানী আরনেস্ট সলভে এতক্ষণ চুপ ছিলেন। আর পারলেন না।

কী বলছ অনিলিখা? নিজের জীবন বাঁচানোর জন্যে তুমি মিলিয়ন লোককে মারতে চাও? তোমার সম্বন্ধে তো অন্য কথা শুনেছিলাম।

জবাবে অনিলিখা বলল, কিন্তু আরনেস্ট সলভে, আপনি বলুন এটাও তো সত্যি যে আজ গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর মাধ্যমে পুরো পৃথিবীকে বিপন্ন করার জন্যে মানুষই দায়ী। অন্য কোনও প্রাণী এভাবে গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর জন্য দায়ী নয়। এমনিতেও মানুষ একদিন মরবে, শুধু আগে মরা বা পরে মরা।

সঠিক। মশা-ই হবে আমার পরের প্রাণী। লেপার্ডে ও শিম্পাঞ্জিতে যে অসুবিধে হয়েছে সেটা এদের ক্ষেত্রে হবে না। এ বিষয়ে আমাকে দ্রুত সফল করাই হবে তোমাদের তিনজনের কাজ। কোনও প্রশ্ন আছে? কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যান্ত্রিক স্বর বলে উঠল।

কী অসুবিধে হয়েছে এদের ক্ষেত্রে? অনিলিখা প্রশ্ন করল।

দুটো। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মাধ্যমে যাদের জিন পরিবর্তন করেছি, তারা কেউই বেশিদিন বাঁচছে না। তাই আগামীদিনে আমাকে অন্য কিছু ভাবতে হবে। আমাকে জেনেটিকালি ইঞ্জিনিয়ারড লেপার্ড ও শিম্পাঞ্জি সমানে তৈরি করে যেতেই হবে। তা না হলে আমার উদ্দেশ্য সফল হবে না।

১ আগস্ট

অনিলিখা নিজের ঘরে ফিরে এল। অনেক রক্তপাত হওয়ায় এখনও ক্লান্তি আছে। ঘাড়ের ব্যাথাটা আরও বেড়েছে। মনে হচ্ছে বিষিয়ে উঠছে জায়গাটা।

খাঁচা থেকে মুক্তি পেলেও এই ঘর যে খাঁচার থেকে ভালো কিছু নয়, সেটা আনিলিখা জানে। নিশ্চয়ই অজস্র ক্যামেরার মাধ্যমে লক্ষ রাখা হচ্ছে ওর প্রত্যেকটা পদক্ষেপের উপরে, হয়তো বিশ্লেষণ করা হচ্ছে ওর উদ্দেশ্য। এ তো আর মানুষ নয় যে বিশ্রামের প্রয়োজন হবে।

তাছাড়া এই বাড়িতে লেপার্ড না থাকলেও বেশ কয়েকটা হিংস্র শিম্পাঞ্জি আছে। এমনিতে এরা মানুষের থেকে পাঁচ থেকে সাতগুণ শক্তিশালী হয়। তাছাড়া এদের আরও অনেক বেশি শক্তিশালী ও হিংস্র করে তোলা হয়েছে। নির্দেশ পেলে অনিলিখাকে টুকরো করতে সময় নেবে না।

এখানে ইন্টারনেট নেই, ফোনে কোনও রকম নেটওয়ার্ক নেই। তবে

অনিলিখা কোথায় সেটা নিশ্চয়ই এতক্ষণে ভারতীয় দূতাবাস বুঝতে পেরেছে। সেভাবে যাতে ট্র্যাক করতে পারে সে ব্যবস্থা করে এসেছিল অনিলিখা।

কথা অনুযায়ী নিশ্চয়ই এতক্ষণে সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছে ওরা। হয়তো কঙ্গো আর্মিও সঙ্গে আছে।

কিন্তু ওরা কী এখানকার পথ খুঁজে আসতে পারবে? যে পথে অনিলিখা আসছিল, সে পথে আসা অসম্ভব। হয়তো অন্য কোনও ভালো পথ আছে। কিন্তু মিস্টার পাই সেটাকেও অত্যন্ত দুর্গম পথ বললেন। হয়তো ইচ্ছে করেই সেরকম ভাবে রাখা আছে যাতে অন্য কেউ সহজে এখানে আসতে না পারে।

অনিলিখা ঘরের মধ্যে হাঁটতে হাটতে ভাবতে থাকে। কীভাবে থামানো যাবে এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে, আরনেস্টকে। এমন কিছু করতে হবে যাতে এ থেমে যায়। কিন্তু কোনও কিছু পরিবর্তন করার চেষ্টা করলে সেটা বোঝার মতো ইন্টেলিজেন্স এখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার থাকবে। এখন যাকে বলে 'Alignment Problem', কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে, সেটা এখন চলে এসছে।

এত বড় বিজ্ঞানী আরনেস্ট সলভে কীভাবে এরকম একটা ভুল করে বসলেন! এরকম একটা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে এভাবে আউট অফ কন্ট্রোল হতে দিয়ে। নির্দিষ্ট কিছু নিয়মের কথা, শর্তের কথা আগেই বলে দেওয়া উচিত ছিল যাতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এই পথে চিন্তা না করে।

'রেড টিমিং' টেকনিক ব্যবহার করে এর ধারণাগুলোকে আগেই চ্যালেঞ্জ জানানো উচিত ছিল, বদলে দেওয়া উচিত ছিল যাতে এ মানুষ হত্যার মেশিন না হয়ে যায়। সেটা না করে কীভাবে ডিজাইন করল এরকম একটা সিস্টেম, যার কোনও 'কিল সুইচ' নেই। সব কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রোগ্রামের ক্ষেত্রেই এই 'কিল সুইচ' বা কীভাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে ইচ্ছেমতো থামানো যেতে পারে, তার কথা সবার আগে ভাবা উচিত।

এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মূল প্রাণভোমরা যে ডেটাসেন্টার সারভার তাকে যদি কোনওভাবে বন্ধ করে দেওয়া যায়। একবার এটা কোনওভাবে করতে পারলে, তবেই থামানো যাবে একে। কিন্তু কোথায় আছে এই সারভার? নিশ্চয়ই এই বাড়িতে কোথাও আছে। কিন্তু কোথায় থাকতে পারে? নিশ্চয়ই সেটা অত্যন্ত সুরক্ষিতভাবে রাখা। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিজেকে কি বাঁচানোর চেষ্টা করবে না!

মুশকিল হচ্ছে এই বিষয়ে সবথেকে ভালো যিনি জানেন, সেই বিজ্ঞানী আরনেস্ট সলভেকে জিগ্যেস করা যাবে না। সব কথা শুনছে অন্য আরনেস্ট, যার পার্থিব কোনও অস্তিত্বই নেই। সেটাই আরো ভয়ের। অনেক সময় নিজের অন্যমনস্কতায় এমন কিছু করে ফেলতে পারে যাতে মুহূর্তে এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা অনিলিখার আসল উদ্দেশ্য ধরে ফেলতে পারে। সেক্ষেত্রে দ্বিতীয়বার সে সুযোগ

পাওয়া যাবে না।

আরনেস্ট সলভে ও মিস্টার পাইকে আলাদা আলাদা ঘরে রাখা হয়েছে। মিসটার পাই এখন অনেকটা স্বাভাবিক হয়েছেন। উনি যথেষ্ট বুদ্ধিমান মানুষ। নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন অনিলিখা কী করতে চলেছে।

অন্যদিকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আরনেস্ট সেও কী চুপ করে বসে আছে? নাকি সে অন্য কোনও খেলা খেলছে ওদের নিয়ে? ও হয়তো অনিলিখার সম্বন্ধে অতীতের সব তথ্য বিশ্লেষণ করে আরও ভালো করে অনিলিখাকে বোঝার চেষ্টা করছে। অনিলিখা সম্বন্ধে আরেকটু বেশি জানলেই ও বুঝতে পারবে যে অনিলিখা কখনই এরকম কোনও অন্যায় কাজ করতে পারে না। মুশকিল হচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কী ভাবছে তা মানুষের পক্ষে জানা অসম্ভব। ঠিক যে কারণে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী আরনেস্ট সলভের পক্ষেও তার সৃষ্টিকে কোনওভাবে বোঝা সম্ভব হয়নি।

ঘর থেকে বেরিয়ে এল অনিলিখা। ও আছে দোতলায়। বেরিয়ে প্যাসেজ দিয়ে স্বাভাবিক পদক্ষেপে এগিয়ে গেল। দু'দিকে একই রকম ঘর। প্যাসেজে আলো জ্বলছে। কোনও শিম্পাঞ্জি নেই এখানে। একটু এগোতেই ডানদিকে সিঁড়ি পড়ল। চওড়া কাঠের সিঁড়ি। কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে কয়েক ধাপ নীচে নামতেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল অনিলিখা। একটা বিশাল শিম্পাঞ্জি নীচের একতলার প্যাসেজে সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে আছে। অনিলিখার দিকেই তার হিংস্র স্থির ঘোলাটে লালচে চোখের দৃষ্টি। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁত বার করে একবার চাপা গর্জন করে উঠল যেন। তারপরে দুটো সিঁড়ি এক লাফে উপরে উঠে এল। অনিলিখা আর না নেমে ফিরে এল ঘরে। এখন আর যাওয়া সম্ভব নয়। তবে জানলা দিয়ে যদি নামা যায়, তবে বাইরে থেকে ভালো করে দেখা যাবে।

কিন্তু তখনই আবার সেই যান্ত্রিক শীতল গলা শোনা গেল— পালানোর চেষ্টা কোরো না অনিলিখা। এখান থেকে পালানো কোনওভাবে সম্ভব নয়। আমি তোমার উপরে লক্ষ রাখছি।

২ আগস্ট

পরের দিন সকাল ন'টায় আবার তিনজনের দেখা হল কনফারেন্সে। একসঙ্গে কাজ করতে হবে। দেখতে হবে কীভাবে আবার CRISPR টেকনিক মশার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়। কাজের মধ্যে অনিলিখা শুধু একবার দুজনের দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল, আমি কাল রাতে সেই স্বপ্নটা দেখলাম। যেখানে মাছের

পেটের মধ্যে ছিল রাক্ষসের প্রাণভোমরা। স্বপ্নে আমি সেটা খুঁজে পেলাম না।

এখানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা হল সেই রাক্ষস। ডেটাসেন্টার সার্ভার হল সেই প্রাণভোমরা। এই বিশাল বাড়ির ঠিক কোথায় আছে সে সার্ভার?

ওরা দুজনে কী বুঝলেন এই ইঙ্গিত থেকে বোঝা গেল না। কিন্তু আরনেস্ট সলভে যে বুঝেছিলেন সেটার প্রমাণ সেই রাতেই পেল অনিলিখা।

ভোররাতের দিকে বাইরে হঠাৎ করে যেন বেশ কয়েকটা গুলির আওয়াজ পেল অনিলিখা। বাইরের দরজা যেন ভেঙে ফেলা হচ্ছে। বাড়ির মধ্যেও পরপর গুলির শব্দ। চমক ভেঙে অনিলিখা উঠে বসল। বাইরে তুমুল ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু তা ছাপিয়ে শোনা যাচ্ছে গুলি চালানোর শব্দ। উঠে দাঁড়িয়ে জানলা দিয়ে তাকাতেই দেখল বাইরে কঙ্গো ও ভারতীয় আর্মির স্পেশাল কমান্ডো ফোর্স (গরুড়) বাড়িটাকে চারদিক দিয়ে ঘিরে ফেলেছে। তাদের হাতে অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র। শুধু তাদের চোখ দেখা যাচ্ছে। দুটো শিম্পাঞ্জি ওদের দিকে ছুটে যাচ্ছিল আক্রমণ করতে। কিন্তু পরক্ষণেই ইন্স্যাস অ্যাসল্ট রাইফেল থেকে পরপর ছুটে আসা গুলিতে স্তব্ধ হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। ঘরের বাইরে বেরোনো এখন ঠিক হবে না। কিন্তু অবাক ব্যাপার আরনেস্টের সেই যান্ত্রিক গলা শুনতে পেল না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই অনিলিখা ও মিস্টার পাইকে উদ্ধার করে ওরা বাইরে নিয়ে এল। চারদিকে বেশ কয়েকটা শিম্পাঞ্জির মৃতদেহ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। দূরে তিনটে লেপার্ডের। কিন্তু আরনেস্ট সলভের কোনও খোঁজ প্রথমে বাড়ির মধ্যে পাওয়া গেল না।

আধঘণ্টা বাদে আরনেস্ট সলভের দেহ পাওয়া গেল সেই বাড়ির অনেকটা পিছনে, আরেকটা বাড়ির মাটির নীচের বেসমেন্টে রাখা ডেটাসেন্টারে। লেপার্ডের আক্রমণে মৃত্যু হলেও তার আগে কৃত্রিম বুদ্ধিকে শেষ করে দিয়ে গেছেন আরনেস্ট সলভে। মৃত্যুর আগে তার ডিজাইন করা কিল সুইচের মাধ্যমে সার্ভারটা পুরোপুরি ধ্বংস করে দিয়েছেন।

যে ক'টা লেপার্ড ও শিম্পাঞ্জি ওই বাড়ির চৌহদ্দিতে ছিল তাদের শেষ করতে বেশি সময় লাগেনি। বাকি সৃষ্ট জেনেটিকালি ইঞ্জিনিয়ারড জীবদের খুঁজে বার করতে হবে, যদিও সে কাজ সহজ নয়। তবে তাদের আয়ু বেশি নয়, এটাই ভরসা।

বাইরে ভোরের আলো ছড়িয়ে পড়েছে। এসময় জঙ্গল রোজ যেন তার নতুন জীবন ফিরে পায়। তার সবুজ ক্যানভাসে নতুন করে ছবি আঁকতে শুরু করে। চারদিকে পাখির ডাক, অজানা অচেনা প্রাণীর ডাক শোনা যাচ্ছে।

মিস্টার পাই অনিলিখার দিকে এগিয়ে এসে বললেন, সত্যি তুমি পারো

বটে অনিলিখা। তোমার জন্যেই এই যাত্রায় প্রাণ ফিরে পেলাম। এরকম বড় সমস্যার সমাধান পাওয়া গেল। কী করে যে সব কিছু আন্দাজ করলে সেটা আমার কাছে এখনও রহস্য রয়ে গেল।

অনিলিখা কঙ্গোতে আসার পরেই মিস্টার পাই-এর থেকে পাওয়া দুটো ইমেলের কথা উল্লেখ করল যেখানে কোনও বাংলা শব্দ ছিল না। তাছাড়া কিছু বিষয় ছিল যা মিস্টার পাই-এর স্বভাবের সঙ্গে পুরোপুরি মেলে না। সেখান থেকেই যে প্রথম সন্দেহ হয় সেটা জানিয়ে অনিলিখা বলে, এটা যে-কোনও অ্যাডভানসড কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কাজ সেটা তখনই প্রথম সন্দেহ হয়। আপনার লেখার স্টাইল, ইংরেজি শব্দের ব্যবহার নিঁখুতভাবে জেনে উত্তর তৈরি করলেও বাংলা শব্দের কাছে জব্দ হয়ে গেছে বেচারা।

তাছাড়া, আমরা যেমন গল্প বানাতে পারি খুব সহজে, সেই কিছু বানিয়ে বলার আর্টটা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা খুব ভালো না জানায় তেমন কোনও জুৎসই কারণ খুঁজে পায়নি আমাকে আসার পরের দিনেই যেতে বলার কারণ হিসাবে। আমরা এমনকী যে-কোনও সাধারণ মানুষ হলে কী করত? ঠিক আরেকটা লাইন লিখে দিত বোঝানোর জন্য যাতে আমি আসি—'আমার শরীর হঠাৎ করে খুব খারাপ হয়েছে, চলে এসো' বা 'চারপাশের যা পরিস্থিতি তাতে এখন আর কোথাও একা যেও না অনিলিখা। একসঙ্গে যাব'—এই ধরনের কিছু। কিন্তু সেরকম কিছু না থাকায় আমি বুঝে যাই ওই ইমেল লিখেছে আপনার হয়ে কোনও আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেনস, লার্জ ল্যাঙ্গোয়েজ মডেলের মাধ্যমে। ওটা আপনার কেন, কোনও মানুষেরই যে লেখা নয়, সেটা তখনই আন্দাজ করেছিলাম।

অসাধারণ অনিলিখা। অসাধারণ!

ভারতীয় দূতাবাসের ফার্স্ট অফিসার ভিনীথ ইতিমধ্যে এগিয়ে এসে বললেন, এরকম অদ্ভুত কাণ্ড আমি আগে দেখিনি। পুরোটাই অদ্ভুত। কিছুই মাথায় ঢুকছে না। অনিলিখার কাছে সব কিছু শুনতে হবে পরে ডিটেলসে। কালকের আরেকটা মজার ঘটনা বলি শুনুন। এই গভীর জঙ্গলের মধ্যে কোথায় সেটা কিছুটা বুঝলেও আমরা কীভাবে আসব, সেটা কিছুতে বুঝে উঠতে পারছিলাম না। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে আসার কোনও পথই প্রায় নেই। এতটা পথ কীভাবে আসব। ঠিক সেই সময় খুব ইন্টারেস্টিং সঙ্গী জুটে গেল। একদল প্রজাপতি।

ঠিক যেন আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে। আমরা সবাই সত্যি অবাক। এরকম ঘটনা কখন আমরা দেখিনি। অথচ সামান্য ঘুরপথ হলেও ঠিক দিকেই যে নিয়ে যাচ্ছে সেটাও বুঝতে পারছিলাম। এত সরু সে পথ যে আমাদের কারো পক্ষে সেটা বার করা ও সেটা ধরে এতটা পথ আসা অসম্ভব ছিল। ঠিক এতটা এসে তারপরে হারিয়ে গেল ওরা। যেন ঠিক আমাদের পথ দেখাতে

দেখাতে আসছিল। এরকম অভিজ্ঞতা আমাদের কেনো, এই কঙ্গো সেনাদেরও কখনও হয়নি। তা না হলে এখান অব্দি আসতে পারতাম কিনা সন্দেহ। পারলেও আরও অন্তত দু'দিন লেগে যেত।

অনিলিখা মিস্টার পাই-এর দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বলল, আপনি নিশ্চয়ই বুঝেছেন এ কার কারসাজি! আপনার হাতে ধরে রাখা ওই পিপুলের চারাগাছটাও কিন্তু আমার থেকে কোনও অংশে কম যায় না। বুঝতে পারছেন তো কী করেছে ও? আপনাকে বাঁচাতে ওই আশেপাশের গাছেদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। যোগাযোগ করেছে এই প্রজাপতির দলের সঙ্গে যাতে তারা পথ দেখিয়ে ওদের নিয়ে আসে এখানে। আমরা ঠিক যেভাবে পথ হারানো অতিথিকে পথ দেখাই। ধন্য আপনার আবিষ্কার। আপনাকে ও সত্যি নিজের করে নিয়েছে।

দুটো প্রজাপতি ঠিক তখনই এসে বসল পিপুল গাছটার পাতার উপরে।



চারনোবিলে অনিলিখা

Arajakata Exclusive

২৬ আগস্ট, কল্যাণগড়

কিছুদিন আগেই মিঃ পাই ফিরেছেন স্পেন থেকে। এবারের অভিজ্ঞতা ওঁর বেশ ভয়ঙ্কর। একটা ছত্রাক, সামান্য একটা ছত্রাক যে কতটা সাঙ্ঘাতিক হতে পারে, সেটাই ড্রয়িংরুমে বই পড়তে পড়তে ভাবছিলেন তিনি। কিছুতেই বইতে মন বসছিল না।

একইসঙ্গে ডেভিডের জন্যে মন খারাপ। কিছুক্ষণ আগেই ডেভিডের মৃত্যুর খবরটা পেয়েছেন। ডেভিডের মতো একজন বিজ্ঞানী ও প্রিয় বন্ধুকে হারানো সত্যিই বেদনাদায়ক। মাদ্রিদের একটা হাসপাতালে আজ সকালে মারা গেছে ডেভিড। নামী ডাক্তাররাও কিছু করে উঠতে পারেনি। সবের পিছনে সেই ছত্রাক!

ড্রয়িংরুমে মিঃ পাই-এর ল্যান্ডলাইন ফোনটা একটানা বেজে যাচ্ছে। আজকাল বড্ড আজেবাজে ফোন আসে। বেশিরভাগের সঙ্গেই বিজ্ঞানের সামান্যতম যোগাযোগ থাকে না। তাই কয়েকদিন আগে মিঃ পাই গণেশকে এইসব ফোন ধরতে বারণ করেছেন। কিন্তু বলার ফলে তারপর থেকে গণেশ কোনও ফোনই ধরছে না।

ফোনটা আবারও বাজছে দেখে মিঃ পাই বাধ্য হয়ে বললেন, গণেশ, দেখো তো কার ফোন?

খানিকবাদে গণেশের উত্তর আসে, স্যার, অনিলিখার ফোন।

অনিলিখা?

মিঃ পাই সঙ্গে সঙ্গে সোফা থেকে লাফিয়ে উঠে ফোনের দিকে এগিয়ে যান। এই একজনের ফোন কখনও অকারণে আসে না।

কী ব্যাপার অনিলিখা? তুমি তো রীতিমতো ভ্যানিশ হয়ে গেছ। কোথায় আছ তুমি?

উল্টোদিকে অনিলিখার কথা স্পষ্ট শোনা গেল না। কথা কেটে কেটে যাচ্ছে।

কী বলছ? শুনতে পাচ্ছি না। তোমার দিকের নেটওয়ার্ক খুব খারাপ। কিচ্ছু শোনা যাচ্ছে না।

আরও কিছু অস্পষ্ট কথা ভেসে এল উল্টোদিক থেকে।

নাহ্, কোথায় আছ বলো তো? কীসের বিল? ইলেক্ট্রিসিটি বিল?

মিঃ পাই, আমি চারনোবিল থেকে বলছি। ইউক্রেনের চারনোবিল।

সর্বনাশ। চারনোবিল। সেখানে আবার কবে গেলে?

হ্যাঁ, আমি আপনার সঙ্গে একটা জরুরি ব্যাপারে কথা বলতে চাই ফোন কেটে যাওয়ার আগে। এখানে আমরা একটা গোপন অভিযানে এসেছিলাম। কিন্তু আমার সঙ্গে যে চারজন এসেছিল, তাদের সবাই এখন নিখোঁজ। আমি এখন এখানে সম্পূর্ণ একা। চারদিকে গভীর জঙ্গল, কেউ কোথাও নেই। একটা খুব দরকারি কথা জানাতে...

ফোনটা কেটে গেল।

হ্যালো, অনিলিখা, হ্যালো। শুনতে পাচ্ছ?

কোনও উত্তর এল না।

একটা অচেনা নাম্বার থেকে ফোনটা এসেছিল। মিঃ পাই সেই নাম্বারে চেষ্টা করলেন। না পেয়ে তারপর অনিলিখার মোবাইল ফোনে কয়েকবার চেষ্টা করলেন। ফোন সুইচড অফ।

মিঃ পাই উত্তেজনায় ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে শুরু করলেন। তাহলে কী অনিলিখার মৃত্যু আসন্ন। চারনোবিল এখন তো মৃত্যুপুরী। ও কী করতে চারনোবিল গেল? অনিলিখার যদি সত্যি কিছু হয়।

তাঁর হাঁটার গতিবেগ বেড়ে গেল। আর কেউ না জানুক, মিঃ পাই জানেন চারনোবিলে কী হয়েছে।

সেই ফাঙ্গাস সংক্রমিত নেকড়ে বাঘটা এসেছিল চারনোবিল থেকে। এখন ওই নেকড়ে বাঘটা নিশ্চয়ই সেই অচেনা ফাঙ্গাসের একমাত্র শিকার নয়। একটা সংক্রমিত নেকড়ে বাঘের মাধ্যমেই যদি স্পেনে এরকম বড় বিপর্যয় ঘটে থাকে, তাহলে অনিলিখার ওখান থেকে বেঁচে ফেরা অসম্ভব। অনিলিখার সঙ্গীরাও নিশ্চয়ই সে কারণেই উধাও, হয়তো ইতিমধ্যেই ওদের শিকার।

এব্যাপারে নিশ্চয়ই কিছু একটা বলতে চেয়েছিল অনিলিখা।

এখানে কিছু কথা আগে থেকে বলা দরকার।

মিঃ পাই দু'সপ্তাহ আগে স্পেনে গিয়েছিলেন একটা সায়েন্স কনফারেন্সে। একা নয়, সঙ্গে মিঃ পাই-এর বন্ধু ডেভিডও ছিলেন। ডেভিড কেম্ব্রিজের প্রফেসার। রোবোটিক্সের রিসার্চের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে যুক্ত। সেখানে থাকাকালীন বন্ধু জুওলজিস্ট কার্লোসের বাড়ি যান। কার্লোসের অনুরোধেই যাওয়া। কার্লোস তার কিছুদিন আগেই এক বৈজ্ঞানিক অভিযানে গিয়ে পরিত্যক্ত শহর চারনোবিল থেকে একটা নেকড়ে বাঘ সঙ্গে করে এনেছে। বিশেষ অনুমতি ছাড়া চারনোবিল যাওয়া যায় না। ওখানকার জীবজগতের উপর এত বছরে পরমাণু বিস্ফোরণের কী প্রভাব পড়েছে—তাই ছিল কার্লোস ও তার সঙ্গীসাথীদের অভিযানের মূল উদ্দেশ্য।

১৯৮৬ সালে চারনোবিলের প্ল্যান্টের চার নম্বর রিয়াক্টরে পারমাণবিক বিস্ফোরণের কথা তো সবারই জানা। তারপর থেকে ওই এলাকায় রেডিও

অ্যাক্টিভিটির মাত্রা অস্বাভাবিক রকম বেশি হয়ে যাওয়ায় সবাই শুধু ওখান থেকেই নয়, আশেপাশের সব শহর ছেড়ে চলে যায়।

বহু মানুষ প্রাণ হারিয়েছিলেন সেই সময়। এত বছরেও কোনও মানুষের বাস নেই ওখানে। পরিত্যক্ত শহর জুড়ে ঘন জঙ্গল। জঙ্গলের মধ্যে আছে বিশাল বিশাল বিল্ডিং। আর তার গা বেয়ে লতাপাতা, আগাছার রাজপাট।

প্রশ্ন উঠতে পারে কেন কার্লোস ওই নেকড়ে বাঘকে চারনোবিল থেকে সঙ্গে করে এনেছিল।

তার পিছনে কিছু কারণ ছিল অবশ্য। বাঘটার কিছু অদ্ভুত ক্ষমতা দেখে কার্লোস অবাক হয়। চারনোবিলের ওই ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যেতে গিয়েই কার্লোসের চোখে পড়ে একটা নেকড়ে বাঘ। এরা সাধারণত জোটে ঘোরে। ওটা ছিল একা, দলছুট। খুব ফ্রেন্ডলি, যেন মানুষের সঙ্গ পছন্দ করে।

কার্লোসদের সঙ্গে-সঙ্গেই ঘুরছিল নেকড়েটা। কার্লোস ও তার সহবিজ্ঞানীদের সব কথা যেন বাঘটা ভালোই বুঝতে পারছিল। এবং সেই কারণেই নেকড়েটার উপরে আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার উদ্দেশে সঙ্গে করে নিয়ে চলে আসে সে।

মিঃ পাই কার্লোসের বাড়িতে নেকড়ে বাঘটাকে দেখেন। শুধু ওই নেকড়েটার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নয়, অন্য আরেকটা ক্ষমতা দেখে অবাক হন। যেন বাঘটাই পুরো বাড়ির অঘোষিত কর্তা, সব কিছুর নিয়ন্ত্রণ ওর হাতে। এমনকী কার্লোসও যেন ওর দ্বারা প্রভাবিত, যেন ওর কথা অনুযায়ী কার্লোসকেও সব ব্যাপারে বুঝে-সুঝে চলতে হয়।

রাতে কার্লোসকে ওই পোষা নেকড়ের পিছন পিছন বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে দেখেন মিঃ পাই।

পরের দিন মিঃ পাই সকালে উঠে দেখেন কার্লোস তখনও বাড়ি ফেরেনি। শুধু তাই নয়। একজন ছাড়া বাড়ির অন্য সব কাজের লোকেরাও হঠাৎ ছুটিতে চলে গেছে। ব্রেকফাস্টের পর কার্লোসের খোঁজে বেরোনোর সময় হঠাৎ মিঃ পাই পিছন থেকে মাথায় আঘাত পান। উনি অজ্ঞান হয়ে যান।

জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর দেখেন উনি একটা অন্ধকার ঘরে বন্দি। কতক্ষণ বন্দি ছিলেন জানেন না, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই টের পান যে কে বা কারা যেন ওর ঘরের দিকে এগিয়ে আসছে।

দরজা খুলে যায়। নেকড়ে বাঘের সঙ্গে দেখা যায় ওই বাড়ির সেই থেকে যাওয়া পরিচারককে যে খুব সম্ভবত মিঃ পাই-এর মাথায় আঘাত করেছিল। হিংস্রভাবে এগিয়ে আসতে থাকে নেকড়ে বাঘটা। কিন্তু মিঃ পাই-এর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ার ঠিক আগে, গুলির শব্দ আসে। ডেভিড পিছন থেকে গুলি করেছে নেকড়েটাকে। ডেভিডের বেশ কয়েকটা গুলিতে বাঘটা মারা যায়।

পরে বোঝা যায় যে ওই নেকড়ে বাঘটাকে নিয়ন্ত্রণ করছিল এক অজানা

ফাঙ্গাস। একই ফাঙ্গাস পরে ছড়িয়ে পড়েছিল ডেভিডের মধ্যেও। সেজন্য তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল।

আজ সকালেই ডেভিডের মৃত্যুর খবরটা পেয়েছেন মিঃ পাই। বুঝতে পেরেছেন অনুমান ঠিক। নেকড়ের মতো ডেভিডের মধ্যেও ওই একই ছত্রাকের ইনফেকশন পাওয়া গেছে। ছত্রাক মারা যাওয়ার আগে তার বসতি ধ্বংস করে গেছে।

কী করে ডেভিডের মধ্যে গেল ওই ছত্রাক? পরজীবী ওই বিশেষ ছত্রাক বুঝতে পেরেছিল যে তাদের নতুন হোস্ট দরকার। বিশেষ করে এমন একজন হোস্ট যে সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় স্বশাসিত যুদ্ধজাহাজ রিসার্চের সঙ্গে যুক্ত আছে। ডেভিডের শেষ রিসার্চ ছিল সেটাই।

মিঃ পাই জানেন ওরা আবার আসবে। ওরা আবার খোঁজ করবে নতুন শিকারের, নতুন হোস্টের। ওরা শিকারের অপেক্ষায় থাকবে ওদের ওই চারনোবিলের রাজত্বে। হয়তো এরকম কিছু হোস্টের মাধ্যমে মানবজগতকে আস্তে আস্তে নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করবে ওরা।

এত দেশ, এত শহর থাকতে সেই চারনোবিলেই গিয়ে হাজির হল অনিলিখা! কিন্তু কেন?

মিঃ পাই মনে মনে বলে ওঠেন, আমার যে চুপ করে বসে থাকলে চলবে না। জানতে হবে ওই ছত্রাকদের কোষীয় গঠন। এমন ন্যানোবট তৈরি করতে হবে, যারা ওদের ধ্বংস করবে ওদেরই কৌশলে, ওদেরই খেলায়। অনিলিখাকে যে করেই হোক বাঁচাতেই হবে। কিন্তু কোথায় পাবেন তিনি সেই মারাত্মক ছত্রাক?

আগের বছর, ১৫ এপ্রিল, লন্ডন

আজকের দিনটা লন্ডনের অন্য দিনগুলোর মতো নয়। গত কয়েক সপ্তাহ বেশ ভালোই ঠান্ডা ছিল। মাঝে মধ্যে ঝিরঝিরিয়ে বৃষ্টি, হাড় কাঁপানো ঠান্ডা হাওয়া। সেখানে আজ হঠাৎ করে গরম পড়েছে। মাথার উপরে ঝকঝকে নীল আকাশ, কিছু ছেঁড়া পেঁজা তুলোর মতো সাদা মেঘ নিজের খেয়ালে ভেসে বেড়াচ্ছে। লন্ডনবাসীরা এরকম একটা হঠাৎ করে পাওয়া রৌদ্রোজ্জ্বল দিন কখনও মিস করতে চায় না। তাই ক্যাফেগুলোতে বেশ ভিড়। লাঞ্চটাইম পেরিয়ে গেলেও অফিসে ফেরার ইচ্ছে কারোরই নেই।

ভিড়ের মধ্যে দিয়েই লন্ডনের হাইড পার্কের সন্নিবর্তী একটা নামী হোটেলে পরপর তিনটে গাড়ি এসে ঢুকল। অতি সাধারণ গাড়ি। এরকম অভিজাত হোটেলের

সামনে এমন গাড়ি সাধারণত দেখা যায়।

যে তিনজন এসেছেন এই গাড়িতে, তারা শুধু ধনকুবের নয়, বিশ্ব জুড়ে থাকা তিনটে ফরচুন হান্ড্রেড কোম্পানির মালিক। কিন্তু তারা কেউ চায়নি, তাদের এই মিটিং অন্য কারো চোখে পড়ুক। তাই এই সাবধানতা অবলম্বন।

হোটেলের বিশাল মিটিং রুমে আলোচনা শুরু হল।

এই তিনজনের মধ্যে আছেন—এক বিশ্বখ্যাত তেল কোম্পানির মালিক, এক নামী গাড়ির কোম্পানির মালিক, এবং তৃতীয় জন বিখ্যাত স্টিল কোম্পানির মালিক।

প্রথমজন বলল, এরকম চললে আমাদের সব ব্যবসা বন্ধ করে দিতে হবে। চারদিকে গ্রিন লবি যেভাবে বাড়াবাড়ি শুরু করেছে যে কিছুই করা যাচ্ছে না। এতদিন তাও সরকারের সাপোর্ট ছিল আমাদের ওপর। কিন্তু এখন সেটাও নেই। সব আলোচনায় শুধু গ্লোবাল ওয়ার্মিং আর গ্লোবাল ওয়ার্মিং। আর সবার উপরে কার্বন এমিশন কমানোর জন্য চাপ।

ঠিকই। আমাদের খুব দ্রুত কিছু একটা ব্যবস্থা করতে হবে। আগে কিছু বিজ্ঞানী অন্তত আমাদের দলে ছিল। কিন্তু এখন তারাও ভয়ে আর কিছু বলে না। সাধারণ জনতা আরও খেপে উঠছে। আরে বাবা, ইন্ডাস্ট্রি রিভোলিউশনের সময়ের থেকে দু-ডিগ্রি বেশি গরম হলে যেন পুরো পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে! আরেকটু বেশি ঝড় হবে, বন্যা হবে, হিমবাহ আরেকটু বেশি গলবে, একটু খাদ্য সঙ্কট দেখা দেবে, এই তো। সব কিছুই না হয় বুঝলাম, কিন্তু আমাদের চলবে কী করে! গাড়ির কোম্পানির মালিক মুখ বেজার করে বলল কথাগুলো।

আমার একটা আইডিয়া আছে। তৃতীয়জন বলে।

হ্যাঁ, সেজন্যেই তো আসা। আপনি যে একটা আইডিয়ার কথা বলেছিলেন! প্রথম ও দ্বিতীয় জন একসঙ্গে বলে উঠল।

সেই কথায় আসি। এসবের থেকে নজর অন্যদিকে ঘোরাতে হবে। তা ছাড়া কোনও উপায় নেই। ধরুন যদি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়, বা অতটা না হোক, দুটো বড় দেশের মধ্যে যুদ্ধ বাধে, বা কিছু দেশে গৃহযুদ্ধ বাধে, সেক্ষেত্রে এসবের কথা সবাই ভুলে যাবে। কে আর তখন চিন্তা করবে গ্লোবাল ওয়ার্মিং নিয়ে। কী বলেন?

ভালো আইডিয়া। কিন্তু কীভাবে? যুদ্ধ চাইলেই তো আর হয় না। দ্বিতীয়জনের কণ্ঠে সংশয়।

কাজটা অবশ্যই সহজ নয়। কিন্তু কিছু খরচ করলে, ঠিক ব্যবস্থা করা যাবে। যদি কিছু না করে চুপচাপ বসে থাকি, এ তো একপ্রকার আত্মহত্যা। এখন তো একটা সাধারণ লোকও কেস করে আমাদের কোম্পানি বন্ধ করে দিতে পারে।

সত্যি, এটা সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এভাবে যুদ্ধ-অশান্তি ছড়িয়ে কি চিরকাল এদের থামিয়ে রাখা যাবে? প্রথমজনের চোখে জিজ্ঞাসা।

হ্যাঁ, যাবে। যদি আমরা কয়েক বছরের জন্য যুদ্ধ বা গৃহযুদ্ধ শুরু করাতে পারি, কয়েক বছরের জন্য গ্রিন হাউস গ্যাস এমিশন কমানো—এসব নিয়ে উন্মাদনা থামাতে পারি, তাহলেই কেল্লাফতে। তৃতীয়জন ভরসা দিল।

কীভাবে? প্রথমজন জিগ্যেস করল।

এমনিতেই গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর জন্য এর মধ্যেই বেশ কিছু দেশে খাবারের চরম সঙ্কট দেখা দেবে। খাবার জল পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যাবে না। কী করবে তখন সেখানকার লোকেরা? তখন সেসব দেশের মানুষ আরও বাধ্য হবে অন্য দেশে যেতে। তখন যুদ্ধ বাধবেই। সুদান, নাইজেরিয়া, ক্যামেরুন, ইয়েমেন, বাংলাদেশের মতো দেশগুলোতে এভাবে গৃহযুদ্ধ লেগে যাবে। যত দারিদ্র বাড়বে, তত অশান্তি বাড়বে, তত লোকে আরও কম গ্লোবাল ওয়ার্মিং নিয়ে ভাববে।

এবার উন্নত দেশগুলোর কথায় যদি আসি। যত উত্তর মেরুর বরফ গলবে, দেখবেন রাশিয়া, ন্যাটোর দেশগুলো, আর চীনের মধ্যে ওই জায়গার দখল-অধিকার নিয়েও প্রতিযোগিতা বাড়বে, রেষারেষি থেকে যুদ্ধ হবে, ওদের নিউক্লিয়ার ওয়ারের দিকেও নিয়ে যাওয়া অসম্ভব কিছু নয়।

ঠিক বলেছ। কিন্তু এখন আমাদের তার জন্য ঠিক কী করতে হবে? প্রথম জন ব্ল্যাককফিতে চুমুক দিয়ে বলল।

সেটারই একটা খসড়া করে এনেছি। এমনভাবে করতে হবে যাতে কোনওভাবে সন্দেহের তির আমাদের দিকে না ঘোরে। আর যদি ঘোরেও, যেন আমাদের সরাসরি ইনভলভমেন্ট প্রমাণ করতে না পারে। এ কাজে আমাদের সাহায্য করবেন একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী। ওনার বেশ কিছু নভেল আইডিয়া আছে।

বিজ্ঞানী? কে সেই বিজ্ঞানী? আবারও বাকি দুজন একসঙ্গে বলে উঠল।

আমরা সবাই এনার নাম শুনেছি। তবে বিশেষ কিছু কারণে ওনাকে এখন সব নামী বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। কিন্তু এককথায় জিনিয়াস। বাইরে অপেক্ষা করছেন। বিজ্ঞানীর নাম ডক্টর গিল হারভে।

১৭ এপ্রিল, ভলক্যানোস ন্যাশনাল পার্ক, রোয়ান্ডা

প্রায় ত্রিশজনের আমেরিকান টুরিস্টের গ্রুপটা এগিয়ে যাচ্ছিল ভলক্যানোস ন্যাশনাল পার্কের পাহাড়ি পথ ধরে। সঙ্গে বেশ কয়েকজন স্থানীয় লোক যারা গরিলা ট্র্যাকিং পোর্টার হিসেবে কাজ করছে। এদের আগের জেনারেশন চোরাকারবারীর কাজ

করত। নানান বন্যজন্তু হত্যা করে রোয়ান্ডার জঙ্গলে এদের প্রায় নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছিল। উধাও হয়ে যাচ্ছিল এখানকার বিখ্যাত মাউন্টেন গরিলাও। বিশ্বের যে কয়েকটা জায়গায় এদের দেখা মেলে তাদের মধ্যে এই জায়গা সবার আগে। সে জন্য সবসময় টুরিস্টদের ভিড় এখানে।

এখন এখানকার স্থানীয় লোকেরা বুঝেছে যে এদের জীবন ও জীবিকা নির্ভর করছে এসব গরিলাদের উপরে। পরবর্তী প্রজন্ম তাই পোর্টার হিসেবে কাজ করে বুঝতে শিখেছে এদের সংরক্ষণ করা কতটা জরুরি। দূরদূরান্ত থেকে ছুটে আসা টুরিস্টদের মাউন্টেন গরিলা দেখানর দায়িত্বটা এই পোর্টাররাই পালন করে আসছে।

বেশির ভাগ মাউন্টেন গরিলা গ্রুপে থাকে। কখনও দশজনের গ্রুপে, তো কখনও তিরিশজনের। এমনিতে এরা খুব শান্ত ভদ্র, তবু টুরিস্টদের বিশেষ কিছু নিয়মনীতি মানতেই হয়। যেমন গরিলাদের চোখের দিকে না তাকানো, ছুটে কাছে না যাওয়া, অহেতুক বিরক্ত না করা। এসব নিয়ম পোর্টাররা আগেই ডিব্রিফিং-এর সময় বারবার করে বলে দেয়। না মানলে দু-একবার গরিলা খেপে গিয়ে তেড়ে এসেছে, এরকম ঘটনাও ঘটেছে।

উচ্চবিত্ত টুরিস্টের গ্রুপ। ঘন পাহাড়ি জঙ্গলে জলকাদার মধ্যে দিয়ে হাঁটার জন্য সবার পায়ে গাম্বুট। এরা কিগালি অব্দি এসেছে ফ্লাইটে। তার পরে জিপে চলেছে মাউনট বিসুকের পথে। আজ মেঘলা আকাশ। হাতে হাইকিং-এর লাঠি নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে পর্যটকের দল।

হঠাৎ যেন সামান্য জোরে কথা বলে উঠল এই পোর্টারদের দলের মধ্যে একজন— ইমানুয়েল। ও-ই সবথেকে বেশি বছর ধরে এই কাজ করছে। কিছু দূরে পাহাড়ের উপরে একটা গরিলার দল দেখতে পেয়েছে ও। প্রায় জনা তিরিশের একটা বড় গ্রুপ।

এবারে ফিসফিসিয়ে ইমানুয়েল বলল, কাছে যেও না। দূর থেকে দেখো।

ওই দলের কয়েকটা গরিলা ধীর পায়ে এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। নাহ্, ঠিক ওদের দিকে নয়। পাশ কাটিয়ে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেল ওরা।

হঠাৎ ইমানুয়েলের কণ্ঠস্বর যেন বদলে গেল। গলায় ভয়ের সুর। কারণটা বুঝতে অবশ্য সময় লাগল না। গরিলার দল চারদিক থেকে কৌশলে ঘিরে ধরেছে ওদের। কয়েকজন নীচের দিক থেকে উপরে, কেউ উপর থেকে নীচে ওদের দিকে আসতে শুরু করেছে। শুধু বাচ্চা গরিলাগুলোকে দূরে সরিয়ে রেখে ওদের কাছে এগিয়ে আসছে ওরা।

শুড উই রান? একজন কমবয়েসি টুরিস্ট বলল।

নো নো। স্টে হোয়ার এভার ইউ আর। দে উইল ডু নাথিং। দে আর ভেরি পিসফুল। তাছাড়া আমাদের থেকে অনেক বেশি জোরে দৌড়তে পারে

ওরা। ছুটলে ওরা আরও তাড়া করবে। কিছু না করলে ওরা পাশ কাটিয়ে চলে যাবে।

সবাই ইমানুয়েলের কথা শুনে সেইভাবে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

কিন্তু না, ঘটনা এবারে ঠিক সেরকম হল না। কিছুক্ষণের মধ্যে গরিলার দল আরও কাছে এগিয়ে এল। আর তারপরেই শুরু হল মরণ চিৎকার। এক এক জনের পা ধরে পাথরের উপর দিয়ে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যেতে লাগল গরিলারা। তারপর ছুড়ে ফেলতে লাগল পাহাড়ের উপর থেকে নীচের দিকে। যারা পালাতে চাইল তাদের ধাওয়া করে এনে ছুড়ে ফেলে দিল নীচের দিকে।

বত্রিশ জন মারা পড়ল ওই গরিলাদের হাতে। প্রথম বার এই পার্কে এরকম ঘটনা হল।

কিছুদিনের মধ্যেই খবরটা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। এই খবরে শুনে টুরিস্ট আসা বন্ধ হয়ে গেল। উপার্জনের আর কোনও উপায় রইল না স্থানীয়দের। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে গৃহযুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ল রোয়ান্ডার নানান প্রান্তে।

১০ মে, মসম্যান, ডেইনট্রি রেনফরেস্টের কাছে, অস্ট্রেলিয়া

এরকম ঘটনা কি আগে কখনও কোথাও হয়েছে জেমস?

নাহ্, আমার তো এরকম ঘটনার কথা মনে পড়ছে না। তবে ক্যাশুয়ারি মাঝেমধ্যে অনেককে আহত করেছে, খেপে গিয়ে আক্রমণ করেছে এরকম বেশ কিছু ঘটনা আছে। কখনও খাবারের জন্য বা কখনও প্ররোচিত হলে এরা খেপে গিয়ে এরকম করে থাকে।

কিন্তু এভাবে একেবারে অকারণে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে দুটো পাখি মিলে বাচ্চাদের স্কুল আক্রমণ করেছে, একের পর এক বাচ্চা ও টিচারদের পা দিয়ে আঘাত করেছে, পায়ের নখ দিয়ে বাচ্চাদের শরীর চিরে দিয়েছে— এরকম ঘটনা কখনো হয়নি।

ওই স্কুলে খাবার দাবার কিছু ছিল? বা অন্য কিছু যার জন্যে এরকম টার্গেট করে থাকতে পারে?

নাহ্, সেরকম কিচ্ছু ছিল না। একদম অন্য দিনের মতো সব কিছু স্বাভাবিক ছিল। স্কুলে ক্লাস হচ্ছিল। তার মধ্যে হঠাৎ হানা। এরা সাধারণত মানুষকে এড়িয়ে চলে। এই বিষয়ে আমার কিছু জুওলজিস্ট বন্ধুর সঙ্গে আজ সকালে কথা বললাম। প্রফেসার ডোনাল্ড এদের উপরে কুড়ি বছর ধরে রিসার্চ করেছেন। ওনাকেও কনসাল্ট করলাম। উনিও বললেন এরকম ঘটনা আগে কখনও হয়নি। তবে উনি দেখছেন বিষয়টা।

একটাকে তো গুলি করে মেরে ফেলা হয়েছে। অন্যটাকে খুঁজে পাওয়া গেছে? ওটা সবার আগে খুঁজে বার করতে হবে।

আধ ঘণ্টার মধ্যে বাইশটা বাচ্চা আর তেরো জন শিক্ষককে মেরে জঙ্গলে ফিরে গেছে, ভাবা যায়।

শুনেছি এদের সঙ্গে নাকি ডায়নোসরদের একটা প্রজাতির ডাইরেক্ট লিঙ্ক আছে।

হ্যাঁ, জেনেটিকালি সেটা দেখা গেছে। কিন্তু একই সঙ্গে এরা যতই হিংস্র হোক না কেন এরকম ঘটনা আনহার্ড অফ। সামথিং কোয়াইট আনন্যাচারাল।

দেখো, আমরা একটা মুহূর্তও নষ্ট করতে পারি না। আমার উপরে প্রধানমন্ত্রীর অফিস থেকে চাপ দিতে শুরু করেছে। বারবার ফোন পাচ্ছি।

হ্যাঁ, স্যার, আমরা দেখছি। আমি এখনই আমার টিম নিয়ে আবার জঙ্গলে ঢুকব।

ঠিক আছে, যে-কোনও দরকারে আমাদের জানিও। প্রাইম মিনিস্টার সরাসরি এই বিষয়ে আপডেট চান। অপোজিশন খেপে উঠেছে, জনসাধারণকে আরও খেপিয়ে তুলছে, বলছে জঙ্গলের এত কাছে কোনও স্কুলে উপযুক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকা উচিত ছিল। সবই সরকারের দোষ।

হ্যাঁ, স্যার, নিশ্চিন্ত থাকুন। উই উইল ডু এভরিথিং পসিবল। পাখিটাকে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ঠিক ধরব। জ্যান্ত বা মৃত।

এই বলে পুলিশ সুপারের রুম থেকে বেরিয়ে যায় দুঁদে শিকারি জেমস।

২২ মে, রেকাভিক, আইসল্যান্ড

রেকাভিক শুধু আইসল্যান্ডের রাজধানী নয়, প্রায় ষাট শতাংশ মানুষের বাস এখানে। শীতের সময় বরফের চাদরে মুড়ে থাকে বলেই হয়তো গরমের সময়ে এখানে চব্বিশ ঘণ্টাতেও দিন শেষ হয় না। এখানে এই কয়েকমাসে জীবনের সব আনন্দ শুষে নিতে চায় এখানকার অধিবাসীরা।

রেকাভিক থেকে কিছু দূরেই ক'দিন আগে চালু হয়েছে ওরকা প্ল্যান্ট। এরকম প্ল্যান্ট সারা বিশ্বে এই প্রথম। বাতাস থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড শুষে নিয়ে তাকে লাইমস্টোন পাথরে পরিণত করা হয় এই প্ল্যান্টে। এভাবেই বাতাস থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড সরিয়ে গ্লোবাল ওয়ার্মিং কমানো সম্ভব।

এরকম একটা প্ল্যান্ট কোনওভাবেই গ্লোবাল ওয়ার্মিং কমাতে পারবে না। তবু হাজার হাজার এরকম প্ল্যান্ট নানান দেশে তৈরি হলে শুধু যে লোকেদের সচেতনতা বাড়বে তাই নয়, উষ্ণতা বাড়ার হার সামান্য কমানো যাবে।

আইসল্যান্ডে আগ্নেয়গিরি থেকে উদ্ভূত অনেক ব্যাসল্ট পাথর আছে। বাতাস থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস টেনে নিয়ে ওই ব্যাসল্ট পাথরের সঙ্গে মিশিয়ে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট তৈরি করা হয় এই প্ল্যান্টে, যা লাইমস্টোন পাথর হিসেবে মাটির নীচে সঞ্চিত হয়।

এই প্ল্যান্টে ইনভেস্ট করেছে বিভিন্ন সংস্থা, বিভিন্ন পরিবেশ সচেতন সংস্থা। যদিও ওরকা সাম্প্রতিককালে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যেসব কোম্পানি তাদের কর্মকাণ্ডে মূলত ফসিল ফুয়েল ব্যবহার করে, তাদের তারা এই সুযোগ দেবে না। সেক্ষেত্রে তাদের মধ্যে ফসিল ফুয়েল ব্যবহার কমানোর কোনও ইচ্ছে থাকবে না।

রেকাভিক শহর থেকে দূরের এই প্ল্যান্ট দেখা যায়। এখানকার অধিবাসীরা জানে তাদের অস্তিত্ব নির্ভর করছে গ্লোবাল ওয়ার্মিং কমানোর উপরে। তারা তাই দু-হাত তুলে আশীর্বাদ করে এই প্ল্যান্টকে। গর্বের সঙ্গে এই প্ল্যান্টের কথা বলে।

কিন্তু আজ বিকেল ছ'টা নাগাদ দূর থেকে আসা একটা প্রবল বিস্ফোরণের আওয়াজে কেঁপে উঠল সারা শহর। মুহূর্তে ব্যাপারটা বোঝা গেল। বিশাল এক বিস্ফোরণ হয়েছে ওরকা প্ল্যান্টে।

প্রায় পুরো প্ল্যান্ট ভস্মীভূত। প্ল্যান্টের কন্ট্রোল সেন্টারে থাকা চারজন মূল অপারেটরের মৃত্যু হয়েছে। কী করে সেটা এখনও বোঝা যায়নি। সিসিটিভি ক্যামেরা সব পুড়ে যাওয়ায় কিছুই পরিষ্কার করে বোঝা না গেলেও দেখা গেছে ঘটনার দিন এক অজানা অচেনা লোক নিরাপত্তার সব স্তর ভেদ করে কন্ট্রোল সেন্টারে পৌঁছে গিয়েছিল।

আপাতদৃষ্টিতে এটা কোনও টেররিজমের ঘটনা বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।

১০ জুন, কলকাতা আলিপুর চিড়িয়াখানা, ভারত

মন্ত্রী আফতাব আলি আলিপুর চিড়িয়াখানায় বেড়াতে এসেছেন। সঙ্গে ওর স্ত্রীও আছে। আফতাব আলি অত্যন্ত প্রভাবশালী বনদপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী। কিছুদিন আগে আফতাব আলির কিছু কথা নিয়ে বেশ কিছু জায়গায় অশান্তি ছড়িয়ে পড়েছিল। কিছু বিতর্কিত কথার জন্য একটা গ্রুপ খুনের হুমকিও দিয়েছিল। তাই চিড়িয়াখানার মধ্যেও নিরাপত্তা রক্ষীদের সঙ্গে নিয়ে ঘুরছিল।

বাঘের খাঁচার কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ ওর দেহরক্ষীর চিৎকারে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে কিছু দূরে একটা রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। বাঘটার ক্রুদ্ধ গর্জনে মনে হল ওর পুরো শরীর অবশ হয়ে গেছে। ভয়ে সেখানেই বসে পড়ল আফতাব আলি। জ্ঞান হারানোর আগে লক্ষ করল একটা হলুদ কালো ডোরাকাটা চেহারা দ্রুত এগিয়ে আসছে ওর দিকে।

পরের দিন সব কাগজের হেডলাইন ছিল—চারটে বাঘের আক্রমণে নিহত বারো। শতাধিক আহত। মৃতদের মধ্যে রাজ্যের প্রভাবশালী বনদপ্তরের মন্ত্রী আফতাব আলিও আছেন। বাঘগুলোকে শেষে গুলি করে মেরে ফেলতে হয়েছে। কিন্তু এরকম ঘটনা আগে কলকাতা চিড়িয়াখানার ইতিহাসে কখনও ঘটেনি।

রহস্য এখানেই যে, সব বাধা পেরিয়ে চার-চারটে বাঘ কীভাবে বেরিয়ে এল! যেন একজন আরেকজনকে সুপরিকল্পিতভাবে বেরোতে সাহায্য করেছে। তা না হলে এটা কোনওভাবে সম্ভব ছিল না। তারপরে একই সঙ্গে যেভাবে একে একে বিভিন্ন লোককে আক্রমণ করেছে, সেখানেও যেন তীব্র বুদ্ধির ছাপ।

এরকম ঘটনা শুধু কলকাতা কেন, সারা বিশ্বেও কখনও ঘটেনি।

এই ঘটনা নিয়ে রাজ্যে বড় ধরনের অশান্তি শুরু হল। কারণ অনেকের ধারণা আফতাবকে মারার জন্য ইচ্ছে করে বাঘ ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। এর পিছনে কোনও ধর্মীয় ষড়যন্ত্র আছে।

১৪ জুন, মোগাদিসু, সোমালিয়া

সোমালিয়ায় দীর্ঘ গৃহযুদ্ধ অবশেষে একটু থেমেছে। কত লক্ষ সোমালিবাসী যে এই যুদ্ধে মারা গেছে কে জানে!

প্রেসিডেন্ট হাসান শেখ মাহামুদ খুব শক্ত হাতে জিহাদীদের শেষ করেছেন। তবে এখনও দেশের মধ্য ও দক্ষিণাঞ্চল টেররিস্ট গ্রুপ আল-শাবাবদের অধীনে। আল-শাবাব আর আল-কায়দার মধ্যে খুব ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। এরা এসব জায়গা থেকে ট্যাক্স সংগ্রহ করে। এখানকার বাচ্চা ছেলেমেয়েদের জোর করে টেররিস্ট গেরিলা ইউনিটে নিয়মিত ভর্তি করে।

প্রায় দু-যুগ ধরে চলা গৃহযুদ্ধ ও চরম অশান্তির পর একটু হলেও নিয়ম-শৃঙ্খলা ফিরে এসেছে।

তবে এসব এলাকায় শান্তি খুবই অস্থায়ী। যে-কোনওদিন আবার শুরু হয়ে যেতে পারে। এজন্য নিজের বিশাল প্যালেসে সব রকম সিকিউরিটির ব্যবস্থা করেছেন প্রেসিডেন্ট।

এদেশে আসলে জাতীয় সংহতি শব্দটার কোনও অর্থ নেই। এখানে দেশ চালাতে হয় শুধু স্বৈরাচারী হিসেবে নিজের বশংবদ ও অনুগতদের নিয়ে। কেউ প্রশ্ন করলে উত্তর দিতে নেই, প্রশ্ন যাতে আর কোনওদিন না আসে তার ব্যবস্থা করতে হয়।

প্যালেসের বাগানের হ্যামকে শুয়ে এসবই ভাবছিলেন উনি।

হঠাৎ যেন আকাশ কালো হয়ে এল। উনি ও ওনার সিকিউরিটির দায়িত্বে

থাকা লোকেরা কিছু বোঝার আগেই নেমে এল প্রায় শ'খানেক ঈগলের দল। তারা যেন তাকেই হত্যা করতে এসেছে। বন্দুকের গুলি চালানোরও সময় পেল না কেউ। আধঘন্টার মধ্যে যখন সেনা ঢুকল বাগানে তখন সেখানে কয়েকটা মৃতদেহ পড়ে আছে। তার মধ্যে আছে হাসানের দেহও।

কয়েক ঘন্টার মধ্যে সে খবর ছড়িয়ে পড়ল সোমালিয়ার প্রান্তে প্রান্তে। আবার শুরু হয়ে গেল রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ।

২৮ জুন, হাবড়া, ভারত

বিশ্বজিৎদাই বলছিল—আমাদের মধ্যে অনেকেরই ধারণা আমাদের চারদিকে অ্যালিয়েন ঘুরে বেড়াচ্ছে, শুধু আমরাই টের পাই না। ধরে নে এই ঘরেই এরকম এক অ্যালিয়েন আমাদের সঙ্গে বসে আছে, দিব্বি মাছের চপ খেতে খেতে ঠ্যাং দোলাচ্ছে হয়তো। শুধু আমরা বুঝতে পারছি না।

কথাটা যে অনিলিখাদিকে উদ্দেশ্য করে সেটা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

তবে প্রতিক্রিয়াটা এল অনর্থবাবুর দিক থেকে। উনি চিংড়ি মাছের চপ খেতে খেতে চেয়ারে বসে এতক্ষণ একটা গান গুনগুন করতে করতে পা দোলাচ্ছিলেন। হঠাৎ খেয়াল করে থেমে গেলেন, আর কৌতূহলী চোখে বিশ্বজিৎদার দিকে তাকালেন।

অনেক দিন পরে আমাদের শনিবারের আসর একেবারে ফুল হাউস। তবে এবারে আমরা কলকাতার প্রতীকের বাড়িতে মিট করছি না। আমাদের আজকের আড্ডা হাবড়ায়। সহেলীর কাকার বাড়িতে। হাবড়া স্টেশনের ঠিক পাশেই বিশাল বাড়ি সহেলীর কাকার।

অনেকদিন ধরেই সহেলী আমাদের এখানে আসতে বলে। অবশেষে অনিলিখাদিই বলল যে এবারে চল, হাবড়া ঘুরে আসি। আড্ডাও হবে আর তোর কাকা ওখানকার ক্রিকেট ক্লাবের প্রেসিডেন্ট না? সবাই মিলে ক্রিকেট খেলাও যাবে।

মানে! অনিলিখাদি, তুমি ক্রিকেটও খেলতে পারো নাকি!

হ্যাঁ, আমি তো কলেজ লেভেলে খেলেছি। আমেরিকায় যখন পড়তাম, তখনও খেলেছি।

ব্যাটসম্যান না বোলার?

অলরাউন্ডারও বলতে পারিস। তবে ব্যাটিংটা বেটার করি।

পাশ থেকে বিশ্বজিৎদা সমানে কেশে যাচ্ছে। সেটা শুনে প্রায় অগ্রাহ্য করে অনিলিখাদি বলে উঠল, তোর কাকাকে বলিস ছেলেদের বিরুদ্ধে মেয়েদের একটা ক্রিকেট ম্যাচ হবে। অবশ্য যদি বিশ্বজিৎ রাজি থাকে খেলতে। ও নাকি

খুব ভালো ফাস্ট বোলিং করে শুনেছি। আমার আবার ফাস্ট বোলিংয়ের বিরুদ্ধে চার-ছয় মারতে খুব ভালো লাগে।

এই ঐতিহাসিক কমেন্টের পরে হাবড়া না এসে আর কোনও উপায় ছিল না। সেই যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছিল সেদিন, তার জেরেই ঠিক তার দুই সপ্তাহ বাদে আমরা হাবড়ায় সহেলীর কাকার বাড়ি এসে হাজির হয়েছি।

এই প্রথম আমরা, মানে ছেলেরা সবাই বিশ্বজিৎদার দিকে, অনিলিখাদির এগেন্সটে। সহেলী, কেয়া, পুনাম, রূপসা—এরা সবাই অনিলিখাদির দলে।

বিকেল চারটে থেকে ম্যাচ। আপাতত দুপুরে জমাটি খাওয়ার পরে আমরা সবাই আড্ডায়।

সঙ্গে অনর্থবাবু এসেছেন। উনি এখন কয়েকমাসের জন্য আমেরিকা থেকে ভারতে এসেছেন। উনিও লাফিয়ে উঠলেন আসবেন বলে। তবে শুধুই দর্শক হিসেবে।

বিশ্বজিৎদার কমেন্টে পা দোলানো থামিয়ে উনি বলে উঠলেন, তা অনিলিখা তোমার কী মত এ ব্যাপারে! অ্যালিয়েনদের খোঁজ পাওয়া যায় না কেন?

পাওয়া যায় না কে বলল? আমার ধারণা এই পৃথিবীতেই আছে। আমি তাদের পরিচয়ও পেয়েছি। তাছাড়া মহাবিশ্বে তো আছেই। আমরা আসলে যেভাবে মহাবিশ্বে এতদিন প্রাণী খুঁজেছি, তাতে পরিবর্তন আসতে চলেছে। তখনই ওদের খুঁজে পাওয়া যাবে।

অনর্থবাবু 'মহাবিশ্বে মহাকাশে' গানটা হঠাৎ করে বেসুরো গলায় শুরু করেছিলেন। তাঁর গান থামিয়ে দিয়ে তন্ময় বলল, কীভাবে?

ধর, আমরা এতদিন ভেবেছি যেখানে জল সেখানে প্রাণ। সে জন্য জল কোথায় থাকতে পারে, তা খুঁজেছি। আমরা কার্বন বেসড লাইফ ফর্ম খুঁজেছি কারণ, পৃথিবীর সব পরিচিত জীবই কার্বন-বেসড। কিন্তু এখন মনে করা হচ্ছে মহাবিশ্বে অন্য কোনও জীব থাকতে পারে যারা সিলিকন-বেসড, কারণ সিলিকনেরও কার্বনের মতো অন্য চারটে পরমাণুর সঙ্গে বন্ড তৈরি করে সিলিকন-বেসড কমপ্লেক্স লাইফফর্ম তৈরি করার ক্ষমতা আছে। সেরকম কোনও জীব আমাদের পৃথিবীতে থাকলেও আমরা তার খোঁজ এতদিন করিনি। মহাবিশ্ব তো অনেক দূরের কথা।

বিকেল সাড়ে চারটে, খেলার মাঠে

বাড়ি থেকে মাঠ বেশি দূর নয়। তবু আমাদের জন্য বেশ কয়েকটা গাড়ির ব্যবস্থা ছিল। এলাহি ব্যবস্থা। তাতে করেই মাঠে এসে পৌঁছলাম। এই মাঠে যে নিয়মিত বড় খেলা হয় তা দেখেই বোঝা যায়। বেশ সুন্দর পিচ।

পঁচিশ ওভারের খেলা। বিশ্বজিৎদা টসে জিতে মেয়েদের আগে ব্যাট করতে পাঠালো। আমাদের এসে বলল, দেখবি পাঁচ ওভারে অল আউট হবে সবক'টা। দু-ঘন্টার মধ্যে বাড়ি ফিরে ফের তপসের ফ্রাই খাওয়া যাবে।

ব্যাপারটাতে আমাদের সবারই মত ছিল।

কিন্তু ফল হল উল্টো। অনিলিখাদি যে এত ভালো ব্যাটিং করে কে জানত! রূপসা আর সহেলীর দুই উইকেট প্রথম ওভারে পড়ে গেলে নামল অনিলিখাদি ও শ্রেয়া। শ্রেয়া এখানকার স্থানীয় মেয়ে। স্টেট লেভেলে খেলেছে। বেশ ভালো খেলে।

কিন্তু অনিলিখাদি হল আসল সারপ্রাইজ এলিমেন্ট। শ্রেয়ার থেকেও অনেক ভালো খেলে। শ্রেয়ার সঙ্গে জুটি বেঁধে যা মারতে শুরু করল আমাদের বলা যায় নাজেহাল অবস্থা।

বিশ্বজিৎদা ক্যাপ্টেন হিসেবে বারবার যতই ফিল্ড আর বোলার চেঞ্জ করুক না কেন আর কোনও উইকেট পড়ে না। দশ ওভারে বিরানব্বই রান।

হঠাৎ দেখি দূর থেকে অনর্থবাবু চিৎকার করতে করতে ছুটে আসছেন।

অনর্থবাবুর ওই পাগলের মতো ছুটে আসা দেখে অনিলিখাদি হাত তুলে আমাদের সবাইকে থামতে বলল।

কী ব্যাপার!

ডেড! মারা গেছে। লাশ। কী সর্বনাশ! অনর্থবাবু দেখি দূরে যে বেঞ্চিতে বসেছিলেন, সেদিকটা দেখিয়ে বলতে বলতে আমাদের দিকে ছুটে আসছেন।

অনিলিখাদির সঙ্গে সঙ্গে আমরা সবাই ছুট লাগালাম বেঞ্চিটার দিকে। বেঞ্চিটা মাঠের বাইরে। রাস্তার ধারে। ওখানেই অনর্থবাবু বসে খেলা দেখছিলেন। অনিলিখাদির একটা ছয় মারার পরে ভয়ে দূরে এসে বসেছিলেন যাতে গায়ে বল না লাগে। আমরা দূর থেকে দেখতে পাচ্ছিলাম, আরেকজন কেউ বসে আছে পাশে।

কাছে গিয়ে দেখি সেই ব্যক্তির ঘাড় একদিকে কাত হয়ে গেছে। মুখ থেকে লালা গড়িয়ে শুকিয়ে গেছে।

অনিলিখাদি নাড়ী দেখে বলল, ডেড। কিন্তু বডি টেম্পারেচার দেখে মনে হচ্ছে এক-দেড় ঘন্টার মধ্যেই মারা গেছেন। শরীর এখনও গরমই আছে। তারপর অনর্থবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, আপনার সঙ্গে কোনও কথা হয়েছিল?

না, মানে আমার দিক থেকে হয়েছিল। আমি ভাবছিলাম ভদ্রলোক চুপ করে আমার কবিতা শুনছেন। পর পর চারটে শোনালাম। কিন্তু এত ধৈর্য ধরে কোনও কথা না বলে শুনছেন বলে, ভালো করে দেখতে গিয়ে বুঝলাম...। একটু থেমে ফের বলে উঠলেন, কী হয়েছে মনে হচ্ছে? হার্ট অ্যাটাক?

টেস্ট না করে বোঝা যাবে না। ইমিডিয়েটলি পুলিশে খবর দিতে হবে। সহেলীর কাকা ইতিমধ্যেই পুলিশে, অ্যাম্বুল্যান্সে ফোন করেছে।

খেলাটেলা সব তখনই বন্ধ।

৫ জুলাই, কল্যাণগড়, মিঃ পাই-এর বাড়ি

অনিলিখা ছুটে এসেছে মিঃ পাই-এর বাড়িতে। ক্রিকেট মাঠে মারা যাওয়া সেই ব্যক্তির পরিচয় পুলিশ পেয়েছে। নাম অরুনাভ সান্যাল। বহু বছর দেশের বাইরে। আমস্টারডামে 'ব্রেনবো' বলে একটা সংস্থায় জীববিজ্ঞানী হিসেবে কাজ করছিলেন। কিছুদিনের জন্য দেশে ফিরে এসেছিলেন।

অরুনাভবাবুর বাবা হাবড়ার কাছে এক স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। বেশ কয়েক বছর হল মারা গেছেন। ওদের বাড়িটা ফাঁকাই পড়ে থাকত। কিছুদিন আগে অরুনাভবাবু থাকতে শুরু করেছিলেন। তেমন কারো সঙ্গে মিশতেন না। মৃত্যু হার্ট অ্যাটাকে বলে সন্দেহ করা হলেও নিশ্চিতভাবে বলা যায়নি।

ভদ্রলোক বাড়িতে সিকিউরিটি গার্ড ছাড়াও সি সি টিভি ক্যামেরা ও আরও অত্যাধুনিক সিকিউরিটি সিস্টেম বসিয়েছিলেন। হাবড়ার মতো জায়গায় এক বিজ্ঞানীর হঠাৎ এত কেন নিরাপত্তার দরকার হয়ে পড়ল?

অনিলিখার সব কিছু শুনেই কেন জানি মনে হয়েছে ব্যাপারটা খুব স্বাভাবিক নয়। এবিষয়ে সরাসরি কিছু কথা বলা দরকার মিঃ পাই-এর সঙ্গে।

গণেশ অনিলিখাকে ড্রয়িংরুমের সোফায় বসিয়ে মিঃ পাইকে ডাকতে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই মিঃ পাই হাজির। হাতে একটা হেমেন্দ্রকুমার সমগ্র।

বইটা টেবিলের উপরে রেখে উল্টোদিকের সোফায় বসে একগাল হেসে বললেন, এ তো দারুণ সারপ্রাইজ অনিলিখা। বলো কী ব্যাপার?

আপনি যেটা নিয়ে ভাবছেন, আমিও সেই বিষয়েই কিছু প্রশ্ন নিয়ে এসেছি।

মানে? আমি কী বিষয় নিয়ে ভাবছি, সেটা তুমি জানলে কী করে?

ওই যে টেবিলের উপরে আধখোলা কাগজ যেখানে অরুনাভবাবুর মৃত্যুর খবরটা বেরিয়েছে। তারপরে ওই যে 'হেমেন্দ্রকুমার সমগ্র' বই-এর গায়ে লাগিয়ে রাখা পোস্ট ইটে ব্রেনবোর ওয়েব সাইট অনুযায়ী ফোন নাম্বার লিখে রেখেছেন—তা থেকেই বুঝলাম আপনিও ওই নাম্বারে কাউকে না পেয়ে নির্ঘাত ফোন করতে গিয়েছিলেন আপনার কোনও বন্ধুকে। আমিও চেষ্টা করেছিলাম।

ওরে বাবা, কী অবসারভেশন। হ্যাঁ, ঠিকই। ব্রেনবোর নাম্বারে না পেয়ে আমার এক ইউরোপীয় জীববিজ্ঞানী বন্ধুকে ফোন করে খবর নিচ্ছিলাম। বলো কী ভাবছ?

আসলে শুধু এটা নয়, বেশ কিছু ঘটনা মাথায় ঘুরছে। জানি না এগুলো কোনওভাবে কানেক্টেড কিনা। এই ধরুন, চিড়িয়াখানার ঘটনাটা—চারটে বাঘের খাঁচা থেকে বেরিয়ে এসে নিজেদের মধ্যে দারুণ সমন্বয় রেখে আক্রমণের ঘটনা, মোগাদিসুতে ঈগলের আক্রমণের ঘটনা, অস্ট্রেলিয়ায় ক্যাশুয়ারির আক্রমণের ঘটনা—এসবের মধ্যে কোথায় যেন মিল আছে।

হুম। অনিলিখা, তুমি ডক্টর জশুয়া শেঙ্গের নাম শুনেছ?

না, খেয়াল করতে পারছি না।

না শোনাটাই স্বাভাবিক। তোমার ফিল্ডের নয়। দু-বছর আগে উনি একটা খুব বড় আবিষ্কার করেছিলেন। উনি আমাদের ব্রেনের নিউরন ইঁদুরের ব্রেনে ট্রান্সপ্লান্ট করে রিসার্চ করেছিলেন।

ইন্টারেস্টিং! বলে অনিলিখা সোফাতে নড়েচড়ে বসল।

আসলে পারকিন্সন্সের মতো স্নায়ুরোগের চিকিৎসা এবং এটা ঠিক কেন হয়—সেটাই ছিল জশুয়ার রিসার্চের বিষয়। সেখানে দেখা যায়, ইঁদুরের মধ্যে বেশ কিছু মানুষের মতো স্বভাব আছে। পরে উনি মানুষের নিউরাল স্টেমসেল নানান প্রাণীর ব্রেনসেলে মিশিয়ে দেখছিলেন। কিছু প্রাণীতে অস্বাভাবিক কিছু মনুষ্যসুলভ ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। এই নিয়ে তখন বিজ্ঞানী মহলে হইচই শুরু হয়।

আপনি কী বলতে চান এই ঘটনাগুলোর পিছনে এই একই কারণ? এ তো সত্যি বেশ চিন্তার ব্যাপার। যদি ওই চিড়িয়াখানার বাঘের ব্রেনসেলে মানুষের ব্রেনসেল ঢুকিয়ে তার বুদ্ধি-বিবেচনা মানুষের মতো করে দেওয়া হয়ে থাকে...

এক্সাক্টলি। এছাড়া, কেন জশুয়া শেঙ্গের নাম বললাম বলো তো?

ওই 'ব্রেনবো' সংস্থার সঙ্গে ওনার যোগাযোগ আছে?

হ্যাঁ। ওটাই খুঁজে পেলাম। উনি আমেরিকা ছেড়ে এখানে এসে কী করছিলেন, এই সংস্থাটা কী কাজ করছিল, সেটা বোঝা দরকার। আমার মনে হয় এমন কিছু রিসার্চ ওরা করছিল, যা আমেরিকায় নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। সেজন্য উনি আমস্টারডামে চলে আসেন।

কিন্তু প্রশ্ন হল অরুণাভবাবুর মৃত্যুর সঙ্গে এসব রহস্যের কোনও যোগাযোগ আছে কিনা! উনি এমন কী জানতেন, যার জন্য ওনাকে সরিয়ে দেওয়া হল?

তুমি ইউরোপে প্রায়ই যাও। কোনও প্ল্যান আছে নেদারল্যান্ডস যাওয়ার?

অনিলিখা মুচকি হেসে সায় দিল। বলল, পরের মাসে যেতে পারি, তখন একবার যাব ভাবছি।

হ্যাঁ, অবশ্যই দেখো। কেন জানি না। আমিও তোমার সঙ্গে সহমত। কিছু একটা অস্বাভাবিক আছে। সাধারণ চোখে সেটা ধরা পড়বে না।

মিঃ পাই একটু থেমে ফের বললেন, তুমি অক্টোপাসের চোখ লক্ষ করেছ?

কেন বলুন তো? মানুষের চোখের মতো একরকম বলে?

ঠিক তাই। দেখো আমরা সবাই অক্টোপাসের কথা জানি, কিন্তু আমরা এরকম একটা বিস্ময়কর বিষয় নিয়ে কেউ ভাবিনি। কেউ না।

আমাদের অর্থাৎ মানুষের ও অক্টোপাসের কমন পূর্বপুরুষ, অর্থাৎ যেখান থেকে আমরা আলাদা হয়ে যাই বিবর্তনের ধারায়, সেটা প্রায় ছ'শো মিলিয়ন বছর আগে। যেখানে শিম্পাঞ্জির ও আমাদের কমন অ্যান্সেটার মোটে দশ মিলিয়ন বছর আগের, কিন্তু ওদের থেকে অক্টোপাসের চোখের সঙ্গে আমাদের অনেক বেশি মিল।

উঁহু, দশ নয়, ষোলো মিলিয়ন বছর আগে শিম্পাঞ্জিদের থেকে আলাদা হয়ে যাই আমরা। তোমার আই কিউ দেখে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি অনিলিখা! আমার মাথায় এই চিন্তাটা শেষ কয়েকদিন ধরে ঘুরছে। দেখো, কোনওরকম যোগাযোগ না থাকা সত্ত্বেও যদি চোখ একরকম হতে পারে বিবর্তনের নিয়মের বাইরে গিয়ে, বুদ্ধির ক্ষেত্রেও কী হাইলেভেল ইন্টেলিজেন্স একইরকমভাবে হঠাৎ করে কোনও এক প্রাণীর মধ্যে গড়ে উঠতে পারে না?

হয়তো অক্টোপাস কতটা বুদ্ধিমান, সেটাও আমরা বুঝতে পারছি না। হয়তো ওদের বুদ্ধির বিকাশ অন্যভাবে গড়ে উঠেছে। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে তা মানুষের থেকে এগিয়ে।

গুড থট প্রসেস। ইনটেলিজেন্স ভিন্ন ভিন্ন ধরনের হয়। আমরা যেভাবে মানুষের ইন্টেলিজেন্স বিচার করি, সেই একই ফ্রেমওয়ার্ক দিয়ে হয়তো অন্য কোনও প্রাণীর ইন্টেলিজেন্স মাপা ঠিক নয়। নাহ্, অনিলিখা, তুমি আমার বাড়িতে কিছুদিন এলে আমার কাজগুলো অনেক তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাবে। মাঝে মধ্যে সময় করে এসো।

১৫ আগস্ট, সুইসরেল, সুইজারল্যান্ড

জুরিখ থেকে জেনিভা প্রায় দু-ঘণ্টার রাস্তা। ট্রেনের দু-দিক দিয়েই অপূর্ব দৃশ্য। ট্রেনের বাঁ-দিকে বসলে নাকি আরও ভালো দৃশ্য চোখে পড়ে, লেকটা এদিকেই পড়ে। তাই বাঁ-দিকের সিটে বসেছিল অনিলিখা।

ট্রেন বেশ ফাঁকা। ছড়িয়ে ছিটিয়ে কিছু লোক বসে আছে। জুরিখ ছাড়ার আধ ঘণ্টা পর থেকেই শুরু হয়ে গেল পাহাড় উপত্যকা, ছোট ছোট গ্রাম, খামার বাড়ি, সুইস কটেজ। লুসারন পেরোনোর পরেই বাঁ-দিকে লেক শুরু হয়ে গেল। পাহাড় আর লেক। প্রকৃতি দেবী কোনও কার্পণ্য করেননি সুইজারল্যান্ডকে সাজানোর জন্যে, সব কিছু দিয়ে নিখুঁতভাবে সাজিয়েছেন।

বাইরের এই দৃশ্য দেখতে দেখতে এত বিভোর হয়ে গিয়েছিল অনিলিখা, খেয়ালই করেনি কখন উল্টোদিকে এক বৃদ্ধ এসে বসেছেন। প্রথমে কিছুটা দ্বিধা থাকলেও একটু পরেই নিশ্চিত হল অনিলিখা। বিখ্যাত পরিবেশবিদ, প্রকৃতিবিদ বিজ্ঞানী মরিস অ্যাশ। আশির কাছাকাছি বয়স।

অনিলিখা ইংরেজিতেই জিগ্যেস করল, আপনি স্যার মরিস অ্যাশ না?

চমকে উঠলেন ভদ্রলোক। হেসে বললেন, তা আমি তো সেরকম কোনও সেলিব্রিটি নই, আমাকে চিনতে পারলে কী করে?

মৃদু হেসে অনিলিখা বলল, আমি ঠিক শিওর ছিলাম না যদিও। আপনার বেশ কিছু বই পড়েছি আমি। বইয়ের পিছনে আপনার ছবি দেখেছি। সেখান থেকেই। তবে আপনি চিরকালই মিডিয়াকে অ্যাভয়েড করেছেন, যেটা অন্য অনেকের ক্ষেত্রে খাটে না। সেজন্য আমারও একটু দ্বিধা ছিল।

কিছুক্ষণের মধ্যে আড্ডা বেশ জমে উঠল। অনিলিখা বাঁ দিক থেকে উঠে ভদ্রলোকের উল্টোদিকে গিয়ে বসল। এরকম আলাপের সুযোগ ছাড়া যায়! গত তিরিশ বছর ধরে গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর বিরুদ্ধে প্রধান যোদ্ধাদের মধ্যে উনি একজন। উনিই প্রথম কীভাবে কোরাল রিফ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, তার ছবি সবার সামনে তুলে ধরেছিলেন। তুলে ধরেছিলেন কীভাবে একের পর এক প্রাণী জীবজগৎ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, তার বৃত্তান্ত।

কথায় কথায় অনিলিখা হঠাৎ করেই বলল, আচ্ছা, এবারে ডাভোসে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের অ্যানুয়াল কনফারেন্সে গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর বিরুদ্ধে সেরকম কোনও কণ্ঠস্বর শোনা গেল না কেন?

ভদ্রলোক তীক্ষ্ণ চোখে তাকালেন অনিলিখার দিকে। তারপর বললেন, আমরা খুব শক্তিশালী লবির বিরুদ্ধে লড়ছি, বুঝলে অনিলিখা? যারা চাইলে, যা ইচ্ছে তাই করতে পারে। তারা চায়নি ডাভোসে এ বিষয়ে কোনও আলোচনা হোক, তাই হয়নি।

কিন্তু এখন তো প্রায় একশো পঁয়ত্রিশটা দেশ কার্বন এমিশন কমানোর টার্গেট নিয়েছে!

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ওটা আই ওয়াশ, লিগালি বাইন্ডিং কিছু নয়। অনেক দেশই কিছুই করছে না। তাছাড়া কিছু শক্তিশালী সংস্থা বুঝেছে যে কার্বন ফুট প্রিন্ট কমাতে গেলে তাদের ব্যবসার বারোটা বেজে যাবে। তারা এখন ডেস্পারেটলি অন্য কিছু করার চেষ্টা করছে।

আর সেটা কী?

বৃদ্ধ একবার চারদিকে তাকিয়ে নিয়ে নীচু স্বরে বললেন, নজর অন্যদিকে ঘোরানোর চেষ্টা করছে। অনেক টাকা, সুযোগ-সুবিধে দিয়ে সব পরিবেশবিদ ও বিজ্ঞানীদের কিনে নিচ্ছে। ডেটাপয়েন্ট বদলে দিচ্ছে। আমাদের মতো লোকদের

চুপ করিয়ে দিচ্ছে। বুঝতেই পারছ কারা সব থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হবে যদি কার্বন নিষ্ক্রমণ কমাতে বাধ্য করা হয়। সব কিছু ঠিক দিকে এগোচ্ছিল। কেন জানি না, গত সাত-আট মাস সবকিছু আবার পাল্টে গেছে। মিঃ লুই প্রিস্টার কথা শুনেছ?

হ্যাঁ, পরিবেশবিদ লুই প্রিস্টার? দু-সপ্তাহ আগে ফ্রান্সে গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা গেলেন তো। খুব আনফরচুনেট।

ব্যাপারটা আরও আনফরচুনেট কারণ ওটা কোনও দুর্ঘটনা নয়। প্ল্যানড মার্ডার। সুপরিকল্পিত হত্যা।

মানে? কী বলছেন।

ঠিকই বলছি। আমার মনে হয় আমারও খুব বেশি সময় নেই হাতে। সেজন্য কিছু বিষয় এখানে জানাতে এসেছি।

বিশ্বজুড়ে আরও বেশ কয়েকটা মৃত্যু হয়েছে গত কয়েক মাসে, যা আমার চোখ এড়ায়নি। কোনওটাই স্বাভাবিক নয়। বলতে পারো, একটু একটু করে গ্রিন লবিকে ভেঙে ফেলা হচ্ছে।

আচ্ছা, জানি না আপনি লক্ষ করেছেন কিনা, বেশ কিছু ঘটনা থেকে মনে হচ্ছে কেউ বা কারা যেন বিভিন্ন দেশে নানান ঘটনা ঘটিয়ে সেই দেশের অভ্যন্তরীণ অবস্থার অবনতি চাইছে, বা এমন কিছু করছে যাতে প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে যুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। এটা অবশ্য আমার ধারণা।

স্যার মরিস যেন চমকে উঠলেন। বলবেন না ভেবেও শেষে বলেই ফেললেন, তোমার সন্দেহ ভুল নাও হতে পারে।

জেনেভাতে নামার আগে স্যার মরিস হঠাৎ করে বলে উঠলেন, আমি মরজেসের বঁ রিভেজ প্যালেস হোটেলে আছি। তুমি তো এখানে কয়েকদিন আছ। পারলে একদিন এসো। একসঙ্গে ডিনার করা যাবে।

সে তো আমারও খুব ভালো লাগবে। আপনি গত চল্লিশ বছর ধরে দেশ-বিদেশে নানান দুর্গম জায়গায় অভিযানে গেছেন। সে সব গল্প শোনা যাবে। আমি অবশ্য তিনদিন আছি এখানে। আপনার নাম্বারটা দিন।

হ্যাঁ, নিয়ে নাও।

১৭ আগস্ট, জেনিভা, সুইজারল্যান্ড

ইউনাইটেড নেশনস-এর সব অফিসের হেড কোয়ার্টার জেনিভায়। সেজন্যেই অনিলিখার এখানে বিশেষ কাজে আসা।

ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরামের এক সিনিয়র অফিসারের সঙ্গে সকালে একটা দরকারি মিটিং ছিল। দুপুর একটা নাগাদ অনিলিখা সেই বিল্ডিংয়ের নিরাপত্তার

ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে এসে খেয়াল করল, কয়েক ঘণ্টা আগে স্যার মরিসের একটা মেসেজ এসেছে।

সন্ধে সাতটায় ডিনারে যদি অনিলিখা যোগ দিতে পারে, উনি খুব খুশি হবেন। উনি আছেন জেনিভা থেকে মিনিট কুড়ির দূরত্বে শহর মরজেসের সেই হোটেলে।

স্যার মরিস কেমন মানুষ সে ব্যাপারে অনিলিখার কিছুই জানা নেই। তবে বই পড়ে লেখক সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যায়। তাতে মনে হয়েছে খুব আদর্শবাদী এবং সাহসী মানুষ মরিস। আদর্শের জন্য নিজের প্রাণ দিতেও দ্বিধা করবেন না। এরকম মানুষকে অনিলিখা খুব শ্রদ্ধা করে।

এমনিতে ইচ্ছে ছিল সন্ধের দিকে জেনিভার লেক, জেনিভার পুরোনো শহরের দিকটা ঘুরে দেখার। কিন্তু তার থেকে স্যার মরিসের সঙ্গে কথা বলা অনেক বেশি দরকার। উনি নিশ্চয়ই সাম্প্রতিক কালের এসব ঘটনার বিষয়ে আরও কিছু জানেন। গত পরশু সেটা প্রথম পরিচয়ে বলেননি।

মরজেস পৌঁছাতে ঠিক বারো মিনিট লাগল। এখানে একদম ঘড়ির কাঁটা ধরে ট্রেন চলে। এক মিনিট দেরি হলেও পাশে লাল রঙে ডিলেড বাই ওয়ান মিনিট বলে পরিবর্তিত সময় দেখানো হয়। তবে সেরকম খুব কমই হয়।

মরজেস খুব পুরোনো শহর। ব্রোঞ্জ যুগে অর্থাৎ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ ২৭০০ বছর আগেও এখানে মানুষের বসতি ছিল। পরে ১২৮৬ সালে লুই অফ স্যাভয় এখানে এক দুর্গ তৈরি করেন। মরজেস সেই সময় থেকে আবার খুব গুরুত্বপূর্ণ শহরে পরিণত হয়।

মরিস নিজেও গ্লোবাল ওয়ার্মিং কমানোর জন্য সব কিছু মেনে চলেন সেটা ওঁর ব্যবহারেই বোঝা যায়। আগের দিনই বলেছিলেন যে নেহাৎ বাধ্য না হলে উনি এখন গাড়ি ব্যবহার করেন না। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বেশিরভাগ কাজ সারেন, গাড়ি, প্লেন সবেতেই কার্বন এমিশন বাড়বে।

এই হোটেলটাও কার্বন ফুটপ্রিন্ট কমানোর জন্য যা যা করা সম্ভব, সব কিছুই করে। এমনকী খাবারের ক্ষেত্রেও এরা স্থানীয় কৃষকদের উৎপাদন করা জিনিস ব্যবহার করে।

খোলা বাগানে একসঙ্গে ডিনার করতে বসে স্যার মরিস বললেন, তুমি তো খুব বিখ্যাত মহিলা অনিলিখা? আমার কীরকম অজ্ঞতা দেখো, শুধু প্রকৃতি নিয়ে মেতে থাকি। পরশু ট্রেনে তুমি হঠাৎ যখন চারদিকের অশান্তি ও যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্নটা করলে, আমি একটু ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, তুমি কারোর স্পাই, বা গুপ্তচর কিনা। এটা তো সারাধারণ কারো খেয়াল করার কথা নয়।

তারপর আমার সেক্রেটারি মারিয়ার কাছে তোমার সম্বন্ধে সব তথ্য পাওয়ার

পর আমি নিশ্চিন্ত হই। তুমি ঠিকই বলেছ। অনেক কিছুই ঘটছে। আমি নিশ্চিত, এগুলো ঘটানো হচ্ছে। কে বা কারা এর পিছনে আছে তা আন্দাজ করতে পারলেও কীভাবে করছে তা বুঝতে পারিনি। আমার ধারণা এর পিছনে খুব বড় কোনও বিজ্ঞানী বা বিজ্ঞানীদের টিম কাজ করছে। এই যে আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে জঙ্গিরা নিষিদ্ধ কেমিক্যাল ওয়েপন ব্যবহার করছে বলে শোনা যাচ্ছে, সেটা ওদের হাতে পৌঁছচ্ছে কী করে। এই যে সোমালিতে প্রেসিডেন্টের প্যালেসে হঠাৎ করে ঈগলের আক্রমণ বা অস্ট্রেলিয়ায় বাচ্চাদের স্কুলে ক্যাশুয়ারির আক্রমণ— এই ঘটনাগুলোর কোনও ব্যাখ্যা আছে কি? আমি খবর পেয়েছি 'ব্রেনবো' বলে একটা সংস্থা যুক্ত আছে এদের সঙ্গে।

ব্রেনবো—নেদারল্যান্ডসের সংস্থা, তাই তো?

হ্যাঁ। পারলে একটু খোঁজ নিয়ে দেখো। এসবের পিছনে আছে তিন মাথা। তবে তারা আমাদের সবার ধরাছোঁয়ার বাইরে। তাদের বিরুদ্ধে সরাসরি কোনও কিছু প্রমাণ পাওয়াও যাবে না।

জেনিভার লেকই এখান অব্দি এসে পৌঁছেছে। গ্লেসিয়ার সরে গিয়ে এসব লেক তৈরি হয়েছে। ডিনারের পর হোটেল লাগোয়া লেকের ধারে হাঁটতে হাঁটতে মরিস বললেন, এদের লবি ইচ্ছে করে পরমাণুযুদ্ধ সংক্রান্ত উত্তেজনাও বাড়াচ্ছে। ফের যদি সবাই পরমাণু অস্ত্র প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠে, গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর কথা আর কে ভাববে!

এই লবিতে কারা আছে?

স্যার মরিস এবারে কোনও উত্তর দিলেন না।

পড়ন্ত সূর্যের আলোয় লেকটা যেন আরও মোহময় হয়ে উঠছিল। সীগালের দল হাওয়ার নেশায় মাতালের মতো উড়ে বেড়াচ্ছিল।

মিনিট পাঁচেক বাদে স্যার মরিস আবার শুরু করলেন, কারোর নাম সামনে আনার আগে এসব ঘটনার পিছনের রহস্য বুঝতে হবে। সেটা সামনে আনলেই এরা এক্সপোসড হয়ে যাবে। ডক্টর গিল হারভের নাম শুনেছ? খুব নামী কিন্তু কুখ্যাত বিজ্ঞানী। এসব ঘটনার সঙ্গে ওঁর কিছু একটা যোগাযোগ থাকতে পারে।

চমকে উঠল অনিলিখা। এই ডক্টর গিল হারভের সঙ্গে অনিলিখার দুবার বিশেষ কারণে গভীরভাবে পরিচয় হয়েছে। দুবারই একদম শেষ মুহূর্তে গিল হারভে রক্ষা পেলেও ওনার সমস্ত ষড়যন্ত্র অনিলিখা সামনে এনে একটা বড় সংখ্যক মানুষকে বাঁচিয়েছে।

অনিলিখা বলল, হ্যাঁ, আমি চিনি, কিন্তু আপনি কী করে জানলেন যে ডক্টর গিল হারভের সঙ্গে এসব ঘটনার যোগাযোগ আছে?

আমি শুনেছি, ডক্টর গিল হারভে ও তার কোম্পানি এদের সঙ্গে কাজ

করে। সেখানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে এঁরা অনেক কিছু করার চেষ্টা করছে। বলে একটু থেমে ফোনটা এগিয়ে দিলেন অনিলিখার কাছে।

এই দুটো কোম্পানির উপরে আমার সন্দেহ আছে।

অনিলিখা স্ক্রিনে দেখল দুটো নাম—একটার কথা আগেই শুনেছে, ব্রেনবো, অন্যটা সুইজারল্যান্ডের ব্যাসেলে অবস্থিত একটা বিখ্যাত ফার্মা ও ড্রাগ কোম্পানি। নাম মেডলা।

এই মেডলাই আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে কোভিডের ভ্যাকসিন তৈরি করার ব্যবস্থা করেছে, তাই না? শুনেছি সমুদ্রে ভাসমান জাহাজে কোভিডের ভ্যাকসিন তৈরি করছে যাতে খুব কম খরচে ওই ভ্যাকসিন মডিউলার ভাবে তৈরি করে আফ্রিকার মানুষকে দেওয়া যায়। এ বিষয়ে ওরা ইউ এন-এর গ্লোবাল ফান্ডের সঙ্গেও তো কাজ করছে!

হ্যাঁ, কিন্তু শুধু ড্রাগ নয়, আমার কাছে খবর আছে এরা কেমিক্যাল ওয়েপনও তৈরি করছে একই ফেসিলিটি ব্যবহার করে।

ও মাই গড! ভেবে দেখলে এটা তো ওদের পক্ষেই করা সহজ। আর এভাবে জঙ্গিদের হাতে পৌঁছে দেওয়াও সহজ।

আর ইউ এন-এর গ্লোবাল ফান্ড ছাড়াও ওদের এই বিষয়ে অনেক অর্থ সাহায্য করছে একটা খুব বড় গাড়ির কোম্পানি ভক্সজেন। বুঝতেই পারছ কী হতে চলেছে! তুমি অবশ্যই ওদের অফিসে যেও। আমার এক চেনা লোক আছে ওখানে, সে তোমাকে খুলে বলবে। আমি পরে তোমাকে তার কথা জানাবো।

হাতঘড়ির দিকে নজর পড়ল অনিলিখার। বাইরে যথেষ্ট আলো থাকলেও সাড়ে ন'টা বাজে। এবারে ফিরতে হবে।

স্যার মরিসকে বিদায় জানানোর সময় মরিস অনিলিখার হাত দুটো সস্নেহে জড়িয়ে ধরে বললেন, আমার অনেক বয়স হয়ে গেছে। আমার পক্ষে আর কিছুই করা সম্ভব নয়। কিন্তু তোমার সম্বন্ধে যতটুকু জেনেছি, আমার ধারণা তুমি পারবে। এই বিশ্বকে বাঁচাতেই হবে। আমরা কিছু অত্যন্ত ক্ষমতাশালী খারাপ মানুষের হাতে খেলার পুতুল হয়ে উঠছি। এদের পিছনে যারা আছে, তাদের কখনই সহজভাবে আইনের সামনে আনা যাবে না। অন্যভাবে কিছু করতে হবে। সে দায়িত্ব পারলে তুমি নিও।

অনিলিখা মরিসকে হোটেলের কাছাকাছি একটা জায়গা অব্দি এগিয়ে দিয়ে স্টেশনের পথ ধরল। রাস্তা এখন ফাঁকা হয়ে এসেছে। সমুদ্রের ধার ছেড়ে পুরনো শহরের পাথরের সরু সরু অলিগলি ধরে এগোনোর সময় লক্ষ করল দোকান, পাব, রেস্টুরেন্ট সবই বন্ধ হয়ে গেছে। রাস্তার ষড়ভুজ ল্যাম্পের হলুদ আলোয় পুরোনো শহরের পাথরের রাস্তা যেন আরও রহস্যময় হয়ে উঠেছে। হাওয়ায় মিষ্টি ফুলের গন্ধ ভাসছে।

হঠাৎ মনে হল পাশের একটা গলি দিয়ে একটা মুখে মাস্ক পরা কালো বিশাল চেহারের লোক বেরিয়ে এল। অনিলিখা কিছু বোঝার আগেই ওর মুখের উপরে লোকটা রুমাল চেপে ধরল। অনিলিখা একটা উগ্র গন্ধ পেল। অবশ হয়ে এল ওর পুরো শরীর।

১৭ আগস্ট, রাত বারোটা, মরজেস, সুইজারল্যান্ড

শরীর খারাপ লাগছে? ফ্রেঞ্চ ভাষায় কোনও এক পুরুষকণ্ঠ বলে উঠল।

প্রথমে মনে হল কে যেন বহুদূর থেকে ডাকছে। আস্তে আস্তে হুঁশ ফিরে পেতে দেখল পাশে উবু হয়ে বসে আছেন এক বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা। আর অনিলিখা রাস্তায় শুয়ে আছে।

ক'টা বাজে? কোনোমতে জিগ্যেস করল অনিলিখা।

রাত বারোটা। এত রাতে এখানে তোমাকে পড়ে থাকতে দেখে আমরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসি। আমার স্ত্রী মারিয়া পাঁচ মিনিট আগে তোমাকে দেখে বাড়ির জানলা দিয়ে।

এটা কোথায়?

মরজেস।

এবারে অনিলিখার সব কিছু খেয়াল হয়।

বৃদ্ধা বললেন, মনে হয় মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলে! ডাক্তার দেখিয়ে নিও। আজকাল কমবয়েসিদেরও কত কিছু হয়। কোনওরকম চোট পাওনি তো?

রাস্তার এক কোণে পড়ে ছিল অনিলিখা। উঠে দাঁড়াল ধীরে ধীরে। আশ্চর্যভাবে গায়ে সেরকম কোনও ব্যথা টের পেল না সে।

বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাকে ধন্যবাদ জানিয়ে স্টেশনের দিকে হাঁটতে শুরু করল।

কে ছিল লোকটা? কেন হঠাৎ করে এরকম করল। কিছু চুরিও তো করেনি। তাহলে? ঠিক কী হয়েছিল। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে ও স্টেশনে পৌঁছে যায়। রাত এখন বারোটা বেজে দশ। ঘড়িতে দেখাচ্ছে জেনিভার ট্রেন বারোটা কুড়িতে।

২০ আগস্ট, বাজিল, সুইজারল্যান্ড

দু-দিন আগে অনিলিখা জেনিভা থেকে জুরিখে ফেরত এসেছে। জুরিখে একটা দরকারি মিটিং ছিল অনিলিখার।

১৭ তারিখে অজ্ঞান হওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে ধন্ধে থাকলেও সে বিষয়ে কিছু খোঁজ নেওয়ার সময় পায়নি। প্রথমত বিদেশ বিভুঁই। ভাষার সমস্যাও আছে। জার্মান বা ফ্রেঞ্চ ভালো করে না জানলে, বোঝানো মুস্কিল। তাছাড়া পুলিশকে জানাতে হলে আবার মরজেসে যেতে হবে। সে আবার দু-ঘণ্টার জার্নি। তাছাড়া কিছু খোয়া যায়নি, শরীরে কোনও আঘাত লাগেনি, এসব বললে কেউ আসল ঘটনাটা বিশ্বাস না করে ভাববে অন্য কোনও কারণে হয়তো অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। এখানে মাত্র কয়েকদিনের জন্য নানান কাজ নিয়ে আসা। তার মধ্যে এসবের জন্য সময় পাওয়া খুব শক্ত।

তার থেকে বাজিলে যাওয়া দরকার। যদি মেডলা সংস্থার সম্বন্ধে কোনও খোঁজ পাওয়া যায়।

১৯ তারিখ একটা ডিনার মিটিং-এ উপস্থিত ছিলেন অন্য এক ফার্মা কোম্পানির উচ্চপদস্থ অফিসার। মেডলার এক সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্টকে উনি ভালো করে চেনেন। তার সূত্রেই পরের দিন মিটিং ঠিক হল।

সকাল দশটায় মিটিং ছিল। সাড়ে ন'টা নাগাদ বাজিল পৌঁছে গেল অনিলিখা। স্টেশন থেকে মেডলার অফিস হাঁটা পথ। ভারি সুন্দর শহর। দূরে বরফ ঢাকা আল্পস দেখা যাচ্ছে। এখানে সারা বিশ্বের অনেক নামী ফার্মা কোম্পানির অফিস আছে, যাদের মধ্যে 'রশ মেডিক্যালস', 'নোভোনরডিস্ক' ও আছে। মেডলার অফিসের আর্কিটেকচারটা খুব সুন্দর, পুরো কাচের বিল্ডিংটা অনেকটা ইংরেজি 'এ' লেটারের মতো দেখতে।

রিসেপশনিস্টের সঙ্গে দেখা করতেই মহিলা বললেন, মিঃ ক্রিস মুলার দেখা করতে পারবেন না। হঠাৎ বিশেষ একটা দরকারে ওনাকে বেরোতে হয়েছে।

অবাক হল অনিলিখা। অনিলিখার নাম্বার ছিল ওনার কাছে। জানাতে পারতেন। তাহলে কি উনি কিছু আন্দাজ করেছেন। আর তাই মিটিংটা অ্যাভয়েড করলেন?

অনিলিখা ধন্যবাদ জানিয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে আবার ট্রেন স্টেশনের দিকে হাঁটতে শুরু করল।

মিনিট পাঁচেক যেতে না যেতে হঠাৎ যেন ওর মনে হল পিছন পিছন কেউ একজন আসছে। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল একজন ছোটখাটো চেহারার লোক ওর দিকে এগিয়ে আসছে।

লোকটা অনিলিখার কাছে এসে ইংরেজিতে বলল, চলুন, যেতে যেতে কথা বলি। আমি মেডলাতে কাজ করি। এক বছর আগে ঢুকেছি। আমি সব জানি। আপনার পরিচয়ও। জানতাম ক্রিস আপনার সঙ্গে দেখা করবেন না। সব কিছু না জেনে এখানে কেউ কারোর সঙ্গে দেখা করে না এখন। স্যার মরিস আমার খুব পরিচিত। স্যার মরিসকে কিছু জিনিস জানানোর ছিল। কিন্তু হঠাৎ

করে চলে যাওয়ায় আমি ওনাকে পুরোটা বলতে পারিনি। দুদিন আগেই পুরো খবরটা পেয়েছি। স্যার মরিস বলেছিলেন ওনার কিছু হলে আপনাকে জানাতে।

স্যার মরিসের চলে যাওয়া। ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না। অনিলিখার ভ্রুদুটো কুঁচকে উঠল।

সে কি, খবরটা পাননি? উনি মারা গেছেন ১৭ তারিখ রাতে, দুদিন আগে। আমিও কালকের আগে জানতাম না। সেই দিনই উনি আমাকে ফোন করে বলেছিলেন যে আপনি এখানে এলে আপনাকে এখানকার ব্যাপারে সমস্ত খবরাখবর জানাতে। আমার ধারণা উনি বুঝতে পারছিলেন যে ওনার মৃত্যু আসন্ন।

অনিলিখা থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। তার মানে সেই রাতেই অনিলিখার সঙ্গে দেখা হওয়ার পরে উনি মারা গেছেন। কীভাবে।

কীভাবে মারা গেলেন উনি?

সেটা নিয়ে তদন্ত হচ্ছে, তবে স্বাভাবিক মৃত্যু নয়। কোনওভাবে পয়জন দেওয়া হয়েছিল।

আশ্চর্য! তা আপনি কী বলবেন বলছিলেন এই কোম্পানির ব্যাপারে।

মেডলার কর্মকাণ্ডের কথা জানেন তো?

হ্যাঁ, কোভিডের ভ্যাকসিন ও আগামীদিনে এরকম কোনও সংক্রমণের ভ্যাকসিন ইউরোপ বা আমেরিকা বা ভারত থেকে না এনে যাতে আফ্রিকার কাছে কোথাও কম খরচে বানানো যেতে পারে, তার জন্য বেশ কিছু মডিউলার কনটেনার তৈরি করেছে। ওই কন্টেনারগুলোর সাহায্যে ও প্রশিক্ষিত অপারেটরদের সাহায্যে যাতে জাহাজের মধ্যেই এসব ড্রাগ তৈরি করা যায়।

কিন্তু এটা কী জানেন যে একইভাবে কেমিক্যাল ওয়েপন তৈরি করা যায় ওই সব কন্টেনারে। শুধু কিছু উপকরণ ও কন্টেনারগুলোর কন্ট্রোল সেটিং বদলে দিয়ে। সেটাই করছে মেডেলা। সেই প্রমাণ আমি এই সপ্তাহে পেয়েছি।

সেটা কীভাবে সম্ভব?

এখন এখানে এসব নতুন ড্রাগ প্রস্তুতিতে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয়। এখানকার স্পিৎজ ল্যাবেও দেখবেন কীভাবে সেটা করা হয়। এসব সফটওয়্যার ব্যবহার করে কিছু ভার্চুয়াল মলিকিউল তৈরি করা হয় ভ্যাকসিন তৈরির প্রসেসে। এই সব ভার্চুয়াল মলিকিউলের সামান্য পরিবর্তনে ভ্যাক্সিনের জায়গায় কেমিক্যাল ওয়েপন বানানো যায়। এর মধ্যে VX-এর মতো অতি শক্তিশালী নার্ভ এজেন্টও আছে। ওরা সেটাই করছে।

কী সাংঘাতিক! সেজন্য এত লোক মারা যাচ্ছে আফ্রিকার সোমালিয়া, উগান্ডা, ইথিওপিয়া ও আরও নানান দেশে।

শুধু আফ্রিকা নয়, জাহাজের মাধ্যমে বিভিন্ন জায়গায় এরকম ফেসিলিটি তৈরি করা হয়েছে। ড্রাগের সঙ্গে সঙ্গে ছড়িয়ে পড়বে নিষিদ্ধ কেমিক্যাল ওয়েপন।

এমন এমন নতুন ধরনের কেমিক্যাল ওয়েপন তৈরি করা হচ্ছে যা চট করে ধরাও পড়বে না। ওখানে এমন সফটওয়্যার ব্যবহার করা হচ্ছে যা প্রতি ছয় ঘণ্টায় নতুন ভার্চুয়াল মলিকিউলের সন্ধান দেবে। কিন্তু এর বেশি আমি কিছু বলতে পারব না। এটুকু বললাম কারণ প্রফেসার আর নেই।

বলে লোকটা করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, আপনিই এখন আমাদের ভরসা।

লোকটা যেরকম হঠাৎ করে এসেছিল ঠিক সেরকমই হঠাৎ করে আবার ডান দিকে একটা গলি ধরে নিল।

অনিলিখা এগিয়ে গেল ব্যাসেল স্টেশনের দিকে। ওর মুঠোয় একটা ছোট বোতামের মতো পেনড্রাইভ, যা ওই লোকটা করমর্দনের সময় দিয়ে গেছে। এর মধ্যেই নিশ্চয়ই সব প্রমাণ আছে।

২৩ আগস্ট ইউট্রেকট, নেদারল্যান্ডস

স্যার মরিসের মৃত্যুর খবরটা পাওয়ার পরে অনিলিখা বুঝেছিল ওর হাতে সময় কম। নিশ্চয়ই ওনার মৃত্যুটা স্বাভাবিক নয়। হয়তো সেই একই কারণে ওর নিজের উপরেও আক্রমণ হয়েছিল।

একইসঙ্গে অনিলিখা বেশ কিছু রিসার্চ করে বুঝতে পারছিল এসবের পিছনে কারা আছে। তারা কী করতে চায়। কিন্তু উপযুক্ত প্রমাণ না পেলে এদের মতো শক্তিশালী ধনকুবেরদের বিরুদ্ধে কিছুই করা সম্ভব নয়।

পেনড্রাইভের সব তথ্য অবশ্য যথাস্থানে পাঠিয়ে দিয়েছে অনিলিখা, যার জন্য ইতিমধ্যেই মেডলার কর্মকাণ্ডের উপরে নজরদারি শুরু হয়ে গেছে।

এদের দলে আছে খুব সম্ভবত বিজ্ঞানী গিল হারভে। এরকম প্রতিভাবান এক বিজ্ঞানী যে কী কী করতে পারেন তা সবই জানা আছে অনিলিখার। সব স্বীকৃত বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানকে ঘৃণা করেন বিজ্ঞানী গিল। বিজ্ঞানকে যে শুধু মানবকল্যাণে ব্যবহার করা উচিত, এটা উনি বিশ্বাস করেন না।

জুরিখ থেকে দু-ঘণ্টার ফ্লাইট আমস্টারডাম। আমস্টারডামের পাশের শহর ইউট্রেকট। নেদারল্যান্ডসের চতুর্থ বড় শহর ইউট্রেকট। ইউট্রেকট বহু শতক ধরে নেদারল্যান্ডসের ধর্মীয় রাজধানী ছিল। এখানেই 'ব্রেনবো'র অফিস। খুঁজে পেতে একটু সময় লাগল। অফিসটা শহরের বাইরের দিকে। ক্যাব থেকে নেমে কিছুটা হাঁটার পর কমলা রঙের বিল্ডিংটা দেখা গেল। বেশ বড় জায়গা জুড়ে অফিস। বিশাল গেট। কিন্তু তার বাইরে তালা ঝুলছে। কোনও কারণে অফিস কি বন্ধ?

দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করল অনিলিখা। এত দূরে আসা যার জন্য,

সেই উদ্দেশ্য কি শেষে ব্যর্থ হয়ে যাবে?

ইন্ডাস্ট্রিয়াল এলাকা। বিভিন্ন ফ্যাক্টরি-অফিস বিল্ডিং অনেকটা দূরে দূরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

হঠাৎ লক্ষ করল খুব লম্বা, রোগামতো একটা লোক ভ্যান থামিয়ে ওর দিকে এগিয়ে আসছে। দু-হাতে বাঘের উল্কি করা।

লোকটা ডাচ ও ইংরেজি মিশিয়ে বলল, আপনি কি কাউকে খুঁজছেন এখানে? ব্রেনবোর এখানকার অফিস তো অনেকদিন বন্ধ হয়ে গেছে।

আপনি কি এই অফিসের?

না, না। তবে আমার কাজ ছিল এখানে থেকে জীবজন্তুদের বন্দরে নিয়ে যাওয়া। সেজন্য আসতাম। তবে এখন তো বন্ধ হয়ে গেছে।

কী ধরনের জীবজন্তু নিয়ে যেতেন?

লোকটা তার উত্তর না দিয়ে উল্টে জিগ্যেস করল, আপনি কি এখানে কারোর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন?

হ্যাঁ, ডক্টর গিল হারভের সঙ্গে। হঠাৎ করে ওই নামটাই করল অনিলিখা।

আচ্ছা, স্যার গিলের সঙ্গে। কিন্তু ওরা সবাই তো যদ্দুর জানি চারনোবিলে চলে গেছেন। এখানকার ফ্যাক্টরি অফিস সব কিছু বন্ধ করে।

সে কী! কবে?

তা প্রায় দু-মাস হয়ে গেল। আমারও অনেক ক্ষতি হয়ে গেল। আগে নিয়মিত একটা রোজগার ছিল। নানান দেশের সার্কাসে, চিড়িয়াখানায় এরা জন্তু পাঠাত। ভালোই টাকা দিত ওরা আমাকে।

কিন্তু এটা তো ওষুধের কোম্পানি, তাই না?

আমি অতো জানি না। তবে ঠিক বলেছেন মনে হয়। ওসব জীবজন্তুদের ওষুধ দিয়ে আরো তাগড়াই করে পাঠাত।

তা এখানকার সবাই কী এখন চারনোবিলে?

হ্যাঁ, প্রায় সবাই চলে গেছে। শুধু একজন বৃদ্ধ প্রফেসার ছিলেন। বেশ ভালো বয়স। উনি মিঃ গিলের সঙ্গে কাজ করতেন। উনি যাননি। তবে ওঁর শরীর বেশ খারাপ। সেই কারণেই হয়তো যাননি।

এখন উনি কোথায় আছেন?

এখানকার হাসপাতালে। এখানে একটা বড় হাসপাতাল আছে।

কী নাম ওনার?

জশুয়া শেন্স।

অনিলিখার খেয়াল হল এই নামটাই সে শুনেছিল মিঃ পাইয়ের কাছে। যিনি আমেরিকা এসে প্রথম এই কোম্পানির প্রতিষ্ঠা করলেন, তিনিই পড়ে রইলেন এখানে!

ধন্যবাদ জানিয়ে অনিলিখা এগিয়ে চলল সেই হাসপাতালের খোঁজে।

তবে দেখা পেতে বেশ সময় লাগল। মিঃ জশুয়া শেল্ল বিশেষ অসুস্থ। ক্যান্সারের শেষ পর্যায়। ঘণ্টা পাঁচেক অপেক্ষার পরে দেখার সুযোগ হল।

অনিলিখা মিঃ পাইয়ের পরিচয় দিয়ে শুরু করল। ভেবেছিল বৃদ্ধ কিছুই বলবেন না। কিন্তু মিঃ পাই ও অনিলিখার কথা উনি আগে শুনেছেন। অপ্রত্যাশিতভাবে জশুয়া শেল্ল বলতে শুরু করলেন।

আমি আর মৃত্যুর ভয় পাই না। সে তো আজ নয়ত কাল আসবেই। তাই সব জানিয়ে যেতে চাই তোমাকে। আসলে আমি চেয়েছিলাম মানুষের বিভিন্ন ব্রেন রিলেটেড অর্থাৎ মানসিক অসুস্থতার কারণ খুঁজে বার করতে। যাতে তার সঠিক চিকিৎসা বার করা যায়। এটা সারা বিশ্বের কাছেই একটা বিশাল সমস্যা। অনেক মানুষ ব্রেনের নানান অসুখে ভোগে, বলা যায় তাদের অনেকের ক্ষেত্রে মৃত্যুর অনেক আগেই মৃত্যু হয়। আমার বাবারও সেরকম মৃত্যু হয়েছিল। এর চিকিৎসার জন্য আমার আপ্রোচ একটু আনকনভেনশনাল ছিল।

প্রথমে মানুষের ব্রেনসেল ও ইঁদুরের ব্রেনসেলের মিশ্রণ দিয়ে শুরু করলাম। দেখলাম ইঁদুরের মধ্যে বেশ কিছু মানুষের মতো স্বভাব দেখা যাচ্ছে। পরের ধাপে আমি মানুষের নিউরাল স্টেমসেল লেমুরের এম্ব্রোয়নিক ব্রেন সেলে মিশিয়ে আরও সাফল্য পাই। বেশ কিছু প্রাণীতে অস্বাভাবিক রকম কিছু মনুষ্য সুলভ ব্যবহার দেখতে পাই, যেটা নিয়ে তখন বিজ্ঞানীমহলে হইচই শুরু হয়ে যায়।

হিউমান নিউরাল ট্রান্সপ্ল্যান্ট আগেও হয়েছে। তবে মানুষের ব্রেনসেলের সঙ্গে অন্য প্রাণীর ব্রেনসেল সঠিকভাবে মেশানোর টেকনিক আমারই আবিষ্কার। বলা যায়, ফল হল এনিমাল উইথ হিউমান ব্রেন সেল।

কিন্তু এর পরের ধাপে আমার উদ্দেশ্য ছিল 'কাইমেরা' তৈরি করা—যেখানে সেই প্রাণীর ব্রেনসেলের সঙ্গে মানুষের ব্রেনসেল মিশে থাকবে ও সেই প্রাণী এভাবে তার নিজস্ব চেতনা-সত্তা খুঁজে পাবে। মানুষের থেকেও উন্নত মস্তিষ্ক ও বুদ্ধি থাকবে সে প্রাণীর।

এরকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে এমন কিছু প্রাণী তৈরি করি যা এমন বিশেষ কিছু ইন্টেলিজেন্সের অধিকারী যা কোনও মানুষেরও নেই। যেমন ধরো, এক ধরনের ঈগল যারা খুব সহজে অন্যদের তার দলে টেনে নিতে পারে। সবাইকে এক লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। তাদের উপর খুব সহজে প্রভাব বিস্তার করতে পারে।

মিঃ গিল আমাকে এখানে টেনে আনেন। আমার আবিষ্কৃত 'ব্রেনবো মাইস'-এর নামেই এই সংস্থার নাম। ইচ্ছে ছিল সবরকম কন্ট্রোলের বাইরে গিয়ে কিছু করার। সেজন্য এখানে আসা। তবে আমার কোনও খারাপ উদ্দেশ্য ছিল না।

বিভিন্ন টেকনিক্যাল বিধি-নিষেধের জন্য আমেরিকাতে এসব নিয়ে রিসার্চ করা সম্ভব ছিল না। এখানে এসে আমার সুবিধেই হল।

যখন যা চাই, তাই পেয়ে যাচ্ছিলাম, যা আগে কখন পাইনি। অর্থের কোনও অভাব ছিল না।

কিন্তু আপনি কী জানতেন যে এখানকার উদ্দেশ্য খুব ভালো কিছু ছিল না। প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন দেশের মধ্যে যুদ্ধ বা গৃহযুদ্ধ শুরু করানোর। আমার ধারণা এখান থেকে আপনারা ক্যাশুয়ারি, বাঘ, ঈগল, গরিলা, এরকম আরও নানান জীবজন্তু বিভিন্ন দেশে পাঠান সেই উদ্দেশেই।

মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল ওনার। ভাঙা গলায় বলে উঠলেন, তুমি তাহলে অনেক কিছুই জেনে গেছ। কী করে আন্দাজ করলে জানি না। তবে অনুমান ভুল না। আমি নিজেও অনেক পরে সে উদ্দেশ্য জেনেছি। পরে জানতে পারলাম আমার তৈরি করা প্রাণীগুলো একটা একটা করে হারিয়ে যাচ্ছে। যখন বুঝলাম আমাকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখে ওই সব প্রাণী দিয়ে মিঃ গিল সারা বিশ্বে নিজের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করছে, তখন বাধা দিলাম।

গিল তখনই প্রতিশোধ নিল। আমার রক্তে বিষ ছড়িয়ে দিল। ওরা এত শক্তিশালী যে আমার কিছুই করার ছিল না। আমি ফিনিশড অনিলিখা। কী ভেবেছিলাম আর কী হল!

কিন্তু আমি জানি ওরা কী করতে চলেছে। ওরা জানে চারনোবিলে গেলে সব ধরনের নজরদারি এড়ানো যাবে। সেখানে কেউ ওদের ধরতে পারবে না। আমার ধারণা গিল এমন কিছু এক্সপেরিমেন্ট করতে চায় যা শুধু চারনোবিলের মতো হাই-রেডিয়েশন পরিবেশেই করা সম্ভব, কারণ সেখানে জেনেটিক মিউটেশন খুব তাড়াতাড়ি হয়। কিন্তু ঠিক কী করতে চায় ওরা ওখানে গিয়ে?

সেটা তো তোমাকে ওখানে গিয়েই দেখতে হবে। আমি তোমার নাম অনেক শুনেছি অনিলিখা। যদি কেউ পারে, সে হল তুমি। তুমি পারলে চলে যাও। তবে তুমি আমার কাছে পৌঁছালে কী করে? ওরা নির্ঘাত আমার উপরে সব সময় নজর রেখেছে। সাবধানে থেকো।

সকাল থেকে এসব নিয়ে ছোটাছুটি করতে গিয়ে কিছুই খাওয়া হয়নি। এখন সন্ধে আটটা। তবে বাইরে ভালোই আলো আছে। খানিকটা পথ হেঁটে আমস্টারডাম সেন্ট্রাল যাওয়ার ট্রেন ধরল অনিলিখা।

এখনও অনেক কাজ বাকি। সবার আগে চারনোবিল যেতে হবে। কিন্তু কীভাবে? সেখানে যাওয়াটা তো অত সহজ নয়।

আমস্টারডাম সেন্ট্রাল পৌঁছতে মিনিট চল্লিশ সময় লাগবে।

হঠাৎ অনিলিখার পাশে ট্রেনের সিটে এক ভারতীয় মাঝবয়েসি ভদ্রলোক এসে বসলেন। সুট-টাই পরা একটু গোবেচারা প্রফেসারসুলভ চেহারা। চোখে ভারী

কালো ফ্রেমের চশমা। পাশের ভদ্রলোক বিশুদ্ধ বাংলায় ফিসফিসিয়ে যেন স্বগতোক্তি করে উঠলেন, পরের স্টেশনে নেমে পড়তে হবে।

অনিলিখা ঘুরে তাকাতেই লোকটা নিজের ফোনটা এগিয়ে দিল অনিলিখার দিকে।

খবরের হেডলাইনটা ও সঙ্গের ছবিটা দেখে চমকে উঠল অনিলিখা। ওর নিজের ছবি। আজকের কাগজ।

খবরটা জার্মানে। ফোনটা ফেরত নিয়ে লোকটা ফের বলল, আমার উপর সম্পূর্ণ ভরসা করতে পারেন। পরের স্টেশনেই নেমে পড়তে হবে। আপনি যে আমস্টারডাম সেন্ট্রালে ফিরবেন সে খবর ইন্টারপোলের কাছে চলে গেছে।

কিন্তু আমার ছবিটা কাগজে কীজন্য?

সি সি টিভির ক্যামেরার ছবিতে আপনাকে স্যার মরিসকে বিষ ইঞ্জেক্ট করতে দেখা গেছে।

মানে? অসম্ভব।

ইতিমধ্যে পরের স্টেশন বিলমার এসে পড়েছে।

লোকটার সঙ্গে অনিলিখা বেরিয়ে এল। গেটের দিকে না গিয়ে কিছুটা হেঁটে রেল লাইন পেরিয়ে স্টেশন চত্বরের বাইরে বেরিয়ে এল লোকটা।

লোকটা নিজের পরিচয় দিয়ে বলল, আমি ভারতের 'র'তে আছি। আইএএস ছিলাম, পরে এই সার্ভিসে জয়েন করি। নাম রজত মুখার্জী। আপনার নাম অনেক শুনেছি। আপনাকে ইউরোপ থেকে যে-কোনওভাবে বার করে ভারতে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব আমাকে দেওয়া হয়েছে। স্যার মরিসের মৃত্যু খুব হাই প্রোফাইল কেস। আপনি তার মেন সাসপেক্ট।

কিন্তু আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। কীভাবে ওরা প্রমাণ করবে যে আমি স্যার মরিসকে বিষ ইঞ্জেক্ট করেছি, যখন এরকম কোনও ছবি বা ভিডিও থাকতেই পারে না।

জানি ফেক, কিন্তু আসলের থেকেও বেশি বিশ্বাসযোগ্য। এই ছবিটা দেখুন। রজত ফোন থেকে একটা ছবি বার করে দেখাল।

অবিকল অনিলিখার মুখ, পোশাক, মুখের এক্সপ্রেশন। স্যার মরিস যেন ঘুমোচ্ছেন একটা বেঞ্চিতে বসে বসে। অনিলিখা ওনার হাতে কিছু একটা ইঞ্জেক্ট করছে।

এ আমার ছবি হতেই পারে না।

জানি, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স দিয়ে ঠিক আপনার ছবি শুধু নয়, আপনার কিছু ভিডিও তৈরি করা হয়েছে, যা আপনি নিজে দেখলেও আলাদা করতে পারবেন না। আপনার পোশাক, আপনার মুখের ভাব, হাঁটার প্যাটার্ন—সব কিছু নিখুঁত। তাছাড়া আপনি তো ওই দিন ওনার সঙ্গে ছিলেন বেশ কিছুক্ষণ।

অনেকেই আপনাকে স্যার মরিসের সঙ্গে দেখেছে ঘটনার এক ঘণ্টা আগেও।

এতক্ষণে বুঝতে পারছি আমাকে কেন অজ্ঞান করা হয়েছিল। যাতে ওই সময় আমি অন্য কোথাও ছিলাম এরকম কিছু প্রমাণ না দিতে পারি, কোনও অ্যালিবাই না থাকে। কত বড় ষড়যন্ত্র।

শুধু এটাই নয়, আপনাকে আরও বেশ কিছু কারণে ইন্টারপোল খুঁজছে। বাজিলে একজনকে আপনার সঙ্গে দেখা গিয়েছিল। লোকটা ইংল্যান্ডের এম আই সিক্সের। হি ইজ অলসো ডেড। এছাড়া আরও আছে। সবই মিথ্যে সাজানো মামলা। সেজন্যই আমরা এগিয়ে এসেছি। কারণ এখানে একবার ধরা পড়লে আমরা আর কিছু করতে পারব না। বড় কিছু ভারতবিরোধী শক্তিও চায় আপনাকে ধরা হোক। খুব শক্তিশালী কিছু লবি এর পিছনে আছে। ওরা হয়তো আপনাকে মেরেই ফেলবে। আমাদের বিশেষ হেলিকপ্টারে আজ রাতেই আমরা আপনাকে এখান থেকে রাশিয়া হয়ে ভারত নিয়ে চলে যাব।

কিন্তু আমি তো ভারত যাব না, আমি যাব চারনোবিল। আজ রাতেই। আমার ধরা পড়ার থেকে সেখানে পৌঁছনো অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

কী বলছেন আপনি! চারনোবিল? ওখানে আবার এখন কেউ যেতে পারে নাকি! পারমিশনের জন্য বহু কাঠখড় পোড়াতে হবে। ইউক্রেনের চেকপয়েন্ট আছে, অত সহজে ছাড়পত্র দেবে না।

লেট মি এক্সপ্লেন কেন আমাকে ওখানে যেতেই হবে। পারলে আজকেই।

অনিলিখা বলতে শুরু করে। যতটা জানে সব কিছু।

২৬ আগস্ট, চারনোবিল, ইউক্রেন

একটা শহরকে যে এভাবে প্রকৃতি গ্রাস করে নিতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস হতো না অনিলিখার। নেদারল্যান্ডস থেকে UH 60 ব্ল্যাক হক হেলিকপ্টারে এসেছে এখানে। পুরোটাই ভারতের 'র' অরগানাইজ করে দিয়েছে। রজত শুনে বুঝেছিল ভারতও এই ষড়যন্ত্রের শিকার। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে এমন কিছু ঘটনা ঘটানো হয়েছে, এমন কিছু ফান্ডিং এসেছে, যা প্রমাণ করে যে এদের উদ্দেশ্য ছিল অন্য দেশের মতো ভারতেও বড় ধরনের অশান্তি তৈরি করা।

দিল্লি রায়টে ধৃত আনোয়ার আবদুল্লাকে তিহার জেলে মেরে যে অশান্তি ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, তার মূলেও নাকি এরা। অনিলিখার কাছ থেকে 'র' অনেক কিছু জেনেছে। জেনেছে কারা এই বিশ্বব্যাপী ষড়যন্ত্রের পিছনে লুকিয়ে থাকা মূল কান্ডারি।

পাইলট ছাড়াও অনিলিখার সঙ্গে এসেছে রজত, একজন বিখ্যাত ভারতীয়

জীব বিজ্ঞানী। তাছাড়া মেজর র‍্যাকের একজন আর্মি অফিসারও সঙ্গে আছেন। খুব কম সময়ের মধ্যে এদেরকে নিয়ে আসা হয়েছে। মূল উদ্দেশ্য মিঃ গিলের ল্যাব খুঁজে বার করা ও উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া। এই ল্যাব যে চারনোবিলের কাছে প্রিপেয়াত শহরে এটুকু জানা গেছে। স্যাটেলাইটের ছবি দেখে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। চারদিক জঙ্গলে ঢাকা।

ওদের হেলিকপ্টার দেড়ঘণ্টা বাদে প্রিপ্রায়াতে ল্যান্ড করল। চারদিকে হাই রাইস বিল্ডিং। গত ছত্রিশ বছর ধরে এসব বিল্ডিংয়ে কেউ থাকে না।

ওদের সবার সঙ্গে গাইগার কাউন্টার রয়েছে, রেডিয়েশনের মাত্রা মাপার জন্য। এখানে চারদিকে এখনও রেডিও অ্যাক্টিভ বর্জ্য ছড়িয়ে আছে। সেজন্য কোনও জায়গাই নিরাপদ নয়। মাঝে মধ্যেই গাইগার কাউন্টারের অ্যালার্ম বেজে উঠে জানিয়ে দিচ্ছে সেই জায়গা নিরাপদ নয়। ওদের সঙ্গে আছে উপযুক্ত আগ্নেয়াস্ত্র। স্নাইপার রাইফেল, সাব মেশিনগান। অনিলিখার সঙ্গে আছে 'গ্লক সেভেন্টিন' সেমি অটোম্যাটিক পিস্তল।

কখন কী বিপদ আসে বলা মুস্কিল। ওই ল্যাবের কোনও জীবের মুখোমুখি যদি হঠাৎ পড়তে হয়। তাছাড়া সবার সঙ্গে আছে স্যাটেলাইট ফোন।

চারনোবিলের চারদিকে ওয়েস্টল্যান্ড। মনে হয় এ যেন এক অন্য পৃথিবী। মানবসভ্যতা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পরে যেন ওরা ফিরে এসেছে। পরিত্যক্ত বিল্ডিংগুলো ভঙ্গুর চেহারা নিয়ে উদাসীনভাবে দাঁড়িয়ে আছে। যে পথ একসময় বেশ প্রশস্ত ছিল, সেই পথ এখন প্রায় হারিয়ে গেছে লতাপাতায়, গাছগাছালিতে। অনেক গাছের পাতাই লাল। অতিরিক্ত রেডিয়েশনে হয়তো এরকম হয়েছে।

প্রিপায়েত খুব ছোট জায়গা। তবু এর মধ্যে কোনও কিছু খুঁজে বার করা সহজ নয়। যেন জঙ্গলের আড়ালে হারিয়ে যাওয়া এক রাজ্য।

অনিলিখা লক্ষ করল, ফোনে কোনও নেটওয়ার্ক নেই। ভরসা এখানে শুধু স্যাটেলাইট ফোন।

পথে একটা বাচ্চাদের স্কুল পড়ল। বাইরে থেকেই ভেতরটা দেখা যাচ্ছে। জানলা দরজা সব ভাঙা। এখনও চারদিকে বইপত্র ছড়িয়ে আছে। চেয়ার টেবিলগুলো ধুলোর আস্তরণে ঢাকা।

কী এক অজানা আকর্ষণে অনিলিখা স্কুলবাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ল। এখানে যেন সময় থমকে আছে। মাটিতে পড়ে থাকা একটা গ্লোব। কিছুক্ষণের জন্য যেন হুঁশ ছিল না অনিলিখার। ঘরের মধ্যে আগাছা গজিয়েছে। একটা অন্য ঘরে ছেঁড়া জুতো, খবরের কাগজ পড়ে আছে। ১৯৮৬ সালের সেই অভিশপ্ত দিনের কাগজ। অনিলিখার মনে হল চারদিকে সবাই যেন আছে। ও যেন ট্রেসপাসিং করছে।

একটা মুহূর্ত যেন সব কিছু পাল্টে দিয়ে গেছে। অথচ এ সবের পিছনে

যে মূল কারণ সেই রেডিয়েশনকে বোঝা যায় না, দেখা যায় না।

দেওয়ালময় ছবি। বেশ কিছু বাচ্চাদের সাদাকালো একটা ছবি দেওয়ালের এক জায়গায় এখনও টাঙানো আছে।

কোথায় আছে এই বাচ্চাগুলো এখন? এদের উপরে কী সেদিনের রেডিয়েশনের প্রভাব পড়েছিল? বাচ্চাদের সেই ছবির সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ ওর খেয়াল হল ওর সঙ্গে স্কুলের মধ্যে আর কেউ নেই। ওরা কী বাইরে অপেক্ষা করছে?

চট করে স্কুলের বাইরে বেরিয়ে এল। কিন্তু কেউ নেই। কোথায় গেল ওরা!

আশেপাশের জঙ্গল খুঁজে দেখল অনিলিখা। কেউ কোথাও নেই।

স্যাটেলাইট ফোনে ওদের নাম্বারে এক এক করে ফোন করল অনিলিখা। রিং হয়ে যাচ্ছে। কেউ ধরল না।

হেলিকপ্টারে ফিরে গেল ওরা? ফেরার পথ অনিলিখার ঠিক খেয়াল ছিল। বেশ খানিকক্ষণ এদিক ওদিক খুঁজে শেষমেশ দেখল যেখানে হেলিকপ্টার ছিল, ঠিক সেখানেই আছে। তাহলে?

আবার ফোনে চেষ্টা করল। কেউ ধরল না। তাহলে কি বড় কোনও বিপদে পড়ল ওরা?

দুটো পসিবিলিটি হতে পারে। যদি এমন কোনও জায়গায় ওরা পৌঁছোয়, যেখানে এই ফোনের সিগন্যাল ঠিকমতো কাজ করছে না, বা দ্বিতীয় পসিবিলিটি—যদি ওরা কেউ বেঁচে না থাকে। সেটা ভাবতেই একটা ভয়ের শিহরন খেলে গেল ওর সারা শরীরে।

একজনের কথাই এই পরিস্থিতিতে প্রথম মনে আসছে। মিঃ পাই। ফোনটা বার করে মিঃ পাইকে ফোন করল অনিলিখা। উল্টোদিকে রিং হতেই কী যে আনন্দ হল অনিলিখার! কেউ তো আছে এখনও মৃত এই পৃথিবীতে।

গণেশ ফোন ধরেছে।

প্রায় পরমুহূর্তে মিঃ পাই ফোন ধরলেন। কিন্তু কাজের কথা বলার আগেই হঠাৎ করে ফোনটা কেটে গেল। নো সিগন্যাল।

এই প্রথম অনিলিখা ভয় পেল। এ যেন পরিত্যক্ত এক পৃথিবীর মাটিতে ও একা। সঙ্গের গাইগার কাউন্টারে মাঝেমধ্যে অ্যালার্মের শব্দ ছাড়া এই জঙ্গলের, এই শহরের সব শব্দই যেন ওর অচেনা।

আবার সেই জায়গায় ফিরে গেল অনিলিখা, যেখানে ওদের শেষ দেখেছে। আশেপাশের জঙ্গল ভালো করে খুঁজতে গিয়ে হঠাৎ ও দেখতে পেল কাদার উপরে কয়েকটা পায়ের দাগ। দাগ দেখে মনে হয় যেন ছুটছিল। সে পায়ের দাগ লক্ষ করে ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে খানিকটা এগোতেই একটা খোলা

জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে অনিলিখা। ছড়িয়ে পড়ে আছে চারটে মৃতদেহ।

কিন্তু ওদের মুখ-এর দিকে তাকানো যাচ্ছে না। মুখ, শরীরের যে-কোনও খোলা জায়গায় যেন কেউ খুবলে খুবলে খেয়েছে। খুব সূক্ষ্ম কিন্তু গভীর অজস্র গর্ত, খুব ধারালো কিছু দিয়ে ছোট ছোট ফুটো করলে যেমন হয়। সেসব জায়গা থেকে রক্ত বেরিয়ে চোখ মুখ বীভৎস হয়ে উঠেছে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে বন্দুক চালানোর সামান্যতম সুযোগও পায়নি ওরা। এটা কোনও পরিচিত প্রাণীর কাজ নয়।

এখন আর ভয় নয়, রাগে ঘৃণায় যেন কিছুক্ষণের জন্য চিন্তা করার ক্ষমতা হারালো অনিলিখা। এ সবের পিছনে মিঃ গিল। এবারে ওকে শেষ করতেই হবে। তা না হলে এই প্রাণীর হাতে পুরো বিশ্ব ধ্বংস হয়ে যাবে।

সন্ধে হয়ে এসেছিল। আরও প্রায় একঘণ্টা ওই ল্যাবের খোঁজ করল অনিলিখা। কিছু পেল না। আরেকটু ঘুরে অনিলিখা বুঝল এই অন্ধকারে আর ঘোরা ঠিক হবে না। পথে ও চারটে নেকড়ের একটা দল দেখেছে, যারা ওর দিকে বেশ হিংস্র চোখেই তাকাচ্ছিল। দেখার পরপরই আপনা থেকে বন্দুকে হাত চলে গেছে। কিন্তু ভাগ্যক্রমে ওরাও আর কাছে আসার আগ্রহ দেখায়নি।

কিন্তু এই জঙ্গলে ওরাই শুধু একা নেই। আছে আরও অজানা অনেক জীব যার মধ্যে এমন কোনও জীব আছে যা একজন প্রশিক্ষিত আর্মি মেজরকে, ও এক উচ্চবুদ্ধিসম্পন্ন সিনিয়র মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স অফিসারকেও কয়েক মুহূর্তে শেষ করে দিতে পারে। অবাক ব্যাপার হল, একটা গুলিও চলেনি। কী ছিল ওই জীবটা? কেন ওরা গুলি চালালো না। অথচ নিশ্চয়ই আগে থেকে দেখেছিল। তা না হলে দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করত না।

তাছাড়া ওই জীব ছাড়াও এখানে হয়তো ভালুক আছে, আছে বুনো কুকুরের দল, আছে হিংস্র বনবিড়াল। এমনকী আমুর শ্রেণীর বাঘও এখানকার জঙ্গলে থাকতে পারে।

এদের মধ্যে কিছু প্রাণীর ব্রেনসেলে নিশ্চয়ই মিঃ গিল মানুষের ব্রেনসেল মিশিয়ে তাদেরকেও অতিমানবীয় বুদ্ধি দিয়েছে। তার দৌলতে হয়তো তারা অনেক দূর থেকে লক্ষ্য রাখতে পারে, গন্ধ পেতে পারে, বা টার্গেট অন্যমনস্ক বা ভয় পেয়েছে কিনা তা বুঝতে পারে। এরকম হাজারটা উপায়ে হয়তো আরও সহজে শিকার খুঁজে পেতে পারে এই নতুন প্রজাতির উচ্চবুদ্ধিধারী জীবেরা।

কিন্তু অনিলিখা আজ রাতে থাকবে কোথায়? যেদিকে তাকায় শুধু ভাঙা বাড়ির কঙ্কাল আর গভীর জঙ্গল। একটাই ভরসা। এরকম এক অন্ধকার দিনেও চাঁদের আলোর কোনও কার্পণ্য নেই। সেই আলোর ভরসাতেই এগিয়ে যাওয়া। এখানে মাঝেমধ্যে মনে হয় যেন কোনও প্রাণই বেঁচে নেই। মাথার উপর দিয়ে কোনও পাখির ঝাঁক উড়ে যেতে দেখেনি এতক্ষণেও।

কিছু দূর হেঁটে অনিলিখা দেখল একটা অপেক্ষাকৃত ভালো বড় বাড়ি। ভিতরে ঢুকে বুঝল এটা আসলে কোনও এক সময় থিয়েটার ছিল। একদিকে ভাঙা স্টেজ। বড় বড় ফাঁকা ঘর। অবশ্য ফাঁকা বলাটা ঠিক নয়, কারণ আশেপাশে শিয়াল বা কুকুর শ্রেণীর প্রাণীর উপস্থিতি ও টের পাচ্ছিল। তবু তার মধ্যেই দোতলার একটা ভাঙা ঘরে রাত কাটানোর উপায় খুঁজে নিল।

তবে ঘুম এল না। বাইরে থেকে কনকনে ঠান্ডা হাওয়া জানলা দরজা দিয়ে ঢুকছে। বাইরের জঙ্গল যেন অপার্থিব সব শব্দে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। যেখানে শুয়ে আছে ও সেখানে গাইগার কাউন্টারে দেখাচ্ছে চার মাইক্রোসিভার্ট। অর্থাৎ রেডিয়েশনের মাত্রা সামান্য বেশির দিকে।

পাশের অচল স্যাটেলাইট ফোনটা ব্যবহার করে কাউকে ফোন করা যায় কিনা তার চেষ্টা করল কয়েকবার। এই রাতই হয়তো শেষ রাত। হয়তো ওদের মতোই অনিলিখার মৃতদেহ পাওয়া যাবে কোনও একদিন, যেখানে ওর মুখও চেনা যাবে না। একটু তন্দ্রা এসেছিল। কিন্তু কীসের শব্দে সে তন্দ্রা ভেঙে গেল। কিছু একটা এসে দাঁড়িয়েছে খোলা ভাঙা দরজার সামনে। তার হলুদ চোখদুটো জ্বলছে। আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে অনিলিখার দিকে। স্বপ্ন?

মুহূর্তে অনিলিখা বুঝল, এটা একটা নেকড়ে বাঘ। পরমুহূর্তে ওর হাতে ধরা পিস্তল গর্জে উঠল। কিন্তু তার আগেই নেকড়েটা লাফ দিয়েছে। এক লাফে অনিলিখার গায়ের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কিন্তু দাঁত বসানোর আগেই ডান হাতের কনুই দিয়ে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে আবার গুলি করল অনিলিখা। ছিটকে গিয়ে আর্তনাদ করে উঠল নেকড়েটা। আরও দু-দুবার গুলি করতে বাধ্য হল অনিলিখা। প্রত্যেকবার শহরের অপার্থিব নীরবতা যেন গুলির আওয়াজে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ওই নেকড়ে যেন মৃত্যুযন্ত্রণায় গর্জন করে উঠল— হাউউউউউউ। আস্তে আস্তে কমে আসা আওয়াজটার সঙ্গে সঙ্গে শরীরটা স্থির হয়ে গেল।

বাইরে দূর থেকে একই সঙ্গে যেন কয়েকটা নেকড়ে চেঁচিয়ে উঠল— উউউউউউ।

অনিলিখার চোখেও জল। ওকে তো ও মারতে চায়নি। কিন্তু বাধ্য হয়ে...।

অনিলিখা এবারে টের পেল নেকড়েটা না কামড়াতে পারলেও বেশ গভীর নখ বসিয়েছে ওর হাতে, কনুই এর কাছে। আর সেখান থেকে উষ্ণ লাল তরল বেরিয়ে আসছে। পুরো হাত কিছুক্ষণেই রক্তে লাল হয়ে গেল। বাথরুমে একটা ধুলোমাখা ছেঁড়া কাপড় পড়ে ছিল। ওটা দিয়েও ক্ষতের জায়গাটা খানিকটা আটকে রক্ত থামানোর চেষ্টা করল অনিলিখা।

মৃত্যু যতই কাছে আসুক না কেন তবু বাইরের এই অপার্থিব সৌন্দর্যকে

এক মুহূর্তের জন্য অস্বীকার করা যায় না। চাঁদের আলো গায়ে মেখে পুরো জঙ্গল, এই অজানা পৃথিবী যেন আরও মোহময়ী হয়ে উঠেছে। কী অদ্ভুত এই রাত।

মৃত নেকড়েটা হিংস্র দাঁত বার করে ঘরের কোণে পড়ে আছে। রক্তধারা গড়িয়ে পড়েছে ঘরের মেঝেতে। এ কী মিঃ গিলের শিকার? তা না হলে আলাদা একটা নেকড়ে বাঘ হঠাৎ করে ওর উপরে আক্রমণ করবে কেন? তবে এটাই হয়তো শেষ নয়। এরকম আরও আসবে।

চাঁদ ঢলে পড়েছে। এর পরে আবার কী অজ্ঞাত বিভীষিকা এগিয়ে আসে কে জানে।

এই রাতটা জেগে থাকতেই হবে। তা না হলে হয়তো আর কালকের ভোর দেখা যাবে না। সেমিঅটোম্যাটিক পিস্তলটা হাতে নিয়েই বসে রইল অনিলিখা।

অনিলিখার যখন ঘুম ভাঙল তখন বাইরে দিনের আলো। মনটা মুহূর্তে গতকাল রাতের সব ভয়, টেনশন মুক্ত হয়ে গেল। সামনে কিছু দূরে ওই বিশাল খয়েরি নেকড়ে বাঘটার রক্তাক্ত দেহ এখনও পড়ে আছে। হাতের ব্যাথাটা ভালোই বেড়েছে। হাতে বাধা কাপড়টা রক্তে ভিজে গেলেও এখন আর নতুন করে ক্ষতস্থান থেকে রক্ত পড়ছে না। আস্তে আস্তে ওই থিয়েটার বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে এল অনিলিখা।

প্রায় এক ঘণ্টা খোঁজাখুঁজির পর খুঁজে পেল ল্যাব বিল্ডিংটা। এটাই এখানকার একমাত্র অক্ষত বিল্ডিং। সামান্য সারিয়ে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু ইচ্ছে করে এমনভাবে গাছ গাছালির আড়ালে আছে, যে চট করে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

ভেতরে ঢুকতেই বুঝল বাইরে থেকে সাধারণ একটা বিল্ডিং মনে হলেও ভেতরে নানান প্রযুক্তিতে সাজানো একটা অত্যাধুনিক ল্যাব। কিন্তু সব দরজা খোলা পড়ে আছে কেন? কোনও সিকিউরিটি সিস্টেম কাজ করছে না কেন? সবাই কোথায়? বন্দুকটা হাতে নিয়ে খুব সন্তর্পণে এগোল অনিলিখা। একটু এগোতেই কারণটা বুঝল সে।

একটা অত্যাধুনিক ল্যাবের উপর দিয়ে যেন কোনও ঝড় বয়ে গেছে। বেশ কিছু চেয়ার টেবিল উল্টে পড়ে আছে। মেঝেতে পড়ে আছে কম্পিউটার, স্ক্যানার, নানান ধরনের সেন্সর। কিন্তু কেউ কোথাও নেই। নাকি আছে?

দেখে বোঝা যায় এখানে যারা ছিল, তারা কয়েক সপ্তাহ আগেও এখানে কাজ করেছে। কিন্তু তারা গেল কোথায়? বিশাল ল্যাব থেকে বেরিয়ে একটা চওড়া করিডর। তার দুপাশ দিয়ে বন্ধ পরপর কিছু ঘর। একটা বিচ্ছিরি পচা গন্ধ আসছে। কিছুটা এগোতেই চমকে উঠল অনিলিখা। লবির চারদিকে একের পর এক মৃতদেহ পড়ে আছে। শরীরগুলো পচে ফুলে ফেঁপে উঠেছে, কিন্তু সবুজ

বা লালচে হয়ে ওঠেনি।

মনে হচ্ছে ২-৩ দিনের মধ্যেই হয়েছে এ ঘটনা। সবার যেন একই রকম চেহারা। আসলে আলাদা করা যাচ্ছে না কারণ সবার মুখে-হাতে হাজারটা ছোট ছোট ফুটো। যেন কেউ পেন্সিল বা পিন বার বার গভীরভাবে ফুটিয়েছে শরীরে। শুকনো রক্ত লেগে আছে মুখে চোখে।

কিন্তু এদের মারল কে? কোনওভাবে কি এসব এক্সপেরিমেন্ট ভুল দিকে এগিয়েছিল? এখানকার কোনও প্রাণীই কি এভাবে এদের মেরেছে?

মৃতদেহগুলো পেরিয়ে করিডরের পাশ দিয়ে থাকা পর পর কাচের ঘরগুলোর মধ্যে একটা ঘরের দিকে তাকিয়ে থমকে গেল অনিলিখা। সেখানে মিঃ গিল হারভে একটা চেয়ারে বসে আছে। মাথা একদিকে কাত। ওনার দেহে একই রকম ফুটো। কিন্তু সেই অজানা প্রাণীর হাতে মৃত্যুর আগেই বোধহয় মাথায় গুলি করে আত্মহত্যা করেছিলেন বিজ্ঞানী গিল। ক্ষতচিহ্ন সেরকমই বলছে।

হাতটা চেয়ার থেকে ঝুলছে। একটা রিভলভার নীচে পড়ে আছে। কিন্তু কী কারণে আত্মহত্যা করতে হল কুখ্যাত জিনিয়াস বিজ্ঞানী গিল হারভেকে?

সামনে একটা চিঠি রাখা।

চিঠিটা হাতে নিয়ে চমকে উঠল অনিলিখা। ওকেই লক্ষ্য করে লেখা চিঠি।

অনিলিখা,

আমি হেরে গেলাম। আমি জানি তুমি এখানে আসবে। একমাত্র তুমিই আসতে পারবে এখানে। কী আশ্চর্য দেখো তোমাকে এতবার জীবন্ত দেখতে চেয়েছিলাম, যাতে তোমাকে আমার হাতে শেষ করতে পারি, কিন্তু জীবনের শেষ প্রান্তে এসে মনে হচ্ছে আমার সব কিছু জ্ঞান, বুদ্ধি যদি তোমাকে দিয়ে যেতে পারতাম...তুমিই হয়তো ওদের থামাতে পারবে। তুমিই হয়তো আমাদের শেষ আশা। আমি বন্ধ ঘরে বসে আছি। কিন্তু জানি ওরা আসবে।

তুমি নিশ্চয়ই জেনে গেছ আমি কী করতে চেয়েছিলাম। আমি চেয়েছিলাম মানুষের ব্রেন সেল ও বিভিন্ন জীবের ব্রেনসেলের সঠিক সংমিশ্রণে এমন এক জীব তৈরি করতে যা আমাদের থেকে বুদ্ধিতে অনেক এগিয়ে থাকবে। হয়তো বুদ্ধির সংজ্ঞাই পাল্টে দেবে। পারলামও শেষে। শুধু একটা নয়, একাধিক। কখনও মানুষের থেকে বুদ্ধিতে অনেক এগিয়ে থাকা বাঘ, কখনও গরিলা, কখন লেমুর, কখনও নেকড়ে তো কখন গরিলা। কিন্তু তারপরে?

হঠাৎ একদিন বুঝলাম আমি নিজের অজান্তে এভাবে পরীক্ষানিরীক্ষা করতে করতে এরকম এক বুদ্ধিতে বহুগুণ এগিয়ে থাকা লেমুরের শরীরে

এক অদ্ভুত ছত্রাকের জন্ম দিয়েছি, যে ছত্রাক আমার চেনাজানা সব জীবের থেকে আলাদা। হয়তো এ জায়গার মাত্রাতিরিক্ত রেডিয়েশনের জন্য দ্রুত জেনেটিক মিউটেশনের হার এর পিছনে দায়ী। কীভাবে যে এই অ্যালিয়েন ছত্রাক ওই লেমুরের শরীরে সৃষ্টি হল, সেটা আমার কাছে খুব বড় রহস্য।

সেই পরজীবী ছত্রাক সব সময় খোঁজে অন্য কোনও প্রাণ, অন্য কোনও জীব যার মধ্যে সে টিকে থাকতে পারবে। সব সময় এমন আশ্রয় খোঁজে যা কিনা সবথেকে শক্তিশালী। কিছুদিনের মধ্যে এর কাছে আমি হার স্বীকার করলাম। একের পরে এক হোস্টের মাধ্যমে ও আমার রাজত্বে এসে আমার সিংহাসনই কেড়ে নিল। আমার সব ক্ষমতা কেড়ে নিল।

কিন্তু শেষে যে সে এরকম এক জীবে আশ্রয় নেবে সেটা কখনও আন্দাজ করতে পারিনি।

সেটা যে কী তা বুঝেছি কয়েক দিন আগে। এখানে একধরনের অদ্ভুত বিষাক্ত পিঁপড়ে পাওয়া যায়, যা খানিকটা বুলডগ অ্যান্টের মতো। কিন্তু অনেক বেশি বিষাক্ত। অনেক বেশি দলবদ্ধ। আমার ধারণা এই পিঁপড়েটা শুধু এখানেই আছে, হয়তো এখানকার অত্যধিক রেডিয়েশনের কারণে ওই বুলডগ অ্যান্ট বিবর্তিত হয়ে এখানে এই জীব সৃষ্টি হয়েছে। লক্ষ লক্ষ পিঁপড়ে তারা সবাই তাদের দলপতির নির্দেশে চলে। আকারে ওই এক ইঞ্চির এই দলপতি পিঁপড়েকে শেষে আশ্রয় করল এই ছত্রাক।

কী বুদ্ধি দেখো। ভালুক নয়, নেকড়ে নয়, মানুষ নয়, আমি নই, সে বেছে নিল এমন এক জীব যে সবার অলক্ষ্যে সব জায়গায় পৌঁছে যেতে পারে, লক্ষ লক্ষ পিঁপড়েকে সংঘবদ্ধ করতে পারে। এই বিশ্বের সব থেকে শক্তিশালী জীবকে এই অ্যালিয়েন ছত্রাকটা পরিচালিত করতে শুরু করল। ভাবতে পারো কী হতে পারে যদি লক্ষ কোটি এ ধরনের পিঁপড়ে এভাবে সংঘবদ্ধ হয়, যদি উন্নততম বুদ্ধির অধিকারী হয়, উন্নততম দৃষ্টি আর রণকৌশলের অধিকারী হয়। এদের কাছে সমগ্র মানবজাতি কয়েক ঘণ্টায় হেরে যাবে।

আমি হেরে গেছি অনিলিখা। তুমি যত তাড়াতাড়ি পারো, এখান থেকে পালিয়ে যাও। তবে হয়তো পারবে না। তুমিও পারবে না। ওরা চারদিকে ছড়িয়ে আছে। বুঝতেও পারবে না মৃত্যু এত চুপচাপ পাশে এসে দাঁড়াতে পারে। সব রকম নিরাপত্তা নেওয়া সত্ত্বেও ওরা আমার ল্যাবে শেষে ঢুকে পড়েছে। আমার সব কর্মীকে শেষ করে দিয়েছে।

আমি এখন এই বন্ধ সিল্ড ঘরে বসেও জানি খানিকক্ষণের মধ্যে

আমার দশাও ঠিক অনাদের মতোই হতে চলেছে। সবার মৃতদেহ বাইরে চারদিকে ছড়িয়ে আছে। মৃতদেহ ছড়িয়ে আছে আমার সৃষ্ট অন্য সব প্রাণীরও। আমি জানি না কীভাবে এদের থেকে তুমি এই বিশ্বকে বাঁচাবে। তুমি যদি এখান অব্দি পৌঁছতে পারো, তবে এখন বাইরে গিয়ে দেখবে কেউ নেই এখানে, সব শেষ, সব শেষ।

বিদায়।

অনিলিখা চিঠিটা নামিয়ে রেখে চারপাশে তাকাল। বীভৎস পচা গন্ধ চারদিকে। মিঃ গিল নিশ্চয়ই দরজা খুলে দেননি। তবু ঠিক ঢুকে এসেছে এরা এ ঘরেও। কিন্তু এখন এরা কোথায়? এ ঘটনা অবশ্য দুই থেকে তিন দিন আগে হয়েছে। বডি ডিকমপজিশন সেরকমই দেখাচ্ছে।

কিন্তু তারা কোথায়? সেই বিবর্তিত পিঁপড়ের দল?

এখানে কোনও জায়গাই সেফ নয়। কিন্তু এদেরকে থামাতেই হবে কোনওভাবে। নিজের প্রাণের ভয়ে ভীত নয় অনিলিখা। এরা যদি চারনোবিলের বাইরে ছড়িয়ে পড়ে!

বেরোতে গিয়ে বুঝল বাইরে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। ঘন জঙ্গলের মধ্যে মুষল ধারা বৃষ্টি। যেন প্রলয় এসে গেছে। সঙ্গে বজ্র বিদ্যুৎপাত। সেই বিদ্যুতের আলোর রেখা ভেতর থেকেই দেখা যাচ্ছে। এ যেন সব কিছু শেষ হয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত।

কিন্তু এর মধ্যেও বেরিয়ে গিয়ে আসন্ন এই বিপদের কথা কোনওভাবে জানাতে হবে বাইরের জগৎকে যাতে মানবসভ্যতা আরও কিছুদিন টিকে থাকার শেষ চান্স পায়। যাতে বিশ্বের সেরা প্রযুক্তির সাহায্যে এদের সঙ্গে লড়াই করা যায়।

কিন্তু বেরোতে গিয়ে হঠাৎ চমকে দাঁড়িয়ে পড়ল অনিলিখা। এ কী অপার্থিব জগৎ। বাইরের রাস্তা, ঘাস, মাটি সব কালো হয়ে গেছে। আকাশও ঘন কালো মেঘে ঢাকা পড়েছে। শুধু কিছু সবুজ গাছগাছালি আর কিছু বিল্ডিং বাদে এই দিগন্ত বিস্তৃত কালো রঙ মাটি থেকে আকাশে যেন গিয়ে মিশেছে। এ যেন ঠিক এক অন্য গ্রহের পরিবেশ তৈরি করেছে।

কীভাবে এত চট করে বদলে গেলো এখানকার মাটির রঙ, ঘাসের রঙ। পরক্ষণেই বুঝতে পারল অনিলিখা কারণটা। লক্ষ লক্ষ না, তারও বেশি কোটি কোটি কালো পিঁপড়েতে মাটি, ঘাস, নীচের সব দিক ঢাকা পড়ে গেছে। তারা সবাই অনিলিখার বাইরে আসার অপেক্ষায় আছে। কিন্তু তারা ভেতরে আসছে না কেন? এরাই কী সেই বিবর্তিত বুলডগ অ্যান্ট? পুরো দেহ-মাথা কুচকুচে কালো। হিংস্র চোখ দুটো শুধু লাল। শুঁড় দুটো মাথার উপরের দিকে তুলে এরা

যেন এক অদ্ভুত আনন্দে মেতেছে। হয়তো ভাবছে অনিলিখাই এই বিশ্বের শেষ মানুষ। একে শেষ করলেই ব্যস।

কিন্তু না। ভুল ভাঙল। এরা অনিলিখাকে দেখছে না। এরা শুধুই এই বৃষ্টিধারার আনন্দে নাচছে। যেন এই বৃষ্টির অপেক্ষায় এরা যুগের পর যুগ অপেক্ষা করেছে। আর আজ সেই বৃষ্টির পরশ পেয়ে মেতে উঠেছে।

অনিলিখা ল্যাবের অন্য দিক দিয়ে বেরোতে গিয়েও দেখল সেই একই দৃশ্য। অপেক্ষা করতে হবে। বেরোনো অসম্ভব। এরা সর্বত্র ছড়িয়ে আছে।

কিন্তু এর পরে যেটা হল, সেটার জন্য অনিলিখা আদৌ প্রস্তুত ছিল না। ভিজে মাটির মধ্যে ঢুকে যেতে লাগল পিঁপড়েগুলো। একটার পর একটা। মনে হল যেন মাটির মধ্যে একটা যুদ্ধ চলছে।

এই ঘটনা কতক্ষণ চলেছিল কে জানে। তিন-চার-পাঁচ ঘণ্টা, নাকি তারও বেশি কে জানে। বৃষ্টি যখন থামল তখন সন্ধে হয়ে গেছে। ওই সব পিঁপড়ে মাটির তলায় ঢুকে গেছে। শুধু কিছু পিঁপড়ের ক্ষতবিক্ষত দেহ বাইরে পড়ে আছে।

মেঘমুক্ত নীল আকাশে আবার চাঁদ উঠেছে। আবার কোথা থেকে যেন কোনও নেকড়ে বাঘের ডাক শোনা যাচ্ছে। মাথার উপরে তারাখচিত আকাশ আবার যেন নতুন জীবনের সম্ভাবনার কথা বলছে।

তাহলে কি বৃষ্টি হলে এদের এরকম মরণ নাচ ও তারপরে মৃত্যু হয়! তার সঙ্গে সঙ্গে কী ওই অ্যালিয়েন ছত্রাকও শেষ হয়ে গেল!

এই প্রথম একা একা জোরে হেসে উঠল অনিলিখা। এত কিছু করে ওই অ্যালিয়েন ছত্রাক এসব পিঁপড়েদের এই প্রবণতার কথা জানতে পারেনি বা তাতে কোনও পরিবর্তন আনতে পারেনি।

১০ সেপ্টেম্বর, কলকাতা, শনিবারের আসর

অনিলিখাকে উদ্ধার করেছিল ভারত সরকারের একটা অ্যাডভান্সড লাইট হেলিকপ্টার।

অনিলিখাদের যে হেলিকপ্টার করে চারনোবিলে নিয়ে আসা হয়েছিল, তার লোকেশন দেখে ও যারা এসেছিল তাদের কারো সঙ্গে যোগাযোগ না করতে পেরে 'র' অর্থাৎ ভারতের 'রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালিসিস উইং' পুরো ব্যাপারটা নিয়ে অনুসন্ধান শুরু করে। পরে ইউক্রেন সরকারের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গেও যোগাযোগ করে। তারপরেই সংগঠিত হয় এই উদ্ধারকার্য।

শনিবারের আসরে কেউই এসব ব্যাপারে কিছুই জানত না। টপ সিক্রেট ঘটনা বলে এখনও মিডিয়ার কাছেও খবরটা আসেনি। হয়তো কোনওদিন আসবেও না।

তবে খুব রহস্যজনক ভাবে 'ভক্সওয়াজেন' গাড়ির ম্যানেজিং ডিরেক্টর কার অ্যাক্সিডেন্টে গতকাল মারা গেছেন। একই সঙ্গে গতকাল গ্রিসের এক রিসোর্টে মেডলা সংস্থার প্রধানেরও সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে।

একই দিনে দুই এত বড় সংস্থার শীর্ষে থাকা দুই ব্যক্তির মৃত্যুকে অনেকেই খুব দুর্ভাগ্যজনক বলছেন।

বহুদিন পরে অনিলিখাকে হাতে ব্যান্ডেজ লাগানো অবস্থায় শনিবারের আসরে ঢুকতে দেখে প্রতীক বলল, কী ব্যাপার অনিলিখাদি। তুমি তো সেই ক্রিকেট ম্যাচের পর থেকে আমাদের ভুলেই গেছ। এতদিন বাদে? তা হাতে চোটটা কীসে পেলে?

বিশ্বজিৎদা সেদিকে একবার তাকিয়ে মুচকি হেসে বলে উঠল, সেদিনের ক্রিকেট ম্যাচ থেকে, আবার কী। আরে বাবা, আমার দেড়শো মাইল স্পিডের বোলিং-এর হাতে লাগলে এই হবে। হাড় ভেঙেছে, তাই তো? তবে অনিলিখা তো আর সেটা মুখে বলবে না। বলবে কোনও নেকড়ে বাঘ বা ভিনগ্রহী প্রাণী কোনও গভীর জঙ্গলে অনিলিখাকে একা পেয়ে হাতে কামড় বসিয়েছে। কী ঠিক বলছি কিনা অনিলিখা?

অনিলিখাদি মুচকি হেসে বলে, তোমার কথা কখনও ভুল হতে পারে! ঠিক তাই।

একটু থেমে অনিলিখাদি ফের জোরে চেঁচিয়ে বলে ওঠে, মাসিমা, আজ কিন্তু আমরা সবাই লুচি আর কষা মাংস খাব। অনেক গল্প বলার আছে। আমি মোহনের দোকানে কষা মাংস বলে এসেছি।

আমরা সবাই আনন্দে চিৎকার করে উঠলাম। যাক, অনেক দিন বাদে নতুন কিছু শোনা যাবে অনিলিখাদির কাছ থেকে। লুচি আর কষা মাংস তো সঙ্গে আছেই!



বরফ পড়ার সেই রাত

Arajakata Exclusive

অনিলিখাদি, তুমি তো এত জায়গায় গেছ, কখনও বরফ পড়া দেখেছ? সহেলী বলে উঠল।

অনিলিখাদি 'কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র' বইটা কোলের ওপরে নামিয়ে মৃদু হেসে বলল, এই ভ্যাপসা গরমের মধ্যে তোর হঠাৎ করে বরফ পড়ার কথা মনে পড়ল!

আসলে আমার মাসতুতো ভাই রঞ্জু কেপটাউনে থাকে। কাল বরফ পড়ার ভিডিয়ো পাঠিয়েছে। কী সুন্দর যে দেখতে লাগছে, কী বলব! চারদিকে শুধু সাদা আর সাদা। তার মধ্যে তুলোর মতো বরফ পড়ছে। তাই মনে পড়ল। ইশশ্, একবার যদি চাক্ষুষ দেখতে পারতাম।

প্রতীক সহেলীর কথার সুর ধরে বলল, আমি দু-বছর আগে একবার দার্জিলিংয়ে দেখেছিলাম। দারুণ লেগেছিল। তবে খুব অল্প সময়ের জন্য। আমরা সবাই রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছিলাম বরফ দেখতে। কিন্তু বরফ পড়তে পড়তে গলে যাচ্ছিল।

তন্ময় আজকাল কবিতার বই আর কলেজ রাজনীতি নিয়ে খুব ব্যস্ত। হাতের বইটা টেবিলের ওপরে রেখে বিজ্ঞের মতো বলল, বরফ দেখতে হলে হিমাচল প্রদেশ। মানালিতে দেখেছিলাম। সে দৃশ্য এখনও চোখে ভাসে। কী অপূর্ব! কে যেন বলেছিল, প্রথম তুষারপাত দেখা হল প্রথম ভালোবাসার মতো।

হ্যাঁ, সেটা দেখেছিস বলে তোর আর ওসব হয়নি! তন্ময়কে থামিয়ে মিলন ফের বলে উঠল, তুমি দেখেছ অনিলিখাদি? এত জায়গায় যাও।

আমাদের আসল উদ্দেশ্য অনিলিখাদির কাছ থেকে গল্প শোনা। অনিলিখাদির গল্পের ঝুলি থেকে অনেক ধরনের টপিক শোনা গেলেও কখনও বরফ পড়ার গল্প শুনিনি। এই দাবদাহে রাস্তায় বেরোনোর সম্ভাবনা নেই। যদি অনিলিখাদির কাছ থেকে কোনো গল্প শোনা যায়, সেই আশায় আছি।

অনিলিখাদি মৃদুস্বরে আস্তে আস্তে বলে উঠল, হ্যাঁ, দেখেছি। অনেকবার দেখার অভিজ্ঞতা হয়েছে। আমেরিকার বিভিন্ন জায়গায়, ইংল্যান্ডে, ইউরোপের নানান জায়গায়। তবে, একবার এমন এক অভিজ্ঞতা হয়েছিল, যে তার কাছে বাকি সব স্মৃতি ফিকে হয়ে গেছে। তবে, সে কথা আজ থাক। বলতে সময় লাগবে। আজকের এটুকু সময়ে হবে না।

থাক মানে? বলতেই হবে! তুমি গল্প বলার ব্যাপারে খুব কিপটে হয়ে

যাচ্ছ। বলতেই চাও না। সাগ্নিক প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল।

আমরাও সমস্বরে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। এমন সুযোগ কেউ ছাড়ে? আমাদের এই শনিবারের আসরে আসার মূল আকর্ষণ হল অনিলিখাদির কাছ থেকে গল্প শোনা।

বিশ্বজিৎদা কিছু দূরে সোফায় বসে ফোনে সুডোকু খেলছিল। খেলতে খেলতে অনিলিখাদিকে উদ্দেশ্য করে বলল, বলেই ফেলো। তা না হলে এদের আজ রাতে আর খাবার হজম হবে না। আমিও একটু শুনি। টেনিদার নতুন গল্প তো আর আসবে না। তোমার গল্পই যা জোটে, ওই যাকে বলে দুধের সাধ ঘোলে মেটানো।

তাহলে, তোমারও শোনার আগ্রহ আছে বলছ? বলে মুচকি হাসল অনিলিখাদি।

হ্যাঁ, তা আছে। সত্যি কথা বলতে কী, আনন্দবাজারের খবরের থেকে তোমার গল্পগুলো অনেক বেশি আকর্ষণীয় হয়। বলে বিশ্বজিৎদা সুডোকু খেলায় অব্যাহতি দিয়ে ফোনটা সরিয়ে রাখল।

এই গরমে মাসিমা অর্থাৎ প্রতীকের মা সবার জন্যে লেবুর শরবত করেছেন।

গ্লাসে একটা বড় চুমুক দিয়ে অনিলিখাদি বলতে শুরু করল।

এ গল্প বলার সময় একটা শর্ত আছে। শেষ হওয়ার আগে কোনো প্রশ্ন করা যাবে না। যেখানেই কেউ প্রশ্ন করবে, সেখানেই আজকের গল্পের ইতি টানা হবে। আর সবার ফোন সাইলেন্ট রাখতে হবে। বলে ফের মুচকি হাসল অনিলিখাদি।

কী, সবার এই শর্তে সম্মতি আছে তো?

তারপরে আমাদের সবার নীরবতাকে সম্মতি ধরে নিয়ে অনিলিখাদি বেশ গুছিয়ে বসে বলতে শুরু করল।

এ গল্পের কেন্দ্রে ইংল্যান্ড। কয়েক বছর আগের কথা। জানুয়ারি মাসে আমি এক সপ্তাহের জন্য ইংল্যান্ড গিয়েছিলাম। কাজটা ছিল বারমিংহ্যামে। পুরো সপ্তাহ খুব ব্যস্ততার মধ্যে কেটেছে। শুধু হোটেল আর অফিস। শনিবারে খানিকটা সময় ছিল। ভাবলাম বারমিংহ্যাম লাইব্রেরির থেকে ঘুরে আসি।

বারমিংহ্যাম লাইব্রেরি ইংল্যান্ড, এমনকী পুরো ইউরোপের মধ্যে সবথেকে বড় লাইব্রেরিগুলোর মধ্যে একটা। ওখানে 'এডিনবার্গ রিভিউ' ম্যাগাজিনের খুব ভালো কালেকশন আছে শুনেছিলাম। তোরা যারা এই ম্যাগাজিনের নাম শুনিসনি, তাদের জন্য বলি।

এই ম্যাগাজিনের প্রকাশকাল ছিল ১৮০০ সালের শুরুর দিক থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত। তারপরে হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে যায়। সে সময়ের খুব প্রামাণ্য

ম্যাগাজিন ছিল এটা। সে সময়ে ভারত ব্রিটেনের কলোনি হওয়ার জন্য, এতে ভারতের উপরেও বেশ কিছু খবর থাকত।

ভারতের সিপাহী বিদ্রোহ সংক্রান্ত কিছু খবরে আমার আগ্রহ ছিল। সে বিষয়ে লাইব্রেরিয়ানকে গিয়ে জিগ্যেস করব, এমন সময় দেখি একজন অত্যন্ত বৃদ্ধ মানুষ আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। খেয়াল করে আমি ওঁকে আগে ছেড়ে দিলাম। কিন্তু দেখলাম উনি লাইব্রেরিয়ানের সঙ্গে কথা বলায় আগ্রহী নন।

তারপর মুখের দিকে তাকাতে দেখি সেই বৃদ্ধ আমাকে দেখে হাসছেন। বুঝলাম, উনি আমাকে দেখেই এগিয়ে এসেছেন।

অনিলিখা। হোয়াট অ্যা সারপ্রাইজ। কেমন আছ? কবে এলে এখানে? আমেরিকান অ্যাক্সেন্টের ইংরাজিতে সেই বৃদ্ধ আমার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন। লম্বা রোগা চেহারা। বয়সের ভারে একটু কুঁজো হয়ে গেছেন।

প্রথমে চিনতে পারিনি। খানিকক্ষণ অপ্রস্তুত হয়ে ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। তারপরে খেয়াল হল। প্রফেসর ম্যাথিয়াস? উনি আমাকে এত বছর বাদেও মনে রেখেছেন?

সেই কবে আমেরিকার স্ট্যানফোর্ডে দেখা হয়েছিল। প্রায় দশ বছর আগের কথা। এর মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ, কথাবার্তা কিছুই হয়নি। এখন তো অনেক বয়স হবে। তখনই বেশ কয়েক বছর হল রিটায়ার করেছিলেন। এই বয়সেও এরকম হেঁটে চলে বেড়াচ্ছেন? এখনও মেমারি এত শার্প?

আমার মনে যে প্রশ্নটা এসেছিল, উনি সেটা সঠিক আন্দাজ করেই বলে উঠলেন, কী করে তোমার নাম মনে রাখলাম, সেটাই ভাবছ তো? তারপর একটু থেমে গলার স্কার্ফটা খুলে হাতে নিয়ে বললেন, আমার স্মৃতিশক্তি এখনও খুব ভালো আছে। তাছাড়া কিছুদিন আগেই তোমার লেখা একটা রিসার্চ পেপার পড়ছিলাম। ট্রান্সপোর্ট ইন্ডাস্ট্রিতে কার্বন ফুটপ্রিন্ট কমাতে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কীভাবে ব্যবহার করা যায় সেই বিষয়ে তুমি যে পেপারটা লিখেছিলে...ভারতে থেকে যে এরকম কাজ করা যায়, সত্যি আমার জানা ছিল না।

না, না, আমার থেকেও অনেক ভালো রিসার্চ এখন ভারতে অনেকেই করছেন। আমি আপনাকে এখানে একদম এক্সপেক্ট করিনি। এখানে দু-সপ্তাহের জন্য এসেছি। তা আপনি কি এখন এখানেই থাকেন?

হ্যাঁ, এখান থেকে মাইল দশেক দূরে আমার বাড়ি। তুমি আগামীকাল কী করছ? রোববার আশা করি কাজে যাচ্ছ না? চলে এসো।

মুখে একটু সৌজন্যের হাসি টেনে আমি বললাম, আমার হয়তো সময় হবে না। ইচ্ছে আছে শেক্সপিয়ারের বাড়ি দেখতে যাওয়ার।

সে তুমি অন্যদিন যেও। এমনিতেও তো সেখানে আর শেক্সপিয়ার নেই। কিন্তু আমি আছি। কতদিন থাকব তা যদিও জানি না। আমার বাড়িতে কাল

আসতেই হবে। তোমার সঙ্গে অনেক বিষয় নিয়ে কথা হবে। যে সব বিষয়ে কথা বলতে চাই, সেসব বিষয়ে কথা বলার লোক খুব কম থাকে। আমি এ চান্স মিস করতে চাই না।

উনি এমনভাবে বললেন কথাগুলো, কী আর করব, কথা দিলাম।

ভদ্রলোক একা থাকেন। তবে দিনের বেলা এক কাজের লোক আছে। সে সব রান্নার কাজ সেরে রাতে চলে যায়। ঠিক করলাম সকাল সকাল গিয়ে বিকেলের দিকে ফিরে আসব।

এখানে একটা কথা বলে নিই। প্রফেসর ম্যাথিয়াস পদার্থবিজ্ঞানের বিখ্যাত প্রফেসার ছিলেন। কোয়ান্টাম ফিল্ড থিয়োরি নিয়ে রিসার্চের জন্য সারা বিশ্বের বিজ্ঞানীমহল ওনাকে চেনে। ওনার দিক থেকে শুধু নয়, আমারও এ ব্যাপারে ওনার কাছ থেকে কিছু শোনার বেশ আগ্রহ ছিল।

কথা তো দিলাম। অ্যাড্রেসও নিয়ে এলাম। বার্টিনগ্রিন বলে একটা গ্রামে থাকেন ভদ্রলোক। খুব দূর নয়। কিন্তু বাড়ি এসে সন্ধেবেলায় বিবিসিতে আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেখে ঘাবড়ে গেলাম। পরের দিন দুপুর বারোটা থেকে ভারী তুষারপাতের সম্ভাবনা। সারা দিন,সারা রাত চলবে। এমনিতে অসুবিধে নেই। ট্যাক্সি করে যাব। তবে তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে হবে। বাড়িটা এমন একটা জায়গায় যেখানে গাড়ি ছাড়া যাতায়াতের কোনো উপায় নেই।

পরেরদিন সকাল দশটা নাগাদ ওনার বাড়িতে পৌঁছে গেলাম। বাংলো প্যাটার্নের বিশাল দোতলা বাড়ি। নুড়িতে মোড়া বেশ খানিকটা রাস্তা পেরিয়ে বাড়ির পোর্চের সামনে এসে ট্যাক্সি দাঁড়াল। টাক্সি থেকে নামতেই কনকনে ঠান্ডা বাতাস হিম ধরিয়ে দিল। ঠিক বরফ পড়ার আগে যেরকম হয়। যেন বাতাসের শেষ উষ্ণতাটুকুও কেউ শুষে নিচ্ছে।

বাড়িটা বেশ বিচ্ছিন্ন। আশেপাশে কোনো বাড়ি চোখে পড়ল না। মনে হয় গ্রামের জনপদের একদম শেষ প্রান্তে। চারদিকে গমের শূন্য খেত আর হালকা জঙ্গল।

কলিং বেল টিপতে এক রোগা লম্বা চেহারার মহিলা এসে দরজা খুলে দিলেন। বুঝলাম, ইনি সেই কাজের মহিলা। আমাকে ডানদিকের লিভিং রুমে এনে বসালেন। খানিকবাদে প্রফেসর নেমে এলেন। আমাকে দেখে ভীষণ খুশি। বয়স নব্বইয়ের কাছাকাছি হলেও, এখনও বেশ সুস্থ। শুধু সামান্য সামনে ঝুঁকে আস্তে আস্তে হাঁটেন।

গত দশ বছর ধরে ইংল্যান্ডে আছেন। তার আগে প্রায় পঞ্চাশ বছর আমেরিকাতে কাটিয়েছেন। জন্ম বার্লিনে। কথায় কথায় জানলাম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ খুব কাছ থেকে দেখেছেন।

ওনার তাড়াতাড়ি লাঞ্চ করার অভ্যেস। সামান্য কিছুক্ষণ আড্ডার পর টুনা

স্যান্ডউইচ এবং স্যালাড দিয়ে লাঞ্চ সেরে আমরা বাড়ির পিছন দিকের স্টাডি রুমে এসে বসলাম।

বিশাল স্টাডিরুম। পুরো ঘরটা খুব সুন্দরভাবে সাজানো। প্রফেসর বেশ শৌখিন মানুষ, সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে ভালোবাসেন।

দেওয়ালের এক ধার দিয়ে পরপর ছাদ ছোঁওয়া ওককাঠের বুক কেস। ঘরের অন্যদিকে একটা বিশাল ফায়ার প্লেস। তারও পাশে সার দিয়ে বুক কেস। ফায়ার প্লেসের সামনে উলের কার্পেটের উপরে আরেকটা খুব দামি লাল পুরু কার্পেট পাতা। লক্ষ করলাম ঘরে বেশ কয়েকটা পাথরের মূর্তি রাখা।

স্টাডিরুমের সবথেকে বড় সৌন্দর্য অবশ্য কাচের দরজার বাইরের বিশাল বাগান। সেদিকে একটা পাথরে বাঁধানো লন। তার পরে সেই বাগান। পাথরের লন আর বাগানের মধ্যে একটা গেট আছে। বাগানটা এতটাই বড় যে তার শেষটা ঠিকঠাক ঠাহর হয় না। মনে হয় যেন বাগানটা পিছনের পাইনের জঙ্গলের সঙ্গে মিশে গেছে।

সোফায় বসে কফি হাতে নিয়ে গল্প শুরু হল। পূর্বাভাস দেখলাম ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে একেবারে মিলে গেল। বেলা বারোটা বাজতে না বাজতেই বরফ পড়তে শুরু করে দিল। বৃষ্টির ফোঁটার মতো নেমে অজস্র ছোট ছোট বরফের কুচি। হাওয়ার ঝাপটায় সে বরফের কুচি কাচের দরজার উপরে এসেও হানা দিতে শুরু করল। মনে হল যেন অজস্র আলোপোকা ঘিরে ধরছে চারদিক দিয়ে। সামনের পাথরের লনের উপর দিয়ে বরফের টুকরোগুলো ছোট ছোট বলের মতো গড়িয়ে যাচ্ছিল। তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই সে বরফের কুচিগুলো পাথরের সংস্পর্শে এসে অস্তিত্ব হারাচ্ছিল।

খানিকবাদে বরফের কুচির বদলে আকাশ ঢেকে নেমে এল তুলোর মতো বরফ। পিছনে বর্ণহীন ঘোলাটে আকাশ। ঘাসের রং আস্তে আস্তে বদলে যেতে লাগল সবুজ থেকে সাদায়। আশেপাশের গাছের শিরা-উপশিরায় ফুটে উঠল বরফের রেখা।

বরফ পড়া অনেক বার দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। তবে প্রত্যেকবারই এই মোহময়ীর পদচারণা যেন নতুন লাগে। দেখলাম বাইরের পাথরের লনে বরফ জমছে। আরও কিছুটা দূরে সবুজ বাগান একটু একটু করে হারিয়ে যাচ্ছে মিহি বরফের কার্পেটের তলায়। দূরে পাতাবিহীন বার্চ গাছে হঠাৎ এই তুষারপাতে থমকে বসে আছে কয়েকটা পায়রা আর দুটো ম্যাগপাই পাখি। এলাকার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে তাদের যুদ্ধ থেমে গেছে। তারাও যেন প্রকৃতির এই হঠাৎ রং বদলে যাওয়ার রহস্য বোঝার চেষ্টা করছে। তাদের পালকের রং দ্রুত বদলাচ্ছে। ঠিক একইভাবে লনে রাখা প্রফেসারের কাচের টেবিল বরফের চাদরে নিজেকে মুড়ে ফেলছে।

এ সবের মধ্যে প্রফেসারের সঙ্গে গল্প আড্ডা শুরু হয়ে গেল।

দেখলাম এখনও তাঁর মেমারি সত্যি খুব শার্প। কে কী বিষয় নিয়ে কাজ করছেন, সারা বিশ্বে কোথায় কী হচ্ছে সব খবর তাঁর নখ দর্পণে। এরকম মানুষের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ খুব কম হয়। নিজের বিষয়ের বাইরেও বিজ্ঞান, রাজনীতি, ইতিহাস সব বিষয়েই অসামান্য জ্ঞান।

চিন থেকে ইরান, ইথিওপিয়ায় গণতন্ত্রের বিপর্যয় থেকে গ্লোবাল ওয়ার্মিং, কোয়ান্টাম ফিল্ড থিয়োরি থেকে চাঁদের মাটিতে জল, আলোর গতিবেগ সবদিকে সমান কিনা থেকে শুরু করে ব্রেন কীভাবে কাজ করে এরকম নানানরকম বিষয় নিয়ে আমাদের আলোচনা বেহিসাবীভাবে এগিয়ে চলল।

খেয়াল করিনি এসব কথা বলতে বলতে কখন বিকেল চারটে হয়ে গেছে। এর মধ্যেই যেন দিনের আলো দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। নিভতে থাকা বিকেলের আলো চারদিক কমলা রঙে সাজিয়ে দিচ্ছে।

কাচের দরজার বাইরে তাকাতে খেয়াল হল বাগান লন সব ইতিমধ্যেই যেন কোনও ম্যাজিশিয়ানের হাতের ছোঁয়ায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। পুরু বরফের চাদরের তলায় উধাও হয়ে গেছে। তুষারপাত তখনো হচ্ছে। মাঝেমধ্যে একটু থামছে। আবার তার পরেই হাওয়ার ঝাপটার সঙ্গে বরফের তাণ্ডবনৃত্য শুরু হয়ে যাচ্ছে। তার আড়ালে আকাশ উধাও হয়ে যাচ্ছে। গাছের শাখায় শাখায় বরফের ভারী প্রলেপ পড়ছে।

নাহ্, আর দেরি করলে চলবে না। এবারে বেরোতে হবে। না হলে আটকে যাব।

এই ভেবে বেরোনোর কথা বলতেই প্রফেসর বললেন, এই দুর্যোগের মধ্যে তুমি এখন কোথায় যাবে অনিলিখা? এরকম জায়গায় এখন কোনও ট্যাক্সি আসতে চাইবে না। তাছাড়া রাস্তার অবস্থাও ভালো নয়। ফেরার রিস্ক নিও না। তার থেকে ভালো, আজ এখানেই থেকে যাও। কাল সকালে ফিরো। আমাদের আড্ডা যেভাবে জমে উঠেছে, তাতে তোমাকে আর ছাড়তে ইচ্ছে করছে না।

একটু থেমে ফের বললেন, আমার মতো এক বৃদ্ধকে এরকম একটা দিন উপহার দিয়ে যাও অনিলিখা। তোমার মতো এরকম কথা বলার সঙ্গী আজকাল পাই না। কত বড় বড় বিজ্ঞানীকে দেখেছি। কিন্তু নিজের বিষয়ের বাইরে অন্য কিছুতে কোনও ইন্টারেস্ট নেই। ইউ আর অ্যান একসেপশন।

এমন আবহাওয়ায় মধ্যে যে একেবারে বেরোনো যেত না, তা নয়। কিন্তু মনে হল এই অবস্থায় এরকম একটা দিনে বৃদ্ধ প্রফেসরকে একা বাড়িতে ফেলে রেখে চলে যাওয়া ঠিক হবে না। কিছুক্ষণ আগেই বাড়ির কাজের মেয়েটা চলে গেছে। যাওয়ার আগে ফায়ার প্লেসে কাঠ দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে।

বাইরের তুষারপাত, সামনে এই আগুনের উত্তাপ, তারপরে একের পর

এক এরকম আকর্ষণীয় বিষয়। এই সব মিলে সময় খারাপ কাটবে না। ঠিক করলাম রাতটা কাটিয়ে পরের দিন এখান থেকেই সোজা অফিসে যাব।

গল্প ফের জমে উঠল।

খানিকবাদে গল্প করতে করতে হঠাৎ বাইরের দিকে চোখ পড়ল। একটা ছেলে বাগানে এই তুষারঝড়ের মধ্যে স্নোম্যান বানাচ্ছে।

বয়স আট-নয় বছরের আশপাশে হবে। এত ছোট ছেলে, হঠাৎ কোথা থেকে এল।

ছেলেটার মুখটা দেখা যাচ্ছে না। বাড়ির দিকে পিছন করে দাঁড়িয়ে সে একমনে স্নোম্যান বানিয়ে চলেছে। মাথায় একটা চ্যাপ্টা নীল-খয়েরি ডোরাকাটা টুপি।

বাগানের চারদিকে উঁচু কাঠের ফেন্স। বাড়ি আর বাগানের মধ্যে একটা গেট আছে। সে দিক দিয়ে কেউ গেলে বাড়ির মধ্যে দিয়েই যেতে হতো। কিন্তু সেরকম কেউ তো আসেনি। তাহলে আমরা জানতে পারতাম।

ছেলেটাকে দেখাতে প্রফেসর প্রথমে চমকে উঠলেন। যেন কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে গেলেন। তারপর বললেন, আসলে কাঠের বেড়াটার নানান জায়গায় ভেঙে গেছে। মনে হয় সেই ফাঁক দিয়েই ঢুকেছে। খানিকক্ষণ দেখে ফের বললেন, কোথায় যেন দেখেছি মনে হচ্ছে ছেলেটাকে।

হয়তো এই বিশাল জায়গা আর এরকম বরফের পুরু কার্পেট দেখেই ছেলেটা ভেতরে ঢুকে পড়েছে। এরকম বরফ দিয়েই তো ভালো স্নোম্যান বানানো যায়। এই বয়সটাই হল নিয়ম ভাঙার বয়স। বেড়া টপকানোর বয়স। আমিও ছেলেবেলায় এমন কত করেছি। পাঁচিল পেরিয়ে অন্যদের বাগানে ঢুকে আম-আমড়া পেড়েছি। মা'র কাছে বকুনিও কম খাইনি তার জন্য। মেয়েদের অন্যদের বাগানে যেতে নেই, গাছে চড়তে নেই, এরকম পোশাকে অন্যদের বাড়ি যেতে নেই, ইত্যাদি ইত্যাদি। সেখানে ছেলেটার পক্ষে এই বাগানে ঢুকে পড়া কিছুই অস্বাভাবিক নয়। আমিও সেটা প্রফেসারকে বললাম। উনি সায় দিলেন আমার কথায়।

ছেলেটা বিভোর হয়ে স্নোম্যান বানাচ্ছিল। অন্য কোনওদিকে তার খেয়াল ছিল না। বরফের একটা দলা বাগানের বাকি বরফের ওপরে গড়িয়ে গড়িয়ে আস্তে আস্তে বড় করছিল বলটাকে। এরকম একটা গোল বড় বরফের বল তৈরি করার পর সেটা সরিয়ে রেখে, আরেকটা বল তৈরি করার চেষ্টা করছে।

বেশ ভালোই লাগছিল। যেন এক নিপুণ শিল্পী কাজ করে চলেছে আপন মনে। যতদূর দেখা যায় বাগান, তারপর বাগানের বাইরে শুধুই পাতাহীন গাছ আর ঝাউ পাইনের সারি। যেন নিথর নিস্পন্দ পৃথিবী শেষদিনের মুহূর্ত গুনছে। সেখানে এরকম প্রাণের স্পর্শ ভালোই লাগছিল।

যাই হোক, আমরা আবার আমাদের গল্পে ফিরে এলাম।

এরকম পরিবেশে গল্প বেশ ভালোই জমে। গল্পে গল্পে চলে এল প্রফেসারের ছোটবেলার কথা। ছাব্বিশ বছর বয়স অব্দি প্রফেসার জার্মানিতে ছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন। পরে আমেরিকায় চলে আসেন। তবে যুদ্ধের কথা বিশেষ বলতে চাইলেন না।

সেটাই স্বাভাবিক। ওই সময়ের স্মৃতি অনেক জার্মানই বলতে চান না। হয়তো জার্মানির পরাজয় কোথাও এদের অহমিকাবোধকেও আঘাত করে। এটা আমি আগেও দেখেছি। বিশ্বযুদ্ধ, ইহুদিদের উপরে অত্যাচার এসব নিয়ে কেউ কথা বলতে চান না।

তবু এরকম সুযোগ কে ছাড়ে। খুব কম লোকই আছে যারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ খুব কাছ থেকে দেখেছেন।

আমি কৌতূহলবশত বলে উঠলাম, হিটলারকে কখনও দেখেছেন?

ফিউরারকে একবার দেখেছিলাম ১৯৪৪ সালের আগস্ট নাগাদ। শুনেছি তাঁর সামনে কেউ কথা বলতে সাহস পেত না। আমি যখন দেখেছিলাম, তার কিছুদিন আগেই তাঁর ওপরে একটা বড় হামলা হয়েছিল। অপারেশন ভ্যালকিরির নাম শুনেছ নিশ্চয়ই?

হ্যাঁ, ওই তো জেনারেল 'ক্লাউস ভন স্টফেনবার্গ' যেবারে জার্মানির মিলিটারি হেডকোয়ার্টার 'উলফ লেয়ার'-এর একটা কনফারেন্সে হিটলারের টেবিলের তলায় বোমা রেখে গিয়েছিল। সেটাই তো?

ঠিক। ওর উদ্দেশ্য ছিল হিটলারকে হত্যা করে যুদ্ধ থামানো। ও ইহুদিদের উপরে অত্যাচারের বিরোধী ছিল। হিটলারের মিলিটারি নীতি অপছন্দ করত। তখন জার্মানির অবস্থা বেশ খারাপের দিকে। জেতার আশা এমনিতেই ছিল না। এর জন্য হিটলারই দায়ী বলে মনে করত। বোমা বিস্ফোরণে সামান্য আহত হলেও হিটলার ভাগ্যক্রমে বেঁচে যান। একটা টেবিলের পায়ার জন্য বেঁচে যান। কিন্তু স্টফেনবার্গ ভেবেছিল হিটলার মারা গেছে। সেরকম খবর রটিয়েও দেওয়া হয়েছিল। রিসার্ভ আর্মির সাহায্য নিয়ে হিটলারের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের চেষ্টা করা হয়। এই অভ্যুত্থানের চেষ্টা অবশ্য ব্যর্থ হয়। পরে যারা এর পিছনে ছিল তাদের সবাইকে ফায়ারিং স্কোয়াড দিয়ে মারা হয়।

কিন্তু এই ঘটনার জন্য হিটলার তখন কাউকে বিশ্বাস করতেন না। সবাইকে সন্দেহের চোখে দেখতেন। এই সময়টাতেই আমি একবার দেখেছিলাম তাঁকে। সে সময় জার্মানির পরাজয় প্রায় আসন্ন। তখনও কী প্রতাপ! অবশ্য উনি তখন বাইরে বেরোনো একদম কমিয়ে দিয়েছিলেন।

তা, আপনি যুদ্ধের পরে আমেরিকা গিয়েছিলেন। যেতে কোনও অসুবিধে হয়নি?

কেন? অসুবিধে হবে কেন? একটু যেন উদ্বিগ্ন হয়ে বলে উঠলেন।

না, না, এমনি বলছিলাম। আমি নিশ্চিত যে সে সময় সবার ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করা হতো। বিশেষ করে ইহুদিদের উপরে

যেরকম অকথ্য অত্যাচার হয়েছিল, সেটা সামনে আসার পরে। নিশ্চয়ই এই অপরাধের পিছনে যারা ছিল তাদের সবাইকে খুঁজে বার করার চেষ্টা হয়েছিল। আমি সেজন্য বলছিলাম। আপনি নাৎসিদের কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের কথা জানতেন?

হঠাৎ একথা? প্রফেসর চওড়া জোড়া ভুরু কুঁচকে ভারী গলায় বলে উঠলেন।

না, এমনি আর কী। ওরকম বর্বরতা সভ্যতার ইতিহাসে খুব বিরল। আপনি সে সময়ে ওখানে ছিলেন। তাই জিগ্যেস করলাম। তখন সাধারণ লোক কি এসব খবর জানত?

উনি একটু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, অন্য সময় হলে প্রশ্নটার উত্তর দিতাম না। কিন্তু এমন একটা বয়সে পৌঁছে গেছি যে, এখন আর বলতে হয়তো ক্ষতি নেই। কিছুটা জানতাম। আমি সরাসরি যুক্ত ছিলাম না অবশ্য। তবে ক্যাম্পের সঙ্গে যুক্ত কয়েকজনের সঙ্গে পরিচয় ছিল। জোসেফ গবেলস-এর নাম শুনেছ?

হ্যাঁ, গবেলস তো হিটলারের প্রোপাগান্ডা মিনিস্টার ছিলেন। নাৎসি বাহিনীর প্রচারের দায়িত্বে ছিলেন। শুনেছি খুব ভালো বক্তৃতা দিতেন। হিটলারের খুব কাছের একজন ছিলেন। নাৎসিরাই একমাত্র জার্মানিকে বিশ্বের সেরা শক্তি হিসেবে গড়ে তুলতে পারে, এরকম সব কথা বলতেন। অসম্ভব ইহুদি বিদ্বেষী ছিলেন।

ঠিক বলেছ। অসাধারণ কথা বলতেন। আমার বাবা খুব দেশভক্ত ছিলেন। বাবা প্রায় তাঁর কথা শোনানোর জন্য আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন। কথা শুনলে মনে হতো উনি যা বলছেন সবই সত্যি। রক্ত গরম হয়ে যেত। মনে হতো জার্মানরা সত্যি সব দিক দিয়ে বিশ্বের সেরা জাতি। ইহুদিরাই জার্মানির শত্রু। ওদের ষড়যন্ত্রের জন্যই জার্মানির এই দুর্দশা। দেশ থেকে ওদের যে-কোনও উপায়ে তাড়াতে হবে। জার্মানিকে আবার পুরো বিশ্বের ভাগ্য নির্ধারণের দায়িত্ব নিতে হবে। এজন্য আমাদের অধীনে থাকা আগের সব জায়গা ফেরত পেতে হবে।

প্রফেসর এবার উঠে আমার আর ওঁর জন্য বার থেকে ফ্রেঞ্চ 'পিনাউ নোঁয়া' ওয়াইন নিয়ে এসে বসলেন। একবার ঠোঁটে ঠেকিয়ে আবার কী ভেবে ধীরে ধীরে কাচের দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। বেশ কিছুক্ষণ বাগানের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

তারপর হঠাৎ করে বলে উঠলেন, আচ্ছা, অনিলিখা ওই ছেলেটা কোথায় গেল? দেখতে পাচ্ছি না তো।

আমিও উঠে দাঁড়িয়ে পাশে গিয়ে ভালো করে লক্ষ করলাম। বাগানে কেউ কোথাও নেই। বললাম, যেখান দিয়ে এসেছিল, সেখান দিয়েই বেরিয়ে গেছে

হয়তো। ওর স্নোম্যান তো রেডি হয়ে গেছে। ওই দেখুন বরফের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। বেশ ভালোই করেছে।

কী! কোথায়? কোথায় স্নোম্যান?

বুঝতে পারলাম প্রফেসর খেয়াল করে দেখেননি। আসলে বাইরে আকাশ তখন পেঁজা তুলোর মতো নেমে আসা বরফের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। দিনের আলো প্রায় নিভে গেছে। একই সঙ্গে মাঝেমধ্যে হাওয়ার প্রবল দাপট। দূরে যদ্দুর দেখা যাচ্ছে শুধু পুরু বরফের চাদর। তার সঙ্গে মিশে গেছে স্নোম্যান। দূরে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে এদিকে এগিয়ে আসছে অবরোহী কালো মেঘ। তার মাঝেই আকাশের গায়ে এক ঝাঁক হাঁসে লেখা সান্ধ্যলিপি ফুটে উঠে দূরে মিলে যাচ্ছে।

তিনটে বরফের বল। পরপর রাখা। মাঝেরটার সঙ্গে আবার গাছের ডাল দিয়ে দু'দিকে দুটো হাত করা হয়েছে। বেশ ভালোই হয়েছে। খুব সম্ভবত লেন্সের খাপ বা বড় কালো বোতাম জাতীয় কিছু জিনিস দিয়ে চোখ করা হয়েছে। গাজরের মতো কিছু একটা দিয়ে নাক করা হয়েছে। আর জামার বেশ কয়েকটা বোতাম লাগিয়ে ঠোঁট করা হয়েছে। মুখে যেন একটা মিষ্টি হাসি লেগে আছে। ছেলেটার মাথায় যে টুপিটা ছিল সেই টুপিটা বসানো রয়েছে স্নোম্যানটার মাথায়। একটা মাফলার বেঁধে দেওয়া হয়েছে স্নোম্যানের গলায়। দেখে ঠিক আট-নয় বছরের একটা ছেলের মতোই মনে হচ্ছে।

খেয়াল করিনি কখন প্রফেসর আবার চশমা পরে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। অবাক চোখে তাকিয়ে আছেন স্নোম্যানের দিকে। খুব গভীরভাবে লক্ষ করছেন। চোখে বিস্ময়, ভয় মেশানো একটা দৃষ্টি। বিড়বিড় করে কী যেন বলে উঠলেন। অ্যারিয়েল...অ্যারিয়েল।

এই কথাটা কানে এল। কিন্তু কিছু বুঝতে পারলাম না।

প্রফেসর, কিছু বললেন?

না, না। তোমাকে নয়। অদ্ভুত। খুব অদ্ভুত। ঠিক একইরকম টুপি। ক্যাম্পের টুপি। এমনই বয়স। একইরকম রোগা চেহারা। একই রকম হাইট।

কোনটা? ওই স্নোম্যানের নীল-খয়েরি ডোরাকাটা টুপিটা। আপনি কারো সঙ্গে মিল পেলেন নাকি? আমি তাঁর দিকে দৃষ্টি মেলে প্রশ্ন করলাম।

না, না, সেরকম কিছু নয়। মনের ভুল হয়তো। তবে এরকম টুপি ও পরত।

কে?

অ্যারিয়েল।

কে অ্যারিয়েল?

বলছি। পরে ওর কথা বলছি। একটু বাদে বলছি।

প্রফেসর সোফায় ওয়াইনের গ্লাসটা নিয়ে খানিকক্ষণ বসে রইলেন। কোনও কথা বলছেন না। যেন কোন এক গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছেন ধীরে ধীরে।

এই নীরবতা কাটানোর জন্য আমি খানিকবাদে অন্য প্রসঙ্গ তুললাম, আচ্ছা, হিটলারের এই উত্থানের মূল কারণ কী ছিল বলে মনে হয় আপনার?

আচ্ছা, এই অ্যারিয়েল কে? প্রফেসর হঠাৎ করে কেন বললেন ওর নাম? অনিলিখাদির কথার মাঝে তন্ময় বলে উঠল।

অনিলিখাদি মুচকি হেসে উঠে দাঁড়াল। উঠেই বলল, আজকের গল্পের এখানেই ইতি। বাকিটা পরের সপ্তাহে। শর্ত ভাঙা হয়ে গেছে। বলেছিলাম কোনও কথা বলা চলবে না।

আমরা সবাই হাই হাই করে উঠলাম। বিশ্বজিৎদা তো পারলে তন্ময়কে এই মারে কি সেই মারে। কিন্তু অনিলিখাদিকে আর থামানো গেল না। মুখ টিপে রহস্যময় হাসি হাসতে হাসতে বলল, পরের শনিবার বিকেল চারটে।

অগত্যা অপেক্ষা।

২

পরের শনিবার বিকেল সাড়ে তিনটেতে আবার আমরা সবাই জমায়েত হয়েছি। অনিলিখাদি ঠিক চারটে বাজতে দশ মিনিট আগে ঢুকল। সঙ্গে আমাদের সবার জন্য মিত্র ক্যাফের ডিমের ডেভিল আর ফিশ ফ্রাই।

তন্ময় বেশ কাঁচুমাচু মুখ করে বসে আছে। আমরা আজ বারবার ওকে সতর্ক করে দিয়েছি।

অনিলিখাদি একদম ঘড়ির কাঁটা মেনে চলে। ঠিক চারটেতে আবার আগের দিনের শর্ত অর্থাৎ কোনো কথা বলা যাবে না মনে করিয়ে দিয়ে শুরু করল।

হ্যাঁ, যা বলছিলাম। হিটলারের উত্থানের মূল কারণ সম্পর্কে প্রফেসরের মতামত জিগ্যেস করলাম।

উনি বললেন, আসলে তাঁর মধ্যে একটা আদর্শ ছিল। উনি জার্মানিকে সত্যি ভালোবাসতেন। সততা ছিল। অসম্ভব ভালো নেতা ছিলেন। এমন আবেগের সঙ্গে কথা বলতেন যে সবাই মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনত। এমন একটা ম্যাজিকের মতো স্পেল তৈরি করতেন যে সবাই তাঁর উপরে খুব তাড়াতাড়ি আস্থা গড়ে তুলতে পারত। মনে হতো এই লোকটার হাতে জার্মানির দায়িত্ব নিশ্চিন্তে তুলে দেওয়া যায়। তাঁর চিন্তাধারা আমরা আজ ভুল বলতে পারি, কিন্তু সেটা সেসময়ে অনেক

জার্মানের চিন্তাধারার সঙ্গে মিলে গিয়েছিল।

কীরকম?

ভাবতে পারো প্রথম বিশ্বযুদ্ধে হারার পরে জার্মানিকে কী শর্ত মেনে নিতে হয়েছিল। শুধু জায়গা নয়, আমাদের অনেক স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। এটা করতে পারব না, ওটা করতে পারব না। আমরা সেই অপমানের ছায়ায় বড় হয়েছি। সেই অপমান আমার মতো অনেকেই মেনে নিতে পারেনি। হিটলার যখন অস্ট্রিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, পোল্যান্ড, ডেনমার্ক, নরওয়ের পরে ১৯৪০ সালের মে মাসে ফ্রান্সের একটা বড় অংশ জিতে নিয়েছিলেন, অনেকেই সেটা সঠিক বদলা বলে মনে করেছিল। জার্মানিবাসীর কাছে তিনি প্রায় দেবতার আসনে পৌঁছে গিয়েছিলেন।

হিটলারের জনপ্রিয়তা তখন আকাশছোঁয়া। সবার ধারণা জার্মানিকে হারানোর মতো শক্তি কোনো দেশের নেই। যখন উনি কোথাও যেতেন, লোকে পাগলের মতো একবার শুধু চোখের দেখা দেখতে চাইত। আর বলে উঠত, হাইল হিটলার।

লক্ষ করলাম, প্রফেসার যেন বহুদিনের অভ্যেসমতো হাত সামনের দিকে করে বলে উঠলেন, হাইল হিটলার!

আচ্ছা, ইহুদিদের ওপরে এত আক্রোশের কারণ কী ছিল বলে আপনি মনে করেন?

শুধু শুধু কী আর এসব হয়? নিশ্চয়ই কিছু কারণ থাকে। ওদের কেমন যেন অদ্ভুত গোঁফদাড়ি থাকত। দেখলেই মনে হতো গুন্ডা-বদমায়েশ। কোনো পরিশ্রমের কাজই করত না। অকর্মণ্যের মতো আরামের জীবন যাপন করত। ওদের মধ্যে যারা ব্যবসা করত নিজেদের জার্মান বলে মনেই করত না। ছোটখাটো ব্যাপারে ঠকাত। তাছাড়া জার্মানিতে থাকার কী অধিকার ছিল ওদের? সবই ছিল বহিরাগত। অথচ ওদের হাতেই ছিল টাকা, জার্মানির অর্থনীতি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির হারের পিছনে ওরাই দায়ী ছিল। ওরা সবসময় জার্মানির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করত।

আমি সত্যি অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম প্রফেসরের মুখে থেকে বার হওয়া প্রতিটা কথা শুনে। এত বছর বাদেও ওঁর মনের গভীরে কোথাও যেন ক্ষোভ জমে আছে ইহুদিদের উপরে। অথচ উনি এত বছর আমেরিকা ইংল্যান্ডে থেকেছেন। নিশ্চয়ই অনেক ইহুদির সঙ্গে কাজও করেছেন।

আরও বেশ কিছু কথা বলে গেলেন প্রফেসর ওদের সম্বন্ধে। যেন খানিকটা ইহুদিদের উপরে হওয়া অত্যাচারকে এখনো সমর্থন করেন তিনি। লক্ষ করছিলাম কথা বলার সময় মাঝে মাঝে বেশ উত্তেজিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ছিলেন তিনি আর পায়চারি করছিলেন।

আমি এবারে সোজাসুজি প্রশ্ন করলাম, আপনি কি আউসউইৎজ কনসেন্ট্রেশন

ক্যাম্পের মতো ক্যাম্পকে সমর্থন করেন? তাদের সমর্থন করেন, যারা লক্ষ লক্ষ ইহুদিকে, রাশিয়ারও আরও নানান দেশের যুদ্ধবন্দীদের গ্যাস চেম্বারে বা ফায়ারিং স্কোয়াডের গুলিতে মেরে ফেলেছিল? আপনি কী সেটা সমর্থন করেন?

না, না, কখনোই না। যেন খানিকটা ধরা পড়ে গেছেন এমনভাবে তাঁর আগের কথার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে ফের বলে উঠলেন, আমি একেবারেই সেটা বলছি না। তবে এটুকু বলতে পারি,সঙ্গত কারণে অনেক জার্মান ওদের ওপরে খুশি ছিল না। অনেকের ধারণা ছিল যে, ১৯৩১-এ জার্মানির অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের জন্যও ওরাই দায়ী ছিল। ওরা কখনোই জার্মানিকে ভালোবাসেনি, নিজের দেশ বলে মনে করেনি। ওরা শুধু ভালোবাসত নিজেদেরকে। ভালোবাসত আমেরিকাকে। কোনও দেশেই ওদের সুনাম ছিল না। সেটা কী অস্ট্রিয়া, কী স্লোভাকিয়া, কী ফ্রান্সে। ওরা সব জায়গাতেই ছিল বহিরাগত।

বাইরে ইতিমধ্যে অন্ধকার হয়ে এসেছে। তবু তখনও মাতাল বরফের উচ্ছ্বাস ভেসে বেড়াচ্ছে। বাগানের আলোয় যেটুকু দেখা যায়, সব ঘাসজমি সাদা বরফের তলায় আত্মগোপন করেছে। যেন কেউ সাদা গ্লুকোজ ঢেলে দিয়েছে চারদিকে। সে বরফ যেন মাটিতে পড়ে থাকা জোনাকির মতো চিকচিক করে উঠছে চাঁদের আলোয়।

অনেকক্ষণ গল্প করছি। আমার অল্প কিছু কাজ ছিল। কয়েকটা ফোন করার দরকার ছিল। গল্পে কিছুক্ষণের বিরতি দিয়ে ফ্রেশ হয়ে ঘণ্টা দুয়েক বাদে ফিরে এসে দেখি প্রফেসরের সামনে তিনটে ফাঁকা ওয়াইনের বোতল পড়ে আছে। তার মানে উনি এতক্ষণ এখানেই ছিলেন।

প্রফেসরের কথামতো একটু তাড়াতাড়িই ডিনার টেবিলে বসে পড়লাম দুজনে। রান্না সব করাই ছিল। মাশরুম চিজ, বেকড স্যালমন আর চিকেন রোস্ট। একটু গরম করে খেয়ে নিলাম।

ফের স্টাডিরুমে আমরা যখন ফিরে এলাম, তখন সন্ধে আটটা।

এই শীতের সন্ধেগুলো যে কী অসহ্য হয়। যেন শেষ হতেই চায় না। ভাগ্যিস তুমি সঙ্গে ছিলে। তা না হলে মনে হচ্ছিল যেন চারদিক থেকে কে আমাকে লক্ষ করছে। সবাই যেন মোমবাতির শেষ আলোর মতো আমার নিভে যাওয়ার অপেক্ষায় আছে। যেন একটু ভয়ে ভয়েই কথাগুলো বললেন প্রফেসর।

তারপর দাঁড়িয়ে উঠে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে শুরু করলেন তিনি। পায়চারি করতে করতে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, এভাবেই মাঝেমধ্যে হেঁটে নিজেকে সুস্থ রাখার চেষ্টা করি।

পরক্ষণেই কাচের দরজার দিকে গিয়ে পর্দা সরিয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে

কী যেন লক্ষ করলেন। সেদিক থেকে চোখ না সরিয়েই বলে উঠলেন, আচ্ছা অনিলিখা, ওই ছেলেটা কি ওখানেই ছিল? অনেক কাছে চলে এসেছে, তাই না? আমি ঠিক স্পষ্ট দেখতে পাই না দূরের জিনিস। কিন্তু সেরকমই যেন মনে হচ্ছে।

কোন ছেলেটা? সে তো কখন চলে গেছে! কথাটা বললাম বটে, তবুও কেমন কৌতূহল হতে সোফা থেকে উঠে দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম। কাচের দরজা দিয়ে বাইরের দিকে ভালো করে লক্ষ করেও সেই ছেলেটাকে দেখতে পেলাম না।

না, না, আমি ওর তৈরি করা ছেলেটার কথা বলছি।

বুঝতে পারলাম উনি স্নোম্যানটার কথা বলছেন। কিন্তু ছেলে-ছেলে করে বলছেন কেন?

কী অদ্ভুত প্রশ্ন! সে আবার কী করে কাছে চলে আসবে! কাচের দরজা দিয়ে ফের বাইরের দিকে তাকালাম। বাগানে আলো জ্বলছে। চাঁদ উঁকি মারছে পাইনের জঙ্গলের মাথার ওপর দিয়ে। বরফ পড়াটা অনেকটাই কমে এসেছে। বরফের ওপরে চাঁদের আলো বিচ্ছুরিত হয়ে চারদিকটা বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। অলৌকিক জোছনা যেন বরফের উপরে একমনে কোনো রূপকথা লিখছে।

স্নোম্যান একইভাবে দিব্যি দাঁড়িয়ে আছে। একই জায়গায়। অন্তত এত দূর থেকে সে কাছে এগিয়ে এসেছে কিনা তা বোঝা যাচ্ছে না।

আচ্ছা, ডানহাতটা কি ওরকমভাবে ছিল?

কী রকম?

যেরকম ডানহাতটা এগিয়ে আছে। মনে হয় যেন এদিকে নির্দেশ করছে।

ঠিক নির্দেশ না করলেও এটা ঠিক যে স্নোম্যানটার ডান হাতটা একটু এগিয়ে আছে। একটা আধভাঙা ডাল লাগিয়ে রাখায় মনে হচ্ছে যেন তর্জনী তুলে আমাদেরকে নির্দেশ করছে। তবে আগে সেরকম ছিল কী ছিল না, তা আমার মনে নেই। বাইরে এতক্ষণ ধরে যা হাওয়ার দাপট চলেছে, তাতে করে বেঁকে যাওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু প্রফেসরের এরকম উদ্ভট চিন্তার কারণ কী? স্নোম্যানের তো আর সত্যি সত্যি হাত-পা গজিয়ে যায়নি।

উনি তবু কেন জানি না বিশ্বাস করলেন না। আমাকে আবার বললেন, অনিলিখা একটু লক্ষ করো তো! এগিয়ে আসে কিনা।

বুঝলাম প্রফেসরের ওয়াইনের মাত্রাটা বেশি হয়ে গেছে। আমি তাঁকে এবার মদ্যপান করতে বারণ করলাম। তবু তিনি আমার কথা না শুনে ফের সোফায় বসেই ওয়াইনে চুমুক দিলেন। আমি রান্নাঘর থেকে আমার জন্যে চা আর ওঁর জন্যে জল নিয়ে এসে বসলাম।

বেশ বড় চাঁদ উঠেছে। দূরে গাছের মাথার কিছুটা ওপরে এখন। আস্তেআস্তে

নেমে আসবে। কিন্তু তার আলোর স্বরলিপিতে যেন বরফের চাদরের উপরে এক অজানা সুরেলা মায়াবী পরিবেশ তৈরি হয়েছে। মনে হচ্ছে কোনো জাদুকর যেন সাদা রঙে চারদিক মুড়ে ফেলে স্টেজে আলো ফেলে ম্যাজিক দেখাচ্ছে।

এ যেন অপার্থিব দৃশ্য। যেন অন্য কোনো গ্রহের মাটিতে বসে আছি। অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। প্রফেসরের প্রশ্নে আবার বাস্তবে ফিরে এলাম।

হিমলারের নাম শুনেছ? আমি তাঁর সঙ্গে কাজ করেছি।

বুককেস থেকে একটা বই হাতে নিয়ে বসে পাতা ওল্টাচ্ছিলাম। চমকে ঘাড় ঘোরালাম। একী বলছেন প্রফেসর।

হাইনরিখ হিমলার? যিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নাৎসিদের এস এস গার্ডদের প্রধান, পুলিশ প্রধান ছিলেন। সিক্রেট পুলিশ গেস্টাপো যার অধীনে ছিল! যিনি পোল্যান্ডে কনসেনট্রেশন ক্যাম্প তৈরি করেছিলেন? যিনি লক্ষ লক্ষ ইহুদিদের মারার পিছনে মূল কারিগর ছিলেন! সেই হিমলার?

হ্যাঁ, সেই হিমলার। চুপ করে বসে রইলেন প্রফেসর।

আমি কী বলব বুঝতে পারছিলাম না। বুঝতে পারছিলাম ওই একটা নাম উল্লেখ করে সভ্যতার সব লক্ষ্মণরেখা উল্লঙ্ঘন করে দিয়েছেন প্রফেসর। এর পরে কী বলা উচিত বুঝতে পারছিলাম না।

মনের মধ্যে একটা রাগ পুঞ্জীভূত হচ্ছিল। গত শতকের সব থেকে ঘৃণ্য একজন লোকের নাম হল হিমলার। ইহুদিদের উপরে ঘৃণা, অত্যাচারের মূলে ছিল হিমলার। বিশ্বাস করতেন জার্মানরা অন্য সবার থেকে উন্নত জাতি। এস এস গার্ডদের সেভাবে নির্বাচন করতেন তাদের বংশপরিচয়, চোখের রং, গায়ের রং, চুল, উচ্চতা দেখে। ইহুদিদের উপরে, শারীরিক প্রতিবন্ধীদের উপরে, পরাজিত যুদ্ধবন্দীদের ওপরে অকথ্য অত্যাচারের মূলে ছিলেন এই হিমলার। হিটলারের খুব কাছের লোক ছিলেন।

বিশ্বাস হচ্ছিল না প্রফেসর হিমলারের সঙ্গে কাজ করেছেন। সেক্ষেত্রে উনি এখানে জেলের বাইরে বসে আছেন কী করে?

একটু অবিশ্বাস নিয়ে প্রশ্ন করলাম, ওঁর সঙ্গে কাজ করেছেন মানে? কী ধরনের কাজ?

প্রফেসর কিছুক্ষণ কোনো উত্তর দিলেন না। মনে হল যেন একটু দ্বিধা করছেন। তারপর আসছি বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

প্রায় আধঘণ্টা বাদে ফিরে এসে ঘরের দেওয়ালে লাগানো আলো আর স্ট্যান্ডিং ল্যাম্পের আলো নিভিয়ে দিলেন। শুধু একটা মোমবাতির আলো জ্বলছিল এক কোণে। ফায়ার প্লেসের আগুন এ পরিবেশে উষ্ণতা বাড়ানোর ব্যর্থ প্রয়াস করছিল মাত্র। মনে হল, এই আধো অন্ধকারে লুকিয়ে থেকে উনি নিজেই নিজের সঙ্গে কিছু কথা বলতে চান। মনের সেই জোরটুকু পাওয়ার জন্যই যেন উনি

কিছুক্ষণ ধরে চেষ্টা করছেন।

আমি নাৎসি অফিসার হিসেবে কিছুদিন কাজ করেছিলাম। আসলে আমার মনেও হয়তো ইহুদিদের ওপরে বিতৃষ্ণা ছিল। তবে ঘৃণা ছিল বলব না। মনে করতাম ওরা অনেক নীচু জাত, সুবিধেবাদীর জাত। ওদের জন্যই জার্মানির এই অবস্থা। ওদের শত্রু মনে করতাম। অবশ্য আমি উগ্রবাদী ছিলাম না। গান ফ্যাক্টরির দায়িত্বে ছিলাম। আমার কাজ ছিল ওদের আর অন্য যুদ্ধবন্দীদের দিয়ে কাজ করানো। লক্ষ রাখা যাতে সবথেকে বেশি উৎপাদন সম্ভব হয়। যুদ্ধে জোগান দেওয়ার জন্য বন্দুক, গোলা-গুলির খুব দরকার ছিল। সে সময় জার্মানির আর্মামেন্টস মিনিস্টার কে ছিল জানো?

কে?

অ্যালবার্ট স্পিয়ার। হিটলারের ইনার সারকেলের সবথেকে কাছের লোক।

উনি খুব ভালো আর্কিটেক্ট ছিলেন শুনেছি।

ঠিক বলেছ। খুব ভালো আর্কিটেক্ট ছিলেন। একইসঙ্গে হিটলারের ঘনিষ্ঠতম বন্ধু। আসলে হিটলারের স্থাপত্যবিদ্যার বিষয়ে খুব আগ্রহ ছিল। সেজন্য গভীর বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল ওদের মধ্যে। নাৎসি জার্মানির সব আইকনিক বিল্ডিং স্পিয়ারই তৈরি করেছিলেন।

উনিই প্রথম টোটাল ওয়ার ইকনমির কথা বলেন। বলেন অন্য সব অনাবশ্যক জিনিস তৈরি বন্ধ করে শুধুই যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী তৈরি করার কথা। কিন্তু শুরুতে হিমলার ও নাৎসিদের একটা বড় অংশ 'টোটাল ওয়ার ইকনমি'র সপক্ষে ছিলেন না। ১৯৪৩ সালে এটা করা হয়। এই দেরির জন্য পরে জার্মানিকে অনেক ভুগতে হয়। এটা খুব বড় ভুল ছিল। ১৯৪০ সালেই যদি এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হতো যুদ্ধে বোমা, বন্দুক, গোলাগুলির এত অভাব হতো না।

আপনি স্পিয়ারকে চিনতেন?

হ্যাঁ, চিনতাম। উনিই আমাকে ওই গান ফ্যাক্টরির অধিকর্তার দায়িত্ব দেন। তবে সেসময় নাৎসি কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে কী হচ্ছিল জানা ছিল না। আউসউইৎজ কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের কাছেই ছিল আমার এই গান ফ্যাক্টরি। ক্যাম্প থেকে ওদের অনেককে শ্রমিক হিসেবে নিয়ে আসা হতো।

তাই? কিন্তু তার পরেও ক্যাম্পের ভেতরে কী হচ্ছে, সে কথা জানতেন না?

না, কোনো তথ্যই জানতাম না। শুধু জানতাম ওরা ওই ক্যাম্পে থাকে। এ বিষয়ে আমার সঙ্গে ওদের কোনো কথা হতো না। কিছু যোগাযোগও ছিল না। ওরা ছিল শুধুই আমার ফ্যাক্টরির শ্রমিক। আমার অত খোঁজ-খবরে কী দরকার! যাক সে কথা।

প্রফেসর একটু থেমে বললেন, আমরা অন্য প্রসঙ্গে যাই। ইদানীং আমাকে একটা জিনিস বড় ভাবাচ্ছে। জীবনের শেষ দিন যত কাছে আসছে, মনে হচ্ছে কিছুই যেন করে যেতে পারলাম না। অনেক প্রশ্ন থেকে গেল। অনেক বেসিক প্রশ্ন যার উত্তর খুঁজে পেলাম না। এই যে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড তার অর্ধেক জুড়ে শুধু শূন্যতা। সেখানে কিছুই নেই। মনে হয় সে শূন্যতা যেন আমার জীবন জুড়েও।

বুঝতে পারলাম প্রফেসার কিছু একটা বলতে গিয়ে বললেন না। হয়তো জানেন, বললে বিপদ হতে পারে।

তবুও আমি একটা চেষ্টা করলাম। আপনি খানিক আগে অ্যারিয়েলের কথা বললেন। তাকে কী ওই স্নোম্যানের মতো দেখতে ছিল।

ঘরের মধ্যে পায়চারি করছিলেন। হঠাৎ আমার প্রশ্ন শুনে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে গেলেন। তারপরে ঘরের আলো-আঁধারিতে যেন নিজের ছায়ার আড়াল থেকে বলে উঠলেন, অ্যারিয়েল? হ্যাঁ, ওকে ঠিক ওই স্নোম্যানের মতোই দেখতে ছিল। সেদিনটা মনে আছে। ১৯৪২ সাল আগস্ট মাস। ফ্রান্সের ড্রান্সি থেকে এসেছিল ও। একা। যেদিন ওই ট্রেনটা এল ক্যাম্পে, সেদিন আমি ওখানে ছিলাম।

ট্রেনের ওয়াগনের মধ্যে থেকে যখন ওই ইহুদিরা বেরোচ্ছিল, সে যে কী অদ্ভুত দৃশ্য কী বলব! মনে হচ্ছিল একটা লাগেজ ভর্তি ট্রেনের দরজা যেন হঠাৎ করে খুলে গেছে। তার থেকে সব লাগেজ একের পর এক হঠাৎ করে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হচ্ছে রাস্তায়। কী করে যে অত লোক ওই সব ওয়াগনে দু-দিন ধরে বোঝাই ছিল কে জানে? তার মধ্যে অ্যারিয়েলও ছিল।

চারদিকে তখন রাইফেল হাতে এস এস গার্ড, ট্রেনে আসা বিধবস্ত ইহুদি নারী-পুরুষ, কান্না, চিৎকার, চেনে বাঁধা হিংস্র কুকুরের গর্জন। নিশ্চিত মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে থাকা সেই ভিড়ের মধ্যে দেখি ওই বছর ছয়েকের একটা বাচ্চা ছেলে।

আরও অনেকে ছিল। কিন্তু ও যেন এক অন্য পৃথিবী থেকে এসেছে। ওর ওই ঔদাসীন্য, ওর ওই নিষ্পাপ দৃষ্টি সবার থেকে আলাদা। ও সবার মুখের দিকে তাকিয়ে ওর মা-বাবা-বোনকে খুঁজছিল। ভেবেছিল ট্রেন থেকে নামার পরেই ওদের সঙ্গে দেখা হবে। আমি দূর থেকে দেখছিলাম। সমুদ্রের বড় ঢেউয়ে ভেসে আসা একটা ছোট ঝিনুকের মতো মনে হয়েছিল ওকে।

পরে ওর কাছ থেকে জেনেছিলাম ওকে অন্য এক ক্যাম্পে ধরে আনা হয়েছিল অনেক মাস আগেই।

কেন জানি আজ ওর কথা মনে হল ওই স্নোম্যানটা দেখে। ওর মতো টুপি। ওর মতো চেহারা। সব সময়ে চারদিকের হিংসা-উত্তেজনার মধ্যেও ওর মুখে একটা মিষ্টি হাসি লেগে থাকত। এর হাসিও যেন ঠিক সেরকম।

প্রফেসর কথা বলতে বলতে আবার জানলার কাচের সামনেটায় গিয়ে দাঁড়িয়েছেন।

হঠাৎ চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, অনিলিখা ওই দেখো স্নোম্যানটা আরও অনেক কাছে চলে এসেছে। দেখো দেখো।

আমি লক্ষ করলাম প্রফেসরের মুখে একটা স্পষ্ট ভয়ের ভাব ফুটে উঠছে ধীরে ধীরে।

আমি তাড়াতাড়ি করে উঠে দরজার কাছে গেলাম। অবাক হয়ে বলে উঠলাম, সত্যি, তাই তো। মনে হচ্ছে যেন কয়েক হাত এগিয়ে এসেছে স্নোম্যানটা! এত কাছে তো ছিল না।

আর ইউ শিওর? আমি ভাবছিলাম চোখের ভুল। ঠিক দেখেছ।

কোনো রিজনেবল এক্সপ্ল্যানেশন হয় না। কিন্তু সত্যি মনে হচ্ছে বেশ খানিকটা এগিয়ে এসেছে ওটা। হাতটাও যেন আরও স্পষ্ট করে বাড়ির দিকেই নির্দেশ করছে।

প্রফেসরের মুখ ভয়ে একেবারে পাংশু হয়ে গিয়েছে।

এর পরে যেটা করলেন সেটার জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিলাম না।

রিডিং রুমের কাচের দরজা চাবি দিয়ে খুলে ফেললেন। খুলতেই একটা কনকনে ঠান্ডা হাওয়ার ঝাপটা ঘরের মধ্যে এসে ঢুকল।

কিন্তু কোনো দিকে কোনো রকম ভ্রুক্ষেপ না করে ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে গেলেন তিনি। বরফের পুরু চাদর পেরিয়ে এগিয়ে গেলেন বাগানের দিকে। পাথরের লনটা পেরিয়ে গেট খুলে বাগানে ঢুকে গেলেন।

খুব কাছে গিয়ে ভালো করে দেখলেন স্নোম্যানটাকে। চারদিক দিয়ে দেখলেন। তারপর গেটের কাছে পড়ে থাকা একটা ভাঙা ডাল নিয়ে এগিয়ে গেলেন স্নোম্যানটার দিকে। ওটাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করলেন। কিন্তু বরফের ভারী বলগুলো এমনভাবে একটার উপরে আরেকটা বসে ছিল যে দুর্বল হাতে ফেলতে পারলেন না। শেষে রেগে গিয়ে হাতের ডালটা দিয়ে স্নোম্যানটার হাতের উপরে ধাক্কা দিতে লাগলেন। দু-তিন বার করার পরে স্নোম্যানটার দুটো হাতের ডাল আর বরফের খানিকটা অংশ ভেঙে পড়ল। দূর থেকেই বুঝতে পারলাম উনি যেন উত্তেজিত হয়ে কীসব বলে উঠলেন। খুব সম্ভবত জার্মানে। তারপর আবার ঘরের ভিতর ফিরে এলেন।

ওঁর লং কোটের ওপরে আর চুলে বরফের কুচি লেগেছিল। উনি এসে সোজা বাথরুমে চলে গেলেন। আমি ইতিমধ্যে কাচের দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। তা না হলে বরফের ঝাপটা ইতিমধ্যে ঘর বেদখল করে নিত।

আমি বুককেসের বইগুলো নেড়েচেড়ে দেখছিলাম। সত্যি কথা বলতে কী, ওঁর নাৎসি যোগাযোগের কোনো প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায় কিনা

দেখছিলাম। যে-কোনও সময়ে ফিরে আসতে পারেন। তাই একইসঙ্গে সেটাও খেয়াল রাখছিলাম।

একটা বুককেসের সামনে কিছু নতুন বইয়ের আড়ালে পিছনে বেশ কিছু পুরোনো বইয়ের সারি দেখতে পেলাম। চামড়ায় বাঁধানো। সেরকম একটা বই নেড়েচেড়ে দেখতে গিয়ে ভেতরে একটা সাদা-কালো ছবি চোখে পড়ে গেল।

ছবির উপরে ছোট করে লেখা ছবির তারিখ, ছবির স্থান। ওয়ানসী নদী, বার্লিন, ২০ জানুয়ারি, ১৯৪২। ছবির মধ্যে প্রফেসরকে প্রথমটায় ঠিক ঠাহর করে উঠতে পারলাম না। অনেক কম বয়স তখন। চশমা পরা উজ্জ্বল চোখ দেখে ঠিক চেনা যায়।

ছবিতে রাইনহার্ড হাইডরিখকে চেনা যাচ্ছে, যিনি হিমলারের ডান হাত ছিলেন। এই রাইনহার্ড ইহুদিদের ওপরে অত্যাচারের মূল কাণ্ডারী ছিলেন। নাৎসি সিকিউরিটি সার্ভিসের প্রধান ছিলেন তখন। যদ্দুর জানি ওই মিটিংয়ে শুধু নাৎসি পার্টির উচ্চপদস্থ সদস্যরাই ছিলেন। ওই মিটিংয়ে ফাইনাল সলিউশনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ক্যাম্পে কীভাবে ইহুদিদের, যুদ্ধবন্দীদের মারা হবে সে বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয় এখানে। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, ইউরোপের কোনো ইহুদিকে বাঁচতে দেওয়া হবে না।

এর আগে নাৎসিরা কীভাবে মাস-মার্ডার করা যায়, তার বিভিন্ন উপায় নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছিল। ফায়ারিং স্কোয়াড দিয়ে বেশ কিছু সংখ্যক লোককে মারা হলেও তা লক্ষ লক্ষ মানুষকে মারার জন্য উপযুক্ত ছিল না।

তা ছাড়া নাৎসি বাহিনীর মধ্যে অনেকের মত ছিল যে, এভাবে সামনাসামনি বাচ্চা-বুড়ো-মহিলা সবাইকে গুলি করে মারলে তা নাৎসি বাহিনীকে আস্তে আস্তে পশু করে তুলবে। তারা নিজেদের ক্ষমা করতে পারবে না। মানসিক দিক দিয়ে বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। প্রয়োজন ছিল উন্নততর মাস-মার্ডারের উপায়ের যেখানে রক্তপাত কম হবে। গ্যাস চেম্বারে বিষাক্ত গ্যাসের মাধ্যমে মারার সিদ্ধান্ত এখানেই ঠিক করা হয়।

কিন্তু প্রফেসর কী এই দিন এখানে ছিলেন? তাহলে আমি যদ্দুর জানি ওঁর অপরাধ লঘু হতে পারে না। এর একটাই অর্থ হতে পারে যে উনি অনেক কিছুই জানতেন। কারণ সে দিনেই এখানে সিদ্ধান্ত হয়েছিল সব ইহুদিদের যেন তেন প্রকারেণ মেরে ফেলার। ফোনে ছবিটা স্ক্যান করে একটা কপি করে নিয়ে বইয়ের মধ্যে যথাস্থানে রেখে আমি আবার চেয়ারে এসে বসলাম।

আধ ঘণ্টা বাদে উনি ফিরে এলেন। ফায়ার প্লেসের সামনে এসে বসে পড়লেন। একটু যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন গত আধঘণ্টার উত্তেজনায়।

যেন কিছুই বুঝতে পারছি না এমনভাবে বললাম, হঠাৎ করে এত উত্তেজিত হয়ে পড়লেন?

একটু থেমে দম নিয়ে বললেন, হ্যাঁ, একটু ছেলেমানুষি হয়ে গেছে। এ তো স্নোম্যান ছাড়া কিছুই নয়। দেখলে তো ধাক্কা দিতেই কীরকম হাত ভেঙে গেল। কেউ হতেই পারে না। কেউ নির্ঘাত চালাকি করে সামনে নিয়ে আসছে বা হাওয়ায় হয়তো এগিয়ে এসেছে। যেরকম হাওয়ার দাপট!...বলে থামলেন। হয়তো বলেই বুঝতে পারলেন ওঁর এই কথাটার মধ্যে কোনো যুক্তি নেই। একটা কুড়ি কেজির স্নোম্যান হাওয়াতে কীভাবে এগোবে?

ফের বলে উঠলেন, অ্যারিয়েল আবার কোথা থেকে আসবে? তবে হ্যাঁ, অনেক মিল আছে। ঠিক সেরকম মুখে হাসি। সেরকম চোখ। সেই দৃষ্টি।

আমি চুপচাপ ওনাকে লক্ষ করে যাচ্ছিলাম।

বাইরে ইতিমধ্যে বরফের ঝড় যেন আরও বেড়েছে। বেশ জোরে আওয়াজ হচ্ছে। মাঝে কমে এসেছিল। তুলোর আড়ালে আবার সারা আকাশ মুখ ঢেকেছে। গ্র্যান্ড ফাদার ক্লক গম্ভীর স্বরে ন'বার বেজে উঠল। দূরে বোবা হয়ে থাকা অন্ধকারের মধ্যে এক গির্জার ক্ষীণ ঘণ্টাধবনি ভেসে এল।

আমি বইয়ের সারি থেকে একটা গল্পের বই নিয়ে বসে পড়তে শুরু করলাম। প্রফেসরও একটা ম্যাগাজিন হাতে নিয়ে মন দিয়ে পড়তে শুরু করলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ নিয়ে, অ্যারিয়েল নিয়ে বেশ কিছু প্রশ্ন করার ইচ্ছে থাকলেও করলাম না। জানি উনি নিজেই বলতে বাধ্য হবেন। এই রাত, এই অন্ধকার, এই স্নোম্যান ওঁর ভেতরের অনেক কথা বার করে আনবে। এই নীরবতা ওঁর সহ্য হবে না।

ঠিক সেটাই হল।

কিছুক্ষণ বাদে উনি নিজের থেকেই বলে উঠলেন, হিটলারের স্বপ্ন ছিল 'জার্মানিয়া' পুরো বিশ্বের রাজধানী হবে। ব্যাবিলনের মতো। আগামী হাজার বছরের জন্য এক উন্নততম মানব সভ্যতা গড়ে তোলা হবে, যার পুরোভাগে থাকবে জার্মানি। কিছু বড় ভুল না হলে সেটা অসম্ভব ছিল না। জার্মানদের 'অ্যাক্সিস পাওয়ার'-এর সঙ্গে পেরে ওঠার মতো শক্তি কারো ছিল না।

শুধু পূর্ব আর পশ্চিমে একইসঙ্গে দুই দিকে জার্মানির পক্ষে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। আরও বেশ কিছু কৌশলগত ভুল হয়েছিল। হিটলার অনেক ভুল লোক নির্বাচন করেছিলেন। যেমন অ্যালবার্ট স্পিয়ার একজন ভালো আর্কিটেক্ট ছিলেন। কিন্তু তাকে করে দিলেন আর্মামেন্টস মিনিস্টার। ভালো বিল্ডিং বানানো আর যুদ্ধের জন্য বন্দুক, গোলাগুলি, কামান, বোমা বানানো তো আর এক কাজ নয়। সেরকম আরও কিছু ভুল করেছিলেন। নিজে সিদ্ধান্ত না নিয়ে উপযুক্ত জেনারেলদের হাতে ছেড়ে দিলে অনেক ভালো হতো।

কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই চাননি হিটলার জিতুক। সেটা বিশ্বের জন্য নিশ্চয়ই মঙ্গল হতো না। প্রফেসরকে উত্তেজিত করার জন্যই এই কথার চালটা দিলাম।

কেন? কে বলল সেকথা? আমার তো অন্যরকম মনে হয়। হিটলার জিতলে, ওর নেতৃত্বে জার্মানি থাকলে, সারা বিশ্ব আরও অনেক দূর এগোতে পারত। জার্মানি আজ আমেরিকার জায়গায় থাকত। তখন আমরা শুধু বাছাই করা সেরা লোকদের ক্ষমতায় পেতাম। আজকের মতো অনুপযুক্ত লোকদের হাতে ক্ষমতা থাকত না।

অবাক হলাম প্রফেসরের মনোভাবে। এখনও কি ওঁর মধ্যে সেই জাতিবিদ্বেষ আছে?

আচ্ছা, অ্যারিয়েল এর কথা আপনার এত বিশেষভাবে মনে আছে কেন? ও কী আপনার ফ্যাক্টরিতে কাজ করত?

হ্যাঁ, একটু থেমে বলে উঠলেন প্রফেসর, বলছিলাম না ও এসেছিল ফ্রান্স থেকে ট্রেনে। অন্য অনেকের সঙ্গে। কিন্তু কী যেন একটা অপার্থিব ইনোসেন্স ছিল ওর মুখের মধ্যে। এক অদ্ভুত ম্লান হাসি। বুকের কাছে জাপটে জড়িয়ে ধরে ছিল একটা ব্যাগ। যেন সব সম্পত্তি রাজা-রাজড়ার ধন তার মধ্যে বোঝাই করে এনেছে। ভিড়ের মধ্যে ধাক্কা খেতে খেতে সমানে এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল। পরে জানতে পারি ও নাকি ওর বাবা, মা, বোনকে খুঁজছিল। অনেক পরে সব কথা জেনেছিলাম।

এক বছর আগে মাঝরাতে ওদের প্যারিসের বাড়িতে ফ্রেঞ্চ পুলিশ হানা দেয়। তখন জার্মান সেনাদের আদেশেই ওরা হানা দিয়েছিল। ওদের বলা হয়েছিল সব ইহুদিদের চিহ্নিত করে ক্যাম্পে পাঠিয়ে দিতে।

মা আলাদা হয়ে যাওয়ার আগে ওর হাতে তুলে দিয়েছিলেন ওই ব্যাগটা যার মধ্যে ছিল ওর সব সম্পত্তি, ওর সবসময়ের খেলার সঙ্গী একটা টেডি বিয়ার। উলের একটা ছোট ভালুকছানা। সে রাতের পরে ও আর ওর বাবা, মাকে কোনোদিন দেখেনি। আমি পরে খোঁজ নিয়ে জেনেছিলাম ওদের দুজনকেই মারা হয়েছিল ট্রেবলিঙ্কা ক্যাম্পে। সেটা অবশ্য ওর জানা ছিল না।

সে রাতেই ওকে আর ওর বোনকে নিয়ে যাওয়া হয় ফ্রান্সের ড্রান্সির ক্যাম্পে। তার কয়েক মাস পরে ও ওর বোনকেও দেখেনি আর। তাকেও অন্য কোথাও সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

এর বেশ কয়েক মাস বাদে ওকে ট্রেনে করে নিয়ে আসা হয় ড্রান্সি থেকে পোল্যান্ডের আউসউইৎজ ক্যাম্পে। তখন ওর কতই-বা বয়স হবে। ছয় কী সাত।

ট্রেনের ওয়াগন থেকে নেমে ও যখন ওর বাবা-মাকে ওই ভিড়ের মধ্যে খুঁজছিল, তখন একজন এস এস গার্ড এগিয়ে এসে রাইফেলের খোঁচা দিয়ে ওকে ডান দিকের সারিতে সরিয়ে দেয়। সে সারিতে সরিয়ে রাখার অর্থ আমি জানতাম। ওই সারিতে গেলে তাদের আর কোনোদিন দেখা পাওয়া যায় না। ও

নির্লিপ্তভাবে এগোচ্ছিল ওই সারির দিকে। আমি কাছেই ছিলাম। তখনই এগিয়ে যাই। থামাই ওকে।

ওকে কি গ্যাস চেম্বারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল?

হ্যাঁ, ওটা ছিল তারই সারি। আসলে যাদের দিয়ে কোনো কাজ করানো যেত না, তাদের জায়গা হতো ওই সারিতে। শুধু শুধু তাদের বাঁচিয়ে রেখে লাভ কী? বাচ্চা, বুড়ো-বুড়ি, বিকলাঙ্গ, অসমর্থ লোকদের ওই সারিতে নিয়ে যাওয়া হতো। শক্ত সমর্থ যাদের দিয়ে যুদ্ধের জন্য কোনো দরকারি কাজ করানো যাবে, তাদের অন্য সারিতে নিয়ে যাওয়া হতো। তাদের মধ্যে অনেকেই আসত আমার ফ্যাক্টরিতে কাজ করতে।

এই খানিক আগেই উনি বলেছিলেন যে, ক্যাম্পে কী হতো, সেটা উনি জানতেন না। বুঝতে পারছিলাম উনি অনেক কিছুই জানেন, কিন্তু লুকোচ্ছেন। একই সঙ্গে হয়তো মনের মধ্যে লুকিয়ে থাকা অন্ধকার থেকে উনি আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসতে চাইছিলেন। এ পরিবেশ ওঁকে বলতে বাধ্য করছিল।

আমি বলে উঠলাম, তারপর?

কেন জানি না আমার কেমন মায়া হল। আমি ওকে সেই সারি থেকে সরিয়ে আনলাম। টেনে নিয়ে এসে বললাম, ও আমার ফ্যাক্টরিতে কাজ করতে পারবে। সবাই একটু অবাক হলেও আমার সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানানোর ক্ষমতা ছিল না কারো।

সেই তবে থেকে ওর সঙ্গে আমার আলাপ শুরু হল। ও রোজ আসত আমার ফ্যাক্টরিতে। কিন্তু ও ফ্যাক্টরির কাজ করতে পারবে না, তাই আমার ফাইফরমাশ খাটার জন্য ওকে রেখেছিলাম। এমনকী চুল কাটা, দাড়ি কামানোর কাজও করত। আসলে ওসব কাজ অন্যদের দিয়ে করাতে ভরসা পেতাম না। হাতে ক্ষুর নিয়ে দাড়ি কামানোর সময় কোনো বন্দী কখন যে কী করে! ওর উপরে পূর্ণ ভরসা ছিল।

পরে আস্তে আস্তে ওর প্রতি একটা টান তৈরি হয়ে গেল। বাড়ির লোকের মতো হয়ে গেল। বুঝলে অনিলিখা, একটা বাচ্চা কীভাবে একটা জাতির সম্বন্ধে ধারণা পালটে দেয়। আমি প্রথম যখন অ্যারিয়েলকে দেখেছিলাম, মনে করেছিলাম ওর মধ্যেও তো সেই খারাপ রক্ত আছে। সেই কোনো খারাপ ইহুদির রক্ত। বড় হয়ে ও একইরকম খারাপ হয়ে যাবে।

কিন্তু পরে সে ধারণা অনেকটা বদলে যায়। ওকে আমি পিয়ানো বাজাতেও শিখিয়েছিলাম। বেশ কিছু গল্প পড়ে পড়ে শোনাতাম। লেখাপড়াও শিখিয়েছিলাম। দিনের শেষে ও নিয়ম মতো ফিরে যেত ক্যাম্পে। তবে আমার সঙ্গে দিনের ওই সময়টুকু কাটানোর জন্যে যে ও বাকিটা সময় অপেক্ষা করে থাকে, সেটা বুঝতে আমার অসুবিধে হতো না। আমি হয়ে উঠেছিলাম ওর সব কিছু।

একটা ডুবন্ত মানুষ যেভাবে খড়কুটো যা পায় তাই ধরে বাঁচার চেষ্টা করে, ঠিক সেরকম। হয়ে উঠেছিলাম ওর ঈশ্বর।

প্রফেসার থামলেন।

কাচের দরজার সামনে পর্দা টেনে দিয়েছিলাম। পর্দা সরিয়ে বাইরের দিকে দেখলাম। বরফঝড় শুরু হয়েছে আবার। তার সঙ্গে সঙ্গে স্নোম্যানের ভাঙা হাত যেন আবার আস্তে আস্তে জুড়ে যাচ্ছিল। বরফ এসে জমছিল ওর ভাঙাহাতের ডালের ওপরে। মনে হচ্ছিল হাতটা যেন আবার আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে।

আমি অবাক বিস্ময়ে বলে উঠলাম, ছেলেটার ভাঙা হাত আবার জুড়ে যাচ্ছে প্রফেসর। ওই দেখুন।

প্রফেসর আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ। বাইরে চারদিকটা বরফে ঢাকা থাকার কারণে চাঁদের আলো যেন অনেকাংশে বেড়ে গেছে। সে আলোয় এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ছেলেটা যেন আরও সামনে চলে এসেছে। প্রায় গেটের কাছে চলে এসেছে। হাতটা যেন গেটের দিকে বাড়িয়ে দিয়েছে। গেট খোলার জন্যে।

সত্যি, কী আশ্চর্য প্রফেসর। চোখে কি ভুল দেখছি? কী করে এগিয়ে আসছে? হাওয়ায়?

প্রফেসরের মুখ লাল হয়ে উঠছিল। দেখলাম, উত্তেজনায় ডান হাতে ধরা বিয়ারের গ্লাস কাঁপছে। ফের সোফায় এসে বসলেন।

বিশ্বজিৎদা ঠিক এই সময় ফুট কেটে বলল,ভুল, ভুল। এই যে বললে ওয়াইন খাচ্ছিলেন। বিয়ার আবার কোত্থেকে এসে উদয় হল? বলেই নিজের ভুল বুঝতে পেরে এক হাত জিভ কেটে বললেন, যাহ্, কথা বলে ফেললাম।

অনিলিখাদি বলে উঠল, ঠিক বলেছ। ওটা ওয়াইনই হবে। কিন্তু আজকে তাহলে এটুকুই থাক...।

বলার দরকার নেই আমরা সবাই বিশ্বজিৎদার উপরে সাংঘাতিক খেপে গিয়েছিলাম। কিন্তু আর উপায় নেই। আবার এক সপ্তাহের ধাক্কা।

৩

পরের শনিবার আবার ঠিক চারটেতে অনিলিখাদি বলতে শুরু করল। আজ অনিলিখাদি একটা নীল জিন্সের প্যান্ট আর একটা লাল কুর্তি পরে এসেছে। দারুণ লাগছে দেখতে।

আমরা প্রথমেই বললাম, আমরা কিন্তু আজ কথা বলব। কোনো শর্ত মানব না। গল্প শেষ না করে উঠতে দেব না।

অনিলিখাদি বিশ্বজিৎদার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বলল, হ্যাঁ, আজ আর ইচ্ছে করে ওয়াইনের জায়গায় বিয়ার বলার দরকার হবে না। আজ বেশ খানিকটা সময় আছে হাতে।

যেটা বলছিলাম। মোম্যানটা যেন আরও সামনে চলে এসেছে। প্রায় গেটের কাছে চলে এসেছে। প্রফেসর কম্পমান হাতে ওয়াইনের গ্লাস ধরে দাঁড়িয়ে আছেন।

তারপর সোফায় বসে বললেন, অনিলিখা, যেটা কাউকে কোনো দিন বলিনি, আজ এই রাতে সে কথা বলার সময় এসেছে। সে জন্যই হয়তো ও এগিয়ে আসছে। এ কথা কেউ জানে না। কোথাও লেখা হয়নি। ও হয়তো আমার স্বীকারোক্তি চায়।

মার্চ ১৯৪৫। 'রেড আর্মি' বার্লিনের খুব কাছে এসে গেছে। আমার ওপরে নির্দেশ এল হিমলারের কাছ থেকে। গান ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়ে যাবে। কোনো শ্রমিক আর আসবে না। অ্যালায়েড আর্মি আরও কাছে আসার আগে, ক্যাম্প থেকে যারা আসত কাজ করতে, তাদের আর কোনো অস্তিত্ব রাখা চলবে না। তাদের সবার সমস্ত চিহ্ন উড়িয়ে দেওয়া হবে।

কেন?

আসলে একদম শেষের দিকে হিমলার চাইছিল, এসব অপরাধের সব প্রমাণ সরিয়ে দিতে। এসব অপরাধের কথা অ্যালায়েড আর্মি জানতে পারলে ওঁর নিশ্চিত মৃত্যু হবে। ক্যাম্পের সামান্য কিছু ইহুদিদের মুক্তির বিনিময়ে 'অ্যালায়েড পাওয়ার'-এর সঙ্গে বিশেষ বোঝাপড়ায় আসতে চাইছিল হিমলার, যাতে হিটলার পরবর্তী যুগে জার্মানির ভালো কোনও পদে ও থাকতে পারে, এমনকী ফিউরারের জায়গা নিতে পারে।

তখন এমনিতেও জার্মানির আর জেতার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। এসব জানতে পারলে ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে নির্ঘাৎ মৃত্যু। সেজন্য কেউ যেন না জানতে পারে এসব গ্যাস চেম্বারের কথা, এসব মানুষদের উপরে অত্যাচারের কথা। হিমলার তাই সব হারানো জুয়াড়ির মতো বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু এসব কৌশল কাজ করেনি। পরে ওকে সায়ানাইড খেয়ে ১৯৪৫-এর মে মাসে আত্মহত্যা করতে হয়েছিল। তবে সে তো পরের কথা। যা বলছিলাম।

আমি জানতে পেরে হিমলারের এই পরিকল্পনার প্রতিবাদ করলাম। বললাম, আর যার যাই হোক, অ্যারিয়েলের কোনো ক্ষতি হতে দেব না। কিন্তু আমার কথা শোনা হল না। হিমলার খুব একগুঁয়ে ছিল। বিশেষ করে ওঁর ধারণা হয়েছিল, অ্যারিয়েল, আমার কাছ থেকে সব গোপন তথ্য জেনে গেছে। এবং ও কোনো ভাবে ছাড়া পেলে সেটা হিমলারের জন্য খুব বড় বিপদ হবে। সেটা পরে অ্যারিয়েল প্রকাশ করে দেবে।

প্রফেসরের গলা বুজে আসছিল। একটু থেমে ফের বলে উঠলেন, আমি চাইনি অনিলিখা। কিন্তু আমার কোনো উপায় ছিল না। অ্যারিয়েল আমাকে অন্ধবিশ্বাস করত। ও জানত আমি ওর কোনো ক্ষতি হতে দেব না। হয়তো খানিকটা ঠিকই। আমি না থাকলে অনেক আগেই ওকে গ্যাস চেম্বারে যেতে হতো। কিন্তু, আমি শেষ রক্ষা করতে পারলাম না।

আজ তাই অ্যারিয়েল এসেছে। ঠিক সেই চেহারা, সেই টুপি, সেই মুখের হাসি। ও হয়তো আমার জবাব চায়।

আমি হিমলারের শর্ত পালন করেছিলাম বলে পরে বেরিয়ে আসতে পেরেছিলাম।

মে, ১৯৪৫-এ রেড আর্মি বার্লিনে ঢোকার ঠিক আগে আমি সুইজারল্যান্ডে পালিয়ে যাই। তারপরে ওখান থেকে দু-বছর বাদে আমেরিকা। নুরেনবার্গ ট্রায়ালে আমাকে ডাকা হয়নি। কেউ আমার সন্ধান পায়নি। সারা জীবন শুধু নিজের কাছ থেকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছি।

সারা জীবন বিয়ে করিনি। কারো সঙ্গে বন্ধুত্ব করিনি, যাতে কোনোভাবে খবর বাইরে ফাঁস না হয়ে যায়। নাৎসি হান্টারদের কথা নিশ্চয়ই শুনেছ! আমি তাদের চোখে ধুলো দিয়ে সারা জীবন পালিয়ে বেড়িয়েছি, যাতে আমার অবস্থা 'ইভান দ্য ডেভিল'-এর মতো না হয় বা 'ডক্টর ডেড'-এর মতো। শেষ পর্যন্ত কেউ আমাকে সন্দেহ করেনি।

তবে আমি জানতাম অ্যারিয়েল কোনো একদিন ফিরে আসবে। আজ ও ফিরে এসেছে। আমার জন্যেই এসেছে। বলে প্রায় কোনোরকমে উঠে দাঁড়িয়ে কাঁপতে কাঁপতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

আমি নীচেই ছিলাম। এরকম ঘটনার পরে ঘুম আসছিল না। একটা বই পড়ছিলাম। রাত অনেক হয়েছিল। কিন্তু, কেন জানি শুতে ইচ্ছে করছিল না। হাতে বই থাকলেও মন পড়ে ছিল ১৯৪৩-৪৪ সালে। কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে। না জানি কত এরকম মানুষ এভাবে হারিয়ে গিয়েছিল।

রাত তখন প্রায় একটা। আবার কাঠের সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনলাম। খানিকবাদে দেখি প্রফেসর ঘরে ফিরে এসেছেন। এখনো ঘুমোননি? তবে কি মৃত্যু ভয় তাঁকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে? হঠাৎ লক্ষ করলাম তিনি ধীরে ধীরে কাচের দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। তারপর পর্দা সরিয়ে বাইরের দিক তাকাতেই উনি আর্তনাদ করে উঠলেন।

তাঁর চিৎকার শুনে আমি দ্রুত জানলার কাছে ছুটে গিয়ে দেখি ছেলেটা আর গেটের বাইরে নেই। পাথরের লনে কাচের দরজা থেকে ঠিক এক হাত দূরে দাঁড়িয়ে আছে। হাত তুলে তর্জনী দিয়ে কাচের দরজা ছুঁয়ে আছে। প্রফেসরকে নির্দেশ করছে। মুখে সেই অদ্ভুত ম্লান হাসি। বোতামের চোখ দুটো যেন প্রফেসরের

উপরে স্থির।

আমি পর্দা টেনে দিলাম।

প্রফেসর ভয়ে পিছোতে পিছোতে ধপ করে সোফায় বসে পড়লেন। আস্তে আস্তে স্বগতোক্তি করে উঠলেন আমার কোনো উপায় ছিল না অ্যারিয়েল। তা না হলে ওরা আমাকে জার্মানি থেকে পালাতে দিত না। আমাকে রাশিয়ার রেড আর্মির হাতে গুলি খেয়ে বা সায়ানাইড খেয়ে মরতে হতো।

কিন্তু, আপনি তো শুধু ওকে মারেননি, অনেককেই মেরেছেন, তাই না? ১৯৪২ সালের ২০ জানুয়ারি আপনি তো রাইনহার্ডের সঙ্গে ছিলেন। যদ্দুর জানি ওয়ানসী নদীর ধারে ওই কনফারেন্সে 'ফাইনাল সলিউশন'-এর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। আপনি কি সত্যিই কিছু জানতেন না প্রফেসর? নাকি সব কিছু জেনেও আপনি চুপ করে থেকেছিলেন।

আমার কথা শুনে চমকে উঠলেন প্রফেসর।

খানিকবাদে একটু স্বাভাবিক হয়ে বললেন, অনিলিখা, যুদ্ধে হয় তুমি আমাদের মিত্র, নয় তুমি শত্রু। আমি শুধু দেশের হয়েই কাজ করে গেছি। দেশের ভালোর জন্য। আমার নিজের জন্য নয়।

তারপর কেমন যেন ঝিমিয়ে বসে রইলেন সোফায় বেশ খানিকক্ষণ।

আমি উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলাম, প্রফেসর, আপনি যাকে দেশের জন্য কাজ করা ভেবেছেন, তা মানবতার ইতিহাসে সবথেকে ঘৃণ্য ঘটনা। একজন নয়, দুজন নয়, পনেরো লক্ষ নিরীহ ইহুদিকে ওই গ্যাস চেম্বারে মারা হয়েছিল। তারা মৃত্যুর আগে ওই সব গ্যাস চেম্বারের দেওয়াল আঁচড়াতে আঁচড়াতে জীবনের শেষ নিশ্বাস নিতে নিতে আপনাদের অভিশাপ দিয়ে গেছে। এসব মৃত্যুর পিছনে আপনি ছিলেন। আপনি! ওদের সঙ্গে কাজ করেছেন আপনি!

সারা জীবন এত বড় অপরাধ করে পালিয়ে বেড়িয়েছেন। আপনার উচিত পুলিসের কাছে সব জানানো। হয়তো এতে অন্য কেউ ক্ষমা না করলেও আপনি মনের শান্তি খুঁজে পাবেন। হয়তো অ্যারিয়েল আপনাকে ক্ষমা করতে পারবে। আমি জানি আপনার মতো অনেক অপরাধী 'নুরেমবার্গ ট্রায়াল'-এর ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গিয়েছিল। তা ছাড়া নুরেমবার্গ ট্রায়ালে নাৎসি যুদ্ধপরাধীদের বিচার হলেও সে বিচার অনেক ক্ষেত্রে ঠিক হয়নি। সেখানে অনেক জাজ নিজেরাই ছিলেন নাৎসি।

যুদ্ধে আমরা যদি না হারতাম, তাহলে কিন্তু আমাদের ইতিহাস অন্যরকম ভাবে লেখা হতো। আমাদের বীর বলা হতো। আজ আমরা হেরে গেছি বলে আমাদের বিচার হচ্ছে, প্রশ্ন তোলা হচ্ছে মানবতা নিয়ে। প্রশ্ন হচ্ছে আমরা ইহুদিদের উপরে কেন অত্যাচার করেছি? কিন্তু বলো তো অনিলিখা, যে-কোনো যুদ্ধে শত্রুদের নিয়ে কী করা হয়? ওদের আমরা শত্রু মনে করতাম। শত্রু!

প্রফেসর, আপনারা কিন্তু এই বন্ধু আর শত্রুর বিচার করেছেন শুধুই ধারণার ওপর নির্ভর করে। চোখের মণি, চুলের রঙের উপরে নির্ভর করে, জাতিবাদের ওপরে নির্ভর করে। আপনার কখনো মনে হয়নি যে কত পরিবারকে আপনারা অকারণে এভাবে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন? তাদেরও আপনার মতো ঠিক একইরকম বাঁচার অধিকার ছিল, অধিকার ছিল এই পৃথিবীর আলো-বাতাস দেখার, অধিকার ছিল এই ড্রয়িংরুমে বসার।

আমি জানি আপনার মধ্যেও সামান্য মনুষ্যত্ব হয়তো কোথাও লুকিয়ে আছে। তাই আপনি অ্যারিয়েলকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন, তাই আপনি আজও বইয়ের মধ্যে একটা ছবি লুকিয়ে রাখেন, যেখানে একজন এস এস গার্ডের উদ্যত বন্দুকের সামনে এক মা তার বাচ্চাকে বুকে জড়িয়ে বাঁচানোর চেষ্টা করছে। সে ছবি আমি পেয়েছি।

উনি চুপ করে পাথরের মতো বসে রইলেন। যেন ঘণ্টা-মিনিট সেকেন্ডের হিসেবের বাইরে চলে গেছেন উনি। বুঝতে পারলাম ওঁর মনের মধ্যে একটা যুদ্ধ চলছে।

রাত তখন প্রায় দুটো। ঘুম আসছে না। প্রফেসর সামনের দেয়ালের দিকে স্থিরদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন। হঠাৎ একটা আওয়াজে চমকে উঠলাম। প্রফেসর প্রায় লাফিয়ে উঠে ফের বসে পড়লেন। কাচের দরজার উপরে কেউ যেন লাঠি দিয়ে আঘাত করছে। বুঝতে পারলাম কী হচ্ছে। স্নোম্যান ধাক্কা দিচ্ছে দরজায়।

মাঝেমধ্যে সে আওয়াজ থেমে যাচ্ছে। আবার হঠাৎ করে শুরু হচ্ছে। আরও বেশি জোরে। নেহাতই পর্দা টানা আছে। অন্তত ওর ওই মুখের দিকে তাকাতে হচ্ছে না। আমি উঠে দেখতে যাচ্ছিলাম। প্রফেসর আমার বাঁ-হাতটা চেপে ধরলেন। ফায়ারপ্লেসের আগুন প্রায় নিভে এসেছে। শুধু কিছু কাঠের গুঁড়ো ধিকি ধিকি জ্বলছে।

পরক্ষণেই যেটা হল আমরা দুজনেই তার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। কেউ যেন সজোরে ভারী কিছু দিয়ে কাচের ওপর আঘাত করল। সঙ্গে সঙ্গে দরজার মোটা কাচ ফেটে যাওয়ার আওয়াজ পেলাম। মনে হচ্ছিল যে-কোনো মুহূর্তে এবারে কাচ ঝনঝন করে ভেঙে পড়বে। আমি এবারে প্রফেসরের কোনো বারণ না শুনে দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম। পর্দা সরিয়ে দেখতে পেলাম বাইরে বাগানের সব আলো নিভে গেছে শুধু চাঁদের আলোর ভরসায় আমাদের রেখে। অন্ধকারে আমার প্রতিবিম্ব পড়ছিল কাচের ওপরে। সেজন্য বাইরে কী আছে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না। স্নোম্যানটাকে খুঁজতে গিয়ে চমকে উঠলাম। আমার ঠিক সামনেই কাচের দরজায় প্রায় মুখ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে। কাচের যে জায়গাটা ফেটে গেছে, সেখানে মুখ রেখে। খুব সম্ভবত মাথার বরফখণ্ডটা দিয়ে কাচের দরজায় আঘাত করেছে।

পিছন থেকে প্রফেসর উত্তেজিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, কী করছ অনিলিখা? পর্দা টেনে দাও।

আমি তাই করলাম। পর্দা টেনে দিলাম। ফের এসে সোফায় বসলাম। বেশ খানিকক্ষণ কেটে গেল। মনে হচ্ছিল যে-কোনো মুহূর্তে কাচ ভেঙে পড়বে। আর তখনই ওই স্নোম্যান যেন ঘরে ঢুকে আসবে। কিন্তু সেরকম কিছুই হল না। পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট, প্রায় আধ ঘণ্টা কেটে গেল। আমরা কোনও কথা না বলে চুপ করে বসে পর্দার দিকে তাকিয়ে যেন তার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম।

প্রফেসর এতক্ষণে বললেন, আমি এখন আর বিচারের ভয় পাই না। সে ভয় গত ষাট বছর ধরে আমাকে তাড়া করে বেড়িয়েছে। আসলে অ্যারিয়েল আমাকে খুব ভালোবাসত। কেন জানি আমাকে দাদার মতো মনে করত। নিজের দাদার মতো। বিশ্বাস করত। আমিই ছিলাম ওর একমাত্র বিশ্বাসের জায়গা, ওর পৃথিবী। আমার ঘৃণা যেন ওর কাছে হার মেনেছিল। আমিও ওকে খুব স্নেহ করতাম, ভাইয়ের মতো ভালোবাসতাম। কিন্তু, কেন যে সেদিন ওকে...মুখ ঢেকে ফেললেন প্রফেসর। ওইভাবেই কয়েকমুহূর্ত বসে রইলেন।

আমি তাঁকে সহজ করতে বলে উঠলাম, আমরা আমাদের নিজের মনের আকাশ গড়ি। তার সীমানা গড়ে তুলি। সেখানে আমাদের অনুভূতির লাল, নীল, সবুজ রং মিশিয়ে ভাবি, এটাই বুঝি আদর্শ পৃথিবী। ভাবি সেখানে বুঝি মেঘ বৃষ্টি-আলো-বাতাস, সব আমাদের হিসেব মতো চলবে। তার বাইরে যা জানি না, আমাদের নিয়মের মধ্যে যা পড়ে না, তার সবটাই কালো, সবটাই খারাপ। আপনার মনের মধ্যে নিশ্চয়ই কোথাও ঘৃণা ছিল, তা না হলে একটা নিরীহ বাচ্চাকে এভাবে মারতে পারতেন না।

আমার কোনো উপায় ছিল না অনিলিখা। কোনো উপায় ছিল না। হিমলার জানত অ্যারিয়েল অনেক কিছু দেখেছে, অনেক কিছু জানে। আমিও তাই শেষে ওকে বাঁচাতে পারিনি...তোমার কী মনে হয় আমি ওকে ক্যাম্প থেকে নিয়ে পালিয়ে যেতে পারতাম? হয়তো অসম্ভব ছিল না। সহজ হতো না যদিও। আমার ওপরেও নজরদারি শুরু হয়ে গিয়েছিল। যদি ধরা পড়তাম, আমাকে শেষ করতেও ওরা দ্বিধা করত না।

ধরা পড়লে কী হতো প্রফেসর? ওদের পাশে দাঁড়ালে বড়জোর আপনি একবারই মারা পড়তেন। বারবার সারাজীবন ধরে আপনি আপনার নিজের কাছে এভাবে মৃত হয়ে থাকতেন না। আপনাকে পালিয়ে বেড়াতে হতো না।

প্রফেসরের মুখে আর কোনো কথা নেই। বুঝলাম ওঁর দিক থেকে আর কিছু বলার নেই।

অনেকক্ষণ এভাবে কেটে যাওয়ার পর প্রফেসর বললেন, আচ্ছা, অনিলিখা,

তুমি আমার একটা অনুরোধ রাখবে? টেগোরের গান আমার খুব প্রিয়। আমি অবশ্য ইংরাজিতে শুনেছি। তুমি একটা গান শোনাবে? আমি জানি বাঙালি মহিলারা প্রায় সবাই খুব ভালো গায়। আজ এই শেষ রাতে তুমি একটা গান শোনাবে?

'শেষ রাত' কথাটার উপরে যেন খুব করে জোর দিলেন প্রফেসর।

আমি সে রাতে 'আগুনের পরশমণি' গেয়েছিলাম। ওই গানের ইংরাজি অনুবাদও আমার জানা ছিল। বাংলা ও ইংরাজি মিশিয়ে গেয়েছিলাম।

অবাক হয়ে দেখছিলাম প্রফেসর গানের কথাগুলো শুনে বাচ্চার মতো কাঁদছেন। গান শেষ হলে বলে উঠলেন, আরেকটা গান করতে পারবে অনিলিখা, কী অপূর্ব কথা। সত্যি। মনে হচ্ছে তোমার কথাই ঠিক। আমার নিজের এসব কথা অনেক আগে বলে দেওয়া উচিত ছিল।

সত্যি বলতে কী এরকম মন খারাপের সময় গান গাইতে খারাপ লাগছিল না। আরও দুটো গানের পর থামলাম।

প্রফেসর ফের বলে উঠলেন, অনেক ধন্যবাদ অনিলিখা। কী গান শোনালে! মনের মধ্যে অনেক দ্বিধা ছিল। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। সব সময় বজ্রপাতের ভয়ে জীবন কাটিয়েছি। এখন সে সব মেঘ কেটে গেছে। আজ বলি সে সব কথা। অ্যারিয়েলকে আমিই নিয়ে গিয়েছিলাম সেই রাতে। সেদিনও এরকম বরফ পড়ছিল। আকাশ থেকে নেমে আসছিল তুলোর মতো বরফ। সেই বরফের স্পর্শে অ্যারিয়েলের সে কী আনন্দ! চোখ-মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল। তুলোর মতো বরফ হাতে নিয়ে মুখে লাগাচ্ছিল।

ওর সঙ্গে ছিল ওর সেই টেডি বিয়ার। আমরা এসে দাঁড়িয়েছিলাম সেই কুখ্যাত বাঙ্কার ওয়ানের সামনে। কত লোকের যে ওই গ্যাস চেম্বারে মৃত্যু হয়েছে কে জানে। ইটের দেওয়ালের জন্য বাঙ্কারের নাম ছিল 'ছোট লাল বাড়ি'।

সঙ্গে ছিল আরও অনেক ইহুদি। তাদের নিয়ে আসা হয়েছিল আউসউইৎজ ক্যাম্প থেকে। কিছু কাছের ট্রেব্লিঙ্কা ক্যাম্প থেকে। সবার মুখ-চোখে তখন মৃত্যুর আতঙ্ক। আসলে সবাই জানত যে কেন ওদেরকে ওই বাঙ্কার ওয়ানের সামনে আনা হয়েছে। তারা তাদের প্রিয়জনদের জড়িয়ে ধরে শেষবারের মতো কান্নায় ভেঙে পড়ছিল। আকাশও যেন ওদের সঙ্গে কাঁদছিল।

অ্যারিয়েল কিন্তু ওর হাতের মুঠো দিয়ে আমার আঙুলগুলো জড়িয়ে ধরে রেখেছিল। কী ভরসায় কে জানে। ওর জীবনের সব চাওয়া-পাওয়া যেন আমার ওই আঙুলের স্পর্শে জড়িয়ে ছিল। আসলে বিগত দেড় বছরে সামান্য যেটুকু জীবনকে দেখেছে, পুরোটাই আমার আয়নায়, আমার ভরসায়। অন্য হাতে ধরে ছিল টেডিটাকে। মুখ উঁচু করে আকাশ থেকে নেমে আসা বরফের ছোঁয়ায়

জীবনের সবথেকে আনন্দের মুহূর্ত উপভোগ করছিল।

ওকে বলেছিলাম স্নান করতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ওই ঘরে ঢুকলে উপর থেকে বৃষ্টির মতো জল পড়বে। ওর চিন্তা ছিল টেডি এই ঠান্ডায় স্নান করতে পারবে কিনা। আমি ওকে আশ্বস্ত করেছিলাম।

ওরা ভেতরে ঢুকে যাওয়ার পরে আমি আর ওখানে দাঁড়াইনি। চলে এসেছিলাম। সেদিন আমিও কেঁদেছিলাম। সেই একবারই কেঁদেছিলাম। ঝাপসা চোখে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখছিলাম অ্যারিয়েল তখনও দরজায় দাঁড়িয়ে আমাকে হাত নাড়ছে। মুখে সেই ম্লান হাসি। তারপরে ও ভেতরে ঢুকে গিয়েছিল।

বাড়ির ছাদের উপরের কাঠের তক্তা সরিয়ে তার খানিক পরে ওখানে ছড়িয়ে দেওয়া হল জাইক্লোন বি। সেই জাইক্লোন বি যার রিসার্চের সঙ্গে আমি জড়িত ছিলাম। বিষাক্ত হাইড্রোজেন সায়ানাইড গ্যাস বেরিয়ে আসত ওর থেকে, যা সহ্য করার ক্ষমতা আমাদের কারো নেই।

দূর থেকে বাতাসে ভেসে আসছিল ওদের আর্তনাদ। সেই একবারই এতটা কাছে এসেছিলাম বাঙ্কার ওয়ানের। কিন্তু সে রাত যেন এখনও গতকালের মতোই। আমি কাঁদতে কাঁদতে বসে পড়েছিলাম সামনের রাস্তার বরফে ঢাকা মাটির ওপর। মনে হয়েছিল তখনো যেন ওর হাত ধরে আছি। সেই রাতে আকাশের বুকে অনুপস্থিত থেকে চাঁদ, তারা সবাই একযোগে যেন সেই ধ্বংসলীলার প্রতিবাদ করেছিল।

পরদিন সকালে আমি সুইজারল্যান্ডের উদ্দেশে রওনা হয়ে যাই। বলা যায় শর্ত পূরণের পুরস্কার হিসেবে। তার দু-বছর বাদে আমেরিকায় এক নতুন জীবন শুরু করি। আমি কিন্তু কোনোদিন ওকে ভুলতে পারিনি। আমার যে ওয়েভ ইকুয়েশন আছে, তার নাম ওর কথা ভেবেই রেখেছি 'অ্যারি ইকুয়েশন'।

আজ ভাবি আমি কতটা নিষ্ঠুর ছিলাম। কতটা অমানুষ ছিলাম...।

আমি লক্ষ করলাম, কথা বলতে বলতে প্রফেসরের মাথাটা কেমন বুকের কাছে ঝুঁকে পড়ছে।

খানিকবাদে দেখলাম প্রফেসর সোফাতেই হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন। হাতটা মুঠো করা। যেন সে মুঠো করা আঙুলে এখনো জীবনের শেষ রোদ্দুররেখা ধরে আছেন। এখনো ধরে আছেন অ্যারিয়েলকে।

অনিলিখাদি এতক্ষণে থামল। আমরা সবাই চুপ করে বসেছিলাম। সহেলী, এষা, সাগ্নিক, রাতুলের চোখে জল।

অনিলিখাদি খানিকবাদে বলল, এজন্য এখনও সেই রাতের সেই দৃশ্য চোখের সামনে ভাসে। প্রত্যেকটা ঘণ্টা, প্রত্যেকটা মুহূর্ত যেন এখনো চোখের সামনে দেখতে পাই।

ভোরের দিকে তুষারপাত থেমে এসেছিল। ভোরের আলোয় ঘুম ভেঙে উঠে দেখি আমিও কখন স্টাডিরুমের শেজ লাউঞ্জ চেয়ারে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি।

কিন্তু শেষে কী হল? সেই ক্রিমিনালটাকে ছেড়ে দাওনি তো অনিলিখা? দ্যাট...বিশ্বজিৎদা উত্তেজিত হয়ে একটা খারাপ কথা বলতে গিয়ে থেমে গেল।

সেই স্নোম্যান ঘরে চলে আসেনি সে রাতে? প্রফেসরকে ছেলেটা এমনি এমনি ছেড়ে দিল? তন্ময়ের একটু ড্রামাটিক এন্ড চিরকাল পছন্দ।

ওই প্রফেসরকে তুমি পুলিশের হাতে তুলে দাওনি? সহেলী রুমাল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বলে উঠল।

আমরা সবাই নানান প্রশ্ন ছুড়ে দিলাম অনিলিখাদির উদ্দেশে।

অনিলিখাদি বলে উঠল, এবারে একটা কথা বলি। ইংল্যান্ডের সিক্রেট ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস 'MI 6' আর পুলিশ কিন্তু এতে আগে থেকেই যুক্ত ছিল। ঘটনার মাসছয়েক আগে ফ্রান্সে এক নাৎসি ক্রিমিনাল ধরা পড়ে। তখন তার বয়স পঁচাশি বছর। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় জানা যায় যে 'জাইক্লোন বি' এবং গ্যাস চেম্বারের রিসার্চের সঙ্গে যুক্ত এক প্রধান নাৎসি বিজ্ঞানী এখনও বহাল তবিয়তে বেঁচে আছেন। বহু বছর আগে সেই বিজ্ঞানী সুইজারল্যান্ড থেকে আমেরিকায় পালিয়ে যায়। সেখানেই আছেন।

ফ্রেঞ্চ পুলিশ আমেরিকার CIA ও FBI-কে সে বিষয়ে জানায়। ইজরায়েলি গোয়েন্দা সংস্থা 'মোসসাদ'-ও সারা বিশ্ব জুড়ে তল্লাশি চালু করে। এত বড় একজন অপরাধী জেলের বাইরে থাকবে এটা কেউ মেনে নিতে পারেনি।

কিন্তু আমেরিকায় সেরকম কাউকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। আসলে প্রফেসর তার আগেই আমেরিকা ছেড়ে ইংল্যান্ডে চলে এসেছেন।

উনি ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তি। কোনোরকমভাবে অতীত অপরাধের কোনো চিহ্ন রাখেননি। অন্য কোনো নাৎসির সঙ্গেও যোগাযোগ রাখেননি। এমনকী, কর্মক্ষেত্র পাল্টে নিয়েছিলেন।

ছিলেন বিখ্যাত কেমিস্ট। পরবর্তীক্ষেত্রে হয়ে ওঠেন বিখ্যাত পদার্থ বিজ্ঞানী।

কিছু কারণে, বিশেষ করে ওই নাৎসি ক্রিমিনালের থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ইংল্যান্ডের সিক্রেট ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস 'MI 6'-এর প্রফেসর ম্যাথিয়াসের উপর সন্দেহ হয়। শুধু ওঁর উপরে নয়, এরকম আরও বেশ কয়েকজনের ওপরে। কিন্তু, হঠাৎ করে তো আর বাড়িতে এসে সার্চ করা যায় না। বিশেষ করে এরকম এক শীর্ষস্থানীয় বিজ্ঞানীকে। তাছাড়া এটা নেহাতই সন্দেহ।

ওরা তাই সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। আমি লাইব্রেরি থেকে হোটেলে আসার পরে আমার কাছে একটা ফোন আসে। পুলিশের চিফ ইন্সপেক্টর অ্যালানের কাছ থেকে। উনি 'MI 6'-কে এ ব্যাপারে সাহায্য করছিলেন। তিনি

আমার কীর্তিকলাপের বেশ কিছু কথা আগে থেকেই জানতেন।

তিনিই আমাকে জানান যে ওরা এবিষয়ে আমার সাহায্য চান। যখন প্রফেসরের বাড়িতে যাব তখন যদি একটু এ ব্যাপারে ওঁর সঙ্গে কথা বলে দেখতে পারি। কিন্তু সরাসরি কোনো প্রশ্ন করলে চলবে না। সে ক্ষেত্রে প্রফেসার কিছু বলবেন না। খুব বুদ্ধিমান ব্যক্তি। আগেও কয়েকজন চেষ্টা করেছিল। কোনো তথ্য বার করতে পারেনি।

সেজন্য বলা বাহুল্য, ওদের হয়ে আমি কাজটা করেছিলাম।

পরের দিন সকালে অ্যালানকে সব খবর দিয়েছিলাম। পুলিশ তদন্তের সময় প্রফেসর, ওঁর সব অপরাধ স্বীকার করে নিয়েছিলেন। আমার সব ধারণা ঠিকই ছিল। উনি হিমলার ও রাইনহার্ড 'ফাইনাল সলিউশন'-এর দুই মূল কাণ্ডারীর খুব কাছের লোক ছিলেন। আউসউইৎজ ক্যাম্পের প্রধান রবার্ট হেসকেও ভালো করে চিনতেন। মাঝেমধ্যে ওরা সবাই মিলে পার্টিও করতেন। একটা বিশেষ কারণের জন্য প্রফেসর এদের সবার থেকে বয়সে অনেক ছোট হওয়া সত্ত্বেও সবার প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিলেন।

এতজন ইহুদিকে একসঙ্গে মারার কোনো ভালো উপায় পাওয়া যাচ্ছিল না। সেখানে 'জাইক্লোন বি' ব্যবহার করে গ্যাসের মাধ্যমে অজস্র লোককে মারার পদ্ধতি বার করার পিছনে প্রফেসরের বড় অবদান ছিল। এসবই প্রফেসর স্বীকার করেছিলেন। ওঁকে ট্রায়ালের জন্য জার্মানি নিয়ে যাওয়ার কথা হচ্ছিল। কিন্তু দশদিনের মাথায় জেলের মধ্যে প্রফেসর ম্যাথিয়াস আত্মহত্যা করেন। সায়ানাইড খেয়ে।

অনিলিখাদি থামল।

কিন্তু ওই স্নোম্যান। ওটা কী সত্যি ভূত ছিল? মানে অ্যারিয়েলের ভূত? প্রতীক বলে উঠল।

অনিলিখাদি একটু হেসে নিয়ে বলল, বোধহয় না। আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে প্রফেসর কিছু একটা লুকোচ্ছেন। তিনি অনেক কিছুই জানেন। সে জন্য কিছু কথার মধ্যে সামঞ্জস্য ছিল না। কথা যত এগোচ্ছিল, আমার ধারণা আরো দৃঢ় হচ্ছিল। বিশেষ করে ছবিটা পাওয়ার পরে আর কোনো সন্দেহ ছিল না। ওটা ছিল একটা খুব বড় প্রমাণ। আমার জানা ছিল ওই দিনেই বার্লিনের উপকণ্ঠে নদীর ধারে সিদ্ধান্ত হয়েছিল 'ফাইনাল সলিউশন'-এর।

সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে একজন ইউরোপীয় ইহুদিকেও বাঁচতে দেওয়া হবে না। সে বাচ্চাই হোক বা বুড়োই হোক। সেখানে প্রফেসর ছিলেন মানে উনি এর সব কিছুই জানতেন।

স্নোম্যানটা শুধু শুধু এগোচ্ছিল না। যখনই প্রফেসর বাড়ির অন্য কোথাও

যাচ্ছিলেন,পুলিশের একজন লোকই ওই স্নোম্যান বারবার সামনে নিয়ে আসছিল আমার নির্দেশ মতো। আমার সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল।

প্রফেসর প্রথমবার অবশ্য শুধু শুধু ভয় পেয়েছিলেন। তখন ওই স্নোম্যান আমার ধারণা একই জায়গাতেই ছিল। তবু প্রফেসর একটা সাধারণ স্নোম্যান দেখে ভয় পেয়েছিলেন বলে আমার প্রথম সন্দেহ হয়। মনে হয় যদি সত্যি করে ওই স্নোম্যানকে এগিয়ে এগিয়ে আনা যায়, তাহলে এর পিছনের আসল ঘটনাটা জানা যাবে। জানা যাবে কে ছিল এই অ্যারিয়েল।

তখনই আমি অ্যালানকে ফোন করে সাহায্য চাই। ভাগ্য সহায় ছিল। সেদিন এরকম তুষারপাত না হলে কোনো কিছুই সম্ভব হতো না।

পুলিশের লোকই দু-তিনবার এগিয়ে নিয়ে এসেছিল স্নোম্যানটাকে, যাতে ওর মধ্যে একটা ইলিউশন তৈরি হয়। উনি আরও ভয় পান। খেয়াল করলে হয়তো উনি বরফের ওপর পায়ের ছাপ দেখতে পেতেন। যদিও অবিশ্রান্ত তুষারপাতের জন্য সে দাগ মুছে যাচ্ছিল। কাচের ওপর ধাক্কা দিতেও আমিই বলেছিলাম।

পুরো কথার রেকর্ডিং আমি পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছিলাম। যদিও তার প্রয়োজন হয়তো হতো না। উনি পরে নিজেই সব স্বীকার করে নিয়েছিলেন। কিন্তু যে লোকটা সারা জীবন তার অপরাধের থেকে লুকিয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছে, তাকে তার অপরাধের কথা মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য এই ভয়টুকু দেখানো জরুরি ছিল।

স্নোম্যান এগিয়ে আসার জন্য ভয় পাওয়া দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম যে, প্রফেসরের সম্বন্ধে সন্দেহটা সঠিক।

প্রফেসর যাদের কথা বলছিলেন, নাৎসি পার্টিতে তাদের সবার পজিশন আমার জানা ছিল। তাদের কথা শুনে বুঝতে পারি যে, আসলে প্রফেসার ম্যাথিয়াস হিটলারের ইনার সারকেলের একজন লোক ছিলেন। কিন্তু, ওঁর বিরুদ্ধে কোনো সরাসরি প্রমাণ ছিল না। ঠিক সময়মতো উনি জার্মানি থেকে পালিয়ে বাইরে চলে গিয়েছিলেন। অপরাধের কোনো চিহ্ন রাখেননি কোথাও। এমনকী পরে আমেরিকা ছাড়ার কারণও সেটাই হয়তো ছিল। কারণ আশি-নব্বইয়ের দশকে অনেক নাৎসিকে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল। বাকিদের খোঁজ চলছিল।

প্রফেসরের আসল নাম ছিল কার্ল ফিশার। কার্ল ছিল হিটলার ও হিমলারের প্রিয়পাত্র।

এতদূর শুনে বিশ্বজিৎদা বলল, পুরোটা বুঝলাম। কিন্তু শুরুর 'বোধহয়'টা বুঝলাম না। পুলিশ যদি স্নোম্যানটাকে টেনে নিয়ে এসে থাকে, তাহলে আবার

'কিন্তু কিন্তু' কেন? ম্যাটার এন্ডস দেয়ার। ওটা ভূত ছিল না। অ্যারিয়েল নামের কোনো ছেলে ছিল না। ওটা ছিল শুধু একটা বাচ্চা ছেলের বানানো স্নোম্যান। তাই তো?

অনিলিখাদি বলল, হ্যাঁ, আসছি সে প্রসঙ্গে। পরের দিন আমাকে প্রায় বিকেল অব্দি প্রফেসরের বাড়ি থাকতে হয়েছিল। প্রফেসরকে ওরা নিয়ে যায় প্রায় বিকেল তিনটে নাগাদ। বাড়ি থেকে বেরোনোর আগে আমি সামনের লনে গিয়েছিলাম ঘটনার আসল হিরো 'স্নোম্যান'টাকে দেখার জন্য।

সেদিন বাইরে ছিল ঝলমলে রোদ। বরফ দ্রুত গলছিল। ইতিমধ্যে বরফের তিনটে বল খুলে গিয়ে পাথরের উপরে আলাদা আলাদাভাবে পড়েছিল। টুপি, বোতাম, চোখ সবই অবশ্য তখনো একইরকমভাবে লাগানো ছিল। হঠাৎ চোখ পড়ল কিছু দূরে বাগানের সেই জায়গায় যেখানে স্নোম্যানটা প্রথমে বানানো হয়েছিল।

ঘাসের উপরে বরফ তখনো গলেনি। তাই দূর থেকে সবটাই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। সেখানে খয়েরি রঙের কী যেন একটা জিনিস পড়েছিল! কাছে গিয়ে জিনিসটা দেখেই চমকে উঠলাম। একটা ছোট্ট টেডি বিয়ার। খুব পুরোনো। নানান জায়গায় ছিঁড়ে গেছে। কী করে যে ওটা ওখানে এল কে জানে!

মানে? কী বলছ? ওটা কী তাহলে সত্যি অ্যারিয়েল ছিল?

কে জানে! আরেকটা কথা না বললেই নয়। ফিরে এসে যখন স্নোম্যানের মুখের দিকে তাকালাম, অর্থাৎ পাথরের ওপরে পড়ে থাকা ওপরের বরফের বলটা দেখলাম, তখন চারদিকে দিনের আলো। স্পষ্ট আলোয় যে মুখটা দেখলাম, সেটা কোনো বাচ্চার পক্ষে তৈরি করা সম্ভব নয়। ইনফ্যাক্ট কোনো শিল্পীর পক্ষেও করা সম্ভব নয়। ঠিক যেন একটা আট-নয় বছরের বাচ্চার মুখ। মুখে সেই ম্লান আবছা হাসি, সেই বোতামের চোখে এক অদ্ভুত জীবন্ত দৃষ্টি। যেন আমার মধ্যেও খুঁজে চলেছে সেই হারিয়ে যাওয়া আপনজনদের। সে দৃষ্টি বর্ণনা করা সম্ভব নয়। এর অর্থ আর কী হতে পারে?

অনিলিখাদি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমার একটা কথা মনে হয়েছিল। এরকম হতে পারে যে, কোনোভাবে ওই টেডি বিয়ারটা প্রফেসারের কাছেই ছিল। ওটা ওই রাতেই প্রফেসর রেখে এসেছিলেন তার প্রিয় অ্যারিয়েলের জন্য।

প্রফেসার পুলিশ কাস্টডিতে থাকাকালীন আমার ওই প্রশ্ন শুনে চমকে উঠেছিলেন। বলেছিলেন, টেডি বিয়ার? না, না। সেরকম কিছু আমার কাছে ছিল না। ও তো সেটা নিয়েই ঢুকেছিল বাঙ্কার ওয়ানে। আমি জানি আমার ভুল হতে পারে না। ওটা অ্যারিয়েলই ছিল। ওর কাছে আমার হয়ে ক্ষমাপ্রার্থনা কোরো অনিলিখা। আমি ওকে ঠকাতে চাইনি। কিন্তু নিজেকে বাঁচাতে গিয়ে যা করেছিলাম

তাকে কোনোভাবে ক্ষমা করা যায় না। যারা তোমাকে বিশ্বাস করে, যারা তোমাকে সত্যি খুব ভালোবাসে, তাদের যখন তুমি ঠকাও, তখন তোমার আর বাঁচার অর্থ থাকে না।

আর কোনো কথা বলেনি প্রফেসর। শামুকের মতো নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিলেন। দু-মিনিট বাদে আমিও উঠে পড়েছিলাম।

এর একদিন বাদে উনি সায়ানাইড খেয়ে কাস্টডিতে সুইসাইড করেন।

কিছু প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় না। তবে এটা ঠিক যে, ওরকম মুখের হাসি আর চোখের সেই দৃষ্টি কোনো স্নোম্যানের হতে পারে না। সে দৃষ্টিতে যেন মিশে ছিল নতুন জীবন শুরু করার স্বপ্ন।

লক্ষ করলাম অনিলিখাদির চোখের কোণটা চিকচিক করে উঠল।





জন্ম ১৮ এপ্রিল ১৯৭০, কলকাতায়। হিন্দু স্কুলের অত্যন্ত কৃতী ছাত্র। পরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং ও আইআইএম কলকাতা থেকে অপারেশনস ম্যানেজমেন্ট নিয়ে পড়াশোনা। বর্তমানে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে উচ্চপদে কর্মরত ও সেই সূত্রে ইংল্যান্ডে প্রবাসী। কর্মসূত্রে বিশ্বের নানান দেশে দীর্ঘদিন থেকেছেন।

লেখালেখির শুরু ১৯৯৪-এ কিশোর ভারতী ও আনন্দমেলার পাতায়। লেখার বিষয় প্রধানত কল্পবিজ্ঞান, রহস্য, অ্যাডভেঞ্চার ও ভৌতিক হলেও সাহিত্যের সব ধারাতেই অত্যন্ত জনপ্রিয়।

তাঁর লেখা একাধিক গল্পের নাট্যরূপ জনপ্রিয় এফ এম চ্যানেলে ও স্টোরিটেলে পরিবেশিত হয়েছে। 'স্পটিফাই অরিজিনাল'-এ অনিলিখার বিভিন্ন উপন্যাসকে ঘিরে পডকাস্ট হয়েছে যা 'বেস্ট ফিকশন প্রোডিউসড' অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে 'ইন্ডিয়া অডিও সামিট'- এ। গদ্যসাহিত্যে অবদানের জন্য পত্রভারতী থেকে ২০১৮-তে পেয়েছেন দীনেশচন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার, ২০২২-এ সানডে টাইমস কলকাতা থেকে কিশোরসাহিত্যে সেরা সাহিত্যিকের পুরস্কার।

পত্রভারতী থেকে প্রকাশিত বই—অনিলিখা রহস্য সমগ্র ১, অনিলিখা ও অনিলিখা, ভৌতিক অলৌকিক, সব লজিকের বাইরে এবং গ্লোবাল ওয়ার্মিং।

প্রচ্ছদ রঞ্জন দত্ত